বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং ২২০।৮
শ্রেণী সং
কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২২০।৮

জন্মভূমি।

অষ্টম ভাগ—অষ্টম বর্ষ।

১৩০৪ সালের পৌষ হইতে ১৩০৫ সালের অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত।

দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।

কলিকাতা,

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেশিন প্রেসে

শ্রীঅরুণোদয় রায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০৫ সাল।

মূল্য ॥৵৹ দশ আনা

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভক্তির ভগবান্	১
বাঙ্গলা ভাষার লেখক ৮, ২৭, ৪৫, ৭৯, ৯৯, ১৪৩, ১৬১	
রাজলক্ষ্মী ১৩, ২৯, ৩৩ ৭০,৮১	
বাঙ্গলা সংবাদপত্রের ইতিহাস ১১, ৪০, ১২৪, ১৫৩	
বাঙ্গালার জমীদার	১৭
ভক্তিতে মুক্তি	২০
দুর্গামঙ্গল-কাব্য	৫২
জমিদার-নির্য্যাতন	৬০
৺কবি রসসাগরের জীবনচরিত ...	৬৪
মন্ত্রের সাধন	৬৫
পরলোকগতা	
সতী রাধাকিশোরী	৮৭
নাটোর রাজবংশ	৮৯
যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ	৯১
রমণীগণের অবস্থা ও শিক্ষা	৯২
বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা	৯৭
লণ্ডন	১০৬
সেক্সপিয়র	১১২
আমার সেই অমূল্য মণি	১১৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন	১১৮
কাল দায়রা	১২৭
সাম্যবাদেই সর্ব্বনাশ	১২৯
ঘু—ঘু—ঘু	১৩৩
অসভ্য জাতির ধর্ম্ম-সংস্কার	১৩৫
ভূত নয় বর্ত্তমান	১৩৭
মাছ-ধরা	১৪১
উৎসবে হিন্দু	১৪৫
গুহাবাস	১৪৮
চুম্বনের নীলাম	১৫১
একটু বিজ্ঞান	১৫৬
লৌহযুগে লৌহমাহাত্ম্য	১৫৯
বড় লাটের ভালবাসা	১৬৮
মদের ভোট	১৭১
বোম্বেটে	১৭৩
হিন্দুরমণীগণের অবস্থা ও শিক্ষা ...	১৭৭
কোথায় কেন্দ্র	১৮০
সুখের মাপ	১৮৩

জন্মভূমি।

অষ্টম ভাগ। } পৌষ। ১৩০৪। { ১ম সংখ্যা।

ভক্তির ভগবান্।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥"

কোন দেশে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি নিতান্ত নির্দ্ধন ছিলেন না। সংসার-নির্ব্বাহোপযোগী ধন-সম্পত্তি এক প্রকার বেশ ছিল। ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র। সাধ করিয়া তাঁহর নাম পুণ্ডরীকাক্ষ রাখিয়াছিলেন। ছেলেটী বড় হইলে তাঁহার উপনয়ন হইল। পুণ্ডরীকাক্ষ যেমন মেধাবী, তেমনি শিষ্ট ও শান্ত ছিলেন। অল্পকাল মধ্যে তিনি বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িয়া ফেলিলেন। তাঁহার দীক্ষাও হইল। বাল্যকাল হইতে তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল; বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে সে ভক্তি, সে অনুরাগ আরও বাড়িয়া উঠিল। পূর্ব্বে তিনি নিত্যস্নায়ী ছিলেন। এখন তিনি ত্রিসন্ধ্যা-স্নায়ী ও নিত্যব্রতাবলম্বী হইয়া উঠিলেন। প্রত্যুষে স্নানের পর পুষ্পচয়ন করিয়া পূজা করিতে বসিতেন। তাহা শেষ হইলে শাস্ত্রালোচনা করিতেন। পুনরায় স্নান করত আহারাদি সমাপনানন্তর পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত হইতেন। সন্ধ্যা সমুপস্থিত হইলে, আবার স্নান করিয়া ঈশ্বরারাধনায় সময় অতিবাহিত করিতেন। এই ভাবে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল।

অল্প বয়স হইতে পুণ্ডরীকাক্ষকে এরূপ দেবারাধন-নিষ্ঠ, সদাচারপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় এবং সংযতচিত্ত দেখিয়া পিতার মনে অপরিসীম আহ্লাদ হইত; কিন্তু সংসার-ধর্ম্মে তাঁহার মন নিতান্ত অনাসক্ত দেখিয়া কখন কখন তিনি চিন্তান্বিত হইতেন। যাহা হউক, তিনি এক শুভ দিনে পুত্রের বিবাহ দিলেন। বিবাহ দিয়া ভাবিলেন, এখন হইতে তাঁহার পুত্র সংসারে মন দিবেন। কিন্তু তাঁহার সে অভিপ্রায় বৃথা হইল;—পুণ্ডরীকাক্ষের কোন পরিবর্ত্তনই হইল না। তিনি এক দিন তাঁহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন,—"পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি সর্ব্বদা পূজা-অর্চ্চনা এবং ঈশ্বরারাধনা করিয়া সময় কাটাও, ইহাতে আমি যে কত সুখী, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু যদি তুমি সময় মত সংসার-কার্য্যে মন দাও, তাহা হইলে বিশেষ আহ্লাদের বিষয় হয়। আমি যে চিরকাল বাঁচিব, এমন নহে। আর তুমি ইহা বেশ জান, মনুষ্যের জীবিত-কাল সহজে অল্প, তাহাতে আবার কত বিঘ্ন। পক্ষান্তরে মৃত্যু আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলিতেছে, কেবল কাল প্রতীক্ষা করিতেছে মাত্র। সুতরাং আমি কখন্ আছি, কখন্ নাই। তাই বলিতেছি, তুমি এখন হইতে যদি বিষয়-সম্পত্তি না দেখ, তাহা হইলে পরিণামে তোমাকেই বড় কষ্ট পাইতে হইবে।"

পিতৃ-আজ্ঞা-প্রতিপালক, বিনয়-ভূষণ পুণ্ডরীকাক্ষ পিতার সকল কথা শুনিলেন; কিন্তু সাহস করিয়া কোন কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। এইরূপ পিতা মধ্যে মধ্যে সংসারিক বিষয়ে পুত্রের মন আকৃষ্ট করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইতেন, কিন্তু পুত্র সর্ব্বদাই তাহা হইতে দূরেই থাকিতেন। সময়ক্রমে পুণ্ডরীকাক্ষের সন্তানাদি হইল; কিন্তু তথাপি অনন্যচিত্ত হইয়া সেই সর্ব্বজীবের আশ্রয় পরম দেবতা হরির পদচিন্তাভিন্ন অন্য কিছুতেই তাঁহার মন অনুরক্ত হইল না। এই ভাবে তাঁহার দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। কিছু দিন পরে পুণ্ডরীকাক্ষের পিতার মরণান্তিক রোগ হইল। অনেক প্রকার চিকিৎসা করিয়াও কোন ফল দর্শিল না। শেষে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

পুণ্ডরীকাক্ষ এখন একাকী। সংসারের গুরুভার তাঁহার উপর পড়িল। একে তিনি সাংসারিক কার্য্যে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন, তাহাতে আবার পৃথিবীর সকল লোককে সমধিক বিশ্বাস করিতেন। কাজেই তাঁহাকে পদে পদে প্রতারিত হইতে হইল। বঞ্চনাপ্রিয় ব্যক্তিরা তাঁহাকে অসামান্য সরল প্রকৃতির লোক দেখিয়া বিষয়াদি ঠকাইয়া

লইতে লাগিল। পুণ্ডরীকাক্ষের স্ত্রী তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে সাবধান করিয়া দিতেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইত না। একে একে বিষয়াদি যাহা ছিল, তাহা গেল; যে বাড়ীখানি ছিল, তাহা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া গেল। পুণ্ডরীকাক্ষ কোন প্রকারে একখানি কুঠীর নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতেই বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য কখন একাকী আসে না,—অনেক অনুচর সঙ্গে করিয়া আনিয়া থাকে। একে ত পুণ্ডরীকাক্ষের বিষয়-আশয়, ঘর-বাড়ী—যাহা কিছু ছিল, তাহা সব একে একে গেল। দুইটী পুত্র হইয়াছিল, তাহারাও অকালে চক্ষু মুদ্রিত করিল। এখন কেবল মাত্র একটী কন্যা রহিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই,—পুণ্ডরীকাক্ষ অবিচলিত ধৈর্য্য সহকারে এই সকল বিপদ্ সহ্য করিতে লাগিলেন; তাঁহার মনের কোন প্রকার ভাবান্তর উপস্থিত হইল না। তাঁহার নিত্যতৃপ্ত প্রসন্ন বদন দেখিলে কাহারও একবার মনে হইত না যে, তিনি সংসারের অরুন্তুদ যাতনায় এত কষ্ট পাইতেছেন। তিনি যে সর্ব্বসুখাস্পদ হরির পরম পদ প্রাপ্তির অভিলাষে পার্থিব সকল সুখকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে করিতেন, এই সঙ্কট কালেও তাঁহার সেই মহোন্নত চিত্ত ভগবানের প্রতি ক্রমশঃ দৃঢ়রূপে সমাসক্ত হইতে লাগিল।

যতই দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, পুণ্ডরীকাক্ষের কষ্ট ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। স্ত্রীর অলঙ্কার, গৃহোপকরণ—যাহা কিছু ছিল, তাহা সবই বিক্রয় করিতে হইল। অবশেষে সংসার একেবারে অচল হইয়া পড়িল। কাল কি খাইবেন, সে সংস্থান পুণ্ডরীকাক্ষের আর থাকিল না। তিনি নিতান্ত উপায়হীন হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। প্রত্যহ তিনি দৈনন্দিন কাজ সমাপন করত ভিক্ষার্থে বহির্গত হইতেন, যাহা কিছু মিলিত, তাহাতে কোন দিন বা অর্দ্ধাশনে, আবার না মিলিলে, কোন দিন অনশনে কাটিত। ইহাতেও পুণ্ডরীকাক্ষের মনে দুঃখ বা ক্ষোভের লেশ মাত্রও ছিল না। তিনি পূর্ব্বেরন্যায় প্রমুদিত-চিত্তে ঈশ্বরারাধনায় নিযুক্ত থাকিতেন।

সময় কাহার সুখ-দুঃখ সম্পদ্-বিপদের জন্য অপেক্ষা করে না; যেমন আসে, তেমনি চলিয়া যায়। পুণ্ডরীকাক্ষের ত এত কষ্ট, তথাপি কোন প্রকারে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার আর একটী নূতন বিপদের সূচনা হইল। তাঁহার একটী কন্যা ছিল, সেটী বিবাহের যোগ্যা হইয়া উঠিল। পেটে অন্ন যুটুক আর না যুটুক, কোন প্রকারে বরস্থা কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে হইবে, এ চিন্তা পিতা মাতার মনে অনুক্ষণ জাগরিত থাকে। কিন্তু সেই বিষয়ানুরাগ-বিহীন কেবল ধর্ম্মনিরত পুণ্ডরীকাক্ষের এ চিন্তা মনে কখন যে স্থান পাইত, এমন বোধ হয় না। যিনি আপনার লাভালাভ, সুখ-দুঃখ, প্রিয়-অপ্রিয়, জীবন মরণ সকল জগদীশ্বরের চরণে সমর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার আর অন্য চিন্তায় প্রয়োজন কি? সে যাহা হউক, পুণ্ডরীকাক্ষ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইলেও, তাঁহার স্ত্রী নিতান্ত নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি দেখিলেন, তাঁহার কন্যা বিবাহের যোগ্যা হইয়া উঠিয়াছে, অথচ বিবাহের কোন চেষ্টাই হইতেছে না। ইহা দেখিয়া তিনি বিশেষ চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি সময় পাইলেই কন্যার বিবাহের কথা স্বামীর নিকট উপস্থিত করিতে ছাড়িতেন না। পুণ্ডরীকাক্ষ বলিতেন,—"চিন্তা কি? নারায়ণ আছেন, তিনি অবশ্য একটা উপায় করিয়া দিবেন, তুমি বেশী উতলা হইও না।" এই কথা বলিয়া তিনি স্ত্রীকে তখন শান্ত করিতেন। কিন্তু এদিকে যত দিন যাইতে লাগিল, মেয়েটীর বয়সও তত বাড়িতে লাগিল, অথচ পুণ্ডরীকাক্ষকে সে বিষয়ে কোন চেষ্টা করিতে দেখা গেল না। ব্রাহ্মণী আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। এক দিন উপযুক্ত অবসর দেখিয়া পুণ্ডরীকাক্ষকে ধরিয়া বসিলেন। তিনি বলিলেন,—"মেয়েটীত বেশ বিবাহের যোগ্যা হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে ত আর ঘরে রাখা যায় না। তুমি সর্ব্বদাই পূজা-অর্চ্চনা লইয়া ব্যস্ত থাক, মেয়েটীর জন্য ত একটী পাত্র দেখা প্রয়োজন?"

"পুণ্ডরীকাক্ষ মৃদু-মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"ব্রাহ্মণি! তুমি মেয়েটীর বিবাহের জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছ কেন? নারায়ণের ইচ্ছা হইলে সবই সম্পন্ন হইয়া যাইবে, আমাদের চেষ্টায় বিশেষ কোন ফল হইবে না।"

ব্রাহ্মণী। নারায়ণের ইচ্ছা না হইলে যে কিছু হয় না, তাহা আমি অবশ্য বুঝি; কিন্তু তোমার ত চেষ্টা করা চাই! চেষ্টা না করিলে বর ত আর আপনি তোমার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইবে না?

পুণ্ডরীকাক্ষ। হরির ইচ্ছা হইলে বর তোমার বাড়ীতে আসিয়াই উপস্থিত হইবে, তজ্জন্য তোমার কোন প্রকারই কষ্ট পাইতে হইবে না। তুমি ইহা নিশ্চয় জানিও, ভগবানের অভিমত না হইলে মানুষের চেষ্টায় কোন ফল দর্শে না। আমি সকল দেবাধিপতি সর্ব্বশরণ্য হরির পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত আছি। তাঁহার করুণা অপার এবং অসীম। যখন সেই দয়াময়ের দয়া হইবে, তখন তোমার কন্যা যে কখনই অবিবাহিতা থাকিবে না, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পুণ্ডরীকাক্ষের এই প্রকার যুক্তিযুক্ত মাধুর্য্যভূষিত কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণী আর সে দিন কোন কথা বলিলেন না। এই ভাবে আরও কিছু দিন কাটিয়া গেল। এদিকে কন্যাও শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মেয়েটী ক্রমশঃ নিতান্ত অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিল। পাত্রের চেষ্টাও কাহার নাই, কিংবা তাহার কোনরূপ সুবিধা হইয়া উঠিল না দেখিয়া ব্রাহ্মণী আর স্থির থাকা উচিত বিবেচনা করিলেন না। তিনি একদিন সময় বুঝিয়া পুণ্ডরীকাক্ষকে বলিলেন,—"মেয়েকে ত আর ঘরে রাখা দায় হইয়া উঠিয়াছে। পাড়ার লোকেরা নানা কথা বলিতে আরম্ভ

করিয়াছে; কেহ কেহ বিদ্রূপ করিতে ছাড়িতেছে না। আমি তাহাদের কথা শুনিয়া মরমে মরিয়া রহিয়াছি। আর যাহার ঘরে এত বড় আইবড় মেয়ে, তাহারই বা কেমন করিয়া আহার-নিদ্রা হয়, তাহা ত আমি বুঝিতে পারি না। আমি স্ত্রীলোক, আমার দ্বারা ত অধিক কিছু হইবার যো নাই। যাহা হউক, তুমি একেবারে উদাসীন হইয়া থাকিলে মেয়েটীর বিবাহ হওয়া ভার হইবে বলিয়া বোধ হয়।"

পুণ্ডরীকাক্ষ পূর্ব্বের ন্যায় অক্ষুব্ধভাবে, ও অচঞ্চল চিত্ত হইয়া, উত্তর করিলেন,—"ব্রাহ্মণি! আমি তোমাকে কতবার বলিয়াছি; আমাদের যত্নে ও চেষ্টায় কোন কাজই সম্পন্ন হয় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবানের ইচ্ছা না হইতেছে, ততক্ষণ তোমার আমার সহস্র চেষ্টায় কোন ফল ফলিবে না। তুমি অনর্থক ব্যাকুল হইয়া কেবল মনের শান্তি নষ্ট করিতেছ মাত্র।"

ব্রাহ্মণী পুণ্ডরীকাক্ষের স্ত্রী, তাঁহার কোন প্রকার স্তোভ বাক্য শুনিবেন না বলিয়া পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন, তাই বলিলেন,—"যখনই মেয়ের বিবাহের কথা উপস্থিত হয়, তখনই তুমি ঐ কথাই বলিয়া থাক, কিন্তু এ পর্য্যন্ত বিবাহের কোন সুযোগই হইল না, তুমিও কোন প্রকার চেষ্টা করিলে না, আর ভগবান্ও তোমার বাড়ীতে এপর্য্যন্ত কোন পাত্রও পাঠাইয়া দিলেন না। এখন উপায়?"

পুণ্ডরীকাক্ষ। নারায়ণের প্রতি অচলা ভক্তি থাকিলে দেখবে, তিনি এমন উপায় করিয়া দিবেন যে, অতি সহজে তোমার কন্যার বিবাহ হইয়া যাইবে, তোমাকে কোন কষ্টই পাইতে হইবে না।

ব্রাহ্মণী। আমি আর তোমার কোন কথাই শুনিব না। যাহাতে মেয়েটীর বিবাহ হয়, তাহার উপায় তোমাকে কালই করিতে হইবে। আমি তোমাকে আর নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে দিব না।

ব্রাহ্মণীর এ প্রকার নির্ব্বন্ধাতিশয়তা দেখিয়া পুণ্ডরীকাক্ষ মনে মনে কিছু ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন,—"যদি তোমার এতই জেদ হইয়া থাকে, তাহা হইলে কাল প্রাতে উঠিয়া যাহার মুখ দেখিব, তাহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিব। ইহার আর কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না।"

পুণ্ডরীকাক্ষের এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণী নিরতিশয় কাতর হইয়া বলিলেন,—"তুমি একি কথা বলিলে? এমন কথা মুখে আনিতে নাই। কাল সকালে যদি তুমি কোন হাড়িমুচির মুখ দেখ, তাহা হইলে তাহাকেই কি কন্যা সম্প্রদান করিবে?"

পুণ্ডরীকাক্ষ। যদি ভগবানের তাহাই অভিপ্রেত হয়, আর যদি আমার কন্যার ভাগ্যে তাহাই থাকে, তাহা হইলে আমি তাহার অন্যথা করিতে কখনই সমর্থ হইব না। আমি বিশেষ দৃঢ়তার সাহত বলিতেছি, কাল প্রাতে যাহার মুখ দেখিব, তাহার হাতে কন্যা সমার্পণ করিতে কিছুমাত্র কাতর হইব না।

পুণ্ডরীকাক্ষের এই নিদারুণ কথা শুনিয়া তাঁহার স্ত্রী একান্ত হতাশ ও কাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহার স্বামীকে নিতান্ত সত্যানিষ্ঠ এবং প্রতিজ্ঞাপালনে সুনিশ্চল বলিয়া জানিতেন। তিনি মুখে যে কথা বলিতেন, কার্য্যে তাহার কখনই অন্যথা করিতেন না। যদি তিনি প্রাতে সত্য সত্যই কোন নীচ জাতির মুখ দেখেন, তাহা হইলে তাহাকে কন্যা দিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতে বিমুখ হইবেন না। এখন উপায় কি? তিনি নিতান্ত শোক-মুগ্ধ-চিত্তে সমস্ত রাত্রি অনিদ্র হইয়া অতি কাতরকণ্ঠে সেই অনাথ-আশ্রয় সর্ব্বদেবাধিপতি হরিকে ডাকিতে লাগিলেন।

এদিকে পুণ্ডরীকাক্ষের হৃদয়ে চিন্তার লেশমাত্রও নাই। তাঁহার সেই অবাত-বিক্ষোভিত সরসিবৎ প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিলে বোধ হয়, যেন তিনি শান্তির নির্ম্মল সলিলে চির-নিমগ্ন। পরদিন রজনী প্রভাত হইলে, পুণ্ডরীকাক্ষ প্রতিদিনের ন্যায় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন, এক জন হাড়ি এক পাল শূকর লইয়া চরাইতে যাইতেছে। তিনি তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি বাপু?" সে বলিল, "আমার নাম হরা হাড়ি।"

পুণ্ডরীকাক্ষ। তুমি কি করিয়া সংসার চালাও?

হরা হাড়ি। আমার এই শূকরের পাল আছে, ইহাই বিক্রয়াদি করিয়া সংসার চালাইয়া থাকি।

পুণ্ডরীকাক্ষ। তোমাকে একটী কাজ করিতে হইবে।

হরা হাড়ি। কি কাজ ঠাকুর?

পুণ্ডরীকাক্ষ। আমার একটী অবিবাহিতা কন্যা আছে, তাহাকে তোমায় বিবাহ করিতে হইবে।

হরা হাড়ি। সে কি ঠাকুর! আমি যে হাড়ি; আমি কেমন করিয়া আপনার কন্যাকে বিবাহ করিব? ইহা ত কখন হইতে পারে না।

পুণ্ডরীকাক্ষ। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, প্রাতে যাহার মুখ দেখিব, তাহাকেই কন্যা দিব। প্রাতে তোমার মুখ দেখিয়াছি, সুতরাং তোমার সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ দিব।

হরা হাড়ি। ঠাকুর! এমন কাজ কখনই করিবেন না। ব্রাহ্মণ হইয়া হাড়ির ঘরে কন্যা দিলে আপনি নিশ্চয় পতিত হইবেন; আর লোকেই বা আপনাকে কি বলিবে? তাই বলিতেছি, আপনি এরূপ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন।

পুণ্ডরীকাক্ষ। আমি কাল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, প্রাতে যাহার মুখ দেখিব, তাহাকেই কন্যা দিব, এ প্রতিজ্ঞা আমি কখনই ভঙ্গ করিব না। তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনই কন্যা লইয়া আসিতেছি।

এই বলিয়া পুণ্ডরীকাক্ষ বাড়ীর ভিতর উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে সকল কথাই বলিলেন। এই

নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া ব্রাহ্মণী শোকে একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিলে পুণ্ডরীকাক্ষকে এই লোকবিগর্হিত কাজ হইতে নিবৃত্তি হইবার জন্যে সবিনয়ে অনেক অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তিনি আপনার প্রতিজ্ঞা পালনে স্থির-নিশ্চয়; সুতরাং কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া কন্যাটীকে সঙ্গে করিয়া বাহিরে আসিলেন এবং যথারীতি সেই হাড়িকে আপনার এক-মাত্র কন্যাকে অকুণ্ঠিত-চিত্তে সমর্পণ করিলেন। বিবাহ আদি সকল কার্য্য সম্পন্ন হইলে, হরা হাড়ি ব্রাহ্মণকে বলিল—"ঠাকুর" আপনার কন্যার সঙ্গে আমার ত বিবাহ হইল, এখন আমি তাহাকে আপনার বাড়ীতে লইয়া যাইতে পারি?"

পুণ্ডরীকাক্ষ। তোমার সঙ্গে যখন আমার কন্যার বিবাহ হইয়াছে, তখন তুমি অবশ্যই তাহাকে আপনার বাড়ী লইয়া যাইতে পার, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।

এই কথার পর হরাহাড়ি আপনার নব-বিবাহিতা স্ত্রী ও শূকরের পাল লইয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

এমন যে একটা অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল, পুণ্ডরীকাক্ষ তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় অটল ও অচলভাবেই রহিলেন। বাস্তবিক যিনি নারায়ণ-চরণ-প্রয়াসী হইয়া অনাসক্ত-চিত্তে সকলই তাঁহাকে সমর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার মন সর্ব্বদাই যে প্রসন্ন এবং আবেগশূন্য, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। পুণ্ডরীকাক্ষ কন্যা সম্প্রদান করত বাড়ীর ভিতর উপস্থিত হইলেন। তখনও তাঁহার স্ত্রী ধরাশায়িনী ছিলেন। পুণ্ডরীকাক্ষ তাঁহাকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। শোকবেগ প্রশমিত হইলে ব্রাহ্মণী বলিলেন,—"যাহা কখন ভাবা যায় নাই, যাহা কখন মনুষ্য-সমাজে ঘটে নাই, সেই অঘটন তুমি ঘটাইলে, ব্রাহ্মণ হইয়া হাড়ির ঘরে কন্যা সম্প্রদান করিলে; কিন্তু সেই হাড়ির বাড়ী-ঘর কোথায়, তাহা কি তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? মেয়েটীকে যে ঘরে আনিবে, সে উপায় ত আর নাই। যদি কখন তাহাকে দেখিতে, কিংবা কখন কিছু দিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে কোথায় যাইতে হইবে, তাহা কি জানিয়া লইয়াছ?"

পুণ্ডরীকাক্ষ। না, আমি তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই।

ব্রাহ্মণী। একেই ত হাড়ির ঘরে দিয়াছ, সে যে দু-বেলা দু-মুটো খাইতে পাইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। সময়-অসময়ে যে কিছু পাঠাইয়া দিব, তাহার পথ রাখ নাই। এখন শীঘ্র যাও, জামাইয়ের বাড়ী কোথায়, তাহা জানিয়া এস।

পুণ্ডরীকাক্ষ দ্রুতগতি জামাতার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। কিছু দূর গিয়া তাহাকে দেখিয়া বলিলেন,—"বাপু! তোমার নাম জানা হইয়াছে; কিন্তু তোমার বাড়ী কোথায়, তাহা জানা হয় নাই। সেই কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।"

হরা হাড়ি। ঠাকুর! আমার বাড়ী বৈকুণ্ঠে; আমি সেইখানে থাকি।

পুণ্ডরীকাক্ষ। বৈকুণ্ঠ কোথায়, কোন দিকে এবং এখান হইতে কতদূর, তাহা জানি না।

হরা হাড়ি। আচ্ছা, আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি পথ দেখাইয়া দিতেছি।

এই বলিয়া সে পুণ্ডরীকাক্ষকে এক জনশূন্য প্রান্তরে লইয়া গেল। সেখানে শাখা-প্রশাখা-পরিশোভিত এক বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষমূলে লইয়া গিয়া বলিল,—"যখন আপনার কন্যাকে দেখিতে ইচ্ছা হইবে, তখন এই বৃক্ষকে বৈকুণ্ঠের পথ দেখাইয়া দিতে বলিবেন, তাহা হইলে বৃক্ষ আপনি একটী ডাল নোয়াইয়া দিবে, আপনি তাহাতে উঠিলেই বৈকুণ্ঠের পথ দেখিতে পাইবেন। সেই পথে গেলে আমার বাড়ীতে উপস্থিত হইবেন। এই কথা বলিয়া উভয়েই আপন আপন স্থানে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই দিন হইতে ব্রাহ্মণী আপনার কন্যার জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে কিছু দিন গত হইলে ব্রাহ্মণী একদিন পুণ্ডরীকাক্ষকে বলিলেন,—"বিবাহের পর হইতে মেয়েটীর আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। আর তাহাকে দিবার জন্য কিছু সঞ্চয়ও করিয়াছি। তুমি তাহাকে একবার দেখিয়া এই সকল দ্রব্য-সামগ্রী দিয়া এস।

পুণ্ডরীকাক্ষ সেই সকল দ্রব্য একটী পুঁটুলিতে বাঁধিয়া কন্যাকে দেখিবার জন্য বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া সেই প্রান্তরস্থিত অশ্বত্থ বৃক্ষের নিকট পঁহুছিলেন এবং তাহাকে বৈকুণ্ঠের পথ দেখাইয়া দিতে বলিলেন। এই কথা বলিবামাত্র গাছটী এক প্রকাণ্ড শাখা নত করিয়া দিল। পুণ্ডরীকাক্ষ তাহারা উপর উঠিয়াই এক অতি সুপ্রশস্ত পথ দেখিতে পাইলেন। তিনি শাখা পরিত্যাগ করত সেই রাস্তায় উঠিলেন। পথটী চন্দন-জল দ্বারা ধূলিশূন্য এবং বিকীর্ণ পুষ্প দ্বারা সুশোভিত। পুণ্ডরীকাক্ষ সেই সুরম্য রাজপথ দিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই সেই স্থানের বিশ্ববিমুগ্ধকর শোভা দেখিয়া বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। তিনি দেখিলেন রাস্তার দুই ধারে সুস্নিগ্ধ-পল্লব-সংযুক্ত, শীতল-ছায়াপ্রদ, বিকসিত পুষ্প-সমূহে সমন্বিত, সুপক্ব-ফল-ভারাবনত শত শত বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। অদূরে নন্দনকানন-নিন্দীত-পুষ্পোদ্যান, অযুত পুষ্পের অপরূপ শোভায় চারিদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। সুখস্পর্শ সুরভি সমীরণ সেই

সকল পুষ্প হইতে পবিত্র গন্ধ লইয়া মন্দ মন্দ বহিতেছে। কোথাও বা অনুচ্চ পর্ব্বতমালা লতা-লক্ষিত নিত্যপুষ্পধর রমণীয় বৃক্ষরাজি দ্বারা পরিশোভিত হইয়া রহিয়াছে। বৃক্ষে বৃক্ষে মধুরালাপী বিহঙ্গকুল মধুর স্বরে গান করিতেছে। কোন পর্ব্বতের হৃদয় ভেদ করিয়া পবিত্র নির্ঝরিণী সুশীতল সুবিমল জল লইয়া প্রবাহিত হইতেছে। স্থানে স্থানে রসনাতৃপ্তিকর সুরসাল দ্রব্য-সামগ্রী স্তূপাকারে রহিয়াছে। পুণ্ডরীকাক্ষ যতই যাইতে লাগিলেন, ততই দিগন্ত-প্রমোদী চিত্তহারী সৌন্দর্য্যে তাঁহারা হৃদয় পুলকে পূর্ণ এবং স্বর্গীয় ভাবে বিভোর হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাঁহার জামাতা হাড়ি হইলে কি হয়, সে অতি মনোরম এবং পবিত্র স্থানেই বাস করিয়া থাকে।

পুণ্ডরীকাক্ষ আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে, এক অপূর্ব্বদৃশ্য তাঁহার নয়ন-গোচর হইল। তিনি দেখিলেন, কয়েকজন বিকৃতাকার দুরন্তদর্শন লোক আর এক জনকে ধরিয়া পাথরের উপর তাহার মুখ ঘষিতেছে। এ প্রকার লাঞ্ছিত হইয়াও লোকটী কোন প্রকার কাতরোক্তি করিতেছে না, বরং তাহার মুখে হাসির রেখা প্রকটিত হইতেছে। পুণ্ডরীকাক্ষ তাহাদের সমীপস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কেনই বা এই লোকটীকে এ প্রকার যন্ত্রণা দিতেছ, আর লোকটী এত কষ্ট পাইয়া কেনই বা হাসিতেছে।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া একজন পীড়নকারী উত্তর দিল,—"ঠাকুর! আপনি যেখানে যাইতেছেন, সেখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে ইহার সদুত্তর পাইবেন।"

পুণ্ডরীকাক্ষ সে স্থান হইতে আরও অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দূর গিয়া আর একটী দৃশ্য তিনি দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন, নানাবিধ কারুকার্য্য-খচিত ও বহুমূল্য আস্তরণ-মণ্ডিত একখানি পাল্কীতে একটী লোক বসিয়া আছেন। বাহকেরা তাঁহাকে দ্রুতপদে লইয়া যাইতেছে। কিন্তু লোকটী যাতনায় অস্থির হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। পাল্কীর দুই পার্শ্বে দুইজন দণ্ডধারী পুরুষ তাঁহাকে নিবারণ করিতেছে। করুণ-হৃদয় পুণ্ডরীকাক্ষ তাহাদের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা এই লোকটীকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরাইয়াছ; নানাপ্রকার সুগন্ধ পুষ্প মালায় ভূষিত করিয়াছে; সুখসেব্য সকল দ্রব্য-সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে দিয়া অতি যত্নের সহিত ইহাঁকে লইয়া যাইতেছ; তথাপি কেন ইনি ঈদৃশ ব্যাকুল হইয়া পাল্কী হইতে পলাইবার চেষ্টা করিতেছেন?" তাঁহার এই কথা শুনিয়া একজন দণ্ডধারী পুরুষ বিনীত-ভাবে উত্তর করিল,—"মহাশয়! আপনি যে স্থানে যাইতেছেন, সেখানে যাইয়া একথা জিজ্ঞাসা করিলে সকলই জানিতে পারিবেন।" এই কথা বলিয়া তাহারা আপনাদের গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। পুণ্ডরীকাক্ষ বিস্ময়-বিহ্বল-চিত্তে হরা হাড়ির বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিলেন

অল্প দূর গিয়া তিনি একটী নগর দেখিতে পাইলেন। নগরটী সর্ব্বত্র অলঙ্কৃত, বহু-তোরণ-দ্বার-বিশিষ্ট, বিচিত্র-পতাকা-শোভিত এবং বিবিধ উৎসবে পূর্ণ। দূর হইতে নগরটীকে দেখিয়া পুণ্ডরীকাক্ষের মন আনন্দে পূর্ণ হইল। তিনি ভাবিলেন, এতক্ষণের পর তাঁহার জামাতার আবাস-ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। নগরের সন্নিহিত হইয়া একটী প্রকাণ্ড প্রাসাদ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। সেই সর্ব্বতঃ মণিমুক্তা প্রবালাদি দ্বারা সুসজ্জিত, বিবিধ সুগন্ধ কুসুমের গন্ধে সুবাসিত এবং নানা প্রকার পতাকা দ্বারা সুশোভিত ভবন তিনি ইহজীবনে আর কখন দেখেন নাই। পুণ্ডরীকাক্ষ ভয়ে বিস্ময়ে কিয়ৎকাল নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। শেষে সাহসে ভর করিয়া সিংহদ্বার উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, সেটী অবারিত দ্বার। দ্বার-রক্ষকেরা তথায় আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা অস্ত্রধারী নহেন। তাঁহাদের বিমল অথচ গম্ভীর মুখকান্তি দেখিলে সহজেই শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে হৃদয় আপ্লুত হইয়া পড়ে। পুণ্ডরীকাক্ষ নির্ভয়ে দ্বাররক্ষকের নিকট উপস্থিত হইয়া অতি বিনয় সহকারে বলিলেন,—"আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি। আমার জামাতা হরা হাড়ি বলিয়া দিয়াছিল, তাহার বাড়ী বৈকুণ্ঠে, আর সে যে পথ দেখাইয়া দিয়াছিল, আমি সেই পথেই আসিয়াছি; কিন্তু এখন আমার বোধ হইতেছে, ভ্রমবশতঃ আমি অন্য পথে আসিয়া পড়িয়াছি। আপনারা যদি দয়া করিয়া হরা হাড়ির বাড়ী বলিয়া দেন, তাহা হইলে আমার বিশেষ উপকার করা হয়।" ইহা শুনিয়া একজন দ্বাররক্ষক স্মিত-মুখে বলিলেন,—"ঠাকুর! তুমি ঠিক স্থানেই আসিয়াছ, তোমার কোন ভ্রম হয় নাই। তুমি বাড়ীর ভিতরে যাও, তাহা হইলে সকলই জানিতে পারিবে।" পুণ্ডরীকাক্ষ আর কালবিলম্ব না করিয়া অতি সন্তর্পণের সহিত সেই মনোরম প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তিনি স্বপ্নে যাহা কখন ভাবেন নাই, জীবনে যাহা কখন ঘটিবে এমন আশা মনে স্থান দেন নাই, আজ সেই অপরূপ অতুলনীয় দৃশ্য তাঁহার সম্মুখে বিরাজিত রহিয়াছে দেখিলেন। তিনি কতবার ভাবিলেন, এ স্বপ্ন, না মোহ, না কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তি প্রভাবে এই দেবদুর্লভ স্থানে নীত হইয়াছেন। তিনি ইহাও মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, আজ যদি শচীপতি বাসবের ন্যায় তাঁহার সহস্র চক্ষু হইত, তাহা হইলেও সেই মহীয়সী শোভা, সেই মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনি কখন তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।

পুণ্ডরীকাক্ষ দেখিলেন, মণি-হেম-ভূষিত-সভার মধ্য-স্থলে রত্ন-প্রবালমণ্ডিত সিংহাসন, তাহার উপর দিব্যাভরণ-ভূষিত, অতসী-কুসুম-সদৃশ-কান্তিবিশিষ্ট, পীতাম্বর-পরিধারী শঙ্খ-চক্র-গদাধর সর্ব্বদেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সুখে সমাসীন রহিয়াছেন। তাঁহার মস্তকোপরি মৌক্তিকমালা পরি-

শোভিত রক্তবর্ণ ছত্র; পার্শ্বদেশ হেমদণ্ড-মণ্ডিত পবিত্র গন্ধান্বিত ব্যজন দ্বারা বীজিত। সভাস্থল ত্রিদিব-সেবিত পারিজাত কুসুমের গন্ধে সুরভিত। এবং বিশুদ্ধাত্মা দীপ্ত-তপা মুনিগণ ও সুরপুরবাসী অমরগণ দ্বারা পরিশোভিত। পুণ্ডরীকাক্ষ সেই অকল্পিতপূর্ব্ব অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া ভক্তিভরে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া মনে মনে অনন্তমায়াসম্পন্ন আদিদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব সমাপন করত তিনি সভার একপার্শ্বে গিয়া বসিলেন। যথাসময়ে সভাভঙ্গ হইল, সকলেই স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন; কেবল পুণ্ডরী-কাক্ষ সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন না। তখন ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু নারায়ণ সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক পুণ্ডরীকাক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"সকলেই ত আপনা আপন স্থানে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তুমি কিজন্য এখনও এখানে বসিয়া আছ?" পুণ্ডরীকাক্ষ ভক্তিভরে নতগ্রীব হইয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন,—"ভগবন্! আমার একটী প্রার্থনা আছে। আমার কন্যার সঙ্গে হরা হাড়ি নামক এক ব্যক্তির বিবাহ হয়। সে বলিয়া দিয়াছিল, যখন আমার কন্যাকে দেখিতে ইচ্ছা হইবে, তখন একটী নির্দ্দিষ্ট অশ্বত্থ বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলে সে পথ বলিয়া দিবে। আমি সেই বৃক্ষের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করত এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এখন বোধ হইতেছে, আমার পথভ্রম হইয়াছে। যাহা হউক, কোথায় গেলে আমার জামাতা এবং কন্যাকে দেখিতে পাইব, তাহাই যদি কৃপা করিয়া বলিয়া দেন ত তাহা হইলে আমার মহোপকার করা হয়।" ভগবান্ বলিলেন—"যদি তোমার জামাতা এবং কন্যাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমার সঙ্গে এস, আমি দেখাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া তিনি পুণ্ডরীকাক্ষকে সঙ্গে করিয়া একটী স্থানে বসিতে বলিলেন এবং তিনি অন্যত্র চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে পুণ্ডরীকাক্ষ দেখিলেন, তাঁহার জামাতা হরা হাড়ি শূকরের পাল ও তাঁহার কন্যাকে লইয়া সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। হরা হাড়ি যে কে, তাহা তখন পুণ্ডরীকাক্ষের জানিতে আর বাকি থাকিল না। তখন তিনি সেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বরের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া তদ্গতচিত্তে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব সমাপ্ত করিয়া করযোড়ে বাষ্পাবিললোচনে "ভবভয়-হারিন্ অখিলগুরো! কত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র চির জীবন আপনার ধ্যান করিয়া যখন অন্ত পায় না, তখন আমি ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতর জীব হইয়া আপনার অবিনাশী, অপার এবং অনুপম মহিমার কথা কেমন করিয়া বুঝিব! আপন কখন্ কি ভাবে যে লোককে করুণা বিতরণ করিয়া থাকেন, তাহা বুঝা মনুষ্যবুদ্ধির অতীত। আমি যে ত্রিলোকবন্দিত চরণ পাইবার প্রত্যাশায় এতদিন সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলাম, বহু-জন্ম-সঞ্চিত পুণ্যবলে এখন সেই চিরে-প্সিত ফল প্রাপ্ত হইয়াছি।" ভক্তবৎসল ভগবান্ এইরূপে উপাসিত ও আরাধিত হইয়া ত্রৈলোক্য-মোহন রূপ ধারণ করত সুমধুর বচনে কহিলেন,—"উঠ বৎস পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি তোমায় অসীম শ্রদ্ধা ও অব্যাভিচারিণী নির্ম্মলা ভক্তিতে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। তুমি নিষ্কাম এবং মদেকচিত্ত হইয়া যখন সর্ব্বপ্রকারে আমায় আশ্রয় লইয়াছি, তখন তোমাকে আমার আর কিছুই অদেয় নাই। এখন বল বৎস! তোমার কোন্ অভিলাষ পূর্ণ করিতে হইবে?" পুণ্ডরীকাক্ষ বলিলেন—"দীনবৎসল! আপনি জগদন্তর্যামী, আপনি ত সকলই জানেন যে, আপনার পাদপদ্ম-প্রাপ্তির কামনা ভিন্ন আমার আর কিছুই প্রার্থিত নাই। আমার সৌভাগ্য বলে এবং আপনার অনুপম দয়ায় আমার সে মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, আমার আর অন্য কোন বাসনা নাই। তবে দুইটী বিষয় জানিবার জন্য আমার একান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে; তাহাই যদি দয়া করিয়া বলিয়া দেন, তাহা হইলে চিরকৃতার্থ হই।" এই কথা বলিয়া তিনি ভগবান্‌কে বলিলেন যে, যখন তিনি বৈকুণ্ঠে আসিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে দুইটী আশ্চর্য্য ঘটনা তাঁহার মনকে বিশেষ আকৃষ্ট করিয়াছিল। প্রথমে তিনি দেখেন, কয়েক জন বিকটাকার পুরুষ এক সুপরিচ্ছদ পরিহিত, বহু-অলঙ্কার-ভূষিত ব্যক্তির মুখ একখানি পাথরের উপর ঘষিতেছে। ইহাতে লোকটী কোনপ্রকার যাতনা অনুভব বা দুঃখ প্রকাশ না করিয়া বরং হাসিতেছে। আর একস্থলে দেখিলেন, বাহক দ্বারা বাহিত একখানি সুসজ্জিত পাল্কীতে এক দিব্য পুরুষ বসিয়া আছেন। সুখসাধন দ্রব্য, যাহা তাঁহার প্রয়োজন. তাহা সেই পাল্কীর মধ্যে প্রায় সকলই রহিয়াছে, এবং তাঁহাকে অতি যত্নের সহিত লইয়া যাইতেছে; তথাপি তিনি তাহাদের হাত হইতে নিস্তার পাইবার প্রয়াস বিধিমতে করিতেছেন। এই উভয় ঘটনার কারণ তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলেই এখানে জানিতে বলিয়া দিয়াছে।

পুণ্ডরীকাক্ষের এই কথা শুনিয়া ভগবান্ উত্তর করি-লেন,—"প্রথমোক্ত ব্যক্তিটী পূর্ব্বজন্মে একজন বিশেষ সঙ্গতিপন্ন লোক ছিল এবং সাধ্যানুসারে দানাদি করিত। কিন্তু সে নিতান্ত মর্ম্মচ্ছেদী নিষ্ঠুরভাষী লোক ছিল বলিয়া দান করিবার সময়ে লোক-জনকে অত্যন্ত অপ্রিয় এবং কর্কশ কথা বলিত, সেইজন্য তাহার এই দুর্দ্দশা হইতেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি একজন অমিত-ধনশালী জমিদার ছিল। সে নিজে অনেক সৎকাজ করিয়াছে। কিন্তু তাহার পুত্রেরা ঘোর পাপাচারী এবং সর্ব্বদা নিষিদ্ধকর্ম্ম-নিরত। সেই পুত্রেরা আগামী কল্য আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া একজনের যথাসর্ব্বস্ব লইবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছে। তাহাদের পাপে পিতাকে নিরয়গামী হইতে হইবে। যম-দূতেরা তাহাকে আজ নরককুণ্ডের নিকট লইয়া যাইতেছে। কাল তাহার পুত্রেরা মিথ্যাসাক্ষ্য দিবামাত্র তাহারা

তাহাকে নরকে নিক্ষেপ করিবে, এইজন্য লোকটী নিতান্ত অধীর হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। তবে পূর্ব্বজন্মে অনেক সুকৃতি করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে মহার্ঘ পরিচ্ছদ পরাইয়া এবং অতি যত্নের সহিত লইয়া যাইতেছে।" ভগবানের এই কথা শুনিয়া পুণ্ডরীকাক্ষ বলিলেন,—"যদি কোন প্রকারে উহার পুত্রদিগকে পাপকাজ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা যায়, তাহা হইলে কি যমদূতের তাহাকে আর নরকে নিক্ষেপ করে না?" ভগবান বলিলেন—"যদি জমিদারের পুত্রেরা মিথ্যা সাক্ষ্য না দেয়, তাহা হইলে সে নরকভোগ হইতে রক্ষা পাইবে।" পুণ্ডরীকাক্ষ অতি বিনীত-ভাবে বলিলেন যে, তাঁহার একান্ত বাসনা, সেই দুরিতাচারী পুত্রদিগকে এই ন্যায়বিগর্হিত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করত এক জন অনপরাধ ব্যক্তির উপকার করেন। তাঁহার এই কথা শুনিয়া ভগবান্ বলিলেন,—"তাহাদের বাড়ী এখান হইতে অনেক দূর, সুতরাং আজ তোমার তথায় যাওয়া ত কখন সম্ভবপর নহে।" তখন পুণ্ডরীকাক্ষ বলেলেন,—"আপনার দয়া হইলে সকল কাজই সম্পন্ন হইতে পারে।"

ভক্তাধীন ভগবান্ ভক্তের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—"যদি লোকটীর উপকার করা তোমার নিতান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাই হইবে।"

এই কথা বলিয়া ভগবান্ স্বীয় বিমান প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। বিমান প্রস্তুত হইলে মহপতিত-জন-পাবন পরমেশ্বর দেবানুগৃহীত পুণ্ডরীকাক্ষকে রথে লইয়া যথাস্থানে চলিয়া গেলেন।

রজনী অবসান হইলে সেই স্বর্গীয় রথ একস্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। ভগবান্ দূর হইতে পুরন্দরপুর সদৃশ এক অতিমনোহর অট্টালিকা দেখাইয়া বলিলেন,—"পুণ্ডরী-কাক্ষ! ঐ দেখ, সেই জমিদারের বাড়ী, তুমি এখন তথায় যাইতে পার।" তখন পুণ্ডরীকাক্ষ রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অবনীলুণ্ঠিত-মস্তকে প্রণামপূর্ব্বক যোড়-হাতে পুনরায় সেই সুর-নর-মুনিগণের বন্দনীয় জগত্রাতা হরির স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ হাস্য-শোভিত বদনে, বীণা-নিন্দিত-বচনে বলিলেন,—"বৎস পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি তোমার উপর নিতান্তই প্রীত হইয়াছি। তুমি সকল কামনা বিসর্জ্জন করত আমার ভক্ত ও উপাসক হইয়া অতি প্রশংসনীয় কাজই করিয়াছ এবং সেজন্য তোমার পুণ্যফলও অপরিমিত হইয়াছে। এই ভাবে তুমি কিছু দিন থাক, সময় পূর্ণ হইলে আবার আমার নিকট উপস্থিত হইবে।" এই কথার পর স্বর্গীয় রথ ভগবান্‌কে লইয়া অন্তর্হিত হইল। পুণ্ডরীকাক্ষ অপ্রেমমহিম হরির অমৃত তুল্য হৃদয়প্রফুল্লকর মধুর বাক্য শুনিয়া এবং তাঁহার সন্দর্শন লাভ করিয়া আহ্লাদে কিয়ৎকালের জন্য অব-শেন্দ্রিয় হইয়া রহিলেন। তদনন্তর তিনি অতি ধীর-পদবিক্ষেপে সেই জমিদারের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাড়ীর দ্বারদেশে একজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, পুণ্ডরীকাক্ষ তাহাকে গৃহস্বামীর নিকট লইয়া যাইতে বলিলেন। তদনুসারে তাঁহাকে এক অতি মনোহর এবং সুসজ্জিত কক্ষে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে পূর্ব্বোক্ত জমিদারের পুত্রেরা বসিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতে-ছিলেন। পুণ্ডরীকাক্ষকে দেখিবামাত্র অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের মনে ভক্তি এবং ভয়ের সঞ্চার হইল। তাঁহাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কোথা হইতে এবং কি অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছেন?" পুণ্ডরীকাক্ষ আপনার নাম এবং বাসস্থান ইত্যাদির কথা বিবৃত করত শেষে বলিলেন,—"আমি বিশেষ কারণের জন্য আপনাদের নিকট আসিয়াছি, যদি আপনারা বিরক্ত না হন, তাহা হইলে আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। আমি শুনিয়াছি, আপনারা আজ একটী মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য সকলেই প্রস্তুত হইয়াছেন।" এই কথা বলিবামাত্র ক্ষণ-কালের জন্য সকলের মুখের ভাব পরিবর্ত্তন হইল। শেষে একজন কিছু রুক্ষস্বরে বলিলেন—"এ কথা আপনাকে কে বলিল? আর যদি এই কথা বলিবার জন্য এখানে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি স্থানান্তরে চলিয়া যান, আপনার এখানে থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই।" পুণ্ডরীকাক্ষ উত্তর করিলেন—"আপনারা রাগ করিবেন না; আমি সকল বিষয় বিশেষরূপে না জানিয়া এখানে আসি নাই। আপনারা যদি মিথ্যাসাক্ষ্য দেন, তাহা হইলে আপনাদের পিতা নিশ্চয়ই নরকগামী হইবেন। আপনাদের অতুল ঐশ্বর্য্য রহিয়াছে, সামান্য লোভের জন্য মিথ্যা বলিয়া পিতাকে নরকগামী করা পুত্রের উচিত নহে; সুতরাং আপনারা একাজ হইতে বিরত হউন।" পুণ্ডরীকাক্ষের এই কথা শুনিয়া জমিদারের এক পুত্র বলিলেন,—"আমরা যে আজ মিথ্যাসাক্ষ্য দিবার সঙ্কল্প করিয়াছি এবং তজ্জন্য আমাদের পিতা যে নরকে নিক্ষিপ্ত হইবেন, তাহা আপ-নাকে কে বলিল?" তাঁহার এই কথা শুনিয়া পুণ্ডরীকাক্ষ তখন একে একে সকল কথাই বলিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া অনেকে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন এবং এক জন ইহাও বলিলেন,—"মানুষ যে আবার কখন সশরীরে বৈকুণ্ঠে যাইতে পারে এমন কথা কখনই শুনা যায় নাই। তাঁহার একথা নিতান্ত অলীক বলিয়া বোধ হয়। পুণ্ডরীকাক্ষ জমিদার-পুত্রের কথা শুনিয়া ক্ষুব্ধ বা বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না; বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৃঢ়তার সহিত আপ-নার কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই সুভাষিত সুমধুর বাক্য শুনিয়া এবং তাঁহার সৌম্য ও দেবোপম মূর্ত্তি দেখিয়া অনেকেই তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। অবশেষে জমিদারের পুত্রেরা সকলে পরামর্শ করিয়া পূর্ব্বের ঘৃণিত সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। পুণ্ডরীকাক্ষ আপনার মনোভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া পুলকিতান্তঃ-

করণে তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

পুণ্ডরীকাক্ষের ধর্ম্মৈকপরায়ণতা এবং নিঃস্বার্থপরোপকারিতা দেখিয়া জমিদারের পুত্রেরা তাঁহার প্রতি নিরতিশয় শ্রদ্ধাবান্ এবং অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কি উপায়ে সেই অনিন্দ্য-স্বভাব সাধু পুরুষের উপকার করিতে পারিবেন, সেই বিষয়ে তাঁহারা সবিশেষ যত্নবান্ হইলেন। পুণ্ডরীকাক্ষের নিজের ও তাঁহার বাড়ী-ঘরে অবস্থা বিশেষরূপে অবগত হইবার জন্য, তাঁহার অজ্ঞাতসারে এক জন লোক পাঠাইয়া দিলেন। তিনি পুণ্ডরীকাক্ষের সকল তথ্য অবগত হইয়া তাঁহাদের নিকট যথা বিবৃত করিলেন। তখন জমিদারের পুত্রেরা-পুণ্ডরীকাক্ষের গ্রামে উপস্থিত হইয়া অর্থ দ্বারা তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া দিলেন; এবং যাহাতে তিনি সুখ-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারেন, তাহার জন্য এক সুরম্য গৃহ নির্ম্মাণ ও উপযুক্ত মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া আপনারা চরিতার্থ হইলেন। বিষয়ানুরাগবিহীন পুণ্ডরীকাক্ষের নিকট যদিও এই সকল ঐহিক সুখ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল বটে; তথাপি তিনি সেই জমিদার পুত্রগণের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি হইতে জীবন-ধারণোপযোগী যৎকিঞ্চিৎ লইয়া অবশিষ্ট দীন-দুঃখীদিগকে বিতরণ করিতেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, সাধু-সেবিত সৎপথেই বিচরণ করিতেন। শেষে কাল পূর্ণ হইলে অনন্ত ধামে গিয়া যোগিজনবাঞ্ছিত পরম সিদ্ধি লাভ করিলেন।

শ্রীসর্ব্বেশ্বর মিত্র।

বাঙ্গলা ভাষার লেখক।

দ

(৪)

—দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। হাল সাকিম, কলিকাতা, ১৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

গাঙ্গুলি মহাশয়, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের একজন খ্যাতনামা ব্রাহ্ম।

নিম্নলিখিত পত্রখানি তিনি আমাদিগকে লিখিয়াছেন;—

"১৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা। ১লা ফেব্রুয়ারী ১৮৯৮।

"সবিনয় নিবেদন,—

আপনার অনুগ্রহ-পত্র পাইয়া বিশেষ বাধিত হইলাম। কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রে আমি এমন কিছু কাজ করি নাই, যাহা আপনার ইতিহাসে উল্লেখের যোগ্য। আমি বীরনারী ও সুরুচির কুটীর নামক দুইখানি পুস্তক লিখিয়াছিলাম, এবং নববার্ষিক বলিয়া আর একখানি বিবিধ বিষয়সম্বলিত গ্রন্থ প্রতি বৎসর প্রকাশ করিবার সূচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু যদিও প্রথম দুইখানি গ্রন্থ ভাষান্তরিত হইয়া ভারতের অন্যস্থানে কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, উহার কোনও একখানি বঙ্গীয় সাহিত্য-জগতে আদৃত হইয়াছে বলিতে পারি না। সুতরাং এই অবস্থায় আমার নাম প্রতিষ্ঠাভাজন গ্রন্থকারদিগের সহিত সংযুক্ত না করাই শ্রেয়ঃ। উহাতে আপনার প্রবন্ধের গৌরব লাঘব হইবারই সম্ভাবনা। এই কারণে আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারিয়া লজ্জিত হইতেছি। আশা করি, আমার এই অনিবার্য্য ত্রুটী ক্ষমা করিবেন. আর এক কথা এই, আমার জীবনে স্মরণ-যোগ্য এমন কোন কাজ হয় নাই, যাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন বহুকাল পূর্ব্বে আমাকে লিখিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর জীবনে তিনটী স্মরণীয় কার্য্য আছে। প্রথম জন্ম, দ্বিতীয় বিবাহ, তৃতীয় মৃত্যু। আমার জীবনে প্রথম দুইটী ঘটিয়াছে। তৃতীয়টি এখনও ঘটে নাই। তবে যাঁহারা জগতের হিতে রত না থাকিয়া, কেবল আপনার চিন্তা লইয়াই ব্যস্ত থাকেন, তাঁহারা জীবিতাবস্থায়ও মৃত। সেই হিসাবে মৃত্যুর পূর্ব্বেই আমিও মৃতসংখ্যার মধ্যে গণ্য।

"নিবেদক
শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।"

* * * *

—দাশরথি মুখোপাধ্যায়। পিতা ৺ তারামোহন মুখোপাধ্যায়। সাং কলিকাতা, জোড়াসাঁকো। স্বর্গীয় তারামোহন,—রেভারেণ্ড কৃষ্ণ বন্দ্যোর সহপাঠী ও বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী গভর্ণর উইলিয়ম মরিসন সাহেবের "হেড বাবু" ছিলেন। পুত্র দাশরথি "কলেজ বাবু" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিন, এবং "সময়" প্রভৃতি সংবাদপত্রে মধ্যে মধ্যে লিখিয়া থাকেন।

* * * *

—দেবেন্দ্রনাথ সেন, এম্, এ, বি, এল আদিবাস হালিসহর, ২৪ পরগণা। ইনি একজন সুকবি এবং সাময়িকপত্রের নিয়মিত লেখক। ভারতী ও সাহিত্যে প্রায়ই কবিতা লিখিয়া থাকেন। "বনফুল" প্রভৃতি কয়খানি পদ্যগ্রন্থও ইহাঁর আছে।

* * * *

—দুর্গানারায়ণ চৌধুরী। পিতার নাম ৺ কালীনারায়ণ চৌধুরী। আদি বাস—পাবনা জেলার অন্তর্গত ভারেঙ্গা গ্রাম। হাল সাকিম কোচবিহার। জন্ম ১২৪২ সাল, মাঘমাস, মঙ্গলবার। চৌধুরী মহাশয় বেশ গান রচনা করিতে পারেন। ইহাঁর রচিত অনেকগুলি গান,—আর্য্যদর্শন, ভারতসংস্কারক, সঞ্জীবনী প্রভৃতি কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। "কি বলিয়া ডাকিব তোমারে—বলো তাই" ইতি শীর্ষক গানটী ইহাঁর রচিত। নিজেও একজন সুগায়ক। গান গাইয়া ইনি অনেককে মুগ্ধ করিতে পারেন। এজন্য

কোচবিহারে অনেক বড় বড় লোকের সহিত ইহাঁর মেলামেশা আছে। চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গীতগুলি একত্রিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে, বাঙ্গলায় একখানি ভালো গানের বই হয়। "কবিতাকলাপ" নামে ইনি একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা জনসমাজে প্রচারিত হয় নাই। যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার ছোট আদালতে দীর্ঘকাল কর্ম্ম করিয়া, কয়েক বৎসর হইল, চৌধুরী মহাশয় পেন্সন লইয়াছেন।

* * * * *

—দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়। পিতা ৺ কালাচাঁদ মুখোপাধ্যায়। আদি বাস কাশীপুর, থানা লোহাগড়া, মহকুমা নড়াইল, জেলা যশোহর। হাল সাকিম, শুক্তাইল, থানা কালিয়া, জেলা যশোহর। স্বকৃতভঙ্গের পুত্র; যোগেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান। ইনি বড় কষ্টে লেখা-পড়া শিখিয়াছেন। এক্ষণে ইনি চাকুলাজাত ষ্টেটে জমানবিশীর কাজ করিতেছেন। কোচবিহার হইতে প্রকাশিত "সুকথা" নামে কাগজে ইনি অনেকগুলি গদ্য-পদ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। যথা;—সাহস, অধ্যবসায়, জীবনের কেন্দ্র, ঋণ-পরিশোধ,—ইত্যাদি। 'সুকথা' কাগজের ভারও কিছুদিন ইহাঁর হাতে ছিল।

* * * *

—দ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী, বি, এ। পিতার নাম ৺ ঈশানচন্দ্র নিয়োগী। জাতি বৈদ্য। সং সাকরইল গ্রাম, জেলা ময়মনসিংহ। জন্ম সন ১২৭১ সাল, জ্যৈষ্ঠ মাস।

নারিট, বনগ্রাম, শিলং, রঙ্গপুর, দ্বারভাঙ্গা, মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানের হাইস্কুলে হেডমাষ্টারী করিয়া উপস্থিত ইনি সাউথ-সিলেট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ করিতেছেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে ইহাঁর পিতৃবিয়োগ হয়, তজ্জন্য ইনি বড় কষ্টে লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন।

কলিকাতার মেট্রপলিটন কলেজে বি, এ অধ্যয়নকালে, ইনি "কার্থেজ-দাহন" নামে একখানি কবিতাপুস্তক লিখেন; কিন্তু অর্থাভাববশতঃ সে সময় তাহা ছাপাইতে পারেন নাই; এখন সে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কোথায় হারাইয়া গিয়াছে।

১৮৮৭ সালে "আশালতা" নামে ইহাঁর একখানি পদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহার অধিকাংশ কবিতা, লেখকের বাল্যকালের লেখা। সমালোচনায়ও তাই আমরা "আশালতার" প্রশংসা করিতে পারি নাই। তবে বলিয়াছি,—"লেখকের কবির-হৃদয় আছে,—অনুশীলন করিলে কালে সুফল ফলিবে।" এখনও আমাদের সেই কথা। এ কথা বলিবার হেতু এই, অন্য সকল বিষয়,—গদ্য-প্রবন্ধাদি, চেষ্টা করিলে কতকটা আয়ত্ত করা যায়; কিন্তু কবির হৃদয় না থাকিলে সহস্র চেষ্টায়ও প্রকৃত কবিতার উদ্ভব হয় না। নিয়োগী মহাশয়ের সেই কবির হৃদয় আছে,—তিনি অনুশীলন করুন,—অবশ্যই ফল পাইবেন।

ঘটক-চূড়ামণি, নাবিকদস্যু প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ নিয়োগী মহাশয় লিখিয়াছেন; কিন্তু তাহা ছাপা হয় নাই। ১৮৮৫ সালে বঙ্গবাসীতে "বাবু" নামে ইনি একটী ব্যঙ্গ কবিতা লিখিয়াছিলেন। ৺ দুর্গাচরণ গুপ্তের প্রকাশিত "একাধিক সহস্র রজনীর" অংশ-বিশেষ ইহাঁর লিখিত। ন্যাশন্যাল ম্যাগাজিন নামে ইংরেজী মাসিকপত্রে ইহাঁর দুইটী ইংরেজী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারেও বাহির হইয়াছে। ষ্টেটসম্যান ও টাইম্‌স অব আসাম নামক ইংরেজী কাগজে ইনি প্রায়ই লিখিয়া থাকেন। "পুরাতন কাহিনী" নামে একখানি গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করিতেছেন।

* * * *

—দীননাথ রায়। পিতা ৺ নবীনচন্দ্র রায়। কুলীন কায়স্থ। বসুবংশ। ইহাঁরা মাইনগরের বসু। অলঙ্কার বসুর সন্তান। সাং সুগন্ধ্যা, জেলা হুগলী। জন্ম সন ১২৪৯ সাল ২০শে কার্ত্তিক। ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষ খ্যাতনাম্না আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক চিন্তামণি বসু। দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে, তস্য পৌত্র সুলতান সুজার এক পীড়িতা কন্যার চিকিৎসা করিয়া সফলকাম হওয়ায় দরবার হইতে চিন্তামণি বসু পুরস্কারস্বরূপ এই সুগন্ধ্যা গ্রাম জাইগীর প্রাপ্ত হন এবং "রায়" উপাধিলাভ করেন। সেই হইতে এই বসুবংশ "রায়" বলিয়া পরিচিত।

শ্রীযুক্ত দীননাথ রায় বিশেষ অধ্যবসায়শীল ব্যক্তি। অতি সামান্য বেতনের কার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া, ভবিষ্যতে দেড়শত টাকা বেতনের ইনেস্‌পেক্টরী পদ পর্য্যন্ত পাইয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে সে চাকরিও তিনি ছাড়িয়া দেন। তারপর নানাস্থানে পুলিস-সংক্রান্ত নানা কাজ করিয়া, এক্ষণে পৈতৃক চিকিৎসা-ব্যবসা করিতেছেন। "আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্র সারসংগ্রহ" ও "রায়বংশাবলী" নামে ইনি দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন; কিন্তু নানা কারণে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। "হরিস্বর্ব্বস্ব" নামে হরিভক্ত বিষয়ক একখানি গ্রন্থ লিখিতেছেন। "সুলভ সমাচার" পত্রে, "শ্রী—রায়" স্বাক্ষর করিয়া, ইনি অনেক পত্র ও প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

* * * *

—কবিরাজ দ্বিজেন্দ্রচরণ গুপ্ত কবিভূষণ। পিতার নাম অভয়াচরণ গুপ্ত। জন্ম সন ১২৭১ সাল, ভাদ্র। হাল সাকিম, কলিকাতা, সানকীভাঙ্গা,—১নং নীলমাধব সেনের গলি। আদি বাস ত্রিবেণী, জেলা হুগলী। দ্বিজেন্দ্র বাবু পৈতৃক ব্যবসায়ও করেন এবং গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ আপিসে চাকরীও করেন। ইনি একজন সুকবি। তেজস্বী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের ইনি একরূপ হাতে-গড়া ছাত্র।

"সাহিত্য-সমাজ" নামে এক সভা হইতে বিদ্যানিধি মহাশয় ইহাঁকে "কবিভূষণ" উপাধি দিয়াছেন। বিদ্যানিধি মহাশয়ের "অনুশীলন ও পুরোহিত" মাসিকপত্রে ইনি প্রায়ই কবিতা লিখিয়া থাকেন। বিদ্যানিধি মহাশয় যে একদল নূতন লেখক প্রস্তুত করিতেছেন, দ্বিজেন্দ্র বাবু তাঁহাদেরই অন্যতম। বিদ্যানিধি মহাশয় যে সময় পাক্ষিক "অনুসন্ধানের" সম্পাদক ছিলেন, সেই সময় দ্বিজেন্দ্র বাবু তাহাতে প্রথম কবিতা লিখেন, তারপর অনুশীলন সুচিন্তা, প্রভৃতি কাগজে এই কবিতাগুলি লিখেন। যথা,—আহ্বান, পথে, শেষে, বর্ষান্তরে, মায়া, সংসার,—ইত্যাদি কবিতাগুলি একত্রিত হইয়া স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে, বেশ একখানি কাব্যগ্রন্থ হইবে।

* * *

—দীননাথ সেন। শক্তিগোত্রীয়গণবংশসম্ভূত বৈদ্য-সন্তান। পিতার নাম ৺ গোলকনাথ সেন। তিনি পার্সি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া কুমিল্লার মাজিষ্ট্রেট কাছারিতে পেস্‌কারী পদ পান। তাঁহার বাসায় থাকিয়া অনেকে লেখা-পড়া শিখিয়াছেন; এবং আহ্লাদের কথা, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখন বড় লোক বলিয়া সমাজে সম্মানিত হইতেছেন।

দীননাথ বাবুর বর্ত্তমান বাস,—ঢাকা-গেণ্ডারিয়া। জন্ম সাল ইংরাজী ১৮৪০ সাল। ইহাঁর মাতা বড় গুণবতী রমণী ছিলেন। মায়ের অনেক সদ্‌গুণ পুত্রে বর্ত্তিয়াছে।

দীন বাবুর শিক্ষাদীক্ষার অবস্থা এইরূপ;—বাল্যে বাঙ্গালা লেখা পড়া শিখেন; পরে পারস্য ভাষা অভ্যাস করেন; তারপর ইংরেজী পাঠে প্রবৃত্ত হন। কুমিল্লা-জেলা স্কুলে জুনিয়র স্কলারসিপ পাইয়া ঢাকা কলেজে ভর্ত্তি হন, এবং সেখান হইতে সিনিয়র স্কলারসিপ পাইয়া, ঢাকা পগোজ স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন।

দীনবাবু একজন পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া, পূর্ব্ববঙ্গে সুপরিচিত এবং বিশেষ সম্মানিত। এক সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মে ইহাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। এমন কি, ঢাকার শাখা-ব্রাহ্ম-সমাজ ইনিই স্থাপিত করেন। কিন্তু নানাকারণে ব্রাহ্ম সমাজের সহিত এখন আর ইহাঁর কোন সম্বন্ধ নাই।

১৮৭২ সালে দীন বাবু, ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই বিদ্যালয়ে, দীন বাবুরই যত্নে একটী শিল্পবিভাগ স্থাপিত হয়। এই শিল্পবিভাগে দীন বাবু অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া নিজ গুণপণা প্রকাশ করেন। তিনি নিজহাতে ছাত্রদিগকে কাঠের ও লোহার কার্য্য শিক্ষা দেন। এই শিল্পবিভাগে দীন বাবু একটী কাপড়ের কল এবং আরও কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি শিল্পশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।

নর্ম্মালস্কুলের কার্য্য করিতে করিতে, দীন বাবু এক বৎসরের জন্য ঢাকার নবাব গনি মিঞা সাহেবের আটিয়া পরগণার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন। এই জমিদারী-কার্য্যেও দীন বাবুর বিষয়-বুদ্ধির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

অতঃপর দীন বাবু ডিরেক্টার ক্রফট্ সাহেবের উপ-দেশে, ১৮৯৭ সালে চট্টগ্রামের সহকারী স্কুলইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হন। তৎপরে ১৮৮২ সালে ঢাকার আসিটাণ্ট ইন্‌স্পেক্টর হইয়া ঢাকায় ফিরিয়া আইলেন।

১৮৮৬ সালে দীন বাবু হাজার টাকা বেতনে, স্বাধীন ত্রিপুরার ভূতপূর্ব্ব মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের মন্ত্রিত্বপদ গ্রহণ করেন। দীন বাবু ৮।৯ মাস কাল মাত্র এই কার্য্যে থাকিয়া, আপন গুণপণা প্রকাশ করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট হইতে, তাঁহাকে হাজার টাকা বেতন দেওয়ার পরিবর্ত্তে, আটশত টাকা দেওয়া সাব্যস্ত হয়। অতঃপর দীনবাবু পুনরায় পূর্ব্বকার্য্যে নিযুক্ত হন, এবং ঢাকা হইতে রাজসাহী বিভাগের প্রতিনিধি ইন্‌স্পেক্টর হইয়া যান। তথা হইতে ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়া, ১৮৮৮ সালের প্রথমভাগে, পূর্ব্ববঙ্গের—অর্থাৎ ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের ইন্‌স্পেক্টাররূপে নিযুক্ত হন। এবং আজিও এই কার্য্য নিযুক্ত আছেন।

বঙ্গদেশের বিবরণ, মানসিক গণনা প্রভৃতি কয়খানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ, দীনবাবু প্রণয়ন করিয়াছেন।

নাম-ছাড়।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, নিম্নলিখিত কয়েক ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনী,—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র-নাথ বিদ্যানিধি মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

—কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বি, এল। পিতার নাম ৺ চন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। আদি বাস জনাই, জেলা হুগলী। বর্ত্তমান বাসা কলিকাতা, ২৩।২ নং রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের লেন। জন্ম ১৭৭০ শক, ১৭ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, শুক্লাষষ্ঠী।

কিশোরী বাবু একজন উচ্চ-ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তি। সুপ্রসিদ্ধ "রিস্ এণ্ড রায়ৎ" পত্রের তিনি বর্ত্তমান সম্পাদক। সংস্কৃত এবং বাঙ্গলায়ও তিনি কম নয়। ভূতপূর্ব্ব "হালিসহর পত্রিকা"য় এক সময় তিনি নিয়মিতরূপে লিখিতেন। প্রতাপ রায়ের ইংরেজী মহাভারতের অনুবাদ ইনিই করেন।

ইংরেজী ১৮৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে ইনি বি, এ পাশ করেন। তারপর ১৮৬৮ হইতে ৭০ পর্য্যন্ত জনাই স্কুলের মাষ্টারী এবং ৭১ হইতে কলিকাতা ট্রেণিং একা-ডেমিতে হেড মাষ্টারী করেন। তারপর ৭২ সালে হালিসহর পত্রিকার সম্পাদক হন। ঐ সময় কবি মদনমোহন মিত্র ও গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব প্রণেতা পদ্মনাথ ঘোষাল তাঁহার সাহায্য করিতেন। ১৮৭৬ সালে কিশোরী বাবু বি, এল পাস করেন। ৭৮ সালে হুগলীর উকীল হইয়া ৮১ সাল পর্য্যন্ত ওকালত

করেন। মধ্যে একখানি বাঙ্গলা মাসিক-পত্রে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার ভূমি-সংক্রান্ত কয়েকটী প্রবন্ধ লিখেন। কিশোরী বাবুর উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, এম, এ মহাশয়ও পিতৃগুণে গুণবান হউন, ইহাই আমাদের কামনা।

* * *

—ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—পেনসন প্রাপ্ত গবর্ণমেণ্টের উচ্চকর্ম্মচারী। আদি নিবাস ২৪ পরগণা হরিনাভি। কলিকাতাতেও এক বাটী আছে। ঠনঠনিয়ার ঈশানচন্দ্র বাবু বলিলে তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহাকেই বুঝায় না। ১০৬ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ ভবনে তদীয় নিকেতন। তিনি অকাতরে এই দুর্দ্দিনে কত কত নিরন্নকে অন্নদান করিয়াছেন,—অবিবাহিতের বিবাহ দিয়াছেন,—বিদ্যা-লয়ের শত শত ছাত্রের বেতন ও ভোজন দিয়াছেন,—কত শত দুঃস্থ ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত পরিজনের লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন,—তাহার সংখ্যা হয় না। তিনি দানী, জ্ঞানী, মানী। ঈশানচন্দ্র সাক্ষাৎ ঈশান! ঈশানচন্দ্র,—বিদ্যাবান্, মতিমান্, ভক্তিমান্, দয়াবান। তাঁহার ভগ-বদ্ভক্তি, প্রত্যক্ষমূর্ত্তিময়ী। দেব-দ্বিজে তাঁহার শ্রদ্ধা, এক আরাধ্যা সম্পত্তি। তাঁহার উপাস্য ও অনুপাস্য দেবে ভেদ-বুদ্ধি নাই। এই সব গুণ, তাঁহার গুপ্তনিধি—হৃদয়-নিলয়ের অমূল্য রত্ন।

বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্য, সত্য সত্যই তাঁহার প্রিয় পদার্থ। তাহার নিদর্শনও আছে।—বাবু ঈশানচন্দ্র ১২৮৩ সালে "পরী ও স্বর্গ" নামে এক কবিতাপুস্তক রচনা করেন। উহা "লালারুখ" কাব্যের পদ্যানুবাদ। ১৩০৩ সালে ২১শে আষাঢ়ে তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ—"আচার" বাহির হয়। ইহা গদ্য-গ্রন্থ। বর্ত্তমান যুগে এমন ধর্ম্ম-প্রবণ পুস্তক—এমন প্রকৃত সামাজিক নক্‌সা সুদুর্ল্লভ।

* * *

—গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, এ উক্ত মুখো-পাধ্যায় মহোদয়ের তৃতীয় তনয়। এক কথায় বলি, তিনি পিতার অমায়িক স্বভাবের উত্তরাধিকারী। তাঁহার অনেক স্বাভাবিক গুণ। উপচিকীর্ষা-বৃত্তি, তদীয় পৈতৃক ধর্ম্ম। বিনয়, বিদ্যাবত্তা, মতিমত্তা, সৌজন্য, শিষ্টাচার ইত্যাকার গুণ তাঁহার অঙ্গাভরণ। তিনি বঙ্গভাষায় বিশেষ অনুরাগী। "হরি-দা" নামক উপন্যাস তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই এক-মাত্র প্রকাশ্য কার্য্যে ও অন্তরের মাধুর্য্যে তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। ভূতপূর্ব্ব "সুরভি" সংবাদপত্রে এক সময় তাঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

* * *

—ডাক্তার অমৃতলাল সরকার, এফ, সি, এস—স্বনাম-খ্যাত ডাক্তার সরকারের একমাত্র পুত্র। তিনি উপযুক্ত, পিতার উপযুক্ত পুত্র। যিনি ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানসভার সহ-সম্পাদক, "কলিকাতা বয়েজ কলেজ" নামক বিদ্যা-লয়ের উপদেষ্টা—অধ্যাপক, নানা দেশের সভাসমিতির কার্য্য-নির্ব্বাহক এবং একজন উৎকৃষ্ট চিকিৎসক, তাঁহার আর নূতন পরিচয় কি দিব? "সমাচার-চন্দ্রিকায়" তাঁহার প্রথম কবিতা প্রকটিত হয়। সে অনেক দিনের কথা। তদ্রচিত গীতাবলীর কিয়দংশ "অমিয়পদাবলী" সংজ্ঞায় প্রচারিত। তাঁহার সারল্যে ও সহৃদয়তায় অনেকে মুগ্ধ। ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।

বাঙ্গালা-সংবাদ পত্রের ইতিহাস।

(দশম প্রস্তাব।)

গতবারে আমরা বলিয়াছিলাম, মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর "সংবাদ-ভাস্করে" প্রবন্ধ-মালা লিখিতেন। আমাদের অনেক সাহিত্য-সুহৃদ্, উহার প্রমাণ জানিতে অভিলাষ করেন। একটী প্রমাণ আমরা দিতেছি,—

"The two Bengali Newspapers "Gunaker" and "Bhasker" which were conducted under his auspices, were entirely written by him (Maharaj Kamal Krishna Dev Bahadur) and he became a good Bengali writer"—Ghosh's Indian chiefs &, Vol 11, p 122 (1881).

দৃষ্ট হইল,—কেবল "ভাস্করে" নয়—কিন্তু "গুণাকর" পত্রিকাতেও তিনি লেখনী চালনা করিতেন। তিনি সংবাদ-পত্রের ও তাহার সম্পাদকদের বন্ধু, উৎসাহদাতা ছিলেন। শোভাবাজারে "দেব" উপাধিধারী রাজ-গোষ্ঠী, চিরদিনই বিদ্যাশালিতা ও জ্ঞান-চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধি পাইয়া আসিতেছে। "প্রভাকর" জন্মদাতা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও "ভাস্কর" কর্ত্তা গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য) এই দুই জন তাঁহার দুই বন্ধু। এই শেষোক্ত ব্যক্তি, প্রথমতঃ রাজা রামমোহন রায়ের মতানুবর্ত্তী থাকেন। তাহার পর তিনি এই মহারাজের পরিষদ্‌ভুক্ত পারিষদ হন। অদ্যাপি তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য, মহা-রাজের দ্বিতীয় তনয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সকাশে মাসিক ২০৲ কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইতেছেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের এই পিতৃকীর্ত্তি রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিজের বিদ্যানুরাগিতার সাক্ষ্য পাওয়া যাইতেছে।

আর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়কেও মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, খড়দহে এক তপোবন-তুল্য কুঞ্জ-কানন-সহিত উপবন উপহার দেন*। অদ্যাপি তাহা ঈশ্বর গুপ্তের নামে পরিচিত ও আখ্যাত। দুঃখের বিষয়, উক্ত উদ্যান,

* মৃত্যু কালে উক্ত গুপ্ত কবিও, মহারাজকে 'একজিকিউটার' নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের অধিকৃত নয়;—তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া উহার অধিকারিণী। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ঐ কীর্ত্তিটীর রক্ষা করিবার কোন উপায় দেখিতেছি না।

এই প্রবন্ধেও রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতা-ভাজন।

২৬। সংবাদ-রসরাজ।

(১২৪৬ সাল—১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ।)

ইহা নামের অন্বর্থতা করিয়াছিল। "রসরাজ" সত্যই "রসরাজ"! এত রস পত্রিকায় থাকিত যে, সপ্তাহে সপ্তাহে বিতরিত হইয়াও, উহা নীরস হয় নাই—বরং বরাবর অধিকতর সরসই হইয়া উঠিয়াছিল। শেষে রসের ছড়াছড়িতে দেশ উন্মত্তপ্রায় হয়। আলঙ্কারিক ষড়রসে বা নবরসে "রসরাজের" কুলান হইত না! তাঁহাকে আর আর রসান্তর উদ্ভাবন করিয়া উহাতে ঢালিয়া দিতে হইত। বেশী মিষ্টি, মুখ-রোচক না হইয়া, বরং কষ্টদায়ক হইয়া উঠে, তাই অন্তকালে "রসরাজের" দশম দশা উপস্থিত হইলে, রস-প্রাচুর্য্যে উহার অনৈসর্গিক স্ফীতি ঘটে। ক্রমে তাহা শোথ রোগের লক্ষণে পর্য্যবসিত হইল।

যিনি যিনি প্রথম প্রথম ইহাতে রসের ভিয়ান করিতেন, তাঁহাদের নাম—গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ও কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়। আমরা শেষোক্ত পুরুষকে চিনি না। তবে ১২৪৭ সালে (১৮৪০ খৃষ্টাব্দে) "রসরাজে" তাঁহার রস-সঞ্চারণের তত্ত্ব-কথা স্থানান্তরে জনান্তর হইতে পরিজ্ঞাত *। সম্ভবতঃ, ইনি নামমাত্র সম্পাদনকর্ত্তা ছিলেন। রাজনিয়মের প্রবল প্রতাপ অতিক্রম করিতে প্রকৃত সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীদিগকে সকল দেশেই ঐ রীতির অনুবর্ত্তন করিতে শুনি।

প্রথমাবধি (১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ ১২৪৬ সাল হইতে ১২৫৭ সাল পর্য্যন্ত) ইহার প্রতি সপ্তাহে দ্বি-বার প্রচার হইত। তখন ইহার প্রভাব দেখে কে? ইহার বাৎসরিক মূল্য ৪।০ চারি টাকা চারি আনা অবধারিত ছিল।

রাজনারায়ণ বসুজ মহাশয় লিখিয়াছিলেন,—একবার "রসরাজ" সম্পাদকের জেলে যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। অনুসন্ধানে জানিতেছি, সম্পাদককে প্রকৃত প্রস্তাবে কারাবাস-কষ্ট ভুগিতে হইয়াছিল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারিতে কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায় ও তৎপত্নী স্বর্ণময়ী "ভাস্কর" ও "রসরাজ" সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য) মহাশয়ের বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ করেন। সম্পাদকের নামে এই নালিশের কারণ স্পষ্ট জানা গেল না। আমরা বহু ক্লেশে এই পর্য্যন্ত সন্ধান পাইয়াছি যে, বাদী ও বাদিনীর তরফে লীথ ও মর্টন সাহেবদ্বয়, উকীলের কার্য্য করেন আর, প্রতিবাদীর পক্ষে হিউম, থিওবাল্ড ও ল্যাণ্ড—এই তিন জন ওকালত-নামা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সার জন্ পিটার গ্রাণ্ট সাহেবের আদালতে বিচার হয়। সম্পাদকের উপর ত্রিবিধ দণ্ড প্রযোজিত হয়। যথা;—

(১) (৬ ছয়) মাস কারা দণ্ড।

(২) ৫০০৲ (পাঁচ শত) টাকা জরিমানা।

(৩) ১০০০৲ (এক হাজার) টাকায় দুই জন জামিন। ইহার উদ্দেশ্য এইরূপ ছিল যে, উক্ত রাজার বিপক্ষে কোন কথা লেখা হইবে না, এতদার্থে ৫০০৲ (পাঁচ শত) টাকার করিয়া দুই জন জামিন।

এই শোচ্য দশাতেই রাজা নরসিংহচন্দ্র রায়, আবার সম্পাদকের নামে নালিশ করিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত বিচারকের এজলাসেই শুনানি হয়। বিজ্ঞ বিচারপতি, আদেশ দিলেন,—প্রথম মিয়াদ অতীত হইবামাত্রই যদি এই দ্বিতীয় নালিশ রুজু হয়, তদ্দণ্ডেই শমন বাহির হইবে। আর, বলাই বাহুল্য যে, সেই মুহূর্ত্তেই সম্পাদক-প্রবর বিচারালয়ে পদার্পণ করিতে বাধ্য হইবেন *!

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে (১২৪৭ সালে) কেবল সহরে এই পত্রিকার ১৫০ (এক শত পঞ্চাশ) খণ্ড বিতরণের সমাচার পাইয়াছি। তখন মফস্বলে গ্রাহক ছিল না—সুতরাং সহরের উপরই ইহার জীবিকা নির্ভর করিত। কতিপয় যুবার উৎসাহে ও অর্থে ইহার পরিচালন-কার্য্য সম্পাদিত হইত। তখন বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন মুদ্রা মাত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল †।

যুবাকালে আমরা এই পত্রিকা পাঠে অনুরক্ত ছিলাম ‡।

১২৪৬ সালে আর কোন পত্রিকার সত্তার বিষয় আমরা জ্ঞাত নহি।

২৭। মুরশিদাবাদ-পত্রিকা।

(১২৪৭ সাল—১৮৪০ খৃষ্টাব্দ।)

পাঠক স্মরণ রাখিবেন, এত দিনের মধ্যে আমরা সহর-বাহিরে কোন পত্রিকার অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন না করিতে পাইয়া অনাহ্লাদিত ছিলাম। এক্ষণে সে দুঃখ দূরীকৃত হইবার উপক্রম হইল। **ইহাই মফস্বলের প্রথম সংবাদ পত্র।** রাজা কৃষ্ণনাথের প্রযত্নে ইহার আবির্ভাব। সদ্বিদ্যাবান্ গুরুদয়াল চৌধুরী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রতি ইহার সম্পাদকতার ভার বিন্যস্ত হয়। এক বৎসর পরে ১২৪৮ সালে জন্মদাতার মৃত্যু ঘটিলে,—তৎসঙ্গেই ইহারও বিলয় ঘটিল। এই মফস্বলীয় পত্রের লোকান্তর-প্রাপ্তির সহিতই সহর-বাহিরের উন্নতির শেষ। পত্রিকায় প্রবন্ধ-রচনার প্রণালী, বড়ই সুরীতি-সঙ্গত ছিল। লেখার প্রকর্ষ জন্য উহার প্রচুর সমাদরও ঘটে। কিন্তু অপমৃত্যুতেই সব মাটী হইল।

* ইংলিশ ম্যান, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ, ৬ই ফেব্রুয়ারি।

* বেঙ্গল হেরাল্ড, ১৮৪৩ খৃঃ, ১৪ই জানুয়ারি।

† ইংলিশম্যান, ১৮৪০ খৃঃ, ৬ই ফেব্রুয়ারি।

‡ "বর্দ্ধমান-জ্ঞানপ্রদায়িনী" এই শ্রেণীর এক প্রকাশ্যপত্রিকা। বার্ষিক মূল্য ৮৲ আট টাকা। প্রকাশাব্দ অজ্ঞাত।—Long's Catalogue, p. 69

২৮। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

(১২৪৭ সাল—১৮৪০ খৃষ্টাব্দ।)

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২লা জুলাই হইতে ইহার প্রচারারম্ভ। প্রথম প্রকাশ-স্থান এই রাজধানী নয়,—শ্রীরামপুর। ইংরেজী ও বাঙ্গালা—এই দুই ভাষায় প্রতি সপ্তাহে উক্ত গেজেট প্রচারিত হইত। রাজনিয়মের অর্থাৎ আইনের বঙ্গানুবাদ ও বঙ্গীয় সমাচারপত্র-সমূহের সারাংশ, ইংরেজীতে মুদ্রিত করিবার বিধি ছিল। তখন উহার বার্ষিক মূল্য ৮৲ (অষ্ট মুদ্রা) নির্দ্ধার্য্য ছিল। প্রথমাবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট গেজেটের সম্পাদকগণের নাম ও সম্পাদন-সময় বলিয়া দিলে, বুঝিবার ও বোঝাইবার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই সুগম হইবে, এই মানসে নিম্নে একটী তালিকা দিলাম।

সম্পাদকের নাম।	সম্পাদন-সময়।
(ক) জন্ ক্লার্ক মার্শম্যান	১৮৪০ হইতে ১৮৫৩ খৃঃ।
(খ) রেভারেণ্ড জন্ রবিন্সন্	১৮৫৩ হইতে ১৮৭৯। ৯ইজুন।
(গ) রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম এ বি এল	১৮৭৯।১০ই জানুয়ারি হইতে ১৮৮৬।১০ই অক্টোবর।
(ঘ) শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল	১৮৮৬।১১ই অক্টোবর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত।

প্রথম সম্পাদক, প্রসিদ্ধ রেভারেণ্ড ডাক্তার জোসুয়া মার্শম্যান সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। অনেকেই পাদরি মার্শম্যান ও এই মার্শম্যান—দুই নাম গোল করিয়া বসেন। প্রথম ব্যক্তি পিতা, দ্বিতীয় তাঁহার পুত্র। দ্বিতীয় সম্পাদককে "প্রভাকর" সম্পাদক, "নন্দী" সাজাইয়াছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় সম্পাদকের আমলের বাঙ্গালা অতি জঘন্য—কদর্য্য। তৃতীয় সম্পাদক হইতে ভাল বাঙ্গালা ভাষায় গেজেট সুশোভিত হইতে থাকে। চতুর্থ সম্পাদক মহাশয়, অতি বিচক্ষণ ও নিপুণ ব্যক্তি। অতি যোগ্যতা-সহকারে তিনি কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন।

রাজকীয় ব্যবস্থাপক সমাজের আইন, বিজ্ঞাপন, সদরের সার্কুলার অর্ডার, মুন্সেফ প্রভৃতি সিভিল কর্ম্মচারীদের নিয়োগ ইত্যাদি, উহার প্রতিপাদ্য অর্থাৎ ঐ গুলিই উহার প্রচারের বিষয়। প্রথম প্রথম কিছুকাল ১৫০০ (এক হাজার পাঁচ শত) কাপি গেজেট, গবর্ণমেণ্টের বিচারালয়-সমূহে বিনামূল্যে প্রদত্ত হইত। প্রেরণের জন্য যে ডাক-মাশুল লাগিত, তাহাও সরকারী তহবিল হইতেই দেওয়া হইত কি না বলিতে পারিতেছি না।

রাজলক্ষ্মী।

নানা কারণে রাজলক্ষ্মী প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে প্রধান কারণ,—৺কাশীধাম হইতে একজন বিশিষ্ট ভদ্রসন্তান এই মর্ম্মে লেখেন, কাশীধামের এক ব্যক্তি রাজলক্ষ্মী পড়িয়া মর্ম্মাহত হইয়াছেন। জন্মভূমিকে তিনি বাঘের ন্যায় ভয় করেন। পোষ্ট-পিয়নের হাতে জন্মভূমি দেখিলে যেন শিহরিয়া উঠেন। কেহ তাঁহাকে জন্মভূমি পড়িয়া শুনাইলে, তিনি তাহাতে দাঁতকপাটী যান। যে স্থানে জন্মভূমি পাঠ হয়, সে স্থান তিনি পরিত্যাগ করিয়া ঝটিতি দূরে চলিয়া যান।

তিনিও জন্মভূমির একজন গ্রাহক ছিলেন। জন্মভূমির প্রশংসাবাদও মধ্যে মধ্যে তাঁহার মুখে শুনা যাইত। রাজলক্ষ্মী উপন্যাস জন্মভূমিতে প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইলে তিনি মুক্তকণ্ঠে, সর্ব্বজন-সমক্ষে, বাহবা দিয়াছিলেন। কিন্তু জন্মভূমিতে যাই কাশীধামের কথা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল, অমনি তাঁহার মুখকমল ধীরে ধীরে শুকাইতে লাগিল। একদিন তিনি সজল-নয়নে—কাতর-কণ্ঠে বলেন, "আমাকেই লক্ষ্য করিয়া কাশীধামের কথা লিখিত হইতেছে। আর কিছুকাল এরূপ ভাবে লিখিত হইলে, আমি বেশী দিন বাঁচিব না। ইহা ত লেখা নয়,—আমার অন্তরের মর্ম্মস্থলে কেবল সূচী বিদ্ধ করা!"

এই ভাবের পত্র পাইয়া, আমরা রাজলক্ষ্মী উপন্যাস লিখিতে ক্ষান্ত হইলাম। বৃথা ভদ্র ব্যক্তির মনে কষ্ট দেওয়া আমাদের অভিপ্রায় নহে। বলা বাহুল্য, ৺কাশীধামস্থ জীবিত কোন ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করিয়া, আমরা এই উপন্যাস লিখি নাই। সনাতন দাস, শিয়াল-মারা এবং কাশীবাসী,—এই তিনটী চরিত্রই অঙ্কিত হইতেছিল। এই তিনটী চরিত্রের মূলে সত্য কিঞ্চিৎ নিহিত আছে, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব। কিন্তু সেই তিনটী লোকের একটীও এখন জীবিত নাই। তাঁহাদের কোন বংশধরও জীবিত নাই। কাশীধামস্থ বর্ত্তমান কোন ব্যক্তিকেই,—অথবা কোন ব্যক্তিত্রয়কে লক্ষ্য করিয়া, আমরা এ চরিত্রত্রয় অঙ্কিত করি নাই।—তবে যদি দৈবগত্যা কাহারও চরিত্রের সহিত, এ চরিত্র মিলিয়া যায়, তবে সে দোষ আমাদের নহে,—তাহা সেই চরিত্রবান্ পুরুষেরই দোষ। যখন জানিতে পারিলাম, আমাদের এই লেখায় কোন ব্যক্তি মর্ম্মপীড়িত হইতেছেন, তখন ঐ তিনটী চরিত্র,—অন্ততঃ একটী চরিত্র প্রস্ফুটন করিতে ক্ষান্ত থাকাই উচিত। সংক্ষেপে দু'চার কথায় তাহাদের ইতিহাস বলিব।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

হালুইকর পয়সা লয় নাই। লুচীর দাম লইতে হইবে বলিয়া সনাতন, হালুইকরকে অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়াছিল, কিন্তু হালুইকর কেবল জিহ্বা কাটিয়া বলিয়াছিল, বাপ্‌রে! উনি সাক্ষাৎ দেবতা, উহাঁর কাছ হইতে কি পয়সা লইতে পারি? সেইদিন হইতে হালুইকর, শিয়ালমারা-রূপ দেবতার,—প্রধান এবং প্রথম শিষ্য হইল। শিয়ালমারা ভোজনকালে হরিনামের ঝুলির ভিতর যে সকল লুচি লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহার অধিকাংশই, গঙ্গার ধারে নির্জ্জনে বসিয়া, সনাতনদাস উদরস্থ করিল। তখন হৃষ্ট-পুষ্ট-বলিষ্ঠ দুই ভক্ত হরিনাম গান গাহিতে গাহিতে কাশীবাসীর গৃহাভিমুখে চলিল।

তখন বেলা আর নাই। সূর্য্যদেব পাটে বসিয়াছেন। কাশীবাসী, ঐ দুইটী ভক্ত বাবাজীর আগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। সকলকে বলিতেছেন, "আমি ঐ দুইটী পরম বৈষ্ণবের প্রসাদ ভিন্ন আর কিছু ভোজন করিব না। উহাঁরা মানুষ নন,—দেবতা। যেন কৃষ্ণ-বলরাম ভূতলে অবতীর্ণ। উহাঁদের কণামাত্র প্রসাদ-সুধার গুণে, আমার এ ভবক্ষুধা অচিরেই দূর হইবে।"

পথে আসিতে আসিতে সনাতনদাস শিয়ালমারাকে কহিতেছে, "দেখ ভাই, চুরী-ডাকাতী করিয়া আর সুখ নাই। এ ব্যবসায়ে বিপদ অনেক, অথচ লাভ কম। আমি অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া, দেখিয়া-শুনিয়া স্থির করিয়াছি, ধর্ম্মের ব্যবসার তুল্য উৎকৃষ্ট ব্যবসা এসংসারে আর কিছুই নাই। ইহাতে ক্ষীরোদ-সাগরের ক্ষীর পাওয়া যায়, নন্দনকাননের পারিজাত পাওয়া যায়, কুবেরের ধন-ভাণ্ডার লাভ করা যায়,—অধিক কি, পৃথিবীর মধ্যে যাহা সারা এবং সুন্দরী, অনায়াসে তৎসমস্তই পাওয়া যায়।

শিয়ালমারা। আচ্ছা ভাই! তোমার কথাই মানিয়া লইলাম। এ কথা বড় মন্দ কথা নয় বলিয়া, বোধ হইতেছে। নমুনা যাহা দেখিলাম, তাহা আশাপ্রদ বটে। পৃথিবীর লোক যে এত বোকা, তাহা পূর্ব্বে আমি জানিতাম না।

সনাতন। আজ যেমন হালুইকরের নিকট তোমাকে দেবতা করিয়া তোমার চেলা হইয়াছিলাম, সেইরূপ বরাবরই তোমাকে দেবতা করিব এবং বরাবরই তোমার চেলা থাকিব। দেবতা সাজা সহজ, চেলা সাজা কঠিন। তুমি এ ব্যবসায়ে অনভিজ্ঞ বলিয়া, তোমায় দেবতা সাজাইয়াছি এবং আমি অভিজ্ঞ বলিয়াই চেলা সাজিয়াছি। দেবতাকে বেশী কথা কহিতে হয় না,—যাহা কিছু ঘটকালি সমস্তই শিষ্যকে করিতে হয়।

শিয়ালমারা। উপস্থিত কাশীবাসীর গৃহে গিয়া কি করিতে হইবে, ঠিক্ করিয়া চল। শেষে যেন অপ্রস্তুত হইতে না হয়।

সনাতন। কাশীবাসী সাক্ষাৎ জীবন্ত কলি। এমন দুষ্কর্ম্ম নাই, যাহা ঐ ব্যক্তি করে নাই। আজ কাল বয়স হইয়াছে, বোধ হয় মরণের ভয় হইয়া থাকিবে। সেই-জন্য কাশীতে সদাই ভাল ভাল সন্ন্যাসী খুঁজিয়া বেড়ায়। সন্ন্যাসীদের নিকট হইতে মন্ত্র লইবে, ঔষধ লইবে,—ইহাই উহার একান্ত চেষ্টা। চিরদিন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, এখন মরণ নিকট জানিয়া, সহজে মুক্তি পাইবার আশায়, কাশী-মৃত্যু কামনা করিয়া, কাশীবাস করিতেছে। কাশীতে আসিয়া বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার বাটীতে দুবেলা যাওয়াও আছে, হরিনামও আছে, বম্ বম্ হর হরও আছে,—আর ওদিকে জাল তমসুক করা আছে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া আছে, আর পরস্ত্রী-গমন-দোষ ত আছে-ই। প্রথম প্রথম কাশীতে আসিয়া, বড়জোর এক সপ্তাহ কাল বেশ ভাল ছিল, কিন্তু কেমন যে মজ্জাগত স্বভাবদোষ, কিছুতেই থাকিতে পারিল না। যেখানে মোকদ্দমার কথা হয়, সেইখানেই কাশীবাসী যাইয়া এক পক্ষ অবলম্বন করে; তার পর ক্রমশই সাক্ষ্য দেওয়া আরম্ভ হইল; জাল-জালিয়াতী আরম্ভ হইল। ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার, মনে মনে একটুকু-আধটুকু ইচ্ছা থাকিলেও, লোকটা হঠাৎ কেমন পাপের প্রলোভনে পড়িয়া যায়, যে, সে সময় তাহার আর জ্ঞান থাকে না। এদিকে কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসী দেখিলে, কাশী-বাসীর ভক্তি বাড়িয়া উঠে। ভক্তিবৃদ্ধির কারণ বোধ হয় এই-রূপ;—সাধুগণ দৈবশক্তি-সম্পন্ন। তাঁহারা অঘটন ঘটাইতে সক্ষম। তাঁহারা অলৌকিকত্বের এবং অপূর্ব্বত্বের আধার। তিন মাসের পথ তাঁহারা তিন মিনিটে যাইতে পারেন। তাঁহাদের ইচ্ছায় নিদারুণ গ্রীষ্মে আকাশে নবঘন দেখা দেয় আর বারিবর্ষণ করে। মৃত-প্রায় রোগীকে মন্ত্রপুত ছাই খাওয়াইয়া তাঁহারা জীবিত করেন। একমুঠা পথের ধূলা লইয়া তাঁহারা একমুঠা খাঁটি সোনা করিতে সক্ষম। তাঁহাদের একটি গণ্ডুষে সাগর শুকাইয়া যায়। তাঁহাদের এক ফুৎকারে দাবানল নিবিয়া যায়। তাঁহাদের নিশ্বাস-বায়ুতে পর্ব্বত উড়িয়া যায়। তাঁহারা ইচ্ছাময়। ইচ্ছায়—কখন নবযৌবন-সম্পন্ন, দিব্য বেশ-ভূষায়-ভূষিত, পারিজাতমালা-পরিহিত, মণি-রত্ন-মণ্ডিত রাজপুত্র হন। ইচ্ছায়—কখন জটা-বল্কলধারী, ভস্মবিলেপনকারী নবীন সন্ন্যাসী হন। ইচ্ছায়—কখন মত্ত মধুকর হইয়া অপ্সরা-সেবিত-মধুবনে গুন্ গুন্ স্বরে গান করেন। ইচ্ছায়—কখন স্বর্গলোকে গমন করিয়া দেব-নর্ত্তকীগণের সহিত হাস্য-পরিহাস করেন। অধিকন্তু এই সকল সাধু-সন্ন্যাসীর নিকট এক এক খানি পরেশ-পাথর থাকে। বোধ হয়, উপরোক্ত ঐ সকল গুণে গুণবান্ হইবার জন্য, ঐ সকল মন্ত্রতন্ত্র শিখিবার জন্য, কাশীবাসী, সন্ন্যাসী দেখিলেই প্রণাম করেন, এবং ভক্তি-গদ্গদ-চিত্তে তাঁহাদের পায়ের ধূলা মাথায় দেন। ভাই শিয়ালমারা! আমার ধারণা এই,—কাশীবাসী আমাদিগকে নিশ্চয়ই

পরমতত্ত্বজ্ঞ সাধু ভাবিয়াছে, অথবা ঈশ্বরের অবতারস্বরূপ স্থির করিয়াছে। নহিলে আমাদের প্রতি উহার এত ভক্তি-যত্ন হইবে কেন? কাশীবাসী ধনবান্। উহাকে আমাদের শিষ্য করিতে পারিলে ভবিষ্যতে এবং বর্ত্তমানে অনেক কাজ হইবে। উহার গৃহে পৌঁছিয়া তুমি উহার সহিত অধিক কথাবার্ত্তা কহিও না। যা কিছু কথা কহিতে হয়, আমি কহিব।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সনাতন এবং শিয়ালমারা, কাশীবাসীর গৃহে পৌঁছিবা-মাত্র, কাশীবাসী অমনি যোড়হাতে গলায় কাপড় দিয়া কহিলেন,—"আসুন আসুন! আ'সতে আজ্ঞা হউক। অপরাহ্ণ অতীত হইয়াছে, সন্ধ্যা হয়-হয়, আপনারা সমস্ত দিন অনা-হারে আছেন,—এখনও সেবা হয় নাই, আপনাদের কতই না কষ্ট হইতেছে। আহা! আহা! মরি মরি! চাঁদ-বদন শুকাইয়াছে!"

শিয়ালমারা মৌনী হইল, কোন কথা কহিল না। সনাতনদাস কহিল, "হরিবোল্ হরি,—একবার হরিহরি বল—হরি রক্ষা কর। (একটু হাসিয়া) আপনি আমা-দিগকে আহার করিবার কথা বলিতেছেন কি? হায় হায়! পার্থিব অন্নের আহারে আমাদের আর ক্ষুধানিবৃত্তি হয় না। হরিনাম-সুধা-পান ব্যতীত এ প্রাণের ক্ষুধা, এ প্রাণের পিপাসা, কিছুতেই মিটে না।

কাশীবাসী। (যোড়হাতে) প্রভু যা বল্‌চেন, তাই ঠিক্। তবে কিনা আপনাদের সেবা করিতে না পারিলে আমাদের মন কাঁদে; তাই বল্‌চি, হবিষ্য-রন্ধনের সমস্তই যোগাড় করিয়া রাখিয়াছি; এ অধীনের গৃহে স্বপাক করিয়া এ অধীনকে কৃতার্থ করুন। আর শেষে এ অধীন আপনা-দের প্রসাদ পাইয়া, যাহাতে এ দগ্ধ প্রাণে শান্তি লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করুন। আমি আপনাদের প্রসাদ-সুধা পান করিব বলিয়া, এ পর্য্যন্ত জলগ্রহণ করি নাই। আপনারা সেই যে, বেলা দুই প্রহরের পর গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন, আমি সেই পর্য্যন্ত পথ-পানে চাহিয়া আছি। আপনাদের আহারের সমস্ত উদ্যোগ করিয়া রাখিয়াছি।

সনাতন। বটে বটে—আমাদের আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে বটে। গঙ্গাস্নানের পর ধ্যানে বসিয়াছিলাম, সে ধ্যান কিছুতেই আর ভাঙ্গে নাই। বহুক্ষণ পরে হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া দেখি, সন্ধ্যা হয়-হয় হইয়াছে। বৈকুণ্ঠবাসী শ্রীহরির প্রেমময় মূর্ত্তি দেখিলে কিছুই আর মনে থাকে না। তাই ধ্যানভঙ্গে এত বিলম্ব ঘটিয়াছিল। আমার যদি ধ্যান ভাঙ্গিল, (শিয়াল-মারাকে উদ্দেশ করিয়া) এই মহা-প্রভুর ধ্যান আর কিছুতেই ভাঙ্গে না। দেখিলাম, ধ্যানে ইনি প্রস্তরবৎ জমিয়া গিয়াছেন। নাকের নিকট হাত লইয়া গিয়া দেখিলাম, নিশ্বাসও পড়ে না। বুঝিলাম, ইহাঁর দেহে আর তখন প্রাণ নাই, দেহ শীতল হইয়াছে। ইহাঁর আত্মা সেই পরম ব্রহ্ম হরিতে গিয়া মিলিয়াছে। তখন আর উপায়ান্তর না দেখিয়া, মহাপ্রভুর চোখে মুখে গঙ্গাজল সেচন করিতে লাগিলাম এবং দক্ষিণ কর্ণে হরিধ্বনি দিতে লাগিলাম। তখন দেখিলাম, ধীরে ধীরে অল্পে অল্পে মহাপ্রভুর দেহ গরম হইয়া আসিতেছে। ক্রমশঃ আরও উচ্চরবে "হরিবোল হরিবোল" করিতে আরম্ভ করিলাম। গা বেশ গরম হইয়া উঠিল, দেহে প্রাণ আসিল, মহাপ্রভু তখন যেন একটু দুলিয়া উঠিলেন। আস্তে আস্তে চক্ষু মেলিয়া ঢুলু ঢুলু নেত্রে বলিলেন,—"আমি কোথায়—হায়! আমি কোথায়? আমার শ্রীকৃষ্ণ কৈ? আমার শ্রীরাধিকা কৈ? আমার যুগল-মূর্ত্তি কৈ?"

"এইরূপ বলিতে লাগিলেন আর মহাপ্রভু কাঁদিতে লাগি-লেন। আমি তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া লইয়া আসিলাম। কিন্তু সেই অবধি মহাপ্রভু কেমন কতকটা মৌনী হইয়া রহিলেন। এই সকল নানা কারণেই আপনার গৃহে ফিরিয়া আসিতে, আমাদের বিলম্ব ঘটিয়াছে।"

কাশীবাসী। আহা! নামের কি অপূর্ব্ব মহিমা! হরি-নামের গুণে সমস্তই সম্ভব। আপনারা মহাযোগী, ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, আমি আপনাদের শ্রীচরণের রেণুর রেণু হইবার উপযুক্ত নই। আপনাদের প্রত্যাগমনে বিলম্ব হউক, তাহাতে ক্ষতি কি আছে! আপনাদের শুভাগমনে, —পায়ের ধূলায় আমার গৃহ আজ পবিত্র হইল, মন পবিত্র হইল। আপনারা যে দয়া করিয়া এ দাসের গৃহে আসিয়া-ছেন, ইহাই যথেষ্ট; আমি আর কিছু চাই না। এক্ষণে কৃপা করিয়া হবিষ্য-রন্ধনের উদ্যোগ করুন এবং আমার জনম সফল করুন।

সনাতন। (হাসিয়া) আচ্ছা, তবে তাহাই হউক। আমরা ভক্ত-মনোবাঞ্ছা সতত পূর্ণ করিয়া থাকি।

কাশীবাসী ধনাঢ্য ব্যক্তি। হরিষ্যান্নের বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। অতি উৎকৃষ্ট পেশওয়ারি আতপ-তণ্ডুল। অতি উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত। ঘৃতের সৌরভে দিক্ আমোদিত। তরি-তরকারী ফল-মূল প্রচুর পরিমাণ। দুগ্ধ, দধি, ক্ষীর, রাবড়ি, মালাই,—প্রচুর পরিমাণ। পেঁড়া, বর্ফী, মিঠাই,—প্রচুর পরিমাণ। উদ্যোগের ত্রুটিও ছিল না, অভাবও কিছু ছিল না। সেই মহা আয়োজন দেখিয়া, সনাতনদাস মনে মনে কহিল, "হায় রে! কেবল লুচি খাইয়াই আজ পেট ভরাইলাম! এত মিষ্টান্ন, এত সন্দেশ-মিঠাই, এত ক্ষীর-দই, সমস্তই বৃথায় গেল। যাহোক, আজ একটা কায়দা এবং কসরৎ দেখাইতে হইবে।"

সনাতনদাস "হরিবোল হরিবোল" শব্দ অনবরত করিতে করিতে, রন্ধন আরম্ভ করিলেন। তরকারী কিছু স্বতন্ত্র রাঁধিলেন না,—যাহা কিছু ছিল, সমস্তই ভাতে দিলেন। বলিলেন, "আমরা একপাকে যাহা হয় তাহাই খাই,—দুই তিনবার হাঁড়ি চড়াই না।" সুতরাং শীঘ্রই রন্ধন-কার্য্য

শেষ হইল। উপযুক্ত পাত্রে অন্নাদি রাখিয়া কহিলেন, "এই বার শ্রীহরিকে সমস্ত নিবেদন করিতে হইবে।" তখন কাণে কাণে কাশীবাসীকে, সনাতনদাস অতি গোপনে কহিলেন, "ইনিই (শিয়ালমারা) স্বয়ং শ্রীহরি বা শ্রীহরির অংশস্বরূপ। ইহাঁকে কেহ এখনও চিনিতে পারেন নাই বা এখনও ইনি নিজ মূর্ত্তিতে প্রকট হন নাই। ইহাঁকেই অন্নাদি নিবেদন করিলে, শ্রীহরিকে নিবেদন করা হইবে। ইহাঁর ভক্ত এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, ইনিই সোঽহং। তবে ইনি আত্মশক্তি এবং নিজ মাহাত্ম্য গোপন করিয়া, থাকেন। যখন আমরা মথুরায় বাস করিয়াছিলাম, তখন একদিন গভীর নিশীথে, যমুনার তীরে, ইনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, বদনে বংশী দিয়া, রাধা রাধা বলিয়া ডাকিয়াছিলেন;—ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু যখন তিনি টের পাইলেন যে, আমি আসিয়াছি, তখন তিনি সে মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া অমনি মানুষ হইয়া পড়িলেন! ইনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পুরুষ। ইচ্ছা করিলে ইনি বোলতা হইয়া ভোঁ করিয়া উড়িয়া যাইতে পারেন,—ইহাও আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কিন্তু ইহাঁকে মনে মনে দেবতা জানিলেও, যদি মানুষ ভাবিয়া ইহাঁর সহিত ব্যবহার না করেন, তাহা হইলে ইনি কখনই থাকিবেন না। ইনি যদি জানিতে পারেন যে, আপনি ইহাঁকে দেবতা বলিয়া ঠাওরাইয়াছেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ইনি পলাইয়া নিরুদ্দেশ হইবেন,—অতএব সাবধান।"

কাশীবাসী এই গূঢ় গোপনীয় কথা, কাণে কাণে শ্রবণ করিয়া, আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না,—সনাতনদাসের পদপ্রান্তে তিনি ধড়াস করিয়া পড়িয়া গেলেন এবং ভক্তি গদ্গদ-চিত্তে তাঁহার চরণ দুইটী ছাঁদিয়া ধরিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতে লাগিলেন,—"হায় আমার আজ কি শুভাদৃষ্ট! না জানি, পূর্ব্বজন্মে কত পুণ্যই করিয়াছিলাম, তাই বুঝি আজ স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান, দেহধারণ করিয়া, আমার গৃহে অধিষ্ঠিত হইলেন! ধন্য আমি,—ধন্য আমার জীবন!"

সনাতন। চুপ! চুপ! একথা কহিও না, মহাপ্রভু একথা শুনিলেই এখনই নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া যাইবেন।

কাশীবাসী প্রকৃতিস্থ হইলেন। দেবতাকে যেমন ভোগ নিবেদন করে, সনাতনদাস শিয়ালমারাকে সেইরূপ ভোগ নিবেদন করিলেন। কত মন্ত্রতন্ত্র বলিলেন, শাঁক-ঘণ্টা বাজাইলেন। এইরূপ অর্দ্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইলে, শিয়ালমারা তখন পাত্র হইতে প্রথমে একটী ভাত লইয়া মুখে দিলেন, তারপর আবার নীরব হইয়া গেলেন। সনাতনদাসের শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর আবার বাজিল। এইরূপ দশ মিনিট অতীত হইল,—শিয়ালমারা আবার দুইটী ভাত লইয়া মুখে দিলেন। তখন সনাতনদাস আনন্দে "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া উঠিলেন। কাশীবাসীকে বলিলেন, "ঠিক হইয়াছে, ঠিক হইয়াছে। আসুন, এইবার আমরা প্রসাদ ভক্ষণ করি।" কাশীবাসীর সমস্ত দিন আহার হয় নাই। বিশেষতঃ প্রসাদে তাঁহার অচলা ভক্তি; এদিকে সনাতনদাসও বলিয়া দিয়াছেন, প্রসাদ ফেলিতে নাই, সাধ্যমত খাইতে হয়,—তবে অসাধ্য হইলে স্বতন্ত্র কথা। কাশীবাসী উদর পূর্ণ করিয়া প্রায় দেড়পোয়া পেশওয়ারি চাউলের অন্ন ভক্ষণ করিলেন।

ক্ষীর-মিষ্টান্নাদিও তদনুযায়ী তাঁহার উদর-গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইল। সনাতনদাস পাত্রপরিপূর্ণ অন্ন এবং যথেষ্ট মিষ্টান্নাদিও আহারার্থ লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু খাইলেন না কিছুই। অর্দ্ধ মুঠা অপেক্ষাও কম অন্ন তিনি হরিধ্বান করিতে করিতে ভক্ষণ করিলেন, এবং একটী খড়িঁকা চাহিয়া লইয়া, তাহার ডগটী,—ক্ষীরে, দ'য়ে, রাবড়ী প্রভৃতিতে এক একবার ঠেকাইয়া সেই খড়িকাগ্রভাগ মুখে দিতে লাগিলেন। এইরূপেই তাঁহার আহার-কার্য্য শেষ হইল।

কাশীবাসী অবাক্ হইলেন। ভাবিলেন, "এ কি! সমস্ত দিনের পর কি এই আহার,—এত সামান্য আহার! তবে ইনি কিরূপে জীবন ধারণ করিয়া আছেন?" আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া প্রকাশ্যেই সনাতনদাসকে জিজ্ঞাসিলেন, —"দেবতা! এত অল্প আহার করিয়া আপনারা কিরূপে প্রাণধারণ করেন, বলুন দেখি!" সনাতন দাস হো হো হাসিয়া উত্তর দিলেন, "উহা কিছুই নহে,—উহা কিছুই নহে,—আপনার ওসব কথা শুনিয়া কাজ নাই।"

কাশীবাসীর কৌতূহল আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি অধীর হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"বলুন বলুন, আমাকে পর মনে করিবেন না। আহা! কিবা হৃষ্ট-পুষ্ট-বলিষ্ঠ দেহ, কিবা কমনীয় কান্তি, অথচ আপনার আহার নাই! গূঢ় রহস্য আছে,—গূঢ় রহস্য আছে।"

সনাতনদাস। তবে শুনুন; কিন্তু এ গোপনীয় কথা অন্য কাহাকেও প্রকাশ করিবেন না। আমাদের নানারূপ প্রক্রিয়া আছে, যোগ অভ্যাস আছে, তন্ত্রমন্ত্র আছে,—সেইজন্যই এত অল্প আহারে প্রাণধারণ করিতে পারি এবং এই অল্প আহারেই শক্তি এবং লাবণ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আমি যত যোগাভ্যাসে পরিপক্ক হইতেছি, ততই আমার আহার কমিতেছে। আমি শীঘ্রই অন্ন ত্যাগ করিয়া কেবল ফল-মূল ধরিব। তার পর অতি-পক্ক হইলে, পত্র আহার আরম্ভ করিব। আর যে দিন চরম পক্ক হইব, সেই দিন হইতে কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিব।—হরি হে! দীনবন্ধু! শ্রীরাধাবিনোদ! তব দাসানুদাসকে রক্ষা কর। হরি হরি হরি।

সনাতনদাসের এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া, কাশীবাসীর অবাক্ত্ব আরও বৃদ্ধি হইল। তিনি বিস্ময়-বিমুগ্ধ-নেত্রে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন এবং শেষে সনাতনদাসের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া অশ্রুজল ফেলিতে ফেলিতে, শিয়ালমারার পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

জন্মভূমি।

অষ্টম ভাগ। | মাঘ। ১৩০৪। | ২য় সংখ্যা।

বাঙ্গালার জমীদার।

মোগল সম্রাট "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" আকবরের সময় হইতে দ্বিতীয় আলমগীরের সময় পর্য্যন্ত বত্রিশটি নবাব বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন। এই সকল নবাবের দাউদ খাঁ প্রথম এবং সিরাজুদ্দৌলা শেষ। সকল নবাব বা সুবাদার দিল্লীশ্বর মোগল সম্রাটের অধীন শাসনকর্ত্তা ছিলেন বটে; কিন্তু সেই প্রবল-প্রতাপান্বিত ভারতের একছত্র সম্রাট আকবর হইতে সেই হৃতশক্তি হীয়মান্ দ্বিতীয় আলমগীর পর্য্যন্ত কোন সম্রাটই অপ্রতিহত প্রভাবে নির্ব্বিঘ্নে বঙ্গভূমে আপনার আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই। ইতিহাসে বোধ হয়, এমন একটী মোগল-সম্রাটের নাম দেখিতে পাইবেন না, যাঁহার রাজত্বকালে অধীন বঙ্গভূমি, কখন না কখন, কোন না কোন বিপ্লব-বিভ্রাটের অল্প-বিস্তর ঝঞ্ঝাঘাতে বিক্ষোভিত হয় নাই। নবাব দাউদ খাঁ হইতে নবাব সিরাজুদ্দৌলা পর্য্যন্ত বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃগণের রাজস্ব-তত্ত্বের ইতিহাস আলোচনা করিলে, পাঠক, সহজে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন।

এই সকল মুসলমান নবাবের রাজত্বকালে বাঙ্গালার জমীদারী ও জমীদারের বিস্তৃতি-শক্তি কিরূপ ছিল, তাহার আলোচনা করা, এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সময় ও শাসনের পরিবর্ত্তনে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন কিরূপ দাঁড়ায়, তাৎকালিকজমীদারী ও জমিদারবর্গের বিস্তৃতিশক্তিতত্ত্বের আলোচনায় তাহার একটা সিদ্ধান্ত হইতে পারে। এই বিস্তৃতিশক্তির বিবৃতি-ব্যাখ্যা বাঙ্গালা ইতিহাসে বিরল; অথচ ইহা বাঙ্গালীর অবশ্য-জ্ঞাতব্য।

দাউদ খাঁ হইতে নবাব সিরাজুদ্দৌলা পর্য্যন্ত নবাবমণ্ডলীর রাজত্বকালে, কি মুসলমান, কি হিন্দু, সকল জমীদার, ধনজনবলে সর্ব্বাংশে শক্তিমান্ ছিলেন। তাঁহাদের জমীদারীর যেমন বহুল বিস্তার ছিল, শক্তি-সামর্থ্যেরও তেমনই বিপুল প্রসার ছিল। অনেক সময় অনেক জমীদার বঙ্গের শাসন-কর্ত্তৃগণের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতেন। কেবল বঙ্গের শাসনকর্ত্তা কেন, দিল্লীর সম্রাটের সমকক্ষতা প্রয়াসে, স্বপ্ন-সম্ভব সাম্রাজ্যৈশ্বর্য্যের প্রলোভনে, কোন কোন বাঙ্গালী, জমীদার, স্বয়ং সাম্রাজ্য-বিভূতি স্বাধীনতার উজ্জ্বল টীকায় ললাট-ফলক বিভূষিত করিয়া, দিল্লীশ্বরের স্বর্ণ সিংহাসনে হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের সে আকুল আকাঙ্খা, কোন্ স্মরণাতীত কালে রণক্ষেত্রে মৃত্যুর ভীমছায়ায় মিশাইয়া গিয়াছে; কিন্তু আজিও জমীদারের সেই আকাঙ্খার প্রকট মূর্ত্তি,—বীরত্বের বীর্য্যাধান, ভীম ভয়াবহ হিমগিরি, তথা খরোজ্জ্বল শত ভানুবৎ অনল-প্রতিভায় উদ্ভাসিত হইয়া, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুরাসদ দুর্দ্দমনীয় যশোহরের বলদৃপ্ত প্রবল প্রতাপান্বিত জমীদার প্রতাপাদিত্য ইহার দৃষ্টান্ত-স্থল। আকবর যখন দিল্লীর সম্রাট ছিলেন, তখন বঙ্গদেশের উড়িষ্যা-অঞ্চলে আফগানেরা বিদ্রোহী হইয়া বঙ্গের শাসনকর্ত্তাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই সময়ে, এই আফগান-বিদ্রোহের অবসরে, প্রতাপাদিত্য স্বাধীনতার কীরিট-ভূষা মস্তকে ধারণ করিবার প্রকট প্রলোভনে বিমোহিত হইয়া, দিল্লীশ্বর সম্রাট আকবরকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। সম্রাট সৈন্যের সহিত তিনি যে অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গের ইতিহাসে বাঙ্গালী বীরত্বের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তরূপে চিরকাল জাজ্বল্যমান থাকিবে। হতভাগ্য প্রতাপ যুদ্ধে পরাভূত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার বীর্য্য-বিক্রমে মোগল সেনাপতি বীর্য্যবান্ মানসিংহকে স্তম্ভিত, ভীত ও চকিত হইতে হইয়াছিল।

প্রতাপের মতন বীর্য্যবিক্রম না হউক; অন্যান্য সম্রাটের সময়, অন্যান্য অনেক জমীদার যুদ্ধে শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। মুসলমান নবাবদের সময় বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমান জমীদারদের এইরূপ শৌর্য্য-বীর্য্য-প্রকটনের সুযোগ ও অবসর সংঘটিত হইয়াছিল। কারণ সেই সুযোগ-অবসরের নিত্য সহায়-সহচর ও পোষক।

মোগল-সম্রাটের সময় অনেক অধীন নবাব স্বাধীনতা-

স্পৃহার অনিবার্য্য দীপ্তরাগে উদ্দীপিত হইয়া, মোগল-সম্রাটের বিপক্ষে অসি সঞ্চালন করিয়াছিলেন। মোগল-সম্রাটকেও তাঁহাদের শাসন-দমনার্থ যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। নবাবগণ রাজ্য-প্রজা ভুলিয়া, আত্মশক্তির পরিমাণ না লইয়া, স্বাধীনতার প্রদীপ্ত প্রলোভনে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেন। প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিয়া, দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া, মুসলমান নবাবগণ সম্রাট-সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধবিদ্রোহে লিপ্ত থাকিতেন। এই যুদ্ধবিদ্রোহের ফলে রাজ্যের মধ্যে বিবিধ প্রকারে বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়িত। সে বিশৃঙ্খলার ফলে রাজ্যে অশান্তি হইত। নবাবগণের অধীন তদানীন্তন মুসলমান বা হিন্দু জমীদারগণ এই অশান্তি-অবসরে আপনাদের বলাধিপত্য বিস্তারের সুযোগ বুঝিয়া, বঙ্গের মসনদে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন। মৃত মৃগ-শিকারের জন্য সিংহ-ব্যাঘ্রে যুদ্ধ বাধিলে, সে শিকারের প্রতি জম্বুক-ভল্লুকের লালসা-দৃষ্টির সুযোগ ঘটিয়া থাকে। অশান্তির অবসরে, আর স্বদেশের অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতার সুযোগে, বাঙ্গালার জমীদারগণ সহজে বলসঞ্চয় করিয়া লইতেন। ক্রমে বলসঞ্চয় করিয়া তাঁহারা নবাবগণের বল পরীক্ষা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। সম্রাট আকবর থাকবস্তী বন্দোবস্ত জমীর শাসন-বিভাগের অনেক সুবিধা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু বঙ্গদেশে তাহা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অধিকন্তু দিল্লীর সম্রাটেরা জমীদারদিগের উপর বড় কঠোর শাসন-দৃষ্টি রাখিতেন না; কেবল জমীদারদিগের নিকট হইতে নির্দ্ধারিত কর লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। কাজেই জমীদারেরা দেশের প্রজাগণকে আপন আয়ত্ত করিয়া রাখিতেন; পরন্তু প্রজামণ্ডলীর উপর জমীদারগণের অনাহত শক্তি সঞ্চালিত হইত। কাজেই তখন জমীদারগণ ধনজনবলে বিক্রান্ত হইয়া উঠিতেন। সেই বিক্রান্ত জমীদারগণ, অশান্তির সুযোগে এবং আপনাদের ধনজনবলের ভরসায়, বঙ্গের মুসলমান শাসন-কর্ত্তাদিগকে মসনদচ্যুত করিবার প্রয়াস-বর্জ্জনের লোভ সংবরণ করিতে পারিতেন না।

কেবল যুদ্ধবিগ্রহের অশান্তি, জমীদারদিগের উত্তেজনার অবসরজনক নহে; ইংরেজি ইতিহাসে যাহা পড়ি, তাহাতে মনে হয়, কোন কোন মুসলমান নবাবের বিকট হিন্দু-বিদ্বেষ, পরাক্রমশালী জমীদারদিগকে উত্তেজিত করিবার অবসর-পথ খুলিয়া দিত। শক্তিমান্ ইংরেজ ইতিহাস-লেখক ষ্টুয়ার্ট সাহেবের বাঙ্গালা ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়, কোন কোন মুসলমান নবাব হিন্দুর ধর্ম্মে আঘাত করিতেন; হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হইতেন; হিন্দুর পবিত্র দেব-মন্দিরাদি কলঙ্কিত করিতেন। ষ্টুয়ার্ট সাহেব অধিকাংশ স্থলে মুসলমান ইতিহাসলেখকদিগের ইতিহাস-সাহায্যে বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়াছেন। সকল নবাবই যে হিন্দুদ্বেষী ছিলেন, ষ্টুয়ার্ট সাহেব এমন কথা বলেন না; কিন্তু যাঁহারা অত্যাচার করিতেন, তাঁহারা অত্যাচারের চরম সীমায় উঠিতেন। নবাব সায়স্তা খাঁ ও নবাব মুরশিদকুলি খাঁ ইহার দৃষ্টান্ত-স্থল।

নবাব সায়স্তা খাঁ ও নবাব মুরশিদকুলি খাঁ বহু গুণোপেত ছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহারা হিন্দু জমিদারদিগের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিতেন।

সায়েস্ত খাঁ শাসনকর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত হইয়া, অনেকগুলি হিন্দুমন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং অনেক হিন্দুকে বলপূর্ব্বক আত্মধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছিলেন। মুল্লুক-চাঁদ নামে একজন উচ্চপদস্থ হিন্দু রাজস্ববিভাগে বি জুয়াচুরী করিয়াছিলেন বলিয়া, নবাব সায়স্তা খাঁ তাঁহাকে বন্দী করেন। কেবল বন্দী করিয়া, তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। তিনি মুল্লুক চাঁদকে স্বধর্ম্মে আনয়ন করিবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মুল্লুকচাঁদ স্বধর্ম্মপরায়ণ নিষ্ঠাবান হিন্দু। কারাবাসের অন্ধতামসে ইহলোক বিসর্জ্জন করিতে হয়, সেও স্বীকার, তবুও তিনি মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে সম্মত হন নাই। অবিচলিতচিত্ত ভক্ত মুল্লুকচাঁদ অনেক দিন কারাগারে ছিলেন। তিনি কারাগারে জীবনত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন কিন্তু রাজকুমার মহম্মদ আজিমের কৃপায় মুক্তিলাভ করেন। পূর্ব্বে এই আজিম মহম্মদের সহিত তাঁহার সখ্যতা হইয়াছিল। সায়স্তা খাঁর অসহনীয় অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া বিহারের জমীদার গঙ্গারাম বিদ্রোহী হইয়াছিলেন তিনি বীর; বীরের মত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু ভাগ্যদোষে পরিশেষে পরাভূত হন।

অশান্তি ও অত্যাচারের হেতু না থাকিলেও, কোন কোন জমীদার, নবাবদের অসাবধানতা ও অপরিণামদর্শিতার সুযোগে, বঙ্গের সিংহাসন প্রলোভনে প্রমত্ত হইতেন। নবাব ইব্রাহিম খাঁর রাজত্বে ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। এই সময়ের জমীদার শোভাসিংহ কুপ্রবৃত্তির ক্রীতদাস না হইলে, হয় ত, একদিন বঙ্গের মসনদে অধিষ্ঠিত হইয়া, অব্যাহত প্রভাবে বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে পারিতেন।

শোভাসিংহ বর্দ্ধমান জেলার অন্যতম জমীদার ছিলেন। তিনি কোন কারণে বর্দ্ধমানের রাজার প্রতি বিরক্ত হন। রাজাকে কোনরূপে শাসন করিয়া বৈরনির্য্যাতন সঙ্কল্পসাধন করাই তাঁহার চরম উদ্দেশ্য হইয়াছিল। এই সময় উড়িষ্যার রহিম খাঁ আফগান জাতির সর্দ্দার ছিলেন। তখন উড়িষ্যায় আফগানেরা হতবল হইয়া পড়িয়াছিল, তবুও আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য শোভাসিংহ রহিম খাঁকে আহ্বান করেন। রহিম সসৈন্য তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছিলেন।

অতঃপর বিপুল বিক্রান্ত শোভাসিংহ রহিমের সঙ্গে একত্র হইয়া যুদ্ধার্থ বর্দ্ধমানে অগ্রসর হন। বর্দ্ধমানরাজ রাজা কৃষ্ণরামের সহিত তাঁহার তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে কৃষ্ণরাম হত হন। কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎ রা

পলায়ন করেন। শোভাসিংহ রাজার সকল পরিবার ও ধন-সম্পত্তি হস্তগত করিয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন।

জগৎ রায় পলায়ন করিয়া ঢাকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় তিনি নবাব ইব্রাহিম খাঁ শরণাপন্ন হন। শোভাসিংহ যে প্রবল-পরাক্রান্ত, নবাব তাহা বিবেচনা করেন নাই। তাহা হইলে, তিনি শোভার শাসনার্থ স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিতেন। তিনি আশ্রিত জগৎ রায়কে সাহায্য করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু শোভাসিংহকে শাসন করিবার জন্য যশোহরের ফৌজদার নুর আল্লাকে আজ্ঞা করেন। নুর আল্লা নামে ফৌজদার অর্থাৎ সেনাপতি; কিন্তু কাজে তিনি ব্যবসায়ী বণিক। বাণিজ্যে তিনি বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। যাহা হউক, যখন নবাবের হুকুম, তখন শক্তি না থাকিলেও, তাঁহার হুকুম তামিল করিতে হইবে ত। তিনি অতিকষ্টে তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া শোভাসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি গিয়া দেখেন, শোভাসিংহ বড় সহজ শত্রু নহেন। তখন তিনি আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া হুগলীর মধ্যে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। সাহসী ফৌজদার নুর আল্লার হুকুমে হুগলী দুর্গের ফটক বন্ধ হইয়াছিল। রুদ্ধদ্বার দুর্গের ভিতর বসিয়া, আপনাকে আত্মারাম ভাবিয়া, তিনি চুঁচুড়ায় ওলন্দাজের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। শোভাসিংহ বুঝিয়াছিলেন, কোন্ বীরপুরুষের উপর নবাব তাঁহার শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া অমিততেজে হুগলী আক্রমণ করেন। বেগতিক বুঝিয়া নুর আল্লা রাত্রিকালের অন্ধকারে মুখ লুকাইয়া গোপনে দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। দুর্গের লোকেরা কর্ত্তার অবস্থা বুঝিয়া দুর্গদ্বার উন্মোচনের ব্যবস্থা করিলেন। দুর্গদ্বার উন্মোচিত হইল। শোভাসিংহ নির্ব্বিঘ্নে বিনা রক্তপাতে হুগলী সহর অধিকার করিলেন।

শোভাসিংহের হুগলী-বিজয়-বার্ত্তায় নবাবের মসনদও প্রকম্পিত হইয়াছিল। চুঁচুড়ার ওলন্দাজ, চন্দননগরের ফরাসি এবং সুতানুটীর ইংরেজ ভয়চকিত প্রাণে আপন আপন ধনসম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। চারিদিকেই ভয়বিহ্বলতা! চারিদিকেই উদ্বিগ্নতা! ফরাসি, ওলন্দাজ ও ইংরেজ, নবাবকে বলিয়া পাঠাইলেন,—"আমরা আপনার সহায় ও সুহৃদ। আপনি আমাদিগকে গড়বন্দী করিতে দিন; নহিলে আমরা আপনার মিত্র জানিলে, শোভাসিংহ আমাদের সর্ব্বনাশ করিবে।" নবাব উত্তর দিলেন,—"তোমরা যেরূপে পার, আত্মরক্ষা কর।" ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসি এই সুযোগে আপন আপন কুঠীর চারি পার্শ্বে সুদৃঢ় প্রাচীর তুলিয়া লয়েন এবং কুঠীগুলি সুদৃঢ়রূপে গড়বন্দী করিয়া ফেলেন। শোভাসিংহের বিভীষিকা, তিনটী ইউরোপীয় জাতির পরম সুখসূচক হইল।

এই সময় শোভাসিংহ চারিদিকে সৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং সকলকে আপনার সহিত যোগ দিবার জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন। যাহারা যোগ দিল না, শোভাসিংহ তাহাদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সকলে বিপদ্‌ত্রাসে আকুল হইয়া উঠিল। গঙ্গার পশ্চিম পারের লোকেরা চুঁচুড়ায় আশ্রয় লইল। এই সব লোকের কষ্টে ব্যথিত হইয়া চুঁচুড়ার শাসনকর্ত্তা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, আমরা যে একটা ক্ষমতাশীল সজীব জাতি, দিল্লীর সম্রাটকে ইহাই বুঝাইবার উপযুক্ত অবসর পাইয়াছি। আজ যদি আমরা এই সব বিপন্ন প্রজাকে আপন বাহুবলে রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে দিল্লীর সম্রাট অবশ্য আমাদের এই উপকারের পুরস্কার দিবেন। এইরূপ ভাবিয়া, তিনি তদ্দণ্ডে দুইখানি জাহাজ সজ্জিত করিলেন। তাঁহার আদেশে অনেকগুলি ইউরোপীয় সৈন্য জাহাজে উঠিল। শাসনকর্ত্তা সেই সৈন্যপূর্ণ জাহাজ দুইখানি লইয়া হুগলীর অপর পারে নোঙর করিলেন।

চুঁচুড়ার শাসনকর্ত্তার প্রকৃত অভিপ্রায় না বুঝিয়া শোভাসিংহ সৈন্যসমূহসহ প্রবলবেগে দুর্গ-প্রাচীরের নিকট উপস্থিত হন। জাহাজ হইতে কামানের গোলা ও বন্দুকের গুলি ছুটিতে লাগিল। শোভাসিংহ তখন বুঝিলেন, ওলন্দাজেরা এখন যে ভাবে আত্মরক্ষার উদ্যোগ করিতেছেন, তাহাতে আপাততঃ হুগলীতে থাকা, শ্রেয়ঃকল্প নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, তিনি সসৈন্য তখনই হুগলী পরিত্যাগ করিলেন এবং যাবতীয় সৈন্যসহ অগ্রসর হইলেন।

শোভাসিংহ সপ্তগ্রামে গিয়া নদীয়া এবং মুরশিদাবাদ আক্রমণ করিবার জন্য রহিম খাঁকে বহু সেনাসহ প্রেরণ করেন এবং স্বয়ং বর্দ্ধমানে প্রত্যাবৃত্ত হন। যেন কোন্ অনতিক্রম্য অলক্ষ্য আকর্ষী, শোভার গলা চাপিয়া টানিয়া লইয়া গেল। শোভার প্রাণের ভিতর নরককুণ্ডের অনল জ্বলিতেছিল। পাপের বিকট পিপাসায় স্নেহের সুধারস শুকাইয়া গিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে তিনি রাজা কৃষ্ণরামের যে পরিবারকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে রাজার একটী পরমা সুন্দরী অনিন্দ্যা রূপসী যুবতী কন্যা ছিলেন। শোভাসিংহ রূপসী যুবতী রাজকুমারীর রূপ-মোহে মুগ্ধ হইয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন। তিনি আত্ম-সংবরণ করিতে না পারিয়া রূপসীর পদতলে বিলুণ্ঠিত হইলেন এবং প্রেম-পিপাসুর কাতরকণ্ঠে করযোড়ে প্রেম-ভিক্ষা করিলেন। সতী সাধ্বী রূপসী রাজকুমারী ঘৃণায় লজ্জায় বদন করকমলে আচ্ছাদিত করিয়া শোভাসিংহের প্রেম-ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান করিলেন। যুবতী বাষ্পাকুলিত লোচনে গদ্গদ বচনে আপনার যশমান সতীত্বগৌরব রাখিবার জন্য শোভাসিংহকে বিনয়ে অনেক বুঝাইলেন। শোভা বুঝিল

না ; পরন্তু বলপূর্ব্বক কঠোর করযুগলে সে বিদ্যুজ্জ্যোতির্ম্ময়ী স্বর্ণলতা যুবতীকে আকর্ষণ করিলেন। যুবতী তখন গভীর গর্জ্জিনী কেশরিণীবৎ গর্জ্জন করিয়া বস্ত্রাঞ্চল হইতে বিদ্যুৎবিচ্ছুরণী শাণিত ছুরিকা বাহির করিলেন। সহসা দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া যেন স্ফাটিক স্তম্ভের অভ্যন্তর হইতে মৃত্যুবাণ নিঃসৃত হইল। শোভা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। রাজকুমারী তখনই শোভার বক্ষঃস্থলে শাণিত ছুরিকা বসাইয়া দিলেন। চকিতে তাঁহার প্রাণবায়ু উড়িয়া গেল। যুবতী দেখিলেন, আত্মহত্যা ভিন্ন তাঁহার আত্মগৌরব রক্ষার আর উপায় নাই। তখনই তিনি সেই শাণিত ছুরিকা আপন কণ্ঠে বসাইয়া দিলেন। মুহূর্ত্তে সে জ্যোতির্ম্ময়ী তেজস্বিনী যুবতীর প্রাণবায়ু নিঃসারিত হইল।

শোভা বীর, শোভা যোদ্ধা, শোভা উদ্যোগী, শোভা সাহসী। যদি পাপের অনিবার্য্য পরিণাম অপমৃত্যু না হইত, তাহা হইলে, শোভা নিজ বীর্য্যবলে বঙ্গের মসনদ করায়ত্ত করিতে যে না পারিতেন, তাহাই বা কে বলিতে পারে ?

মুসলমান নবাবদের সময় বাঙ্গালায় শোভার ন্যায় শৌর্য্যশালী আরও অনেক জমীদারের আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু শোভার পরিণাম দৃষ্টান্ত বিরল।

ভক্তিতে মুক্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"কৃষ্ণে রতাঃ কৃষ্ণমনুস্মরন্তি
রাত্রৌ চ কৃষ্ণং পুনরুত্থিতা যে।
তে ভিন্নদেহাঃ প্রবিশন্তি কৃষ্ণং
হবির্যথা মন্ত্রহুতং হুতাশে।"

তুরুষ্ক দেশে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান বাস করিতেন। তাঁহার চারি পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর চারি ভাই অতুল বিভবের অধিকারী হইল। দুঃখের বিষয় এই, তাহাদের মধ্যে সৌভ্রাত্র অধিক দিন স্থায়ী হইল না। অনতিবিলম্বে তাহারা পৃথগন্ন হইয়া পড়িল। জ্যেষ্ঠ তিন সহোদর বুদ্ধিমান্, কার্য্যকুশল এবং তাহাদের বিষয়বুদ্ধি সমধিক প্রখর ছিল। কনিষ্ঠ আবদুল রহিম মনস্বী, প্রতিভাশালী, সরলচেতা, শুভকর্ম্মশীল এবং পরম ধার্ম্মিক। তাহার বিষয়বুদ্ধি আদৌ ছিল না। সেজন্য তাহার বৈষয়িক উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, বরং ক্রমশঃ তাহার অবনতিই হইতে লাগিল। রহিম নিতান্ত চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। সে ভাবিতে লাগিল, এক সময়ে যেখানে তাহাদের এত মান, এত প্রতিপত্তি ছিল, সেখানে হীন-অবস্থায় থাকা ত যুক্তি-সঙ্গত হয় না। এক্ষণে তাহার এমন কোন স্থানে যাওয়া উচিত, যেখানে ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা সহজে আপনার উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হয়, তাহার পর অর্থ সংগ্রহ করতঃ দেশে আসিয়া স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে পারিবে। সে লোকমুখে শুনিয়াছিল, ভারতবর্ষ বেশ বাণিজ্যপ্রধান দেশ, আর সেখানকার লোক জনও অতিশয় ধর্ম্মভীরু, সেখানে গেলে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। এই ভাবিয়া, সে আপনার জন্মভূমি পরিত্যাগ করত ভারতবর্ষে যাওয়াই স্থির করিল। আসিবার সময় রহিমের সঙ্গে তাহার সমব্যবসায়ী আরও কয়েকজন জুটিল এবং তাহারা সকলে একত্র হইয়া ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিল। তাহারা নানা নদ নদী, পাহাড় পর্ব্বত, ঊষর ঊর্ব্বর ভূমি, অধিত্যকা উপত্যকা এবং গ্রাম নগর অতিক্রম করিয়া একদিন কাশ্মীরের কোন এক দস্যুসেবিত ভীষণ মহারণ্যে উপস্থিত হইল। সেখানে তাহারা দস্যুকর্ত্তৃক লুণ্ঠিতসর্ব্বস্ব হইয়া কে কোথায় পলায়ন করিল, তাহার আর স্থিরতা থাকিল না।

রহিম হৃতসর্ব্বস্ব এবং সঙ্গিগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বড়ই বিপদে পড়িল। তাহার এই অচিন্তিতপূর্ব্ব ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে, সে কি করিবে, কোথায় যাইবে প্রথমে তাহা কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। অনেক চিন্তার পর ইহা স্থির করিল, ব্যবসা-বাণিজ্যে আশা ভরসা ত একেবারে ফুরাইয়া গিয়াছে, এক্ষণে দিল্লী যাইয়া যদি কোন চাকরির সুবিধা করিতে পারি, তাহা হইলে উদরান্নের জন্য কাহারও আর গলগ্রহ হইতে হইবে না। তাহার পর যদি অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়, তাহা হইলে তখন দেখা যাইবে। এই সঙ্কল্প করত সে দিল্লী যাত্রা করিল। যথাসময়ে রহিম অট্টালিকাময়ী, লোকপূর্ণা দিল্লীতে আসিয়া, কোন এক সঙ্গতিপন্ন স্বজাতীয়ের বাটীতে আশ্রয় লইল। সেখানে কিছুদিন থাকিল বটে ; কিন্তু চাকরির কোন সুবিধা করিতে পারিল না। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া মথুরায় যাওয়া যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া মনে করিল। একে মথুরা হিন্দুদিগের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান, তাহাতে সেখানে অনেক ধনাঢ্য শেঠ বাস করেন। যদি সেখানে কোনরূপ সুযোগ না হয়, তাহা হইলে কোন শেঠের বাড়ী দ্বারবানের কাজ করিয়াও দিনপাত করিতে পারিবে। এই চিন্তা মনে উদয় হওয়াতে সে আপন আশ্রয়দাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া সেই দেবনির্ম্মিতা মনোহারী মথুরাপুরীতে সমুপস্থিত হইল। আবদুল রহিম সেই অপরিচিতপূর্ব্ব রমণীয় স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রথমে নানাস্থান পরিভ্রমণ করত বিশ্রাম-ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন প্রাতঃকাল। নবোদিত সূর্য্যকিরণ শিশিরসিক্ত বৃক্ষপত্রে এবং নির্ম্মল মণিতুল্য স্বচ্ছ যমুনার জলে পতিত হইয়া ঝক্‌মক্ করিতেছে।

স্থানে স্থানে নানা রাগরঞ্জিত উচ্ছ্রিত পতাকা সুমন্দ পবন-হিল্লোল বিচলিত হইতেছে। এখন স্নানের সময়। এই সময়ে ঘাট লোকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। কেহ স্নানের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, কেহ স্নানে যাইতেছে. কেহবা মহর্ষিগণ-সেবিতা পাপভয়নাশিনী যমুনার জলে অবগাহন করিতেছে। কত সুস্নাতা শোভনবসনা কুলকামিনী, দেবায় তন সকল পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিতেছেন, কেহবা জল দ্বারা দেবদেবীর মূর্ত্তিকে স্নান করাইতেছেন। কেহবা এক স্থানে বসিয়া ভক্তিবিহ্বল-চিত্তে ভগবানের চরণ-কমল চিন্তা করিতেছেন। স্থানে স্থানে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা লোকজনের হৃদয় ভক্তিরসে একেবারে প্লাবিত হইয়া উঠিতেছে। রহিম ঘাটের যে দিকে চক্ষু ফিরাইতেছে, সেই দিকে ভক্তির উৎস একেবারে উচ্ছলিত হইয়া পড়িতেছে। ইহা দেখিয়া তাহার শরীর অবসন্ন এবং হৃদয় ভক্তিভরে যেন বিগলিত হইয়া গেল। তখন সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, হায়! সে যদি জবন-গৃহে জন্মগ্রহণ না করিয়া হিন্দুর ঘরে জন্মিত, তাহা হইলে আজ এই হিন্দুদের সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া, তাহাদের সঙ্গে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া প্রাণ ভরিয়া হরিগুণ গাইত। রহিম বিষাদ-ক্ষুণ্ণ মনে এই কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘাটের এক প্রান্তে বসিয়া পড়িল। কিন্তু এই হিন্দুদের স্নানের ঘাটে রহিমের বসিয়া থাকা নিতান্ত সুখকর বলিয়া বোধ হইল না। স্নানার্থীদের অনেকেই তাহাকে ঘাটে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। কেহ বলিল, "হিন্দুর ঘাটে মুসলমান বসিয়া কেন?" কেহবা ঘৃণা-ব্যঞ্জক স্বরে অপরকে সতর্ক করিতে গিয়া বলিল—"দেখিও, যেন মুসলমানকে ছুঁইয়া ফেলিও না।" তৃতীয় ব্যক্তি বলিল,—"তুমি এখানে কেন বসিয়া আছ, অন্য স্থানে চলিয়া যাও।" এই ভাবে অনেকেই তাহাকে অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিল ; কিন্তু রহিম তাহাদের কোন কথার উত্তর দিল না। হিন্দুদিগের ধর্ম্মানুরাগ, তাহাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভক্তি দেখিয়া, রহিম বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া গেল ; আর আপনাকে জবন বলিয়া মনে মনে শত ধিক্কার দিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে বেলা দ্বিপ্রহর হইয়া উঠিল। তীক্ষ্ণ-রশ্মি দিবাকর আপনার প্রখর কিরণজাল বিকীর্ণ করত চারিদিক্ দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ঘাটে লোক-সমাগম কিছু বিরল হইয়া পড়িল। যে সকল দীন দুঃখী ভিক্ষার্থী হইয়া ঘাটে আসিয়াছিল, তাহারা কেহই বিফল-মনোরথ হইয়া গৃহে ফিরিল না। তাহাদের কিছু না কিছু লাভ হইল। যদিও রহিম অতি মলিন বেশে করলগ্নকপোলে তথায় বসিয়াছিল বটে ; কিন্তু সে নিজে কাহারও নিকট ভিক্ষা চাহে নাই ; আর তাহাকে মুসলমান দেখিয়া, কেহ ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া, কিছু দেয়ও নাই। যাহা হউক, বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইলে রহিমের যেন চমক ভাঙ্গিল। সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, পূর্ব্বের ন্যায় ঘাটে আর সেরূপ জনতা নাই,—অনেকেই আপন আপন গৃহে চলিয়া গিয়াছে। তখন সে আপনার স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক স্নানার্থ ধীরে ধীরে ত্রিলোকপাবনী তপনতনয়া যমুনায় গিয়া উপস্থিত হইল। তথায় দেখিল, নদীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা নির্ম্মাল্য পুষ্প লইয়া ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতেছে। তণ্ডুলকণালোভী শত শত পক্ষী তীরে বিচরণ করিতেছে। বৃহদাকার কচ্ছপেরা তাহাদের দীর্ঘ শুণ্ড প্রসারিত করত আহারান্বেষণে ব্যস্ত রহিয়াছে। রহিম যমুনার নির্ম্মল সুখস্পর্শ সলিলে স্নান করিয়া শরীর ও মনকে পবিত্র করিল। স্নানের পর সে যে কি খাইবে, তাহার সংস্থান কিছুই ছিল না। সে দেখিল, জলে তখন পর্য্যন্ত চাউল-কণা কিছু কিছু পড়িয়া আছে। তাহাই সংগ্রহ করত জলে ধুইয়া আহার এবং অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া যমুনার সুশীতল জল পরিতোষপূর্ব্বক পান করিয়া কোন প্রকারে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল। তাহার পর সে আপনার স্থান অধিকার করিয়া বসিল।

ক্রমে দিবা অবসানপ্রায় হইল, প্রচণ্ড-কিরণবর্ষী সূর্য্যদেব হীনপ্রভ হইয়া অস্তাচলে গমন করিলেন। সর্ব্বজনবন্দনীয় প্রদোষকাল সমুপস্থিত হইল। তখন বিশ্রামঘাটের নূতন আর এক অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া রহিম অনুপম প্রীতিলাভ করিল। সে সময় দীপালোকে ঘাটের চারিদিক্ আলোকিত হইয়া গেল। আরতির সময়ে ঘ্রাণ-মনোহর ধূপগন্ধে সেই স্থান সুবাসিত এবং কাঁসর ঘণ্টার শব্দে চারিদিক্ অনুনাদিত করিয়া তুলিল। স্বর্গপথাভিলাষী পুণ্যশীল সাধুরা অনুচ্চকণ্ঠে তন্ময়প্রাণে ভবভয়ভঞ্জন ভগবানের বন্দনা করিতে লাগিলেন। তাহার পর সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। হিন্দুদিগের ঈদৃশ অনুপম ভক্তিভাব দেখিয়া রহিম আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে যে জবন, তাহা কিয়ৎকালের জন্য একেবারে বিস্মৃত হইয়া, ভক্তবৃন্দের সঙ্গে হরিনাম করিতে লাগিল। এইভাবে যে কতক্ষণ অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা সে কিছুই জানিতে পারে নাই। যখন তাহার মোহ অপগত হইল, তখন সে দেখিল, ঘাটে আর অধিক লোক নাই, অনেকেই প্রায় স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গিয়াছে। সে তখন আপনার স্থানে গিয়া উপবেশন করিল। কিন্তু এখন তাহার হৃদয়ে আর অন্য ভাব নাই ; হরিনাম সেখানে পূর্ণাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে ; কর্ণে অনুক্ষণ হরিনাম প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং মন ভক্তিতে একেবারে আর্দ্র হইয়া গিয়াছে। জবনতনয় রহিম তখন ভাবিতে লাগিল, এমন সুরম্য মনঃপ্রীতিকর স্থান পরিত্যাগ করত তাহার আর কোন স্থানে যাইবার ত প্রয়োজন নাই। সে নিত্য এ প্রকার উৎসব দেখিয়া, কর্ণে হরিনাম শুনিয়া, অতুল আনন্দে দিন অনায়াসেই কাটাইতে পারিবে। এক আহার—তাহা কোন প্রকারে মিলিয়া যাইবে। হিন্দুরা প্রত্যহ

মৎস্যকে কচ্ছপকে এত আহার দিতেছে, আর সে একটা মানুষ, তাহাকে কি কিছু খাইতে দিবে না? এখন যাহারা তাহাকে জবন বলিয়া ঘৃণা করিতেছে, প্রত্যহ তাহাকে এখানে থাকিতে দেখিলে, তাহাদের অবশ্যই দয়ার উদ্রেক হইবে; সুতরাং তাহারা তাহাকে কিছু না দিয়া থাকিতে পারিবে না। পাঁচজনের কিছু কিছু পাইলে, কোন প্রকারে তাহার পেট চলিয়া যাইবে, আর কোন ভাবনা থাকিবে না। মনে এই স্থির করিয়া সে আর কোন স্থানে যাইল না।

রাত্রিটী অতি রমণীয় ছিল। নির্ম্মলকান্তি নিশাপতি স্বীয় বিমল জ্যোতি দ্বারা চরিদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেইস্থানে সুনির্ম্মল কিরণরাশি যমুনাবক্ষে বালুকাময় সৈকতভূমিতে পতিত হইয়া মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছিল। গভীর নিশীথে যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একেবারে নিঃস্তব্ধ, তখন সেই নৈশ নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া এক সুমধুর সঙ্গীত শ্রুত হইতে লাগিল। তন্ত্রীস্বনসদৃশ সুখকর সুললিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া রহিম তীরের ন্যায় একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিল এবং যেদিক্ হইতে সেই সঙ্গীত শুনা যাইতেছিল, সেইদিকে লক্ষ্য করিয়া সে যাইতে লাগিল। নিশাকর-করশোভিত মনোহর রাত্রিতে রহিম নির্ভয়ে দৃঢ়পদবিক্ষেপে চলিতে লাগিল। ক্রমে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া গৃধ্রগোমায়ুসঙ্কুল, বহুলকঙ্কালাবৃত, সর্ব্বপ্রাণি-ভয়ঙ্কর এক ঘোরতর শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে পঁহুছিয়া তাহার হৃদয়ে কিছু ভয়ের সঞ্চার হইল; কিন্তু তাহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। সে শ্মশানের চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া একস্থানে দেখিল, তথায় এক আলোক জ্বলিতেছে। ক্রমশ নিকটবর্ত্তী হইয়া সে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল, তথায় এক অনুচ্চ বেদীর উপরে বিভূতিচন্দনভূষিত, রুদ্রাক্ষশোভিত, গৈরিকবসনপরিধায়ী শশি-মিহিরসদৃশ-প্রভাশালী এক দিব্য পুরুষ বসিয়া আছেন। বেদীর এক স্থানে হোমাবশিষ্ট ভস্মাদি পড়িয়া রহিয়াছে, আর এক স্থানে গৈরিক বসনের ঝুলি রক্ষিত আছে। উক্ত দিব্য-পুরুষের হাতে একখানি চিত্র রহিয়াছে। তিনি একতানমনে সেই ছবির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হৃদয়-উন্মাদকারী গান গাইতেছেন। রহিম তাঁহার অজ্ঞাতসারে বেদীর অতি সন্নিকটে বসিয়া সেই অমৃতনিনাদিনী সঙ্গীতধারায় অভিষিক্ত হইতে লাগিল। উক্ত মহাপুরুষ গীত সমাপন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় চিত্রের দিকে চাহিয়া কতক্ষণ কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া রহিম বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল; কোন কথা যে জিজ্ঞাসা করিবে, তাহার অবসর পাইল না এবং সে সাহসও হইল না। তাঁহার কার্য্যশেষ হইলে তিনি সেই চিত্রখানি অতি সযত্নে ঝুলির মধ্যে রাখিয়া দিলেন। তদনন্তর যখন তিনি বেদী পরিত্যাগ করত আপনার গন্তব্য স্থানে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন রহিম তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই গভীর রজনীতে শ্মশানমধ্যে মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিয়া মহাপুরুষ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে, আর কি নিমিত্তই এমন সময়ে এখানে আসিয়াছ?" রহিম সংক্ষেপে আপনার পরিচয় দিয়া অতি বিনীতভাবে বলিল—"দেব! আমি যমুনার তীরে বসিয়াছিলাম, আপনার সুমধুর সঙ্গীত শুনিয়া এখানে আসিয়াছি। আমার নিতান্ত বাসনা, আপনার মনপ্রাণহারী জগৎভরা সঙ্গীত আর একবার অতৃপ্ত শ্রবণে শুনিয়া লই, আর যাঁহার চিত্র সম্মুখে রাখিয়া আপনি যুগপৎ গাহিলেন এবং কাঁদিলেন, সে ছবিখানি কাহার, তাহাও জানিতে একান্ত ইচ্ছা হয়। আর একটী কথা বলি, যদি আমার প্রতি দয়া হয়, তাহা হইলে আমাকে অনুগত ভৃত্য মনে করিয়া সঙ্গে লইলে আমার জীবন সার্থক হয়।" মহাপুরুষ একটু হাসিয়া বলিলেন,—"জবনতনয়! এ সঙ্গীত শুনিয়া তোমার কোন লাভের প্রত্যাশা নাই, ছবির বিষয় অবগত হইয়া তোমার যে কোন ফল হইবে, এমন কথাও মনে হয় না আর তুমি দেখিতেছ, আমি সন্ন্যাসী, আমার সঙ্গে গিয়া তোমার কোন উপকারও হইবে না, অতএব তুমি আপনার অভীষ্ট স্থানে চলিয়া যাও।" এই কথা বলিয়া দিব্যপুরুষ চলিয়া যাইতে লাগিলেন। রহিম কিন্তু তাঁহার অনুগমন করিতে ছাড়িল না। অল্প দূর গিয়া মহাপুরুষ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, রহিম তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। তখন তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"তুমি কেন আমার সঙ্গে আসিতেছ? আমার সঙ্গে আসিলে তোমার ত কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না; কেন তুমি বৃথা কষ্ট করিতেছ?"

রহিম। ঠাকুর! আমি সেই গান শুনিতে এবং চিত্র দেখিতে বড়ই উৎসুক হইয়াছি। যদি এখন গান শুনাইবার সুবিধা না হয়, তাহা হইলে ঐ ছবিটী কাহার, তাহাই আমাকে কৃপা করিয়া বলিয়া দিন।

দিব্য পুরুষ। তোমার যদি ছবির কথা জানিবার এত কৌতূহল হইয়া থাকে, তাহা হইলে শুন,—এই চিত্র মহারাজ গোবিন্দজীর।

রহিম। গোবিন্দজী কোথায় থাকেন?

দিব্যপুরুষ। তিনি বৃন্দাবনে থাকেন। তুমি তথায় যাও, সেখানে গেলে তোমার চাকরি হইবে; আর মধ্যে মধ্যে এই গানও শুনিতে পাইবে।

এই কথা বলিয়া দিব্যপুরুষ অতি দ্রুতপদে তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

জবন-পুত্র রহিমের মনে আর আনন্দ ধরে না। সে চাকরি পাইবে, মহারাজকে দেখিতে পাইবে, আবার সেই সঙ্গীত শুনিয়া কর্ণকে তৃপ্ত করিতে পারিবে,—ইহা অপেক্ষা অধিক সুখের ইচ্ছা, তাহার মনে তখন আর উদয় হয় নাই। রহিম তৎক্ষণাৎ শ্মশানভূমি পরিত্যাগ করত লোকালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং রাত্রি প্রভাত হইলে বৃন্দাবন যাত্রা করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রহিম কোন স্থানে আর বিলম্ব না করিয়া পরম সুখ-নিকেতন বৃন্দাবনে গিয়া উপস্থিত হইল। অনুসন্ধান দ্বারা গোবিন্দজীর মন্দির দেখিতে পাইল। মন্দিরটী অতি বৃহৎ এবং প্রস্তরনির্ম্মিত। তাহার অভ্রংলিহ চূড়া, অপূর্ব্ব নির্ম্মাণকৌশল এবং অশেষবিধ পারিপাট্য দেখিয়া রহিম একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। সে ভাবিল, এমন সুখময় সৌন্দর্য্যপূর্ণ স্থান না হইলে কি মহারাজের থাকা শোভা পায়! রহিম মন্দিরের এক পার্শ্বে গিয়া বসিয়া থাকিল। প্রাতঃকাল হইতে কত যে লোক দেবদর্শনাভিলাষে আসিতে লাগিল, তাহার কে সংখ্যা করিবে? কিন্তু প্রায় কেহই রিক্তহস্তে আইসে নাই। কেহবা পূজোপকরণ সদ্য-আহৃত সুগন্ধি পুষ্প, কেহবা নৈবেদ্য, কেহবা মিষ্টান্ন লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে লাগিল। যাহার যেরূপ আচার এবং রীতি নীতি, সে তদনুসারে সকল বিষয় যে বিবেচনা করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি? রহিম জাতিতে মুসলমান, তাহার শিক্ষা দীক্ষা সকলই স্বতন্ত্র, সে লোকজনকে দ্রব্য-সম্ভার লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ভাবিল, ইহারা মহারাজের সাক্ষাৎ করিবার বাসনায় এই সকল ভেট লইয়া আসিয়াছে। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় মন্দিরের সম্মুখে অনেক লোক আসিয়া জড় হইল, তাহারা প্রচুর পরিমাণে আহার করিয়া যথাস্থানে আবার চলিয়া গেল। এই সকল দেখিয়া রহিমের শরীর পুলকে পূর্ণ হইল। সে ভাবিল, মহারাজ কি দয়াশীল, তাঁহার দয়ায় আজ কত অভুক্ত লোক উদরপূর্ণ করিয়া খাইতে পাইল! যাহা হউক, রহিম সেই এক স্থানে বসিয়া থাকিল; তাহাকে কেহ চাকুরির কথা বলিল না; কিংবা সে আহার করিয়াছে কিনা তাহাও কেহ একবার জিজ্ঞাসা করিল না। এদিকে তিমিরাপহারী দিবাকর আপনার দৈনন্দিন কাজ সমাপন করিয়া অস্তাচলে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যা সমুপস্থিত হইল। সেই সময়ে গোবিন্দজীর আরতির মহাধূম পড়িয়া গেল। উচ্চরাবী শঙ্খ, কাঁসর, ঘণ্টা এবং দামামার শব্দে সে স্থানটী একে-বারে শব্দায়িত করিয়া তুলিল। আরতি দেখিবার জন্য দলে দলে সকল লোক মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। আরতির পর গোবিন্দজীর ভোগ হইল। তাহার পর লোকজন চলিয়া গেল। উক্ত মন্দিরের প্রথা এই, কেহ অভুক্ত আছে কি না, প্রতি রাত্রিতে তাহা একবার জানা হয়। সেই রীতি অনুসারে অধিক রাত্রিতে মন্দিরের পূজক বাহিরে আসিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, মন্দিরের এক পার্শ্বে একজন লোক বসিয়া আছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, তাহার নাম আবদুল রহিম, সে চাকুরির প্রত্যাশায় তথায় আসিয়াছে।

পূজক। চাকুরির কথা আমি জানি না, তুমি আহার করিয়াছ কিনা, তাহাই জানিতে আসিয়াছি।

রহিম। না, আমি সমস্ত দিনই আজ অনাহারে আছি।

পূজক। আচ্ছা, তুমি এখানে থাক, আমি এখনই তোমার জন্য কিছু খাদ্য আনিয়া দিতেছি।

এই বলিয়া তিনি মন্দিরের ভিতর হইতে তাহাকে অপর্য্যাপ্ত আহার্য্য আনিয়া দিলেন। রহিম অনেক দিনের পর এরূপ উপাদেয় সুখভোগ্য আহার পাইয়া আকণ্ঠ তৃপ্তি করিয়া খাইল। তদনন্তর রাত্রি যাপন করিবার মানসে মন্দিরসংলগ্ন একটী স্থান স্থির করিয়া লইল। সেই অপরিচিত স্থানে আসিয়া নানা প্রকার চিন্তায় তাহার আর ভাল নিদ্রা হইল না। সে ভাবিতে লাগিল, মহাপুরুষ ত তাহাকে চাকুরি দিবার ভরসায় এখানে পাঠাইলেন; কিন্তু সে তাঁহারও দেখা পাইল না; চাকরিরও কোন সুযোগ হইল না। তবে যদি কোন প্রকারে মহারাজের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে তাহাকে তাহার সকল দুরবস্থার কথা বলিবে, তখন হয়ত তিনি দয়া করিয়া তাহাকে চাকুরি দিবেন। এই আশায় নির্ভর করিয়া সে তথায় রহিয়া গেল। রজনী অবসান হইল। অরুণোদয়ে পূর্ব্বদিক উদ্ভাসিত হইতে দেখিয়া বিহঙ্গকুল কলরব করত আহার অন্বেষণে বহির্গত হইয়া চারি দিকে প্রস্থান করিল। রহিমও গাত্রোত্থান করিয়া আপনার ঈশ্বরোপাসনায় নিযুক্ত হইল। তাহার পর মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া বসিয়া রহিল। এদিকে রাত্রিতে দেবমন্দিরের প্রধান পাণ্ডার প্রতি এই প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে, কাল হইতে কোন এক নবাগত মুসলমান মন্দিরের বাহিরে আছে, তাহাকে যেন মন্দিরের দ্বারবান্ নিযুক্ত করা হয়। বেলা আট ঘটিকার সময় মন্দিরের প্রধান পাণ্ডা একটী তুলাভরা মেরজাই, শালুর পাগড়ী আর এক গাছা বাঁশের লাঠি লইয়া মন্দিরের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের সম্মুখে রহিমকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহাকে নিকটে ডাকিলেন এবং তাহার বিষয় সকল অবগত হইয়া তাঁহার মনে বেশ প্রতীতি হইল, এই মুসলমানকে চাকুরি দেবার জন্যই প্রত্যাদেশ হইয়াছে। তিনি তখন তাহাকে বলিলেন, "আজ হইতে তুমি এই গোবিন্দজীর মন্দিরের দ্বাররক্ষক নিযুক্ত হইলে। মাসিক চারি টাকা বেতন এবং দুই বেলা খাইতে পাইবে। বাহিরের যে সকল কাজ হইবে, তাহাই তোমাকে করিতে হইবে। তুমি মুসলমান, মন্দিরের ভিতর কখন যাইতে পারিবে না।" এই কথা বলিয়া তিনি তাহাকে পরিচ্ছদাদি দিয়া মন্দির মধ্যে চলিয়া গেলেন।

পথশ্রান্ত ব্যক্তির শয়ন, ক্ষুধিত ব্যক্তির অন্ন এবং তৃষিত ব্যক্তির পানীয় যেমন পরম তৃপ্তিজনক হয়, রহিমের পক্ষে আজ এই সংবাদ তাহা অপেক্ষা অধিক প্রীতিপ্রদ এবং সন্তোষজনক হইল। সে ভাবিতে লাগিল, শুধু যে, সে প্রচুর পরিমাণে দুই বেলা আহার পাইবে, এমন নহে, সে আবার চারিটী টাকা করিয়া মাসিক বেতনও পাইবে।

ইহার অপেক্ষা অধিক উচ্চাভিলাষ তাহার যেন তখন আর ছিল না। দেশ হইতে বহির্গত হইয়া নানা স্থানে কত বিপদ কত কষ্ট যে সে পাইয়াছে, তাহার আর শেষ নাই, কিন্তু আজ এই চাকরি পাইয়া সে সকল যাতনা, সকল কষ্ট এবং সকল অবসাদই একেবারে মন হইতে তিরোহিত করিয়া ফেলিল। সে তাহার নূতন পরিচ্ছদ পরিয়া, মাথায় লাল পাগড়ী বাঁধিয়া, হাতে লাঠি লইয়া, মন্দিরের সন্নিকটস্থ এক উপযুক্ত স্থান অধিকার করিয়া লইল।

আবদুল রহিমের আজ এই প্রথম চাকরি। এই সময়ে তাহার মনে কত যে আনন্দপ্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহা কে বর্ণনা করিবে? তবে সর্ব্বাপেক্ষা তাহার মনে এই কথা অনুক্ষণ উদিত হইতেছিল যে, কেমন করিয়া প্রাণপণে প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হয়, কি ভাবে ভৃত্যের প্রভুপরায়ণতা দেখাইতে হয়, তাহা একবার ভাল করিয়া সে জগৎকে দেখাইবে। বহুদিন হইতে যে ইচ্ছা সে হৃদয়ে পোষিত করিয়া আসিতেছিল, আজ তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার অবসর পাইতেছে বলিয়া, সে বিশেষ আনন্দিত। এক্ষণে সে প্রহরীর কার্য্য করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। স্নানাহার করিতে রহিমের যে সময় লাগিত, তাহা ভিন্ন সে প্রাতঃকাল হইতে প্রায় সমস্ত রাত্রি একস্থানে ঠায় দাঁড়াইয়া থাকিত। পাছে তাহার প্রভুর কোন কার্য্যের প্রয়োজন হয়, আর সে সেই সময়ে উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে নিতান্ত গর্হিত কাজ হইবে ভাবিয়া, সে সহজে আপনার স্থান পরিত্যাগ করিত না। অরুণোদয়ের পর হইতে সে দেখিত, দলে দলে লোক জন মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতেছে; কিন্তু প্রবেশের পূর্ব্বে প্রায় সকলেই আগে মন্দিরের দ্বারদেশে ভক্তিভরে অবনীতল-বিলুণ্ঠিত-মস্তকে প্রণিপাত করিয়া তবে যাইতেছে। মধ্যাহ্নে কত শত অনাথ আতুর মন্দিরের সম্মুখে কাতার দিয়া বসিয়া গিয়াছে। তাহাদের পরিতোষপূর্ব্বক আহার করান হইতেছে। এই সময়ের মধ্যে যে আসিতেছে, সে আর অভুক্ত হইয়া গৃহে ফিরিতেছে না। সন্ধ্যা-সমাগমে আরতি দেখিবার জন্য মন্দিরে অগণিত লোকের সমাগম হইতেছে। প্রত্যহ এইরূপ ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া সে ভাবিত, মহারাজের কি অপ্রতিহত প্রভাব এবং তাঁহার করুণাও কি অপরিসীম! তাঁহার আশ্রিতেরা যেমন তাহাদের হৃদয়জাত শ্রদ্ধা এবং ভক্তির ফুল্ল শতদল দিয়া তাঁহার পূজা করিতেছে, তিনিও অকাতরে তাহাদের অনন্ত দয়া এবং অপার স্নেহ বিতরণ করিতে কিছুমাত্র কৃপণতা করিতেছেন না। এমন না হইলে কি আর মহারাজ!! তাহার বড় সৌভাগ্য, তাই সে এমন প্রভুর চাকর হইতে পাইয়াছে।

এইরূপে কয়েক দিন কাটিয়া গেল। একদিন নিশীথ সময়ে দেবদর্শনাদি কার্য্য শেষ হইলে যখন সকলে নিদ্রিত হইয়াছে, তখন রহিম দেখিল, কাঞ্চনসম-প্রভাশালিনী দেবলোকবাসিনী সুগাত্রী অপ্সরাগণ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া জবনতনয় ভাবিল, আজ বোধ হয়, মহারাজের মন্দিরে একটা বিরাট মজলিস্ হইবে, তাই বুঝি, এই সকল তয়ফা-ওয়ালীরা দলে দলে রাজসমীপে নৃত্য করিতে যাইতেছে। ইহার অনতিবিলম্বে তাপসধুরন্ধর মহর্ষি নারদ বীণাহস্তে মন্দিরের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে আরও অনেক তপ্তকাঞ্চনপ্রভ তেজঃপ্রদীপ্ত জটাধারী মুনিপুঙ্গবেরা বীণা মুরজ হস্তে ভগবান্‌কে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিলেন। ইহাঁদের মস্তকে জটাজূট এবং গৈরিক বসন পরিহিত দেখিয়া, রহিম স্থির করিল আজ মহারাজের নিকট ভাঁড়ের নাচও হইবে দেখিতেছি,—তাই এই সকল ভাঁড় আসিতেছে। ইহার অল্পক্ষণ পরে অমরালয় হইতে সুরভিচন্দনচর্চ্চিত, কাঞ্চনমণিরাজিভূষিত অম্লানপুষ্পমালাশোভিত এবং সুবসনপরিহিত সুরগণ একে একে তথায় দর্শন দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যপ্রভা এবং লাবণ্য-নিকেতন শরীর দেখিয়া মুসলমানতনয় ভাবিল, ইহাঁরা নিশ্চয়ই রাজারাজড়া এবং আমীর ওমরাও হইবেন। আমাদের মহারাজ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাই ইহাঁরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য সমাগত হইয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে মন্দির মধ্য হইতে শ্রুতিমনোহর হৃদয়দ্রবকারী গীতিধ্বনি সমুত্থিত হইল। গীত শুনিবামাত্র রহিম চমকিত হইয়া উঠিল এবং তাহার পূর্ব্বস্মৃতি মনে জাগরিত করিয়া দিল। একদিন রাত্রিতে শ্মশানে যে সঙ্গীত শুনিয়া তাহার চিত্ত ব্যাকুলিত হইয়াছিল, এই সেই গীত। রহিম স্পন্দরহিত হইয়া সেই গীত শুনিতে লাগিল। ক্রমে সঙ্গীত বন্ধ হইল। তদনন্তর অপ্সরাগণ, দেবর্ষিগণ এবং অমরবৃন্দ মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। রহিম আপনার স্থানে থাকিয়া সকলই দেখিতে লাগিল।

এক এক করিয়া রহিমের সকল ইচ্ছা পূর্ণ হইতে লাগিল; কেবল একটী আশা তাহার তখন পর্য্যন্ত অপূর্ণ রহিল। সেইজন্য তাহার মনে সর্ব্বদাই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। সে এতদিন যাঁহার চাকরি করিতেছে, এক দিনের জন্যও তাঁহাকে দেখিতে পাইল না,—এ কেমন কথা? সে ভাবিতে লাগিল, মহারাজ কি মন্দির হইতে কখন বাহির হন না? অথবা তাঁহার দর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। সত্য বটে, সে মুসলমান; কিন্তু মুসলমান বলিয়া কি সে তাঁহাকে একবার দেখিতে পাইবে না? তিনি তাহার প্রতাপান্বিত এবং করুণাময় প্রভু, আর সে তাঁহার পদাশ্রিত অনুগত ভৃত্য। প্রভু ভৃত্যে সন্দর্শন হওয়া কি এতই সুদুর্লভ? যাহা হউক, যাঁহার লোকাতীত এত গুণ, যিনি করুণার আধার, না জানি, তাঁহার কত রূপই হইবে! হায়! রহিম যদি মুসলমানকুলে জন্মগ্রহণ না করিয়া হিন্দু হইত, তাহা হইলে সে অবাধে একদিন মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করত

মহারাজকে নয়ন ভরিয়া দেখিয়া জীবন সার্থক করিত। বিধাতা কোন্ পাপে যে তাহাকে মুসলমান করিয়াছিলেন, তাহা কে বলিবে? সে মনকে প্রবোধ দিবার জন্য আবার ভাবিত, এখন যেন সে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না, কিন্তু কোন দিন না কোন দিন তিনি অবশ্যই মন্দির হইতে বাহির হইবেন, তাহা হইলে সে একবার তাঁহাকে দেখিয়া লইবে। এই আশায় নির্ভর করিয়া রহিম নিশিদিন অনিমেষ নয়নে মন্দিরের দিকে চাহিয়া থাকিত; বড় ভয়, পাছে তাহার অনবধানবশতঃ তিনি কোন দিন মন্দিরের বাহিরে আইসেন আর সে দেখিতে না পায়।

এইরূপে রহিমের দিন কাটিতে লাগিল বটে; কিন্তু তাহার আশা পূর্ণ হইল না। মহারাজের দর্শন-লালসা তাহার হৃদয়কে বড়ই ব্যাকুল করিয়া তুলিল, সে ক্রমশঃ নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিল, কিন্তু কোন উপায় স্থির করিতে পারিল না। সে প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া ভাবিত, আজ হয়ত মহারাজ বাহিরে আসিবেন; কিন্তু প্রাতঃকাল গেল, মধ্যাহ্ন সময় উপস্থিত হইল। তখন ভাবিল আহারাদির পর হয়ত তিনি বাহিরে আসিবেন, কিন্তু তাহাও হইল না। সায়ংকাল উপস্থিত হইলে ভাবিল, হয়ত বায়ুসেবনের জন্য তিনি আজ বাহিরে আসিবেন, তথাপি তিনি আসিলেন না। রহিম এখন কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া তাহার মনোরথ পূর্ণ করিবে? সে এক দিন মনে ভাবিল, আহার নিদ্রাতে তাহার কিছু সময় যায়, সেই সময় যদি মহারাজ বাহির হন, তাহা হইলে সে ত তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না। এই ভাবিয়া সেই দিন হইতে সে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিল। আর তাহার সকল ইন্দ্রিয়ই যেন এক দর্শনেন্দ্রিয়ে পরিণত হইল। কিন্তু কৈ, তবু ত তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না! হায়! নির্ব্বোধ রহিম! যখন জটা-বল্কলধারী, পরিমিতাহারী, শীতবাততপনতাপাদি সহিষ্ণু, শমপরায়ণ মহাযোগীরা চিরদিন কঠোর তপস্যা করিয়া যাঁহার দর্শন পায় না, তুমি ক্ষুদ্র জীব হইয়া কোন্ তপস্যাবলে সেই সর্ব্বদেবনমস্কৃত, শিব-বিরিঞ্চি-কর্ত্তৃক স্তুত ভগবানের সন্দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইবে? তোমার আকাঙ্ক্ষা বড় উচ্চ; কিন্তু তোমার তপস্যা তাহার অনুরূপ নহে। সে যাহা হউক, রহিমের হৃদয় মহারাজের দর্শনকামনায় একেবারে উদ্‌ভ্রান্তপ্রায় হইয়া উঠিল। সে প্রত্যহ বিফলমনোরথ হইয়া এক একদিন অবিরল ধারে অশ্রুসির্জ্জন করিতে লাগিল; কিন্তু তথাপি মহারাজের দয়া হইল না। এক শশিশোভনা রজনীতে রহিম প্রহরীর কার্য্য করিতেছে, এমন সময় দেখিল, পূর্ব্বের ন্যায় প্রথমে অপ্সরাগণ, তাহার পর জরাশোকবিহীন দেবর্ষিগণ, তাহার পর ত্রিদিববাসী অমরগণ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে অমৃতস্রাবী সুললিত গীত শুনা যাইতে লাগিল। ক্রমে তাহা বন্ধ হইল। তাহার পর স্বর্গবিদ্যাধরীরা মুনি ঋষি এবং দেবতারা বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহাদের পশ্চাৎ বিবিধ রত্নভূষিত একখানি সুসজ্জিত তাঞ্জাম মন্দিরের বাহিরে আসিল। বাহকগণ উক্ত তাঞ্জামখানি বাহিরে আনিয়া অল্পক্ষণের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। চিরদর্শনকাতর রহিম উক্ত তাঞ্জামস্থিত যুগলমূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়ে যেন বিহ্বল হইয়া পড়িল। তখন সে মনে মনে বলিতে লাগিল—"আঃ মরি মরি! এমন রূপ ত কখন দেখি নাই! কেমন নয়নমনোহর নবীন-নীরদ শ্যামরূপ, কেমন নীরদনিন্দিত কুঞ্চিত কেশদাম, কেমন সুললিত, সুমধুর সুঠাম লাবণ্যপূর্ণ দেহ, কেমন নলিননিভ লোচন, কেমন কম্বুর ন্যায় গ্রীবা, কেমন সুগঠিত নাসা, আর কেমন শারদীয় পূর্ণ শশধরের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক মুখমণ্ডল! আবার মস্তকে কিরীট, কর্ণে আলোল কনককুণ্ডল, বাহুতে কেয়ূর, বলয়, কটিতট কাঞ্চীদামে পরিবেষ্টিত। ইনিই বোধ হয়, আমাদের মহারাজ হইবেন। আর ইহাঁর বামে যে সুরললনা-ললাম-ভূতা সর্ব্বাভরণভূষিতা, আনিন্দ্য সুন্দরী রমণী রহিয়াছেন, ইনিই বোধ হয় আমাদের মহারাণী হইবেন। তাঁহাদের এই অলোকসামান্য রূপরাশি দেখিয়া অভিবাদন-নিপুণ জবনতনয় হিন্দুকুলের ন্যায় ভূলগ্নমস্তকে প্রণাম করত সবহুমান কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিল। বাহকেরা সেখানে অল্পমাত্র বিশ্রাম করিয়া তাঞ্জাম লইয়া যাইতে লাগিল। রহিম ভাবিল, হয়ত মহারাজের সহিত তাহাকে কেহ যাইতে বলিবে, এই মনে করিয়া সে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু কেহই তাহাকে কিছু বলিল না। তখন সে ভাবিল, তাহাকে আবার কে যাইতে বলিবে? তাহার প্রভু যখন স্থানান্তরে যাইতেছেন, তখন তাঁহার সঙ্গে যাওয়াই ভৃত্যের অবশ্যকর্ত্তব্য। এই স্থির করিয়া সে সবেগে তাঞ্জামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। বাহকেরা শীতলানিলবীজিত যমুনা-তীরগামী এক নির্জ্জন-পথ দিয়া শেষে এক চিত্ত-সুখপ্রদ রমণীয় কুঞ্জবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে যে এক লতাবিতান ছিল, বাহকেরা সেখানে তাঞ্জাম রাখিল। রহিম ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে ইহার কিছু দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

কুঞ্জবনটী নিস্তব্ধ। তাহাতে আবার শীতরশ্মি পূর্ণশশধর তাঁহার রজতজ্যোতি বিকীর্ণ করত আরও শোভান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। বনশোভী বৃক্ষগণ কুসুমসম্ভারে সুসজ্জিত রহিয়াছে। সুখপ্রমোদকর দিব্য গন্ধবহ পবিত্র বায়ু মন্দ মন্দ বহিয়া চারিদিক্ আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। এখানে কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর অপ্সরাগণ অতুলনীয় কণ্ঠে গীত গাইতে এবং নৃত্য করিতে লাগিল। নৃত্যগীত শেষ হইলে সেই শান্তিময় কুঞ্জবনে সকলে বিচরণ করিয়া বিমল সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। দেবগণের সর্ব্বস্বভূত নারায়ণ, ছায়ার ন্যায় অনপগামিনী লক্ষ্মীকে লইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। আর তাঁহার চারু চরণে নূপুরধ্বনি মুখরিত হইতে লাগিল। এইরূপে

তাঁহারা সকলে কুঞ্জবনে বিহার করত আবার মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। যে স্থানে সর্ব্বলোকপূজিত ভগবান্ লক্ষ্মীকে লইয়া বসিয়াছিলেন, রহিম যাইবার সময় সেখানে উপস্থিত হইল এবং তাহার স্বদেশপ্রচলিত প্রথা অনুসারে সেই স্থানটী ভাল করিয়া হাত বুলাইয়া দেখিতে লাগিল। সেই সময়ে তাহার হাতে কোন একটী বস্তু ঠেকিল। সে তাহা উঠাইয়া দেখে, একছড়া স্বর্ণ-নূপুর। তখনই তাহার মনে হইল, ইহা তাহার মহারাণীর পা হইতে পড়িয়া গিয়া থাকিবে। তখন সেই প্রভুহিতৈষী কর্ত্তব্য-পরায়ণ ভৃত্য অতি যত্নে সেই নূপুর শিরস্ত্রাণে বাঁধিয়া দ্রুতগতি তাঞ্জামের অনুসরণ করিল; আর পথে ভাবিতে লাগিল, কাল প্রাতে মন্দিরের পূজক যখন বাহিরে আসিবেন, তখনই তাঁহার হাতে ইহা দিবে। যথাসময়ে সকলে মন্দিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কেবল মাত্র তাঞ্জামখানি মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল, আর আর সকলে যাথাস্থানে চলিয়া গেলেন। রহিমও আপনার স্থানে গিয়া প্রহরীর কাজে নিযুক্ত হইল।

পরদিন প্রাতে যখন পূজক গোবিন্দজী ও রাধারাণীকে স্নান করাইতে গেলেন, তখন রাধারাণীর পায়ের স্বর্ণ নূপুর দেখিতে পাইলেন না। তখনই মন্দির মধ্যে হুলস্থূল বাধিয়া গেল। সকলেই মন্দিরমধ্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু কোন স্থানেই নূপুর পাওয়া গেল না। পূজকের মনে বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল, তিনি রাত্রিতে মন্দিরের দ্বার বিশেষরূপে বন্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, আর প্রাতে তিনি আসিয়াই খুলিয়াছেন। এই ভাবে আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছেন, কখন ত কিছু চুরি হয় নাই, আজ এ কাজ কে করিল? তখন হতভাগ্য রহিমের উপরই সকলের সন্দেহ হইল। সে একে বিদেশী, তাহাতে আবার মুসলমান; সুতরাং তাহারই চুরি করা সম্ভব বলিয়া বোধ হইল। এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, মন্দিরস্থ কয়েক জন লোক রহিমের নিকট উপস্থিত হইয়া নূপুরের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। নূপুরের কথা হইবামাত্র রহিম আপনার শিরস্ত্রাণ হইতে নূপুর খুলিয়া পূজকের হাতে দিল। তখন তিনি রোষকষায়িত চক্ষে বলিলেন, "তুই এ নূপুর কোথায় পেলি?" তখন রহিম গত রাত্রির সকল ঘটনা একে একে বিবৃত করত শেষে বলিল, সে কুঞ্জবনে মহারাণীর এই নূপুর কুড়াইয়া পাইয়াছে; চুরি করে নাই। পূজক তাহার প্রতি আরও কুপিত হইয়া বলিলেন—"আমি কাল রাত্রিতে মন্দিরের দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়াছিলাম, তাহার পর প্রাতে আমিই দরজা খুলিয়াছি; ইহার মধ্যে আরত কেহই মন্দিরের ভিতর যায় নাই, যে ঠাকুরকে বাহিরে লইয়া যাইবে? তোর সকল কথাই মিথ্যা। তুই ধরা পড়িয়া এখন এই ছলনা করিতেছিস্। তোর মত কৃতঘ্ন এবং দুরাচার আর কে আছে বল্? তুই যাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছিলি, তাঁহার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিয়াছিস্? তুই শুধু যে চুরি করিয়া অন্যায় করিয়াছিস্, এমন নহে, তুই জবন হইয়া যখন দেবমূর্ত্তি স্পর্শ করিয়াছিস্, তখন তোর অপরাধ মার্জ্জনীয় নহে। তুই এখনই ইহার উপযুক্ত প্রতিফল পাইবি।" এই বলিয়া তাঁহারা কয়েক জনে সেই নিরপরাধ রহিমকে গুরুতর রূপে প্রহার করিতে লাগিল। রহিম অতি কাতরস্বরে আপনার নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কত কথাই বলিতে লাগিল; কিন্তু কেহই তাহার কথায় কর্ণপাতও করিল না। শেষে তাহাকে এক সঙ্কীর্ণায়তন গৃহে লইয়া গিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে এক গুরুভার প্রস্তর চাপাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া আসিল। জবন কর্ত্তৃক দেব দেবীর মূর্ত্তি স্পৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া পুরোহিত মূর্ত্তিদ্বয়ের যথারীতি অভিষেক করিলেন এবং নূপুরও অগ্নিদ্বারা শোধিত করিয়া লইলেন।

এদিকে রহিম বিনাপরাধে নির্দ্দয়রূপে প্রহারিত এবং বক্ষঃস্থলস্থ গুরুভারের তীব্রতর যাতনায় অধীর হইয়া অতি করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে বলিল,—"মহারাজ! আপনি হয়ত সব জানেন। আমি কোন অপরাধে অপরাধী নহি, তবে কেন আমি বিনা বিচারে এত অত্যাচার সহ্য করিলাম? কেন আপনার লোকেরা আমার কথায় অবিশ্বাস করত চোর বলিয়া এত প্রহার করিল? আমি আপনার দাস, আপনার অন্নে আমি প্রতিপালিত, আমি কেমন করিয়া এমন কৃতঘ্নের কাজ করিব? যাহা হউক, আপনি যদি জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমার প্রতি কখন এমন অবিচার হইত না।" রহিম এইরূপে সমস্ত দিন অতি কাতরকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিল; কিন্তু কেহই তাহার একবার সংবাদও লইল না। রাত্রি আসিল, তথাপি কেহই সেই হতভাগ্যের কথা একবার মনেও করিল না। কিন্তু রহিমের যাতনা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল; সে একেত বিধিমতে লাঞ্ছিত হইয়াছে, তাহাতে সমস্ত দিন অনাহার, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ, সুতরাং তাহার ক্লেশের আর অবধি নাই। এত কষ্টে এত যন্ত্রণায় তাহার চক্ষু দিয়া অবিরল ধারে অশ্রু পড়িতেছে, আর তাহার সেই দয়াময় মহারাজকে স্মরণ করিতেছে। গভীর রজনীতে যখন পৃথিবীর সকল জীবই নিদ্রিত, তখন অতি ধীরে ধীরে রহিমের গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইল। রহিম চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখিল, তাহার ঘর স্বর্গীয় আলোতে যেন আলোকিত হইয়াছে, আর সেই আলোক মধ্যে এক দিব্য পুরুষ দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র রহিম বলিল,—"দেব! আপনাকে আমি চিনিয়াছি। আজ কয়েক দিন হইল, আপনার সঙ্গে আমার মথুরার শ্মশান-ভূমিতে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কিন্তু দেব! আজ আমি বিনা দোষে বড়ই কষ্ট পাইতেছি। প্রহারে আমার সর্ব্ব-শরীর জর্জ্জরিত, পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ এবং প্রাণ যেন কণ্ঠাগত হইয়াছে; এই সময়ে আপনি আমার প্রতি দয়া করুন।" এই বলিয়া হতভাগ্য রহিম কাঁদিতে লাগিল। যাঁহার

সর্ব্বভূতে সমান দয়া, যাঁহার অপার করুণা সমভাবে সর্ব্ব জীবে সন্ন্যস্ত, সেই অবিনাশী বৈকুণ্ঠবাসী ভগবান্ স্বীয় সুকোমল করপদ্ম দ্বারা সেই অস্পৃশ্য জবনের বক্ষঃস্থল হইতে অতি সাবধানে সেই গুরুভার প্রস্তর অপসারিত করিয়া দিলেন। তখন রহিম কথঞ্চিৎ নির্ব্ব্যথিত হইয়া বলিল,—"ঠাকুর! আজ আমার প্রতি যে কি অবিচার হইয়াছে, তাহাই বলিতেছি। কাল রাত্রিতে মহারাজ এবং মহারাণী বনভ্রমণে গিয়াছিলেন; আমিও তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিলাম। বনে মহারাণীর নূপুর কুড়াইয়া পাই, তাহা আমি অতি যত্নের সহিত আনিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, পুরোহিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে দিব। আজ প্রাতে নূপুরের কথা হইবামাত্র তাঁহাকে দিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহারা কোন বিচার না করিয়াই আমাকে চোর বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন এবং নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিয়া শেষে এই ঘরে রাখিয়া গিয়াছেন। আজ যদি আপনি না আসিতেন, তাহা হইলে আমার আর বাঁচিবার কোন আশা ছিল না। যাহা হউক, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমি এই কয়েক দিনে বেশ দেখিয়াছি, আমাদের মহারাজ দয়ার সাগর, তাঁহার কৃপাতে প্রত্যহ কত দীন দুঃখী প্রতিপালিত হইতেছে তাহা বলা যায় না। তাই বলি, যিনি এত করুণহৃদয়, তাঁহার কর্ম্মচারীরা এত নির্ম্মম এবং অত্যাচারী কেন? যাহা হউক, আমার একান্ত ইচ্ছা যে, একবার মহারাজের নিকট গিয়া বলি, আমি চোর নহি এবং আমি মহারাণীর নূপুরও চুরি করি নাই, কিন্তু আমি যবন বলিয়া তাঁহার কাছে যাইবার আমার অধিকার নাই। আপনি যদি দয়া করিয়া আমার মহারাজকে সকল কথা বুঝাইয়া বলেন, তাহা হইলে আমার বিশেষ উপকার করা হয়।"

নিষ্পাপ রহিমের এই করুণ-কাহিনী শুনিয়া প্রপন্ন-বৎসল ভগবানের কারুণ্য-পরিপূর্ণ মুখমণ্ডলে ঈষৎ অনাহ্লাদ-জনিত ভ্রুকুটি বিকশিত হইল এবং তিনি বলিলেন,—"জবন-তনয়! তুমি যাঁহাকে তোমার সকল কথা বলিবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছে, তিনি সকলই শুনিয়াছেন। তোমার মহারাজের রাজত্বে কেন যে এত অত্যাচার এবং অবিচার হয়, তাহা এখন তোমার শুনিবার প্রয়োজন নাই। তবে এই কথা বলি, তুমি এই শোকতাপপূর্ণ, প্রবঞ্চনা-প্রতারণা-পূর্ণ এবং অত্যাচার-অবিচারপূর্ণ সংসার পরিত্যাগ করিয়া সেই নিত্যসুখময় নিত্যবিভবপূর্ণ সুদুর্লভ সুরলোকে যাও; যেখানে শোক নাই, জরা নাই, আয়াস নাই, পরিবেদনাও নাই এবং অবিচার অত্যাচার কিছুই নাই,—সেই স্থানে গিয়া তুমি পরম সুখে বাস কর। এই কথা বলিয়া ভগবান্ অদৃশ্য হইলেন। রহিমের ঘরও তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং দ্বারও অর্গলবদ্ধ হইল।

পরদিন প্রাতে মন্দিরের লোকদিগের যখন রহিমের কথা মনে পড়িল, তখন তাহারা দ্বার খুলিয়া দেখে যে, রহিমের বক্ষঃস্থলস্থ প্রস্তর দূরে রহিয়াছে, তাহার শরীরে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইতেছে এবং ভক্তবৎসল ভগবানের সর্ব্বজীবে যে কিরূপ অপরিমেয় দয়া, তাহার নিদর্শন-স্বরূপ জবন-তনয় রহিমের প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার চরণ-কমলে লীন হইয়াছে, আর এই পৃথিবীতে কিরূপ অবিচার অত্যাচার হয়, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য তাহার মৃতদেহ সেইখানে পড়িয়া রহিয়াছে।

শ্রীসর্ব্বেশ্বর মিত্র।

বাঙ্গলা ভাষার লেখক।

ধ।

—ধীরেন্দ্রনাথ পাল। পিতার নাম ৺মহিমচন্দ্র পাল। কায়স্থ। আদি বাস—শক্রজিৎপুর, যশোহর। বর্ত্তমান বাস, কলিকাতা, চাঁপাতলা, স্কট্‌স লেন। উপস্থিত বয়স, ছত্রিশ বৎসর।

ধীরেন্দ্র বাবু বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত। ইহাঁর স্বর্গীয় পিতাও একজন খ্যাতনামা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইহাঁর ভ্রাতাও একজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট। ধীরেন্দ্র বাবু ইংরেজী ও বাঙ্গালা,—উভয় ভাষাতেই সুশিক্ষিত এক সময়ে বাঙ্গলায় ইহাঁর অনেক গুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাঁর রচিত "স্ত্রীর সহিত কথোপকথন" এক সময় বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে প্রচারিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত "আশা-লতা", "হাওয়া," "ভ্রমর"; নরনারীতত্ত্ব, "কলিকাতা রহস্য", "হাজার জিনিষ" প্রভৃতি ছোট বড় অনেক গুলি নানা বিষয়ক গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন। "জ্ঞানভাণ্ডার" এবং পাশ্চাত্য কবিদিগের কতকগুলি গ্রন্থও ইনি সঙ্কলিত করেন। "শান্তি" নামে একখানি বাঙ্গলা ও 'লিসার আউয়ার' নামক একখানি ইংরেজী সংবাদপত্র কয়েক বৎসর ইনি সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত পাওনিয়র, ইংলিস্‌ম্যান, ষ্টেটস্‌ম্যান প্রভৃতি ইংরেজী কাগজেও ধীরেন্দ্র বাবু অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। মধ্যে "কুইন" নামে ইংরেজী সাপ্তাহিক-পত্রের ইনি সম্পাদক ছিলেন। গ্রন্থে নাম নাই, এমন অনেক গ্রন্থও ইনি প্রণয়ন ও সঙ্কলন করিয়াছেন। ধীরেন্দ্র বাবু অবিশ্রান্ত লেখনী চালনা করিতে পারেন। কিন্তু যে কারণে হউক, এখন আর বাঙ্গলা ভাষায় ইহাঁর কোন গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে না। ইহা অবশ্য দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। তবে আজ কয় বৎসর ধরিয়া, ইনি কৃষ্ণ চরিত্র সম্বন্ধে ইংরেজীতে একখানি বহুগবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তিনখণ্ডে গ্রন্থ সম্পূর্ণ। ধীরেন্দ্র বাবু ইংরেজীতে সুলেখক; সুতরাং

ইংরেজী গ্রন্থ লিখিবেন বৈ কি! কিন্তু বাঙ্গালীর ছেলে তিনি এবং বাঙ্গলাও যখন লিখিতে জানেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা ভাষার অনুশীলন করিলে, আমরা অধিকতর সুখী হইব। স্বীকার করি, বাঙ্গলা-সাহিত্যের আলোচনায়, সহজে জীবিকা-অর্জ্জন হয় না; কিন্তু তাই বলিয়াও ত সকলের আসর ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়। যাঁহারা ইস্কুল-বই লিখিয়া, বাঙ্গলা-সাহিত্য-রথী বলিয়া, মনে মনে গর্ব্ব করেন, অবশ্য তাঁহাদের কথা বলিতেছি না; পরন্তু প্রকৃত সাহিত্যে যাঁহাদের শক্তি ও প্রবৃত্তি আছে,—তাঁহাদিগকে অসময়ে দোকান-পাট গুটাইতে দেখিলে বড় দুঃখ হয়। পাল মহাশয় আমাদের কথাটা গ্রহণ করিবেন কি?

* * * *

——ধীরানন্দ কাব্যনিধি। শ্রীযুক্ত ধীরানন্দ কাব্য-নিধি মহাশয় একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি। সংস্কৃত কাব্য-অলঙ্কারে তাঁহার বিশেষ অধিকার আছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রেও তিনি একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। উপস্থিত বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ে শাস্ত্রপ্রকাশ বিভাগে কাজ করিতেছেন। বয়স ৩১। ৩২ বৎসর। ধীর, অমায়িক, সুরসিক। কাব্য-নিধি মহাশয়ের পিতার নাম ৺যশোদানন্দ বিদ্যা-সাগর। জাতি গ্রহবিপ্রশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ। নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রাম।

কাব্যনিধি মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ ৺হরিদেব বিদ্যানিধি মহাশয়,—বর্দ্ধমান-রাজ ৺তিলকচন্দ্র বাহাদুরের সভার প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন। তদবধি ইহাঁরা পুরুষ-পরম্পরাক্রমে উক্ত রাজবাটীতেই জ্যোতির্ব্বিদের পদে নিযুক্ত। ৺হরদেবের বিদ্যাবত্তায় সন্তুষ্ট হইয়া, মহারাজ তিলকচন্দ, হরদেবকে একহাজার বিঘা জমি ব্রহ্মত্র দান করেন। উপস্থিত কাব্যনিধি মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জীবানন্দ জ্যোতিঃশেখর মহাশয়, বর্দ্ধমান রাজবাটীতে জ্যোতির্ব্বিদ্‌পদে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার অনেকগুলি শিষ্য ও ছাত্র আছে। কাব্যনিধি মহাশয়ও এই কলিকাতাতে দুই একটি ছাত্র প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ইহাঁরা প্রকৃত পণ্ডিতবংশ। একসময়ে দেশে ইহাঁদের অনেকগুলি চতুষ্পাঠী ছিল। তন্মধ্যে জ্যোতিষ-শিক্ষার্থীর সংখ্যাই অধিক। এক সময় ইহাঁরা অনেক অন্নব্যয় করিয়াছেন। অনেক ছাত্র ইহাঁদের কৃপায় মানুষ হইয়াছে। সুতরাং ইহাঁরা যথার্থই পুণ্যবান্। এ দেশে ইহাঁদের গণিত পঞ্জিকাই অধিক প্রচলিত এবং পণ্ডিত-সমাজে সাদরে পরিগৃহীত।

সাত আট বৎসর বয়সে কাব্যনিধি মহাশয় মুগ্ধবোধ পাঠ আরম্ভ করেন। বর্দ্ধমানরাজের টোলে ৺অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি মহাশয়ের নিকট ইনি অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার নিকট যথারীতি ব্যাকরণ, গণ, অভিধান, সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বাল্যকাল হইতেই কাব্যনিধি মহাশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধাবী। প্রতি বর্ষেই রাজ-কলেজে তিনি যে পরীক্ষা দিতেন, তাহাতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেন এবং পুরস্কার পাইতেন। প্রায় কুড়ি বৎসর বয়সে ইনি গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন এবং 'কাব্যনিধি' উপাধি লাভ করেন। তার পর অগ্রজের নিকট কাব্যনিধি মহাশয় জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তাহাতে ব্যুৎপন্ন হন।

ইংরেজী ১৮৮৪।৮৫ সালে ইনি কলিকাতার গুপ্তপ্রেসে চাকরি করেন। গুপ্তপ্রেস হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের কিয়দংশের পর দ্বাদশ স্কন্ধ পর্য্যন্ত ইহাঁরই অনুবাদ। অতঃপর রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়ের "ফলিত জ্যোতিষ" গ্রন্থের তিন খণ্ডই ইনি সঙ্কলিত করেন তার পর বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ে ইনি নিযুক্ত হন এবং শাস্ত্রপ্রকাশ বিভাগে থাকিয়া,—সামুদ্রিক, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, বৃহৎসংহিতা গ্রন্থের অনুবাদ করেন। বঙ্গবাসীর বার্ষিক উপহারে যে পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়, তাহা কাব্যনিধি মহাশয়ই গণনা করিয়া থাকেন।

পঞ্চম বৎসরের জন্মভূমিতে, জ্যোতিষ বিষয়ে ইহাঁর একটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

ন।

(১)

—নারায়ণচন্দ্র সেন, এম, এ, বি, এল। পিতার নাম শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ সেন। জন্মস্থান, কলিকাতা আহিরীটোলা, শঙ্কর হালদারের লেন।

নারায়ণ বাবু একজন কৃতবিদ্য ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি। বর্ত্তমানে তিনি নোয়াখালীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। রাজকার্য্যের গুরু পরিশ্রমের মধ্যে থাকিয়াও তিনি মাতৃ-ভাষার আলোচনা করিয়া থাকেন,—ইহাতে আমরা তাঁহাকে বড় ভালবাসি। তাঁহার প্রথম বাঙ্গলা লেখা এই জন্মভূমিতে প্রকাশিত হয়। প্রথমে 'কেরাণী' নামে একটী পদ্য এবং তারপর যথাক্রমে মুরলা, মধুমতী, মনোরমা, লীলা, পুরাণকথা, ও আষাঢ়ে গল্প,—এই কয়টী গল্প জন্মভূমিতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। 'লীলা' নামে গল্পটী সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং উহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। কালাচাঁদ-চরিত নামে ইহাঁর আর একটী ছোট গল্প 'সৎসঙ্গ' নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়া-ছিল। অনেক দিন তিনি আর কিছু লেখেন নাই।

নারায়ণ বাবু অল্প বয়সে মাতৃহীন হন। মাতামহের সাহায্যে ও নিজের যত্নে তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। বি, এল

পাস করার পরেই, প্রায় ছয় মাসের জন্য, তিনি কলিকাতার ফ্রিচার্চ্চ ইনষ্টিটিউসনের বিজ্ঞান-অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটী মাজিষ্টর হন। বর্দ্ধমান, হাওড়া, কাঁদি প্রভৃতি অনেক স্থান ঘুরিয়া, উপস্থিত তিনি নোয়াখালিতে আছেন। পঠদ্দশায় কিংবা অন্য সময়ে তিনি বড় একটা কিছু লেখেন নাই;—রাজকার্য্যের সময় তাঁর যাহা কিছু বাঙ্গলা লেখা। সেই জন্যই বলিয়াছি, নারায়ণ বাবুকে আমরা ভালবাসি। তাঁহার লেখা সরল ও প্রাঞ্জল এবং ভাবও সহৃদয়তার পরিচায়ক। ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গল করুন।

* * * *

—নগেন্দ্রনাথ দাস। পিতার নাম ৺বিহারিলাল দাস। আদিবাস, হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুলকৃষ্ণনগরের নিকট রাধানগর গ্রামে। হাল সাকিম,—কলিকাতা, সুকীয়াষ্ট্রীট। সাহিত্যে ও ধর্ম্মে ইহাঁর অনুরাগ আছে। নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী গুপ্তিপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস মৈত্রের সাহায্যে ইনি "ঈশ্বর-তত্ত্ব" নামক একখানি ধর্ম্মপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

* * *

—নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। হাল সাকিম, কলিকাতা পার্শীরবাগান, গিরিশ বিদ্যারত্নের লেন। নবকৃষ্ণ বাবু একজন সুকবি ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি। প্রচার, ভারতী, সখা সাথী, বীণা, মুকুল প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় ইহাঁর অনেক কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। 'শিশুরঞ্জন রামায়ণ' ও 'বালকবোধ' নামে ইনি দুইখানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহার ভাষা, ভাব, রচনাপ্রণালী,—অতি পরিপাটী।

* * *

—নিত্যকৃষ্ণ বসু, এম, এ। হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন্নগর ইংরেজী স্কুলের ইনি হেড মাষ্টার। "প্রেমের পরীক্ষা," "মায়া-কানন" প্রভৃতি ইহাঁর কয়খানি গ্রন্থ আছে। ইনি একজন সুকবি ও ভাবুক। নব্যভারত, জন্মভূমি, সাহিত্য প্রভৃতি মাসিকপত্রে ইহাঁর অনেক কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। নব্যভারতে এখনও ইনি মধ্যে মধ্যে লেখেন। ইহাঁর লেখায় বেশ একটুখানি আন্তরিকতা ও প্রাণ আছে।

রাজলক্ষ্মী।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

৺কাশীধাম। দশাশ্বমেধ ঘাট। সন্ধ্যা ঈষৎ উত্তীর্ণ হইয়াছে। শীত খুব কন্‌কনে হইলেও জনতা বিষম। ঘাটের চারিদিক্ আলোকমালায় উদ্ভাসিত। শঙ্খ, ঘণ্টা বাজিতেছে। নাগরা বাজিতেছে। নৃত্য হইতেছে। গান হইতেছে।—আর, মাঝে মাঝে উচ্চরবে হরিধ্বনি হইতেছে। জনতানিবারণের জন্য,—পুলিস-প্রহরিগণ 'তফাৎ যাও—তফাৎ যাও'—বলিতেছে।

এত সমারোহ কিসের? উহা আর কিছুই নহে,—স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান্ মানবদেহ ধারণপূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন; এবং সন্ধ্যার পর, পূজক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক তাঁহার আরতি হইতেছে। পাঠক এবং পাঠিকা,—মানবরূপধারী দেবতা যদি দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, আমার সঙ্গে আসুন। দেহে একটু বল চাই;—কেননা, লোকারণ্য ভেদ করিয়া চলিতে হইবে। কোমর বাঁধুন। জীবন্ত দেবদর্শন করিবেন, কিছু প্রণামী লইয়া চলুন। কিছু ফলমূল সংগ্রহ করুন। উঃ! বড় ভিড়!—নিকটে যাওয়া অতীব কষ্টকর।

পূর্ব্বজন্ম-পুণ্যফলে, এবং ইহজন্মের দেহের বলে,—নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম, সত্য সত্যই এক মানুষরূপী দেবতা উচ্চ সিংহাসনে উপবিষ্ট। দেবতা মৌনী; মুদ্রিত-নয়ন; যেন নিঃস্পন্দ। কেহ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চামর দুলাইতেছে; কেহ যোড়হস্তে দণ্ডায়মান আছে; কেহ পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া পড়িয়া আছে। পূজারি ব্রাহ্মণ দক্ষিণ হস্তে পঞ্চপ্রদীপ, বাম হস্তে ঘণ্টা লইয়া, আরতি করিতেছেন। আর দেখিলাম, শ্রীল শ্রীযুক্ত কাশীবাসী, দেবতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যুক্তকর হইয়া, কেবল নয়নজলে ভাসিয়া যাইতেছেন। দেবতার সম্মুখে একখানি থালা আছে।—রূপার থালা, কি গিল্টি করা, কি মুরাদা-বাদী কলাই করা, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। থালার উপর ঘন ঘন পয়সা পড়িতেছে; সিকি পড়িতেছে; আধুলি পড়িতেছে; টাকা পড়িতেছে; ঐ যে একটি মোহরও পড়িল দেখিতেছি! বামপার্শ্বে খুব এক-খানি বৃহৎ থালা রহিয়াছে! তাহার উপর চাল পড়িতেছে! কলা পড়িতেছে! সন্দেশ পড়িতেছে! এবং বহুতর ফল মূলও পতিত হইতেছে। দেখিলাম, ফল, মূল এবং

প্রণামীর পয়সা বা টাকা দিবার পর যুবতী রমণীকুল মানব-রূপী দেবতার উদ্দেশে পুষ্পবর্ষণ, মালাবর্ষণ, তোড়াবর্ষণ, আরম্ভ করিলেন। কোন ফুল দেবতার চরণপ্রান্তে পড়িল; কোন ফুল মাথায় পড়িল; কোন ফুল গ্রীবায়, কোন ফুল বক্ষে, কোন ফুল কক্ষে, কোন ফুল অঙ্কে পতিত হইল। মালাফেলারও বেশ তারিপ দেখিলাম। দূর হইতে এক গাছি মালা একটী রমণী এমন ভাবে নিক্ষেপ করিলেন যে, সেই মালা গাছটী দেবতার গলায় গিয়া ঠিক পতিত হইল, মনে হইল, কে যেন একগাছি মালা ধীরে ধীরে তাঁহার গলায় পরাইয়া দিয়া গেল। মালা-ক্ষেপণের এমনই সুশিক্ষা এবং সুকৌশল! কতকগুলি রমণী উলু উলু ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। এক সম্প্রদায়,—'জয়-রাধারাণীকী জয়' বলিয়া উঠিলেন।

৺কাশীধামে আজ প্রকৃতই এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার উপস্থিত। মানবরূপধারী দেবতা কেহ কখন দেখেন নাই; বোধ হয়, এমন কথা কেহ কখন শুনেনও নাই। কিন্তু ৺কাশীধামে আজ তাহাই দেখিতে হইল,—আজ তাহাই শুনিতে হইল। কাশীতে কি না হয়? অফলা ফলে; অবোলা বলে, অন্ধে দেখে;—কাশীতে কি না হয়? এখানে যিনি পঙ্গু, তিনি আগেই গিরিলঙ্ঘন করিয়া বসেন; এখানে যিনি মহামূর্খ, তিনি সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হন; এখানে যিনি লম্পট, তিনি আদর্শসাধু বলিয়া সম্মানিত হন। সেই কাশীতে এই মানবরূপী দেবতা যে আবির্ভূত হইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি?

ব্যাপার বিচিত্র না হইলেও, কাশীধামে আজ ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত। চারিদিক্ হইতে দলে দলে, মানবরূপী ভগবান্ দেখিবার জন্য, দশাশ্বমেধঘাটে লোক ছুটিতেছে। মুনি ঋষি যতিগণ বহু সহস্র বৎসর,—বহু যুগযুগান্তর কঠোর তপস্যা করিয়াও যে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন না, সেই ভগবান্ আজ কাশীধামে,—দশাশ্বমেধ ঘাটে,—অবতীর্ণ! লোকের মন চঞ্চল হইবে না কেন? লোক দৌড়িবে না কেন? আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা,—ধাবিত হইতেছে। সাত আট বছরের ছেলেগুলি ন্যাংটো হইয়া,—'মা কোথা যাচ্ছিস্!—মা কোথা যাচ্ছিস্, আমিও তোর সঙ্গে যাইব'—বলিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতেছে। ভগবান্-দর্শনে তন্ময়-চিত্তা জননী, সন্তানের কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়াই, অক্ষুণ্ণমনে বেগে ছুটিতেছে; দিগম্বর পুত্রগুলিও, ঈষৎ কাঁদিতে কাঁদিতে, ঈষৎ হেলিয়া-দুলিয়া,—মাতার অনুবর্ত্তী হইতেছে! সে এক অপূর্ব্ব বাহার!

আরতি শেষ হইল। মানব-রূপী ভগবানের দক্ষিণ পার্শ্বে,—তাঁহার ভক্ত চেলা উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আগন্তুক দর্শকবৃন্দের কপালে একটী করিয়া টিপ্ দিতে লাগিলেন; বলিলেন,—ইহা মন্ত্রপূত সদ্যত ভস্মের টিপ্! সেই টিপ্ লইবার জন্য স্ত্রীলোকবৃন্দ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যাকুলা হইলেন এবং প্রধান ভক্ত তাঁহাদের কপালে টিপ্ দিবার জন্য আরও অধিক ব্যাকুল হইলেন। তখন ব্যাকুলা যুবতীর কপালে. ব্যাকুল ভক্ত,—ধীরে ধীরে মন্ত্রে সাথে টিপ্ দিতে লাগিলেন। যে যুবতী আবার একটু অধিক সুন্দরী, তাহার শুধু কপালে নয়,—অধরে, কণ্ঠে, বাহুমূলে টিপাঙ্কিত করিতে লাগিলেন। যে যুবতী রমণী আবার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এবং ষড়দর্শননিপুণা বলিয়া বোধ হইল, সেই রমণীটীকে ব্যাকুল ভক্ত কহিলেন,—'সর্ব্বশেষে তোমায় টিপাঙ্কিত করিব এবং আরও একটী অধিক বর দিব; তুমি এখন এই খানে থাক।' সুন্দরী যুবতী মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া কহিলেন,—'আমরা দাসী। শ্রীভগবানের সেবার নিমিত্ত দেহমন উৎসর্গ করিয়াছি এবং তাঁহারই চরণসুধা পান করিয়া, আমার এই মনচকোরের পিপাসা মিটিবে, ইহাই কামনা করিয়া এখানে আসিয়াছি। হায়! আশা বুঝি পূর্ণ হইল! মনোভৃঙ্গ বুঝি, পদ্মের মধু পান করিতে সমর্থ হইল!' প্রধান ব্যাকুল ভক্ত, তখন আপন দক্ষিণ কর দ্বারা, সুন্দরীর কর-কমল ধারণ করিয়া শ্রীভগবানের চরণোপান্তে,—আপন সম্মুখে সুন্দরীকে বসাইলেন এবং কহিলেন,—'তুমি যদি জাতিস্মর হইতে, পূর্ব্বজন্মের কথা যদি স্মরণ করিতে পারিতে তাহা হইলে, বুঝিতে, তুমি সামান্য মানবী নহ। পূর্ব্ব জন্মে বৃন্দাবনে তুমি একজন রসজ্ঞা গোপিকা ছিলে; শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসলীলা করিবার অধিকার পাইয়াছিলে এ সব বিষয় কিছু স্মরণ হয় কি? শ্রীকৃষ্ণের সহিত হাত ধরাধরি করিয়া, একাঙ্গ হইয়া, যখন তুমি রাসমণ্ডপে নাচিয়াছিলে, সেই সুখময় কাল এখন তোমার মনে পড়ে কি? যদি একান্তই স্মরণ করিতে না পারো, তবে এই শিকড়টী হস্তে ধারণ করো, তোমার পূর্ব্বজন্মের কথা সমস্তই মনে পড়িবে। বেশ ভাবো!—সেই শ্রীকৃষ্ণকে মনে কর; সেই সুখ বৃন্দাবন মনে কর: সেই কুল্ল জ্যোৎস্না,—সেই নিধুনিকুঞ্জবন,—সেই মধুর বাঁশরী, সেই পীত ধড়া—এই সমস্ত, একবার মনে মনে ভাবো দেখি? এই শিকড়ের আঘ্রাণ লও আর ভাবো; এখনই সব মনে পড়িবে।'

সুন্দরী ঈষৎ ভাবিয়া, ধীরে ধীরে কহিতে আরম্ভ করিলেন,—"প্রভু! দয়াময়! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাই ঠিক। অতি অপূর্ব্ব কথাসমূহ এখন আমার স্মরণপথে উদিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ একদিন আমাকে স্কন্ধদেশে স্থাপনপূর্ব্বক বনভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাও আমার মনে হইতেছে। একদিন সোহাগ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ আমার উত্তমাঙ্গে হাত দিয়া বলিয়াছিলেন,—'আমি তোমারই প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ।' রাসলীলার কথাও মনে পড়িতেছে এবং আমার লোমহর্ষণ হইতেছে। আমি শ্রীকৃষ্ণানুগতপ্রাণা; আমি তাঁহাকেই চাই; শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছু আমি চাহি না; তাঁহার সেবাতেই এ দেহ আমি উৎসর্গ করিব। আজ হইতে গৃহ ছাড়িলাম; পতি ত

অনেক দিনই ছাড়িয়াছি; ১২৩০ সালের বাণে পতি যে কোথা ভাসিয়া গিয়াছেন, সেই অবধি কোন সন্ধানই নাই। আমি কাশীবাসিনী হইয়াছি; অদ্য হইতে আমার সার সর্ব্বস্ব,—শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিলাম।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইল; তথাচ ভিড় ভাঙ্গে না। প্রধান ভক্ত কহিলেন,—"দেবতা এইবার শয়ন করিবেন; সকলে সরিয়া যাও; এ স্থানে থাকা উচিত নয়; এখনই দীপ নির্ব্বাণ হইবে। যিনি থাকিবেন, তাঁহারই এই সময়ে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। আবার কাল সকালে আসিও; এখন তফাৎ যাও!—তফাৎ যাও!—দেবতার কোপে কেহ পতিত হইও না! শয়নে বাধা দিলে,—বিঘ্ন দিলে,—শয়নকালে ঈষৎ কথা কহিলে, দেবতার নিদ্রা-ভঙ্গ হয়। এই নিদ্রাভঙ্গরূপ পাপে যিনি লিপ্ত হইবেন, তিনি কৃমি-কীট হইয়া অবশ্যই জন্মগ্রহণ করিবেন। সকলে সাবধান! সাবধান!—সরিয়া যাও, সরিয়া যাও!"

প্রধান ভক্তের কথায় সকলেই আপন আপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল; রহিলেন কেবল,—সেই কৃষ্ণগতপ্রাণা সুন্দরী যুবতী।

দেখিতে দেখিতে দীপসমূহ,—মশালসমূহ,—একবারে নিবিয়া গেল। ঘোর অন্ধকারে ঘাট পূর্ণ হইল। আকাশের তারাদল, আর কুলকুল নাদিনী গঙ্গার জল,—পরস্পর কেবল মুখ-চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল।

যিনি স্বয়ং-কৃষ্ণ-ভগবান্ হইয়া, দশাশ্বমেধ ঘাটে বসিয়া আছেন, তিনি আমাদের সেই শিয়ালমারা; আর যিনি তাঁহার প্রধান ভক্ত,—দীপ নির্ব্বাণ করিতে যিনি সদাই ব্যস্ত, তিনি আমাদের সেই ভক্ত সনাতনদাস—বৈরাগী।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ধরাধামে মানবরূপী ভগবানের আবির্ভাব সম্ভব কি অসম্ভব, তাহা কেহ ভাবিতেছে না;—হঠাৎ ঈশ্বরের নূতন অবতার হওয়া সম্ভব কি অসম্ভব, তাহাও কেহ ভাবিতেছে না;—অমন হাড়ে-মাসে-জড়িত পাকশিটে গড়নে, অমন বিতিকিচ্ছি লম্বা আকারে,—কোঁকড়া কোঁকড়া-চুলবিশিষ্ট মানুষের, ভগবান্ হওয়া কতদূর সম্ভব, তাহাও কেহ ভাবিতেছে না;—সুন্দরী যুবতী কাছে আসিয়া বসিয়াছে বুঝিতে পারিলে, যে ধ্যানস্থ মুদ্রিতনয়ন পুরুষ, চক্ষু মেলিয়া, আড়-নয়নে সেই সুন্দরীকে দেখিতে থাকেন, তাঁহার ভগবান হওয়া কত দূর সম্ভব, তাহাও কেহ ভাবিতেছে না;—যে ভগবান্,—পয়সা, সিকি, আধুলি, টাকা পতিত হইবার জন্য, সম্মুখে এক খানি বৃহৎ থালা রাখিয়াছেন, তাঁহার সত্যিকারের ভগবান্ হওয়া সম্ভব কি না, তাহাও কেহ ভাবিতেছে না। কিন্তু ৺কাশীধামে যেরূপ হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়াছে, যেরূপ হৈ হৈ শব্দ উঠিয়াছে, তাহাতে সমগ্র কাশীবাসীর অবশ্যই নিশ্চয়ই বিশ্বাস জন্মিয়া থাকিবে যে, কাশীধামে দশাশ্বমেধ ঘাটে, সত্যসত্যই মানবরূপী ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছে। কাশীতে এখন কেহ আর রাত্রিতে নিদ্রা যায় না;—সারারাত কেবলই ঐ দেবতার গল্প। যেখানে পাঁচজনে বসিয়াছে,—অন্য কথা নাই,—কেবলই ঐ দেবতার কথা। পত্নী, পতির নিষেধ মানিতেছেন না,—ভগবান্-দর্শনে দৌড়িতেছেন। পুত্রও পিতার কথা মানিতেছে না, ঐ দিকে দৌড়িতেছে। সকলেই দৌড়িতেছে; দশাশ্বমেধ ঘাটের পথে,—দূর হইতে দেখ,—যেন, অনন্ত ধূলা উড়িতেছে! ধন্য লোকের বিশ্বাস! মানুষ এরূপ বোকা-বিশ্বাসী না হইলে, সংসার চলিত কি না সন্দেহ!

বাল্যকালে শুনিয়া ছিলাম, অমুক মাসে, অমুক তিথিতে—অমুক তারিখে—অমুক সময়ে—মরা মানুষ ফিরিয়া আসিবে। ইহাতেই তখন বহুসংখ্যক লোকের ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ী অন্ততঃ বঙ্গের পাঁচকোটী লোক যথাযথ কাজ করিয়াছিল। কেহ কেহ কাপড় কিনিয়া রাখিয়াছিল; কেহ কেহ রন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল, বিরহবিধুরা বালা মৃতপতির নিমিত্ত শয্যা প্রস্তুত করিয়া, মৃতপতির আসার আশায় সারা নিশি যাপন করিয়াছিলেন।

১২৬১ সালে,—হুগলীতে যখন প্রথম বিদ্যালাভ করিতে আসি, তখন একদিন সংবাদ পাইলাম যে, একজন বিদূষী ভৈরবী একটী মৃত মানুষকে জীবনদান করিবেন,—এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। জীবনদানের স্থান,—রাণী রাসমণির ঘাট। আমি দৌড়িলাম; বাসার ঝি দৌড়িল! পথে এই কথা যে শুনে, সেই আমাদের সঙ্গে দৌড়ায়। রঙ্গভূমে পৌঁছিবার পূর্ব্বে আমার সঙ্গে প্রায় একশত লোক দৌড়িয়াছিল। গিয়া দেখি, রাসমণির ঘাটে একটী খাট পাতা আছে; খাটের উপর মশারি খাটান। পুরু মার্কিণ কাপড়ের মশারি তৈয়ার হইয়াছে। কাপড় এত পুরু যে, ভিতরে কি হইতেছে, কিছুই দেখিবার যো নাই! শুনিলাম, মড়াটীকে খাটের উপর শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে, আর সেই বিদুষী ভৈরবী মড়ার কাছে বসিয়া কত মন্ত্র তন্ত্র বলিতেছেন, কত ক্রিয়া প্রক্রিয়া করিতেছেন; এবং আরও শুনিলাম, বিদূষী ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছেন,—আর তিন ঘণ্টার মধ্যেই মৃত মানুষ সজীব হইয়া উঠিবে; ইহারই মধ্যে মড়াটির ক'ড়ে আঙ্গুল নড়িতেছে। খাট-রক্ষার জন্য আটজন পুলিস প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে। জনতা এত অধিক হইয়াছে যে, পুলিস সাহেব মধ্যে মধ্যে দর্শকবৃন্দকে বেত মারিতেছেন এবং "তফাৎ যাও!—তফাৎ যাও!"—বলিতেছেন। অর্দ্ধক্রোশব্যাপী পথ, লোকপূর্ণ হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে শুনিলাম, পুলিস সাহেব টমটম্ হাঁকাইয়া আসিতেছেন! তখন দর্শক-

বৃন্দের উপর বেত্রাঘাত অধিকতর আরম্ভ হইল এবং "তফাৎ যাও,—রাস্তা সাফ করো!"—এইরূপ শব্দ উত্তরোত্তর অধিকতর উত্থিত হইল।

মশারির ভিতর কি যে কাণ্ড ঘটিতেছে, তাহা দর্শকবৃন্দ কেহ দেখে নাই,—ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। কিন্তু প্রত্যেক দর্শকই বলিতেছেন যে, মৃত ব্যক্তির নাড়ী বেশ তর্জ্জনীভুক্ত হইয়াছে; মৃত ব্যক্তির নাকটী বেশ গরম হইয়াছে; কেহ বলিতেছেন, আমি তাহাকে স্বকর্ণে একটী কথা উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি। বলা বাহুল্য, আমি তখন এ সব কথা অবিশ্বাস করি নাই। আমিও ঘরে ফিরিয়া আসিয়া, স্বচক্ষে দেখার মতন, অনেকের নিকট ঐ সকল গল্প করিয়াছিলাম। আমার কথার আরও অধিক লোক,—সেই পাড়া হইতে রাসমণির ঘাটের দিকে ছুটিয়াছিল।

ভজহরি শর্ম্মা,—বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া, ভৃত্য নিযুক্ত করিতেন না। একদিন একজন ভৃত্য, চাকরীর প্রার্থী হইয়া, শর্ম্মা মহোদয়ের নিকট সমাগত হইল। ভজহরি জিজ্ঞাসিলেন, 'কত টাকা মাহিনায় তুমি থাকিতে পারিবে বাপু?' চাকর উত্তর দিল, 'খোরাক পোষাক পাঁচ টাকা মাহিনা আমার চাই; তা আমার কাজ দেখিয়া লইবেন। আমি ইস্তক চণ্ডীপাঠ—নাগাদ পাঁটা-কাটা পর্য্যন্ত,—সকল কাজই করিতে পারি।' ভজহরি মনে মনে ভাবিলেন,—'এটি যে বড় চালাক চাকর দেখিতেছি, মুখে যে আর কথা ধরে না!' প্রকাশ্যে ভৃত্যকে কহিলেন,—'একটু দাঁড়াও বাপু; একটু অপেক্ষা কর।" ভৃত্য অপেক্ষা করিয়া, ভজহরির সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভজহরি শর্ম্মা, পার্শ্বস্থ প্রিয় বয়স্যকে কহিলেন,—'ভায়া আর শুনেছ! এমন আশ্চর্য্য ঘটনা কেহ কখনও শুনেও নাই;—কেহ কখন দেখেও নাই। অতি আশ্চর্য্য! অতি আশ্চর্য্য!'

বয়স্য। আশ্চর্য্য ঘটনার বিষয় পাড়াময় রাষ্ট্র হইয়াছে। ব্যাপারটা কি বলুন দেখি? সত্য সত্যই কি তাই?

ভজহরি। হাঁ, ঠিক সত্য; সত্য বই মিথ্যা নয়। অতি আশ্চর্য্য! অতি আশ্চর্য্য! আজকাল কোন দিন পুরা দেড় সের দুধ দেয়,—কোনদিন দুই সের দুধ দেয়; আর দুধই বা কি মিষ্টি!—খাঁটি;—যেন বড়ের আটা! বলদ-গরু যে গর্ভিণী হইবে, প্রসব হইবে, চারিটা বাঁটবিশিষ্ট হইবে এবং কেঁড়ে কেঁড়ে দুধ দিবে, ইহা আমি কখনই ভাবি নাই! মোড় কি!—যেন একবারে নধর! দিনের বেলা সেই বলদ লাঙ্গল ঘাড়ে করিয়া প্রায় এক বিঘা জমি চষিয়া আসে, আর চাষকার্য্য শেষ হইলে, ঘরে আসিয়া বলদ, কপিলা গাভীর ন্যায় দুধ দিতে থাকে। অতি আশ্চর্য্য!—অতি আশ্চর্য্য!!

এরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া, নবাগত ভৃত্য স্তম্ভিত ও অবাক্ হইল; যোড়হাতে সাধুভাষায় কহিল,—"মহাশয়! বলিতেছেন কি? এ অধীন একবার তাহা দর্শন করিবার ইচ্ছা করিতেছে। কোথায় সেই বলদ আছে, বলিয়া দিন। বলদটী কি এখন গোশালায় বদ্ধ আছে?"

ভজহরি। হাঁ; গোয়ালেই বলদ বাঁধা আছে। বলদ দেখিবে; তাহার বকনা বাছুরটিকে দেখিবে এবং মোড়ের বাহার দেখিবে! সে ত এখন বলদ নাই;—ঠিক যেন ভগলপুরী গাই হইয়াছে। এই পথ দিয়া যাও; গেলেই গোশালা দেখিবে।

নবাগত ভৃত্য, ইঙ্গিতমত পথ ধরিয়া চলিল। খানিকদূর যাইতে না যাইতেই ভজহরি ভৃত্যকে ডাকিল,—"ওহে ফিরে এস,—ফিরে এস! তুমি যে কত বড় চালাক তাহা বুঝিয়াছি! বলদে গর্ভিণী হয়, সন্তান প্রসব করে, দুধ দেয়,—এ কথা যে বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তি আমার বাড়ী চাকুরী করিবার উপযুক্ত নয়। তুমি আপন ঘরে চলিয়া যাও।"

ভৃত্য একটু থতমত খাইল; অপ্রস্তুত হইল; আপন নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারিয়া, কোন কথার উত্তর না দিয়াই ম্লানমুখে আপন আবাসে প্রস্থান করিল।

ভৃত্যের কিন্তু দোষ ছিল না। এইরূপ এবং অন্যরূপ বিশ্বাস-ব্যাপারে বড় বড় পালোয়ান পড়িয়া যাইতেছে,—দুর্ব্বল ভৃত্য ত কোন্ ছার! এইরূপ অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ-কুবের-হুতাশন ভূমে লুটাইয়া গড়াগড়ি যাইতেছেন,—দরিদ্র ভৃত্য ত কোন্ ছার! ফল কথা, এইরূপ বোকা-বিশ্বাসী না হইলে, সংসার অচল হইত! সেই জন্যই ভগবান্ বারো-আনা ব্যক্তিকে বোকা-বিশ্বাসী করিয়া জন্ম দিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন,—চৌদ্দ আনা; কেহ কেহ বোকা-বিশ্বাসীর সংখ্যা পনর-আনা উনিশ গণ্ডা ধরিয়া রাখিয়াছেন।

ভূতলে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছেন,—এই কথা বিশ্বাস করিয়া কাশীবাসিগণ যে উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের দোষ ছিল না। বিধাতার সৃষ্টি,—বিধাতার নির্ম্মাণ-কৌশল যেরূপ,—সেইরূপ ঘটনাই ঘটিবে। ভগবৎ-মায়ায় মানবমাত্রেই আবদ্ধ। এক আধ জন ব্যক্তিমাত্র এই মায়ারূপ মাকড়শার জাল এড়াইয়া থাকেন। সুতরাং কাশীবাসিগণের অন্ধ-বিশ্বাস হেতু, ভক্তিহেতু, দৌড়াদৌড়ি হেতু, রাত্রিজাগরণ হেতু,—কোনই দোষ ছিল না।

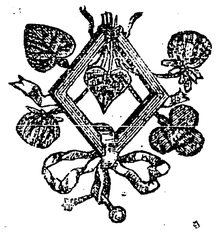

জন্মভূমি।

অষ্টম ভাগ। } ফাল্গুন ও চৈত্র। ১৩০৪। { ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা।

রাজলক্ষ্মী।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীভগবান্ শিয়ালমারার পসার দিন দিন অধিকতর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এক বৎসর মধ্যে, বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা মধ্যে তাঁহার নাম প্রচারিত হইল। এদিকে উত্তর-পশ্চিমের ত কথাই নাই,—পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, এমন কি, লঙ্কাদ্বীপ হইতে যাত্রিগণ তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। কেহ কেহ কাশীতে আসিয়া, বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করিবার পূর্ব্বেই, শিয়ালমারাকে দর্শন করিতে আরম্ভ করিল।

শিয়ালমারা বড়ই সৌভাগ্যবান্ পুরুষ। বড় বড় ভট্টাচার্য্য আসিয়া, তাঁহার পায়ের ধূলা লইতে লাগিল। অনেক রাজা, মহারাজা, জমিদার,—শিয়ালমারার শিষ্য হইল। অনেক উকীল, ডেপুটী, জজ,—শিয়ালমারাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিল। অনেক ইংরেজী-নবীস উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং অনেক সম্পাদক ও গ্রন্থকার শিয়ালমারাকে দেবতা-বোধে, তাঁহার পূজা দিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। ইতর-সাধারণের ত কথাই নাই,—তাহাদের শিয়ালমারাই ধ্যান, শিয়ালমারাই জ্ঞান, শিয়ালমারাই সর্ব্বস্ব।

শিয়ালমারার নামে নানারূপ গল্প প্রচারিত হইল।—তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ,—ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানবক্তা, বাক্‌সিদ্ধ, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী। লোকে বলিতে লাগিল,—তিনি মহাবিদ্যা;—ধন্বন্তরি তাঁহার নিকট দাসানুদাস—মন্ত্রবলে অণুমাত্র ভস্মদানে সর্ব্বরোগ আরোগ্য করিতে তিনি সক্ষম;—মৃত মানুষকেও জীবিত করিতে তাঁহার শক্তি আছে। মূর্চ্ছিত মানবকুলের অঙ্গে হাত বুলাইলেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়।

কাশীধামে, দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকট, এক্ষণে যেখানে বৈদ্যকুল-চূড়ামণি ৺ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের বাটী অবস্থিত, সেই স্থানের নিকট, তখন একদিন কি কথাবার্ত্তা হইতেছিল, একবার শুনুন,—

প্রথম ব্যক্তি। এই ছেলেটী আজ চৌদ্দ বৎসর কাল বোবা ছিল, গুরুর কৃপায়, তিন দিনে ইহার কথা ফুটিল। ধন্য,—ধন্য তিনি!

দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর দিল,—"তুমি কথা-ফুটার কথা কি বলিতেছ?—সেদিন একটী মানুষ মরিয়া গিয়াছিল; মরিয়া পচিয়া ঢোল হইয়াছিল; চক্ষু দুটী পাখীতে উপড়াইয়া লইয়াছিল; শিয়ালে কাণ কামড়াইয়া খাইয়াছিল; নাকটী পচিয়া ধ্বসিয়া গিয়াছিল; পেটের নাড়ী-ভুঁড়ী সমস্তই শকুনিকুল লইয়া গিয়া, মহা-মহোৎসব করিয়াছিল;—মৃত রোগীটিকে ধরাধরি করিয়া, দেবতার সম্মুখে যাই ফেলা হইল, অমনি দেবতা করুণচক্ষে তাহার প্রতি চাহিলেন; এবং মধুর-বচনে বলিলেন, 'উঠ বৎস, উঠ!' বৎস অমনি তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। কোথা হইতে মুহূর্ত্ত মধ্যে নাক আসিল, কাণ আসিল, চক্ষু আসিল, নাড়ী-ভুঁড়ি পেটের ভিতর ঢুকিল; দুর্গন্ধ দূর হইল, পদ্মগন্ধ বাহিরিল;—তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

তৃতীয় ব্যক্তি কহিল,—"১২৩০ সালের বাণে আমার একটী গাই-গরু ভাসিয়া গিয়াছিল,—মানবরূপী ভগবানের নিকট গিয়া, আমি জোড়-হাত করিয়া কহিলাম, 'প্রভো! আমার গাভীটীকে আনাইয়া দাও। গাভীর শোকে আমার পত্নী একাল পর্য্যন্ত আধপেটা খাইয়া আছেন এবং রাত্রি সাড়ে নয়টার তোপটী পড়িলেই তিনি ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া থাকেন। হে দয়াময় প্রভো! আমার সেই সাধের গাভীটীকে কৃপাপূর্ব্বক আনাইয়া দাও। যদি না আনাইয়া দাও, তাহা হইলে আমি এখনি তোমার সমক্ষে মাথায় ইট মারিয়া মরিব।" শ্রীভগবান্ অমনি আয় 'গাভী,—আয় গাভী,—আয় গাভী' বলিয়া ডাকিলেন।—জানি না, কোথা হইতে তৎক্ষণাৎ গাভীটী আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।"

চতুর্থ ব্যক্তি কহিল,—"গাভী হারানো ত সহজ কথা, এক বৃদ্ধ ব্যক্তির এক যুবতী স্ত্রী হারাইয়াছিল। বৃদ্ধ লাঠী হাতে করিয়া, এ গ্রাম হইতে ও গ্রাম,—এ রাজার দেশ হইতে ও রাজার দেশ, খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া স্ত্রীকে খুঁজিতে

লাগিল। বৃদ্ধের পা ফাটিল, পা দিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল,—তথাপি বৃদ্ধ থামিল না,—সেই খোঁড়া-ফাটা-রক্তাক্ত পায়েই কত নদ-নদী পার হইল,—কত বন-জঙ্গল পার হইল,—কত পাহাড় পর্ব্বত এড়াইল,—তথাপি যুবতী স্ত্রীটীকে বৃদ্ধ খুঁজিয়া পাইল না। এইরূপ বারো বৎসরকাল নানা স্থানে স্ত্রী অন্বেষণপূর্ব্বক বৃদ্ধ গৃহে ফিরিল। তারপর আরও বারো বৎসর কাল বৃদ্ধ, স্ত্রীর শোকে জর্জ্জরিত হইয়া কাল কাটাইতেছিল; কিন্তু বৃদ্ধ যখন শ্রীভগবানের হঠাৎ এইরূপ আবির্ভাব শুনিল, তখন একদিন প্রাতে আসিয়া, ভগবানের পদপ্রান্তে কেবল মাথা কুটীতে লাগিল। কোন কথা বলা নাই, কোন কথার উত্তর নাই,—বৃদ্ধ কেবল মাথা কুটিয়া, রক্ত বাহির করিতে লাগিল। তখন শ্রীভগবান্ বৃদ্ধকে সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসিলেন,—"বাপু, তোমার কি হইয়াছে?' বৃদ্ধ অমনি যোড়হাতে কহিল,—"আমার ষোল বৎসরের সুন্দরী যুবতী স্ত্রীটী (আহা! তাঁর গুণই বা কি ছিল!) আজ বিয়াল্লিশ বৎসর নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছেন। বারো বৎসর কাল আমি এই ভারত-ভ্রমণ করিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়াছিলাম; কিন্তু কোথাও তাঁহাকে পাই নাই। তারপর বারো বৎসর তাঁহার ধ্যান করিয়া এবং গুণগান করিয়া কাটাইয়াছি। আমার বয়স বিরানব্বই বৎসর হইয়াছে। আমি আর বেশীদিন বাঁচিব না। প্রথম পক্ষের পুত্র আমার গঙ্গাবাসের আয়োজন করিতেছেন। এ সময় যদি আমার সুন্দরী যুবতী স্ত্রীটী, সেই ষোল বৎসরের প্রেয়সীটীকে খুঁজিয়া আনিয়া দেন, তাহা হইলে আমার জীবনদান করা হয়। আপনার কাশীতে শিবস্থাপন করার পুণ্যলাভ হয়। হে ভগবন্! আমি মরিবার পূর্ব্বে, যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য, তাঁহাকে দেখিয়া মরিতে পাই, তাহা হইলে অন্তিমে, আমার এ জীবন সার্থক হয়। আর আমার এক লক্ষ বারো হাজার টাকা নগদ আছে। প্রথম পক্ষের ছেলেরা তাহা জানে না,—আমি সে টাকাগুলি মাটীর নীচে পুঁতিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছি। হে মানবরূপী শ্রীকৃষ্ণ! তোমাকে আমি সেই এক লক্ষ বারো হাজার টাকাই নিজে গণিয়া দিতেছি,—তুমি তাহা লইয়া আমার সেই ষোড়শীটীকে আনিয়া দাও।

"শ্রীভগবান্ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া উচ্চ হাস্য করিলেন। কহিলেন,—'সংসারে অর্থ সর্ব্বাপেক্ষা হেয়। টাকাকে আমি কৃমি কীট অপেক্ষাও অতি জঘন্য বস্তু বলিয়া মনে করি। সম্মুখে পুকুর দেখিলেই, টাকাকে আমি খোলার কুচি ভাবিয়া, ছিনিমিনি খেলি। অতএব টাকাতে আমার প্রয়োজন নাই। আমি চাই ভক্তি, প্রীতি এবং প্রেম। টাকাটী যদি সঙ্গে করিয়া আনিয়া থাক, তাহা হইলে আমার পশ্চাতে যে গর্ত্ত আছে, উহাতে হুড় হুড় করিয়া ঢালিয়া দাও,—একেবারে পাতালে মহীরাবণের বাড়ী চলিয়া যাইবে।—আমার টাকার প্রয়োজন নাই।'

"বৃদ্ধ তখন জোড় হাতে উত্তর দিল,—'ভগবন্, ক্ষমা করুন। টাকার কথা উত্থাপন করিয়া আমি অন্যায় করিয়াছি। আমি আপনার দাসানুদাস;—দিবারাত্রি আমি কেবল আপনার নাম জপ করিব এবং ভক্তিতে গলিয়া গিয়া কেবল কাঁদিব।'

"শ্রীভগবান্ তৎক্ষণাৎ ধূলি হইতে ভস্ম লইয়া বৃদ্ধের দিকে উড়াইলেন। অমনি একটা যুবতী স্ত্রীলোক আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। ঘোম্‌টা দিল। 'হা নাথ' বলিয়া বৃদ্ধের পদপ্রান্তে পতিত হইল। বৃদ্ধ তখন আহ্লাদে গদগদ হইয়া অবগুণ্ঠনবতী সেই ষোড়শী যুবতীকে সঙ্গে লইলেন; গৃহে গেলেন। ইহাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে?"

পঞ্চম ব্যক্তি কহিল, "ভগবানের হৃদয় বড় কোমল। প্রভাতে বেলা—আটটার পর যিনি তাঁহার নিকটে যান, তাঁহাকে তিনি হাত দেখিয়া ভূত, ভবিষৎ, বর্ত্তমান বলিয়া দেন,—কাহাকে বিফল-মনোরথ করেন না। হাত-দেখা ব্যাপার দশটা পর্য্যন্ত চলে। দশটার পর ঔষধ বিতরণ আরম্ভ হয়। যাহার যেমন রোগ হউক না কেন,—ধূলি হইতে একটু ভস্ম লইয়া তিনি বলিতেছেন,—'তুমি একটু খাও, এখনি রোগ আরোগ্য হইবে।' আশ্চার্য্য! অমনি রোগও সঙ্গে সঙ্গে আরাম হইতেছে। একজন অন্ধের চক্ষে ভগবান্ ভস্ম নিক্ষেপ করিলেন, আর অন্ধের চক্ষু, মল্লিকা ফুলের ন্যায় তৎক্ষণাৎ ফুটিয়া উঠিল। ভগবান্ যদি কাহারও নেড়া-মাথায় হাত বুলাইয়া বলেন, 'চুল সকল! এখনি তোমরা উঠিয়া পড়ো।' অমনি মায় আলবার্ট-টেরী শুদ্ধ পোমেটমমাখা মিহি মিহি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ চুল উঠিয়া পড়িবে। ভগবান্ যদি আবার কাহারও চুলযুক্ত স্থানে হাত দিয়া বলেন, 'চুল সকল! এখনি তোমরা এস্থান হইতে চলিয়া যাও।' অমনি সেইখানটী বেমালুম তেলপানা নেড়া হইয়া যাইবে। ঔষধ বিতরণের সময় ভয়ানক ভিড় হয়। সেইজন্য তিনি প্রথমতঃ অবলাদিগকে ঔষধ দেন। অবলাজাতির মধ্যে যাঁহারা আবার যুবতী, তাঁহাদের সম্মান সর্ব্বাগ্রে রক্ষিত হয়। যুবতীগণের মধ্যে যাঁহারা আবার সুন্দরী, তাঁহারা তৎপূর্ব্বে আদরে ঔষধ পাইয়া থাকেন। আবার সুন্দরীগণের মধ্যে যাঁহারা বিধবা সুন্দরী, তাঁহাদের ঔষধ গমনমাত্রেই প্রীতি-ভরে প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিবা সুনিয়ম, কিবা সুব্যবস্থা! —ভগবানের মর্ত্তলোকে নর-লীলা অতি অদ্ভুত দৃশ্য!"

ভগবানের পশার-প্রতিপত্তি শেষে এত বৃদ্ধি হইল যে, ঘটি হারাইলে, গৃহস্থ ঘটি না খুঁজিয়া, অগ্রে ভগবানের নিকট যাইতেন,—'প্রভু, বলিয়া দাও,—ঘটিটী কোথায় আছে?' নিরুদ্দিষ্ট পতি ও পত্নী অনুসন্ধানদানে ভগবান্ বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

ইহা ব্যতীত তখন বহু লোক দেখিয়াছিল, মানবরূপ-ধারী শ্রীভগবান্, প্রত্যহ রাত্রি তিনটার সময় মুখ দিয়া দপ্ দপ্ আগুন বাহির করিতেন। কখন বিশ হাত ঊর্দ্ধে,—শূন্যে, কোনরূপ সাহায্য ব্যতীত বসিয়া থাকেন।

কখন বা মাছি হইয়া উড়িয়া যান। কখন বা মশা হইয়া ভোঁ ভোঁ করেন। কখন বা জিবকাটা কালী হইয়া দৈত্য বিনাশ করেন। কখন বা সামান্য মানব হইয়া বালকরূপ ধরিয়া, ধামি করিয়া মুড়ি খান। কখন বা নাড়ুগোপাল হইয়া, হামা দিয়া; নাড়ু খাইতে খাইতে চলিয়া যান। অনেকে আরও দেখিয়াছিলেন, একদা ফুল্ল-জ্যোৎস্না রজনীতে,দশাশ্বমেধঘাটে, রাত্রি এগারটার পর শ্রীভগবান বংশীহাতে করিয়া বাঁকা হইয়া, বামে হেলিয়া, রাধা রাধা বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। আহ্বানের কি অপূর্ব্ব মহিমা! দেখিতে দেখিতে একটী গোলাপী রংএর কাঁচুলি আঁটা রাধিকা আসিয়া, শ্রীভগবানের বামে দাঁড়াইলেন। পরস্পরের বাহু, পরস্পরের দেহ যেন নাগপাশে বদ্ধ হইল। যুগলমূর্ত্তির পূর্ণস্ফূর্ত্তি হইল। তখন, যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত, তাঁহারা আরও দেখিয়াছিলেন, আকাশ হইতে সেই সময় ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে, ইন্দ্র উঁকি মারিয়া সেই যুগলরূপ হেরিতেছেন। শচী তাহাতে রাগ করিতেছেন।

পুষ্পবৃষ্টির পর,—কি আশ্চার্য্য! কি আশ্চর্য্য!—দেখিতে দেখিতে আকাশ হইতে সন্দেশবৃষ্টি আরম্ভ হইল। সন্দেশের পর রসগোল্লাবৃষ্টি, তারপর জিলিপিবৃষ্টি;—ধন্য ভগবানের ঐশীশক্তি,—ধন্য ভগবানের মাহাত্ম্য!

ফল কথা, শিয়ালমারা প্রকৃতই সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বলিয়া দেশে গণ্য এবং পূজিত হইলেন। তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায়ও বহু বিস্তৃতি লাভ করিল। গণ্ডমূর্খ হইতে অগাধ শিক্ষিত পর্য্যন্ত তাঁহারা শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হইল। শিয়ালমারার যশঃসৌরভ ভারতময় বিকীর্ণ হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

শিষ্য সনাতন দাসের সংশিক্ষায় শিয়ালমারা, ষোল-কলায় সম্পূর্ণ শ্রীভগবানরূপে লোকচক্ষে পরিগণিত হইলেন। কিন্তু উপযুক্ত শিষ্য সনাতনের তখনও মন উঠিল না। পূর্ণ ভগবানত্ব লাভ করিতে এখনও একটু বাকী আছে,—ইহাই সনাতন দাসের ধারণা।

এক দিন শিয়ালমারার সহিত সনাতন দাসের রজনী-যোগে নিভৃতে এই মর্ম্মে কথাবার্ত্তা হইল।

সনাতন। সবই ঠিক হইয়াছে; কেবল একটু বাকী আছে। আমরা এখন ক্ষুদ্র দোকানদার নহি,—সওদাগর হইয়াছি। সওদাগর হইয়াছি বটে; কিন্তু আকাঙ্ক্ষা আমার এখনও পূর্ণ হয় নাই। আরও উচ্চপদ প্রাপ্তির আশা করিতেছি।

শিয়ালমারা। আর কিছু করিতে হইবে না। যাহা হইয়াছে, ইহাই ঢের। এইরূপ ব্যবসা চালাইতে পারিলেই দুই তিন বৎসরের মধ্যেই আমাদের অন্ততঃ কুড়ি বাইশ লাখ টাকা নগদ জমিবে; জমিদারীর আয়ও,—চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা হইতে পারে।

সনাতন। কুড়ি বাইশ লাখ টাকা,—কিরে শালা!—তো বেটার বড় ছোট-নজর দেখিতেছি। কুড়ি বাইশ ক্রোড় টাকার কথা ক। আগে ডাকাতি ক'রে, আপনার ভাগে সাত আট টাকা পেলেই মহা সন্তুষ্ট হ'তিস্ কিনা! তাই এখন প্রত্যহ দুই চারি হাজার টাকা আয় দেখে, একবারে চম্‌কে গেছিস্! এ অবস্থায় তোমার এই স্ফূর্ত্তিতে দৈনিক যেরূপ আয় হওয়া উচিত, তাহা ঠিকই হইয়াছে; কিন্তু অবস্থার একটু অন্তর করিতে হইবে, আরও একটু উচ্চ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইতে হইবে।

শিয়ালমারা। সোণা শালা এইবার মলো রে!—অতি লোভে তাঁতি নষ্ট!—এই যা আছি, বেশই আছি! আর এর চেয়ে কি হ'ব বাপু? ডাকাতি ক'রে ত আমাদের সংসার চল্‌ত। কোন মাস পাঁটা মেরে মদ মেরে বেশ সুখসচ্ছন্দে চল্‌ত; আবার কোন মাস আধপেটাও চল্‌ত না! এ একদিকে ক্ষীরের সাগর; একদিকে লুচির পর্ব্বত; একদিকে দুধের নদী! ইহা অপেক্ষা ভাই আর কি সুখ হইবে? রাত্রে বিশ পঁচিশ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া, গলদঘর্ম্ম হইত; ডাকাতি করিয়া, গায়ের রক্ত দিয়া, এক রাত্রে পাঁচটি টাকা রোজগার করা আমাদের পক্ষে কঠিন ছিল। এখন সম্মুখে সদাই ঝর্-ঝর্-ঝর্-ঝর্ টাকা পড়িতেছে! সুতরাং আর কেন ভাই! সুখের যে চরম হইয়াছে!

সনাতন। উঁহুঁ!—এ সুখ, কি সুখ?

শিয়ালমারা। দূর শালার বেটা শালা! তবে তুই আর কি চাস্ বল্ দেখি? সেদিন একজন বাঙ্গালী বঙ্গেশ্বর আসিয়া, আমার পায়ে ধ'রে আধ ঘণ্টা প'ড়ে রইল এবং যাবার সময় দশ হাজার টাকা নগদ দিয়ে গেল। রাজা পায়ে ধরিতেছে; ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পায়ের ধূলা লইতেছে; নবযুবতীগণ আসিয়া আলাপ করিতেছে,—শালা! তুই এর চেয়ে আর কি চাস্?

সনাতন। এ কিছুই নয়,—এ কিছুই নয়!

শিয়ালমারা। তবে মর; যা হয় ক'র; তবে ধরা পড়্‌লে, একুল ওকুল দুকুল যাবে!—শেষে মারও খেতে হ'বে; হয় ত, জেলেও যেতে হ'বে।

সনাতন। (হাসিয়া) এখন যদি আমাদের মার খাইবার,—জেলে যাইবার অদৃষ্ট হইত, তাহা হইলে, কি হঠাৎ একবারেই এত ঐশ্বর্য্য হইয়া উঠে! সে সব ভাবনা তোর কিছু নেই। আমি যা বলি, তুই শালা সব শুনে যা!—এবং আমার মতলব নিয়ে সেই সব কাজ ক'রে যা! ভয় কিছুই নাই।—ভাবনাও নাই!

শিয়ালমারা। তোর ত কথা শুনেই আস্‌ছি। আমি ত কেবল ঠুঁটো-জগন্নাথ ব'সে আছি। আমার এই ভাবনা,—শেষে তোমার অতি-বুদ্ধিতে কোন বিপরীত ফল যেন না ফলে! অতি-শব্দটাই খারাপ! আমার ঠাকুর-মা বল্‌তেন,—

অতি ভাল নয় বলা-বক্তা!—
অতি ভাল নয় চুপ!
অতি ভাল নয় কুরূপ কুচ্ছিৎ,—
অতি ভাল নয় রূপ!

সনাতন। (হাসিয়া) শালা আবার ভাটপাড়ার কাব্যচুঞ্চু হয়ে এ'ল যে! ওরে!—ও-রকম নয়!—ও রকম নয়।

অতি দর্পে হতা লঙ্কা অতি মানে চ কৌরবাঃ।
অতি দানে বলির্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্॥

শিয়ালমারা। আমি না হয় একটা বাঙ্গালা বয়েৎ বলেছি! তুই শালা, সংস্কৃত শিখলি কোথা বল্‌ত?

সনাতন। কি বল্‌লে?—আমি সংস্কৃত জানি না?—আমার ঠাকুরদাদা, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের টোলে পড়েছিল!

শিয়ালমারা। শালা—কৈবোৎ কেওট! মাছ-ধরে,—নৌকা বে'য়ে,—তোদের বিশ পুরুষের জান—লবেজান হয়ে গেছে। সোনা শালা বলে কিনা!—আমার ঠাকুরদাদা ত্রিবেণীর টোলে সংস্কৃত পড়েছে!—আরে কেওট—মালা,—জোলা—জুগী—কৈবোৎ—এদিগে কি কেউ টোলে ঢুক্‌তে দেয়?

এই কথা বলিয়া,—শিয়ালমারা চোয়াড়ে হাসি—স্বজাতীয় হাসি,—হাসিতে লাগিল।—সোনাতন দাসও হো-হো-শব্দে সে হাসিতে যোগ দিল। কহিল,—সাবাস্!—সাবাস! শিয়ালমারা! জিতা রও!—জিতা রও!

শিয়ালমারা। আর একটা বোতল ভাঙ্গ!—তোর্ যেমন কাণ্ড!—শ্যাম্পিনে কি নেশা হয়?—না, সুখ হয়? বেশী টাকা দাম দিয়ে, ওগুলো যে কেন কিনে আনিস্, তা আমি কিছুই বল্‌তে পারি না।

সনাতন। (হাসিয়া) শালা আমাকে কৈবোৎ বলে; আমি ত কৈবোৎ চিরকালই আছি এবং থাকিব;—তুই শালা যে বামুন হ'য়ে কৈবোতেরও অধম হ'য়ে গেলি। শালা দুধ ছেড়ে,—ঘোল খেতেই মজবুত। সন্দেশ ছেড়ে মুড়ি খেতেই মজবুত। ষোল টাকা করে এক এক বোতল শ্যাম্পেল আন্‌ছি; তুই কিনা, হ্যাক থু ক'রে তাই ফেলে দিচ্ছিস্! নিরেট চাষায় কি কখনও পোলাও খেতে পারে? ঘিয়ের গন্ধে তার বমি আসে। শ্যাম্পিনের মর্ম্ম চাষায় কি বুঝিবে?

শিয়ালমারা। আমি চাষা—চাষাই! আমায় কিন্তু ভাল মদ দাও।—ব্রাণ্ডির বোতল খোল আর ঢাল। আমি শ্যাম্পিন খাইয়া দেবতা হইতে স্বীকার নই,—আমি ব্রাণ্ডি খাইয়া, মুদ্দফরাস্ হইতেও ভাল বাসি।

সনাতন। বেটা কি মদের ভক্ত রে! তুই যা বলেছিস্, এক হিসাবে কথাটা ঠিক বটে। যদিও আমি মুখফুটে বলিতে পারি না! কিন্তু আমার মনে মনে হয়, শ্যাম্পিন-ফ্যাম্পিন—ও সব কেবল বাহার মাত্র! আসরের শোভা মাত্র; ব্রাণ্ডিই মদের রাজা। তবে কি জানিস্ ভাই! এ সব মদ ত কখনও খাই নাই! উহাতে কি মজা আছে, জানিবার জন্য, উহা কেবল চাখিয়া লইতেছি। ব্রাণ্ডি আমিও ভালবাসি।

তখন দুই বোতল ব্রাণ্ডি আসিল; গ্লাস আসিল; জল আসিল এবং ভাজা-ভাজা পাঁঠার মাংসও একথালা আসিল। উভয় বন্ধু,—শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার প্রধানতম চেলা,—তখন গ্লাস-গ্লাস সুরাপান আরম্ভ করিলেন। উভয়েরই স্ফূর্ত্তির মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল। গল্পশক্তি দশগুণ বাড়িল। উভয়ের কথায় উভয়ের মন মজিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সনাতন। ভ্রাতা হে! আমি যাহা বলি, তাহা শুন। মনে আছে ত।—প্রথম প্রথম তোমাকে যখন গেরুয়া বসন পরাই,—তখন একরকম সম্মান পাইয়াছিলে; তাহার পর তোমাকে বাঘছাল পরাই। বাঘছালে সম্মানের মাত্রা কিছু বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাহার পর, যে দিন তোমাকে কৌপীন ধরাইলাম, বহির্ব্বাস ত্যাগ করাইলাম, সেই দিন হইতে তোমার শিষ্যসংখ্যাও বাড়িতে লাগিল; আরও বাড়িতে লাগিল। সম্মান-বৃদ্ধির ত কথাই নাই। এমন কি, এখন তোমাকে অনেকে সত্য সত্যই শ্রীভগবান্ বলিয়া ভাবিতেছে। ইহা অপেক্ষা যদি আরও অধিক সম্মান বাড়াইতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে আরও একটি কর্ম্ম করিতে হইবে।

শিয়ালমারা। সে কর্ম্মটি কি ভাই?

সনাতন। সে অতি সহজ কর্ম্ম।

শিয়ালমারা। সহজ হউক আর শক্তই হউক, তুমি যখন বলিতেছ, তখন সে কর্ম্ম করিবই। তুমি যদি আমাকে আকাশের চাঁদ ধরিতে বল, তাহাতেও আমি পেছপাও হইব না। ওহে ভাই, তোমার কথায় আমি বাঘের মুখে গোখ্‌রা সাপের মুখে—হাত দিতে পারি। তুমিই আমার আমিই তোমার; সেও আমার আমিও তার;—হরি রামের রামও হরির। অতএব ভায়া, তুমি যাহা আমাকে করিতে বলিবে,—আমার পক্ষে তাহা অকার্য্য, কিছুতে কার্য্য নহে। নাট্যশালায় গেলে অপাঠ্য হইতে পারে তবে শাঠ্য কিনা—সংসারে সকলি লাঠ্য হইয়া যায়!

মদে ঢুলু ঢুলু আঁখি শিয়ালমারা, এইরূপ এবং অন্যরূপ নানা কথা বলিতে লাগিলেন। ভক্ত সনাতনদাস বৈরাগী সুরায় সিদ্ধ ছিলেন; মহানির্ব্বাণতন্ত্রের মতে তিনি নেশা করিতেন;—শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের মতে লীলা করিতেন। শাস্ত্রছাড়া একপাও চলিতেন না। শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ সনাতন, বন্ধু শিয়ালমারার ভাব-বিহ্বলতা দেখিয়া, অন্তরে বড় হৃষ্ট হইলেন, বুঝিলেন, এইবার আমার কার্য্য সফল হইবে, এইবার বন্ধুকে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ করিয়া লইব প্রকাশ্যে কহিলেন, ভ্রাতঃ শৃগাল-হন্তা! সে কর্ম্মটী অতি সহজ এবং অতি উত্তম।

শিয়ালমারা। হে দাদঃ!—হে শ্রীসনাতন বৈরাগ্যঃ! সে প্রিয় মধুর কর্ম্মের কথাটি কহ; আমি নিশ্চয়ই তদনুযায়ী কার্য্য করিব।

সনাতন। সে কার্য্য আর কিছুই নহে, এইবার তোমাকে কৌপীন ছাড়িয়া, উলঙ্গ হইয়া, তিন দিন কাল কাশীময় বেড়াইতে হইবে।

শিয়ালমারা। (সচকিতে) ওরে বাপরে!—ওরে বাপরে!—তা আমি পারবো না; দশ লক্ষ টাকা গণিয়া দিলেও তাহা আমি পারিব না। ন্যাঙটা হইয়া,—ঢং ঢং করিয়া কাশীতে বেড়ান আমার কর্ম্ম নয়; শ্রীভগবান্ সাজিয়া আমার কাজ নাই। এই যে কৌপীন পরিয়া বসিয়া আছি; ইহাতেই আমার লজ্জা পায়; মধ্যে মধ্যে হাসি আসে।

সনাতন। সে কি ভাই! উলঙ্গ হইতে ভয় কি? লজ্জাই বা কি? আমাকে বল না, এখনি মাথায় কাপড় বাঁধিয়া একবারে দিগম্বর হইয়া, বড়বাজার দিয়া বেড়াইয়া আসি। তুমি কি কাশীতে ন্যাঙটা সন্ন্যাসীর দল দেখ নাই। প্রয়াগে কুম্ভমেলায় প্রায়ই দু-চারি হাজার নিরেট ন্যাঙটা পঞ্জাবী সন্ন্যাসীর দল আসিয়া থাকে। তুমি কি তাহা দেখ নাই? তাহাদের জেহের কোথায়ও কিছু নাই,—সব ফাঁকা; আর ন্যাঙটো নয় কে? এই যে শুকদেব গোস্বামী এত বড় পণ্ডিত ছিলেন, তিনিও উলঙ্গ হইয়া বেড়াইতেন। আর এই যে মহাদেব, তিনি ন্যাংটার বাবা; কাপড় পরা বা না পরা দুই সমান; বরং পরার চেয়ে না পরা ভাল। আর এই যে শ্রীকৃষ্ণ, তিনি মেয়ে দেখিলেই কাপড় কাড়িয়া লইয়া ন্যাংটো করিয়া দিতেন। তাই বলিতেছি, ন্যাংটো নয় কে? যাহাতে দেবতার প্রীতি, মুনি-ঋষির প্রীতি, সাধু সন্ন্যাসীর প্রীতি, তাহাতে ভাই, তোমার অপ্রীতি হয় কেন? দ্বিপদ ছাড়িয়া চতুষ্পদে আইস, দেখিবে প্রত্যেক জন্তুই উলঙ্গ। এমন যে হনুমান,—যাঁহারা কেবল মিউনিসিপাল ট্যাক্সের ভয়ে কথা কন না, তাঁহাদের নর নারীর মধ্যে কাহাকেও কাপড় পরিতে দেখিয়াছ কি? কুকুরের কাপড় নাই অথচ কুকুর কি বাড়ী বাড়ী, পাড়ায় পাড়ায় বেড়ায় না? ছাগলের যে কাপড় নাই, অথচ ছাগল কাহার না সমক্ষে আসিতেছে? এমন যে ঐরাবত হাতী,—সে বিরাট মূর্ত্তির বর্ণন কেমন করিয়াই বা করি,—এমন যে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, যাহার প্রকট মূর্ত্তির দৃষ্টান্ত সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেই উলঙ্গ হাতী ও ঘোড়াকে মানুষে অর্থ দিয়া কিনিয়া সম্মুখে বাঁধিয়া রাখে; আর মেয়ে পুরুষে তাহার উপর চড়ে। ইহা দ্বারা কি বুঝা যাইতেছে যে, বিধাতার ইচ্ছা, সর্ব্বথা জীবসমূহ উলঙ্গ হইয়া ধরাধামে বসবাস করুক। আচ্ছা, একটি কথা ভাব দেখি। মানুষ যখন জননী-জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হয়,—উলঙ্গ হইয়া না, কাপড় পরিয়া? বিবেকবান্ চসমা-নাকে ভক্ত ভ্রাতা ছাড়া আর কাহাকেও বলিতে হইবে না যে, মানুষ উলঙ্গ হইয়াই ভূমিষ্ঠ হয়! মানুষকে উলঙ্গ রাখাই যদি বিধাতার অভিপ্রায় না হইত, তাহা হইলে, তিনি একখানি দিব্য শান্তিপুরে কল্কাদার কাপড় পরাইয়া, মানুষকে কি ভূমিষ্ঠ করাইতে পারিতেন না? তিনি নাক দিতে পারেন, কান দিতে পারেন, চোক দিতে পারেন,—পারেন না কি কেবল কাপড়টুকু দিতে? তিনি বাক্‌শক্তি,—চিন্তাশক্তি,—চলচ্ছক্তি,—আস্বাদনশক্তি,—সবই দিতে পারেন, পারেন না কি কেবল কাপড়টুকু দিতে? ভগবান্ যদি গরীব হন,—নাই বা তিনি শান্তিপুরে বা ঢাকাই কাপড় দিতে পারিলেন,—পাঁচ গণ্ডা-পয়সার একখানি বিলাতী কাপড়ও ত দিতে পারিতেন। অথবা পুরাণো কাপড়ের হাট হইতে, পাঁচ পয়সা দিয়া, একখানি পুরাণো কাপড়ও ত দিতেই পারিতেন! অতএব বিধাতার একান্তই অভিপ্রায়, নর-নারীগণ উলঙ্গ হইয়া বসবাস করুক। আদম ও ইভের কি কাপড় ছিল? এই যে শক্তিরূপিণী মা—কৈবল্যদায়িনী করালবদনী কালী, ইনি যে উলঙ্গিনী। গানে কি শুননি?—

"কে শ্যামাঙ্গিণী, মত্ত মাতঙ্গিণী,
উলাঙ্গিণী হ'য়ে সমরে নাচিছে!"

শিয়ালমারা। বৈরাগীর পো! তুই এত পণ্ডিত হলি কোথা থেকে? দেখ, ও সব কথা রাখ, আর একটা বোতল নিয়ে আয়। শেষে যে কালীনাম করিলি, ও নামের একটু সার্থকতা হউক।

সনাতন। বেশী মদ খাওয়া হবে না; খুব ভোর ভোর রাত্রি তিনটার পরই আমাদিগকে শয্যা হইতে উঠিতে হইবে। কারণ, খুব ভোরবেলা হইতেই শিষ্যবর্গ এবং যাত্রী সমাগম হইয়া থাকে। তখন মাতাল হইয়া পড়িয়া থাকিলে, প্রকৃত কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে।

শিয়ালমারা। আরে ঘটে ঘটুক;—তুই একটু মদ দে। আর বেশী চাইনে,—দুই গেলাস হইলেই হবে। একটু দে। আর আমি ত অধিকাংশ সময়ে মৌনী হইয়া থাকি, না হয়, মাতাল হইয়া পড়িয়া থাকিলাম! তুই একখান বালাপোষ চাপা দিয়া আমাকে ঢাকিয়া রাখিবি। আর না হয় বলিবি, ঠাকুর এখন সমাধিস্থ।

সনাতন। ঐ রকম অবস্থায় যদি তুই বমি করিস?

শিয়ালমারা। তুই বলিবি, ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল, তাই উদ্গার উঠিতেছে। ঠাকুর এতক্ষণ শ্রীবৈকুণ্ঠে ছিলেন কিনা! স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী স্বহস্তে চৌষট্টি প্রকার ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া, শ্রীভগবানকে খাওয়াইয়া ছিলেন কিনা,—তাই উদ্গারের কিঞ্চিৎ আতিশয্য হইয়াছে!

সনাতন। সাবাস্, ভায়া—সাবাস্! তোর যে এত বুদ্ধি হইয়াছে, তাহা আমি জানিতাম না! তুই যদি আর কিছু দিন বেঁচে থাকিস্, তা হ'লে জগতের অনেক উপকার হ'তে পারে।

শিয়ালমারা। বেঁচে থাকা-থাকির কথা ঈশ্বরের হাত;—কিন্তু উপস্থিত যে আমি তোর হাতে প্রাণে মলাম! দে ভাই! একটু মদ দে; আর আমি থাকতে পারিনে!

সনাতন। তুই যদি উলঙ্গ হ'য়ে বেড়াইতে স্বীকার করিস, তা হ'লে এক বোতল কেন,—দুই বোতল দিতে পারি।

শিয়ালমারা। আচ্ছা, তাই না হয় বেড়াব; দে এখন মদ দে।

সনাতন। তা হবে না বাবা, আগে প্রতিজ্ঞা কর,—শপথ কর।

শিয়ালমারা। গুরুর দিব্যি করে বল্‌চি, কালই উলঙ্গ হ'য়ে বেড়াব।

সনাতন। তোর আবার গুরু কেরে বেটা?

শিয়ালমারা। জানিস্ নে, আমার গুরু কে? সেদিন তোকে বলেছিলাম।

সনাতন। ও হো বটে, বটে, রঘুদয়াল তোর গুরু; আমি তাকে জানি,—বেশ চিনি। সে ত তোর লাঠি-খেলার গুরু। আমি মনে করেছিলাম, বুঝি মন্ত্র দেওয়া সন্ন্যাসী গুরু। অথবা তোর ঠাকুর মহাশয়ের কথা বলছিস।

রঘুদয়ালের নাম হইবামাত্র, শিয়ালমারা রঘুদয়ালের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। সনাতন দাসও যুক্ত-করে প্রণাম করিল। আবার এক বোতল মদ আসিল। সনাতন দাস মদ ঢালে; মদের উপর জল ঢালে; নিজে একটু খায়; আর তার পরে শিয়ালমারাকে খাইতে দেয়। এরূপ ভাবে সুধাপান চলিতে লাগিল এবং কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

সনাতন দাস কহিল, "হঠাৎ ন্যাংটা হওয়া ভাই একটু শক্ত বটে; তুই যা বলচিস্ তা ঠিক্। ন্যাংটো হ'য়ে বাজারে বেরোবার পূর্ব্বে ঘরে দিন কতক খিল দিয়ে, ন্যাংটো হ'য়ে একোণ ও-কোণ পাচালি কর। এইরূপ অভ্যাস কিছুদিন হইলেই তোর আর হাসি আসিবে না; লজ্জাও হইবে না।

শিয়ালমারা। আমি মুখে যাহাই বলি না কেন, হাসি বা লজ্জাকে তত ভয় করি না। আমি যেরূপ গতিক দেখিতেছি, তাহাতে স্ত্রীলোকগণের বিশেষতঃ কাশীর স্ত্রীলোকগণের মধ্যে অনেকেরই,—অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই। আমি উলঙ্গ হইয়া পথে বাহির হইলেই, আগে স্ত্রীলোকগণ বিশেষতঃ—সুন্দরীগণ,—যুবতীগণ,—রসিকাগণ, দলে দলে আমাকে দেখিতে আসিবে, ঘেরিয়া দাঁড়াইবে এবং অনিমিষলোচনে আমার দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে। আমার ত এই বয়স,—আর এই শরীর, 'সংযম কাহাকে বলে, তাহা ত আমি কস্মিন্ কালেও জানি না। এইরূপ উলঙ্গ হইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে যদি কোনরূপ গোলযোগ ঘটে,—তাহা হইলে তখন উপায় কি? একবারে সমস্ত মায়াজাল যে ছিন্ন হইয়া যাইবে!

সনাতন। কুছ পরোয়া নেই, কুছ পরোয়া নেই! হাম সব ঠিক্ কর লেঙ্গে! গোলযোগের ভয় তুমি ভাবিও না। তুমি উলঙ্গ হও, গোলযোগ যদি কিছু ঘটে, সে দায় আমার রহিল। তুমি উলঙ্গ হইলে, আমি তোমার সাত খুন মা করাইয়া দিব, একবার উলঙ্গ হইতে পারিলে, আমাদে এখন যে ঐশ্বর্য্য হইয়াছে, তাহা অপেক্ষ সহস্র গুণ অধি বৃদ্ধি হইবে।

শিয়ালমারা। তোমার কথাতেই আমি উলঙ্গ হই সম্মত হইলাম। দেখিও ভাই, বিপদে রক্ষা করিও, গা তরোয়ালে কাটা দাগ কয়েকটা আছে; পায়ে গুলি ফোটা দাগ আছে;—এ গুলা ঢাকিতে হইবে।

সনাতন। তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই। যে দিন তু প্রথম উলঙ্গ হইবে, সে দিন তোমাকে ধূলা-কাদা মাখাইব তাহার উপর ভস্ম মাখাইব,—সে সব দাগ কেহই দেখি পাইবে না। কল্য হইতে দিনের বেলা ঐ কুটীরে অন্ত দুই দিন উলঙ্গ হইবার আখড়াই দিও। আখড়াই দিব বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

শিয়ালমারা। আচ্ছা, তাহাই হউক; আমাকে এ যাহা বলিবে, তাহাই করিব। আমাকে যে মদ দেয়, তাহ জন্য আমি মরিতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত আছি,—উলঙ্গ হওয় ছার কথা।

সনাতন। তোমার মধুমাখা কথায় আমার প্র জুড়াইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

কাশীধামে, আজ নগর সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উল সন্ন্যাসী বাহির হইয়াছেন। চারি দিক্ হইতে লো ছুটিয়াছে। অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার, অতি আশ্চর্য্য ব্যাপা পথে এত জনতা যে, লোক ঠেলিয়া যায়, সাধ্য কার? কে অশ্ব-পৃষ্ঠে, কেহ গজ-পৃষ্ঠে, কেহ একার উপর, কেহ পাল্ভিতর,—অবশিষ্ট পদব্রজে,—সকলেই উলঙ্গ সন্ন্যাসী দ মানসে যাত্রা করিয়াছেন। কাশীধামে কোন গৃহেই বৃ আজ লোক নাই,—সকলেই বাহির হইয়া রাজপ আসিয়াছে। অশ্বের হ্রেষারব, গজের বৃংহিতধ্বনি, আ সাগরতুল্য মানব কণ্ঠের কল্লোল-কোলাহল একত্র মিশি এক অপূর্ব্ব ভৈরবনাদের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রায় এক ক্রো পথ জুড়িয়া লোক সমাগম। কে কাহার গায়ে প তাহার ঠিক্ নাই। কে কাহাকে ধাক্কা দেয়, কেহ কাহা ঠেলিয়া দেয়, কে কাহাকে মারে, তাহারও ঠিক্ নাই হুড়াছড়ি জড়াজড়ি ক্রমশঃ বিষম হইয়া উঠিল। মনুষ্য খ হইবার উপক্রম হইল, কি ভয়ানক ব্যাপার! দেখা গে এক পর্ব্বত প্রমাণ হস্তী আরোহিগণকে ফেলিয়া দি মাহুতকে ফেলিয়া দিয়া, ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া, নক্ষত্রবেগে ছুটি সেই জনতার দিকে আসিতেছে। 'সর্ব্বনাশ হইল, সর্ব্বনা হইল,—গেলাম, গেলাম,—মরিলাম মরিলাম,'—লোকমু হইতে এইরূপ একটা ধ্বনি উত্থিত হইল। আর র নাই, আর রক্ষা নাই, ঐ দেখ, উন্মত্ত ঐরাবত ভিড়ের ভি

আসিয়া এইবার বুঝি ঢুকিল। লোক সকল পলাইবার চেষ্টায় আপনা-আপনি পরস্পর তাল পাকাইয়া, জড়াইয়া, ভূতলে পড়িতে লাগিল। কাহারও হাত ভাঙ্গিল, কাহারও পা ভাঙ্গিল,—কাহারও মাথায় আঘাত লাগিল,—কেহ চিৎপাত হইয়া পড়িয়া গিয়া, লোকের চরণাঘাতে মৃতপ্রায় হইয়া রহিল। লোক আত্মপ্রাণ রক্ষা করিতে গিয়া এইরূপে আপনা-আপনি বিভিন্ন হইতে লাগিল। আর ঐ দিকে,—ঐ প্রচণ্ড দাবানলবৎ, অগ্নিমুখ ভীষণ ব্রহ্মাস্ত্রবৎ ক্ষিপ্ত হস্তী ভীমবেগে, শুণ্ড ঘুরাইতে ঘুরাইতে, বৃংহিতধ্বনি করিতে করিতে দেবদারুবৎ বৃহৎ দণ্ডদ্বয় প্রসারণপূর্ব্বক ঐ আসিয়া আমার উপর পড়িল;—এই বার বুঝি সত্য সত্যই মরিলাম। প্রাণরক্ষার ত আর কোন উপায় দেখি না,—গেলাম, গেলাম!

একি দেখি! এক ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকার পুরুষ,—এক বিশাল-লোচন, বিশাল বক্ষঃ মহাপুরুষ—আজানুলম্বিত বাহুদ্বয় দ্বারা এক লম্বা লাঠী ধারণ করিয়া লম্বা-লম্ফে দৌড়িয়া গিয়া, সেই ক্ষিপ্ত হস্তীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া, একটু চমকিয়া দাঁড়াইলেন। হাতী যখন সম্যক্‌রূপে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইল, তখন তিনি হস্তী-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া, সজোরে তাহার মাথার উপর যেন নিমেষ মধ্যে, চক্ষুর পলক পড়িতে না পড়িতে, তিন বার লাঠী বসাইয়া দিলেন। প্রথম লাঠী খাইয়া যেমন তাঁহার দিকে হাতী ছুটিল, অমনি তিনি এক লাফে বারো হাত দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন। তথা হইতে দ্বিতীয় লাঠী তিনি আঘাত করিলেন। দ্বিতীয় লাঠী খাইয়া হাতী যখন তাঁহাকে তাড়া করিল, তখন তিনি সেইখান হইতে হাতীকে তৃতীয় লাঠী মারিলেন। হাতীর মাথার খুলি ভাঙ্গিল কিনা জানি না; কিন্তু রুধিরে হাতীর সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত হইল। হাতী পশ্চাৎপদ হইয়া, এক বিকট চীৎকার করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইল। অল্প দূর যাইতে না যাইতে হাতী কম্পিতকলেবর হইয়া, মাথা ঘুরিয়া, ভূতলে পড়িয়া গেল।

হাতী পড়িল, ওদিকে নগর-সঙ্কীর্ত্তন থামিল,—লোক সকল যে যেখানে ছিল, পলাইল। অনেক গণ্য মান্য ধনাঢ্য ব্যক্তি সে খানে ছিলেন। যে ব্যক্তির লাঠীর আঘাতে হাতী মরিল, তাঁহাকে তাঁহারা বহু অন্বেষণ করিলেন; কিন্তু কোথাও আর খুঁজিয়া পাইলেন না।

কাশীর সর্ব্বত্রই ধন্য ধন্য ধ্বনি পড়িয়া গেল। লাঠীর আঘাতে হাতীর মৃত্যু ঘটিল,—এ কি সামান্য কথা! কৈ, কোথায় সেই লাঠীবাজ? তিনি মানুষ না দেবতা? অথবা অনুমান করিলেন, শ্রীভগবান্‌রূপী সন্ন্যাসী আজ লাঠীয়াল বেশে, জীবের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া লাঠীর দ্বারা, ঐরাবতের প্রাণসংহার করিয়াছেন। ভগবান্ ভিন্ন আর রক্ষাকর্ত্তা কে আছে?

দশাশ্বমেধের ঘাটে উলঙ্গ শ্রীভগবান্ পঁহুছিয়াই সনাতন দাসের কাণে কাণে কহিলেন, "ভাই, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। নিশ্চয় আমার গুরুদেব আসিয়াছেন। আমার গুরুদেবের লাঠী ভিন্ন কাহার এমন শক্তি যে, হাতীর প্রাণবধ করিতে পারে? সর্ব্বনাশ হইয়াছে ভাই, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। চল অদ্য রাত্রিই এখান হইতে পলাই। কারণ তিনি কাল প্রাতে অবশ্যই এখানে আসিবেন। আমি সর্ব্ব দুষ্কর্ম্ম করিতে পারি, কিন্তু গুরুদেবের সমক্ষে কখন বেয়াদপি করিতে পারিব না। কেমন করিয়া তাঁহার সাক্ষাতে, তাঁহার সমক্ষে, উলঙ্গ হইয়া বসিয়া থাকিব? যে গুরুদেবের সাক্ষাতে কখন আমি তামাক পর্য্যন্ত খাই নাই,—যাঁহার নিকট সর্ব্বদা জোড়হাতে গলায় কাপড় দিয়া দাঁড়াইয়া থাকি,—আমি ব্রাহ্মণ হইলেও যে গুরুদেবকে অন্তরের সহিত ভক্তিপূর্ব্বক মনে মনে প্রণাম করি,—সে গুরুদেবের নিকট কাল আমি কিরূপে এরূপ বুজরুকি দেখাইব? আমি পাপী,—মহাপাপী বটে; আমি নরহন্তা বটে; অনেকের গৃহ দগ্ধ করিয়াছি, অনেকের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছি; পৃথিবীতে অনেক অকাজ-কুকাজ করিয়াছি; কিন্তু গুরুদেবকে অসম্মান কখন করি নাই। এক গুরুদেব ভিন্ন সংসারে আমার কেহ নাই। মাতা নাই, পিতা নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই। প্রভাতে সূর্য্যদেব উঠিলে আগে গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া তবে সূর্য্যকে প্রণাম করিয়া থাকি। রাত্রে গুরুদেবের মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া তবে নিদ্রিত হই। সে গুরুদেবের সমক্ষে আজ কিরূপে আমরা উলঙ্গ হইয়া দাঁড়াইব বলো দেখি? ভাই, চল, আজই পলাইয়া যাই। চল প্রয়াগে যাই। ঘাটে বৃহৎ বজরা বাঁধা আছে,—বত্রিশটী দাঁড়ী লইয়া, বত্রিশটী দাঁড় এককালে ফেলিয়া, ধনসম্পত্তি যাহা কিছু আছে, সমস্তই বজরায় তুলিয়া লইয়া, চল ভাই, আমরা প্রয়াগে পলাইয়া যাই।"

সনাতন। তাও কি কখন হয়? বিপদ বিষম, সত্য বটে; বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় চিন্তা করো;—রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন-পরায়ণ হওয়া কাপুরুষের কার্য্য। প্রয়াগে গিয়া কি করিবে ভাই! এখানে যেমন পসারটা জমিয়াছে, শত চেষ্টা করিলেও প্রয়াগে তাহার সিকি পসারও জমিবে না। স্থানগুণে, লোকগুণে, কালগুণে পসার জমিয়া থাকে। প্রয়াগ কাশীর নিকট ক্ষুদ্র স্থান। অতএব প্রয়াগ-গমন যুক্তিসিদ্ধ নহে,—এইখানে থাকিয়া যাহাতে বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, তাহার উপায় দেখ ভাই!

শিয়ালমারা। আমি ত উপায় কিছু দেখিতেছি না।

সনাতন। আচ্ছা, কল্য প্রভাতে মুখে তেল-কালী মাখিয়া থাকিলে কি হয়? তাহা হইলে তোমার গুরুদেব ত তোমাকে কিছুতেই চিনিতে পারিবেন না। তেলকালীর উপর একটী লম্বা দাড়ী যদি বাঁধো, তাহা হইলে কাহার সাধ্য তোমাকে চিনিয়া লয়।

শিয়ালমারা। ভাই, তুমি পাগল হইয়াছ, দেখিতেছি। প্রথমতঃ আমি যদি মুখে তেল কালি মাখিয়া এক দাড়ি

করিয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলে ভক্তবৃন্দ কি মনে করিবে, বলো দেখি? তাহারা ভাবিবে, ঠাকুরের এ আর রকম বা কি রোগ!

সনাতন। ওহে ভায়া, এর জন্য তুমি ভাবিও না। এক কথায় ভক্তবৃন্দের মন একেবারে জল করিয়া দিব। আর ভক্তকে যাহা বিশ্বাস করিতে বলিবে, তাহাই সে নিশ্চয় বিশ্বাস করিবে। যেদিকে ফিরাইবে, সেই দিকে ফিরিবে। ভক্ত আর ভেড়া, দুই সমান। ভক্তের জন্য তোমার কোন ভাবনা নাই। সে সব আমি সারিয়া লইব। বলিব, অদ্য ভগবান্ এক নূতন লীলা করিতেছেন। কালীরূপেতে অসি এবং কৃষ্ণরূপেতে বাঁশী ভগবান্ ধরিয়াছিলেন। আর আজ ভগবান্ কৃষ্ণ মর্কটরূপী হইয়া দাড়ী ধারণ করিয়াছেন। অতএব মহামর্কটের মহামহোৎসবে আম পূজা দাও। দেখিবে, সহস্র সহস্র লোকে কল্যই তোমার ষোড়শোপচারে পূজা দিবে। যাহা তোমার আয় হইত, কল্য হইতে তাহার দ্বিগুণ তোমার আয় হইবে। তাই বলিতেছি, ভাই ভক্ত আর ভেড়া, দুই সমান।

শিয়ালমারা। আচ্ছা, ভাই না হয় তাই হইল কিন্তু আমি গুরুদেবের সমক্ষে মর্কট হইয়া, দাড়ী লইয়া, উলঙ্গ হইয়া, কিরূপে বা থাকিব? গুরুদেব আমাকে না হয় নাই চিনিতে পারিলেন; কিন্তু আমি গুরুদেবকে এরূপ অসম্মান করিব কিরূপে? এক কর্ম্ম করো। কল্য আর আমি বাহির হইব না। ঐ গুপ্ত গৃহেই লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া থাকিব। তুমি বাহিরে রাষ্ট্র করিয়া দিও, ভগবান্ সমাধিস্থ হইয়াছেন।

সনাতন। তোমার কোন চিন্তা নাই? যাহা করিতে হয়, আমিই তাহা কাল করিব। সাপও না মরে, লাঠীও না ভাঙ্গে, এমন উপায় অবশ্যই আমি করিব। তুমি সুখে নিদ্রা যাও, অনেক রাত হইয়াছে।

শিয়ালমারা। আচ্ছা ভাই, বলো দেখি, গুরুদেব হঠাৎ কেন কাশীতে আসিলেন? বোধ হয় অদ্য প্রাতেই আসিয়াছেন। পূর্ব্বে আসিলে, অবশ্যই আমাকে আগে দেখিতে আসিতেন। উহাঁর মণিব খুব বড়লোক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর ছেলেদের অবস্থা ত বড় খারাপ,—ছেলেদের ত তীর্থ করিতে আসিবার সময় নয়।—তবে যদি মাঠাকুরুণ আসিয়া থাকেন, বলিতে পারি না;—বোধ হয় মাঠাকুরুণের সঙ্গে গুরুদেব আসিয়া থাকিবেন। ভাগ্যে গুরুদেবের আগমন পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি, তাই রক্ষা; নচেৎ তিনি যদি হঠাৎ আমাদের নিকট আসিতেন, তাহা হইলে আমাদিগকে হাতে-নাতে ধরিতেন। সে যাহোক, আমি যেন না হয় লুকাইয়া রহিলাম: কিন্তু ভাই, তোমাকেওত তিনি চিনেন।

সনাতন। ওরে ভাই, কোন চিন্তা নাই; কোন চিন্তা নাই। আমি একটা মুখোস পরিয়া বসিয়া থাকিব। গণ্ডারের মুখোস পরিয়া বলিব, আমি আজ গণ্ডার অবতার হইয়াছি। ধরাধামের পাপ রাশি নাশ করিবার জন্য আমার প্রতি তাঁহার আদেশ হইয়াছে। তুমি মজাটী দেখিও,—এই গণ্ডার অবতারের কথা লোকে বিশ্বাস করিবে, পূজাও দিবে। ইহা যদি না হয়, ত আমার নাক কাণ কাটিয়া, আমাকে নরকে ফেলিয়া দিও।

শিয়ালমারা। ধন্য তোমার বিদ্যা, আর ধন্য তোমার বুদ্ধি। তোমার বিদ্যাবুদ্ধিতেই এই সব।

সনাতন। কোথায় তোমার গুরুদেব, তাহারও ঠিক নাই; কোথায় কে লাঠী মারিল, তাহাও কেহ দেখে নাই,—আর গুরুদেব হইলেও কাল তিনি আমাদের নিকট আসিবেন কিনা, তাহারও স্থির নিশ্চয়তা নাই,—অথচ তোমাকে কল্য গুপ্ত গৃহে লুকাইয়া থাকিতে হইবে এবং আমাকে গণ্ডার সাজিতে হইবে। বিধাতার বিচিত্র লীলা এইরূপ।

বাঙ্গলা সংবাদ-পত্রের ইতিহাস।

(একাদশ প্রস্তাব।)

২৯। সুজন-রঞ্জন।

(১২৪৭ সাল—১৮৪০ খৃষ্টাব্দ)।

গোবিন্দচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ইহার পরিচালন-ব্যাপার সমাহিত হইত। সপ্তাহে সপ্তাহে ইহাঁর বার-দ্বয় আবির্ভাব হইত। "সংবাদ রসরাজ" যাঁহাদের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া গালি-বর্ষণ দ্বারা কৌতুক পরিহাসে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন, সেই আক্রান্ত দলকে তীব্র কটু ভর্ৎসনা হইতে পরিত্রাণার্থে "সুজন-রঞ্জন" কটিবন্ধন পূর্ব্বক আসরে অবতীর্ণ হন। কিন্তু তাঁহার এই অযাচিত ওকালতি, বড় বেশী দিন চলিয়াছিল, এমন বিবেচনা করিবার কারণ অন্বেষণ করিয়া পাওয়া দুর্ঘট। ভগবান্ স্বয়ং গোবিন্দ, ভাগিনেয় অভিমন্যুকে নিয়তিগ্রাস হইতে নিষ্কৃতি প্রদানে অশক্ত হইয়াছিলেন। এই গোবিন্দচন্দ্রও সুতরাং কি উপায়ে "সুজন-রঞ্জনের" অপমৃত্যু-রক্ষায় সিদ্ধকাম হইবেন? গোবিন্দাধীন সুদীন বস্তু বা ব্যক্তির এই বিধিলিপি সনাতন নহে কি! অভিমন্যুর অকাল-মরণই এ শ্রেণীর ব্যাপারের নিয়ামক নিদর্শন। যিনি নিজেই অসিদ্ধ—অপরের অভীষ্ট সিদ্ধি করা তাঁহা দ্বারা কিরূপে সম্ভবপর হইবে বল! কর্ত্তাই যখন সুদীর্ঘজীবী হইলেন না—তখন তাঁহার আশ্রিতও অল্পায়ুঃ হইয়া দিন কয়েকের মধ্যে ভবের-লীলা-খেলা সঙ্গে করায় অচিরেই সব দিক সুশান্ত হইল—সমাজস্থ সকলেই নিশ্চিন্ত হইলেন।

৩০। জ্ঞান-দীপিকা।

(১২৪৭ সাল—১৮৪০ খৃষ্টাব্দ।)

ভাগবতচরণের * সম্পাদকতায় "জ্ঞানদীপিকা" পত্রিকা, লোকের অজ্ঞান-তিমির বিনষ্ট করিতে কৃত-প্রযত্ন হইয়াছিলেন। সম্পাদক নিয়ম করিয়াছিলেন—সাত দিবসের ব্যবধানে পত্রিকার এক এক সংখ্যার প্রচার হইবে। সুতরাং বুঝিতে বাকী থাকিল না, অন্যান্য অনেক সংবাদপত্রেরই মত সপ্তাহের অন্তরালে "জ্ঞানদীপিকার" সাক্ষাৎকার লাভ ঘটিত। "দীপিকা" প্রচার বিষয়ে কিছুই অসাধারণত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। গুণবত্তাতেও তাঁহার কিছুই বাহাদুরি ছিল না। ইহাঁর জীবনও ক্ষণপ্রভাসদৃশ ক্ষণস্থায়ী। পরমায়ুঃ বৎসরের ঊর্দ্ধ কাল নয়—বরং তদপেক্ষাও ন্যূন হওয়া সম্ভব। কাজেই "দীপিকার" দীপ্তিতে জনসমাজ, অধিক দিন অধিক পরিমাণে উপকৃত হইতে পায় নাই।

৩১। জ্ঞানোদয়।

(১২৪৭ সাল—১৮৪০ খৃষ্টাব্দ।)

রামচন্দ্র মিত্রজ মহাশয় যে, এই পত্রিকার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই বিষয়ের উত্তম প্রমাণ আমাদের অধিগত হইয়াছে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের "কলিকাতা ক্রিশ্চিয়ান্ অব্জার্ভার্" সংবাদ-পত্রিকায় ইহার প্রসঙ্গে সম্পাদকের নামটীই কেবল নির্দ্দেশিত হইয়াছে। আর কোন বৃত্তান্ত আমাদের জ্ঞানগোচর হইবার উপায় নাই। উল্লিখিত সম্পাদক মহাশয়, হিন্দু কলেজের তদানীন্তন বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষাদাতা ছিলেন। "জ্ঞানোদয়ে" বাঙ্গালীদের কতটা জ্ঞান জন্মিয়াছিল, নিশ্চয় বলিবার পক্ষে ঘোরতর সন্দেহ।

৩২। জ্ঞান-সিন্ধু-তরঙ্গ।

(১২৪৭ সাল—১৮৪০ খৃষ্টাব্দ)।

১২৪৭ সালে অর্থাৎ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইহার উৎপত্তি। জন্ম-বর্ষেই "জ্ঞান-সিন্ধু-তরঙ্গ" কাল-সমুদ্রের ঊর্ম্মিমালার সঙ্গে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। যেখানেই বাহ্যাড়ম্বর অধিক, সেই খানেই কার্য্যের মাত্রা বেশী হইবার কথা নয়। যেরূপ সাড়ম্বর নাম, তাহাতে সুফলের সম্ভাবনা কোথায়! রসিককৃষ্ণ মল্লিক, এই "তরঙ্গের" কাণ্ডারী। রসিককৃষ্ণ, হিন্দু-কলেজের তাৎকালিক খ্যাতনামা ছাত্র।

এই পত্রিকাকে বিদায় দিতে গিয়া, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দকেও এখানে ত্যাগ করিতে হইতেছে। এই সময়াবধি যত পত্রিকার পত্তন ঘটিয়াছিল, তাহার এক তালিকা দিয়া তৎপরে বর্ষান্তরের ঘটনার বর্ণনায় মনোযোগী হইব।

এই স্থানে আমরা অব্দান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ১২৪৮ সালের সমাচার-পত্রিকার এইবার প্রসঙ্গ করিব।

৩৩। ভারত-বন্ধু।

(১২৪৮ সাল—১৮৪১ খৃষ্টাব্দ)।

"ভারতবন্ধু" প্রত্যেক সপ্তম দিবসে বঙ্গবাসীদের সহিত আত্মীয়তা করিতে উপস্থিত হইতেন। "ভারতবন্ধুর" পরিচালক শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্যামাচরণের নেতৃত্বে পত্রিকা, বঙ্গদেশে অধিক কাল বন্ধুত্ব স্থায়ী করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু "ভারতবন্ধু" যত দিন জীবিত ছিলেন, নিজ নামের অন্বর্থতা বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন, এই টুকুই আনন্দের সমাচার। সুদীর্ঘ পরমায়ুঃ লইয়া "ভারতবন্ধু" ধরাধামে যদি আসিতেন, তাঁহা দ্বারা যথেষ্ট ইষ্ট সংসাধিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। সদ্বস্তুর সমাদর স্বল্প।—বিধির এই বিধির মূলে কি নিগূঢ় অভিসন্ধি নিহিত, কে তাহার রহস্য উদ্ঘাটিত করিবে?

৩৪। নিশাকর।

(১২৪৮ সাল—১৮৪১ খৃষ্টাব্দ)

নীলকমল দাস, "নিশাকরের" উৎপাদনকর্ত্তা। ত্রিযামাযোগে যে "নিশাকরকে" নভোমণ্ডলে নিরীক্ষণ করি, তাঁহার ক্ষীণ রশ্মিতেও ধ্বান্ত বিধ্বস্ত হয় কি? তাই বুঝি এই "নিশাকরকে" দিবালোকে বহু কাল বিচরণ করিতে হয় নাই! যে কঠোর সমস্যা-ক্ষেত্রে—বিষম সমর-স্থলে "দিবাকরও" পর্য্যুদস্ত—নিষ্প্রভ, সেই বিভীষিকাময়ী মরুস্থলীতে "নিশাকরের" অকিঞ্চিৎকর চেষ্টা উপহাসের আস্পদ হইয়া উঠে। তত্ত্বজ্ঞ কবি অতি যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন—

"জ্যোতিরিঙ্গণ! কিং লজ্জসে,
যৎ তমঃ শময়িতুং প্রবর্ত্তসে।
ইদমেব কিং ন বহু মন্যসে,
যৎ তমোনিবহেঽপি দৃশ্যসে॥"

জোনাকী পোকার অন্ধকার-বিনাশ প্রয়াস নিঃসন্দেহই হাস্যকর। তিমির-নিকরে তাহাকে লোকে দেখিতে পায়, ইহার তাহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত।

"নিশাকর" সম্বন্ধেও আমরা ঐ কথায় "ঢেরা-সহি" দিয়া গেলাম।

বিধাতা, ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে (১২৪৭ সালে) "ভারত-বন্ধু" ও "নিশাকর" বঙ্গের এই যুগল বান্ধবকে সমাচার-পত্রিকা ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এখন এস পাঠকগণ! পরবর্ত্তী অব্দে কোন পত্র কি কি ঘটনা ঘটাইয়াছিল, তাহার আলোচনায় চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া দেখি।

---

* "দূত" পত্রে (১২৮২ সাল, ২৮শে বৈশাখ) এখানে ভ্রম ক্রমে "শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের" নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

৩৫। বেঙ্গল্ স্পেক্‌টেটর।

(১২৪৯ সাল—১৮৪২ খৃষ্টাব্দ)।

ইংরেজি সাহিত্যের একতম বিদ্যাবীর অডিসনের (Adision) স্বনাম-প্রথিত "স্পেক্‌টেটর" (Spectator) পত্রিকাকে চক্ষের সম্মুখে আদর্শ রাখিয়া এই পত্রিকার প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ব্বাচিত ও লিখিত হইবার জন্য ইহার সৃষ্টি। নামকরণেই সে কথার আভাস পাঠক পাইতেছেন। উহার ইতিহাস পড়িয়া দেখিলে, আভ্যন্তরিক ব্যবস্থার অবস্থা বিদিত হইতে কাহারই পক্ষে দুর্ঘট হইবে না।

পত্রের আকার অষ্ট পৃষ্ঠা পরিমিত। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের "সমাচার-দর্পণে" এবং "সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ের" লিখিত্ অংশের উপর নির্ভর করিয়া আমরা ইহার ঐতিহাসিক বিবরণের উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিতেছি।

রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র বসাক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তিদের কেহ কেহ ইহার সম্পাদনে আর কেহ কেহ বা লিপি-কার্য্য-করণে ব্রতী হইয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা "জ্ঞানান্বেষণের" সৃষ্টি করেন, তাঁহারাই এই পত্রিকারও সৃষ্টিকর্ত্তা। সুতরাং ইহারা সোদর ভ্রাতা। "জ্ঞানান্বেষণ" ইংরেজি ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় সমলঙ্কৃত হইত। "স্পেক্‌টেটরেরও" প্রকৃতি তাদৃশী হইল। সুতরাং এ অংশেও দুই সহোদর ভ্রাতার সৌসাদৃশ্য অতি সুন্দর। সুতরাং বলিতে হইল, বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর্" অগ্রজ ভ্রাতা "জ্ঞানান্বেষণের" দৃষ্টান্তে দ্বিভাষী পত্র হইয়াছিল। তাহা না ঘটিতে দেখিলে আমরা ইহাদিগকে সহোদর গণনা না করিয়া বৈমাত্রের ভ্রাতা বলিতাম।

দুই ভাষায় সমাচার-পত্রিকা পরিচালন, অধিক ব্যয়-সাপেক্ষ এবং কৃচ্ছ্র-সাধ্য। দুই ভাষায় চালিত এই পত্রিকার জীবন, দুই বৎসর মাত্র। দুই ভাষায় যাহার দেহালঙ্কার সম্পাদিত হইত, তাহার পরমায়ুও দুই বর্ষ কাল-ব্যাপক! এই বিষম সাদৃশ্য, উত্তম বিষয়ের দিকে নীত হইলে দেখিতে শুনিতে, বলিতে বলাইতে কেমন কমনীয় সুশোভনীয় হইত, বল দেখি। তাই বুঝি বা ইহার জীবন অধিক দিন স্থায়ী হইতে পাইল না। কতিপয় মনস্বী ব্যক্তির মতে দুই ভাষায় সম্পাদিত হইত, এ প্রযুক্তই, উহার আয়ু অল্প হইয়াছিল। অনধিক আয়ুর ঐরূপ কারণ-নিরূপণ, নিদর্শন-হীন বলিয়া বিবেচনা করা অসঙ্গত নয়। উৎসাহের অভাবে, ঔদাসীন্যে, অনাস্থায়, অযত্নে, অচেষ্টায় কতই সময় আমরা শত শত সদ্বস্তু হারাইতে বসি! কার্য্যকালে সুস্থিরান্তঃকরণে অনুধ্যান করিতে পারিলে সৎ-ফলের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হয় না। কিন্তু নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় জাতির কথা স্বতন্ত্র। তাহাদের সকলই কিম্ভূত-কিমাকার! আমাদের মত দ্বিতীয় নিশ্চিন্ত জাতি, বিদ্যমান সময়ে ধরণীমণ্ডলে বিদ্যমান আছে কি? অনুৎসাহে আমরা অদ্বিতীয়। আমাদের অবর্ণনীয় গুণ।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দেই "স্পেক্‌টেটর" উঠিয়া যায়। অতিশয় উপাদেয় ও মনোহর অথচ প্রয়োজনীয় বিষয়ের পত্রিকার প্রবর্ত্তকেরা, প্রকৃষ্ট দৃষ্টি রাখিতেন। পত্রিকার প্রচারেরও নিয়ম উত্তম ছিল। তদ্বিষয়ে অনিয়ম করা দূরে থাকুক বরাবর সুনিয়ম, সমভাবে লেখ্য বিষয়ে অনুরাগ-প্রদর্শন ও পাঠকগণের অভাব ও অভিযোগের উল্লেখ—ইত্যাদি এই পত্রিকার মহাগুণের পরিচায়ক। সুতরাং সমাজে ইহার সমাদর, সম্মান ও সুপ্রতিষ্ঠার সীমা ছিল না। স্থায়িত্ব বেশী কালের জন্য হইলেই মণি-মুক্তার মিলন ঘটিত—সোনায় সোহাগা হইত। কাজে কাজেই দেখিতে শুনিতে কিরূপ ভাল লাগিত বল দেখি!

৩৬। ভৃঙ্গ-দূত।

(১২৪৯ সাল—১৮৪২ খৃষ্টাব্দ)।

মত্ত মাতঙ্গ ও পতিত পতঙ্গ, কখন কখন বসন্ত-বাত তাড়িত বিলাসীর রঙ্গ-ভঙ্গীর সহায় হয়। আর, ভৃঙ্গ ও কুরঙ্গ, মীন-কেতনের নিয়ত নিদেশ নির্ব্বাহ করিতেছে সেই জন্য সাহিত্য "ভৃঙ্গ-দূত" কত রঙ্গদার—রসিক হইবে ভাবিয়া অস্থির হইতে হয় না। ভাঁড়, এদেশে গালি দিয়া 'রসরাজ' নাম পায়। তাই বুঝি বসন্ত-বন্ধু "ভৃঙ্গ" বর্ষাধিক কাল অশ্রাব্য কটূকাটব্যে লোকদিগকে উত্যক্ত করিয়া কর্ত্তব্য সমাপন করিলেন। "নিশাকরকে" পরিচালিত করিবেন ভাবিয়া যে নীলকমল দাস, ইতিপূর্ব্বে বারেক আসরে আসিয়াছিলেন, তিনিই "ভৃঙ্গ"-সাহায্যে আবার দিন কয়েকের নিমিত্ত পবিত্র দৌত্য-কৃত্য কলঙ্কিত করিয়া অল্পমাত্রই কাল কাটাইলেন!

আবার আমাদিগকে এক স্বতন্ত্র সালের শরণাপন্ন হইতে হইতেছে। মধ্যে বৎসরেক কাল কেহই দেখা দিলেন না। তৎপরে ১২৫১ সালে যিনি আসরে অবতীর্ণ হইলেন, তিনি "রাজরাণী"।

৩৭। সংবাদ রাজরাণী।

(১২৫১ সাল—১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ)।

ইনি রাজনীতি-মতে "রাজরাণী" নহেন। দেশের অধিকারিণী 'রাজরাণীর' একটা রাজধানী থাকে। কিন্তু "সংবাদ রাজরাণীর" তো সে রাজধানীর সম্ভাবনাই নাই—অধিকন্তু মানবের মনেও কি তাঁহার কোন স্থানই নাই! তবে তিনি বৃথনামধারিণী "রাজরাণী"। আমাদের কলিকাতার "রাস মণি" যেমন মাতৃ-কৃপায় "রাণী"—এই পত্রিকার নাম, তেমন নই। "সংবাদ রাজরাণী" কোন রূপেই "রাণী" নাম গ্রহণে অধিকারিণী নয়। "দিবাকর"-স্রষ্টা গিরিশচন্দ্র বসু, এই পত্র খানির পিতা। গিরিশচন্দ্রকে "রাজরাণীর" জননী নির্দ্দেশ করিলেও, হানি হয় না। পৌরুষ-পরিত্যক্ত পুরুষ যেমন নারী! না হয়, ঐরূপ পুরুষকে "পুঙ্গব" বলিতে চাও—বলিও; কিন্তু তাহাকে প্রকৃত পুরুষ বলিতে পার না। যে সম্পাদক, সামান্য দিনও উত্তম নিয়মে দুই খানা পত্রিকা চালাইতে পারিলেন না, তাঁহাকে রমণী বোধ করা অস্বাভাবিক নয়। "সংবাদ রাজরাণী" শেষে কেবল একটা কার্য্যে রাণীর মান লইবার সাধ করিয়াছিলেন। তিনি বিভীষণ ভয়াল মূর্ত্তি ধরিয়া গালিবর্ষণ, কলম-বাজি ইত্যাশয়ে লেখনী সমরে কিছুকাল আপন অবয়ব কলুষিত করিয়া অসময়েই শমন-সদনে গমন করিলেন।

৩৮। সর্ব্ব-রস-রঞ্জিণী।

(১২৫১ সাল—১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে।)

শিক্ষিত নব্য-যুবক-নিচয় কর্ত্তৃক ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। বরাবর ইহাকে স্ব-নামের সার্থকতা রক্ষা করিতে বিধি-মতে প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। সুতরাং ইহার পরিচালকগণ, প্রাণপণ যত্ন, কঠোর পরিশ্রম, উত্তমরূপ উদ্যম ও অশেষ অধ্যবসায়—এই সকল সদ্‌গুণ-সাহায্যে কর্ত্তব্য-কর্ম্মে—গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেন। পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি-কল্পে সহিষ্ণুতা ও শ্রমশীলতা, তাঁহাদের মহাগুণশালিতার অস্তিত্বের অনুকূল পক্ষে প্রবল সাক্ষী।

নীতিতত্ত্ব, পুরাবৃত্ত, সুন্দর সুন্দর সদুপদেশময় পরমার্থ বিষয়, এতদ্দেশের আচার-ব্যবহার, রীতি-পদ্ধতি প্রভৃতি সংক্রান্ত সরস অথচ সারবান্ প্রবন্ধ-পুঞ্জে এই পত্রিকার কায়-দেশ, বেশ সুবেশ ধারণ করিয়াছিল। সুতরাং তদ্দ্বারা পত্রখানি সুশ্রী ও দৃষ্টি-আকর্ষক হইয়া উঠিয়াছিল। দশ-চক্রে শেষে কিন্তু প্রাণ হারাইল। একবার "সর্ব্ব-রস-রঞ্জিনী," সামাজিক এক সাম্প্রদায়িক লোকের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে সংহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করেন। সে যাত্রা, ইনি জয়লাভ করায় মানিনী হইলেন। বৈষ্ণবী প্রকৃতিতে শান্তিরসে সর্ব্বশেষে অশেষ মতাশ্রয়ী বঙ্গ-সমাজে দেখা দিলেন। মোটে দুই বৎসর কাল তাঁহার লীলা-খেলায় কাটিয়া গেল। তৃতীয় বর্ষে তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে আর কর্ম্ম করিতে হয় নাই। তখন অন্তকাল সমীপস্থ অবধারিত করিয়া "সর্ব্ব-রস-রঞ্জিনী" ভয়ঙ্কর কাল-কুটীরে প্রবিষ্ট হইলেন।

সাহিত্য-সূতিকাগার অন্বেষণ করিতে গিয়া বুঝিলাম, পর বর্ষে কোন পত্রিকারই উদ্ভব হয় নাই।

৩৯। জগদ্দুদ্দীপক ভাস্কর।

(১২৫৩ সাল—১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ।)

এই কাগজ খানার নামটা যত জাঁকাল, কাজটায় ততটা না হউক, অন্ততঃ যদি কিছুও সারত্ব থাকিত, তাহা হইলেও কিঞ্চিৎ প্রবোধের বিষয় হইত। যে বস্তু বা ব্যক্তির জীবন, ঘটনায় পরিপূর্ণ, ইহ-সংসারে তাহার জন্মগ্রহণ সার্থক। নতুবা অসার সামগ্রীর সংসারে সর্ব্বদাই তো উত্থান-পতন হইতেছে। তাহাতে জগতের কি স্বার্থ—কি উপকার! কার্য্যময় জীবন গতায়ু হইলে, লোকেরা তাহার নিমিত্ত কি না করিয়া থাকে!

ভাগ্যে "সংবাদ-প্রভাকর" (১) "দূত" (২) তাঁহার প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন, তাই নামটী জানিতে পারা যাইতেছে। নচেৎ তাঁহার এমন কোন কীর্ত্তি নাই, যাহার জন্য তাঁহার যশোগানে ও গুণ-কীর্ত্তনে ঐতিহাসিকের প্রবৃত্তির উত্তেজনা হইতে পারে। প্রাগুক্ত প্রত্রিকা-দ্বয়, "জগদ্দুদ্দীপক ভাস্করের" উল্লেখ করাতেই, তাহার অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইল। অন্যথা উহার সত্তাতেও সকলকে সন্দিগ্ধ হইতে হইত।

লোক-সমাজে 'বহুরূপী' যে-প্রকৃতির জিনিস, ইনিও প্রায় সেই ধরণের। বহুরূপীর পরিচ্ছদ, চিত্র-বিচিত্র। বহুরূপী, বহুবিধ বস্ত্র পরিধান করে। "জগদ্দুদ্দীপক ভাস্করও" সংবাদ-পত্র-মহলে প্রকারান্তরে বহুরূপী। বাঙ্গালা ইংরেজি, হিন্দী ও পার্সী—এই ৪ চারি ভাষায় মহাড়ম্বরে তিনি মানবগণকে দেখা দিতেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ৮ আট খানি পত্রিকা * দ্বিভাষীর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন—তাই দেখিয়া ইহাঁর এই সাড়ম্বর সাধ। যেখানেই জাঁকজমক, সেই খানেই সব ফাঁক।

"বৃহদ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" অতি প্রসিদ্ধ প্রবাদ। ঐ মহাবাক্যের মূলে নিগূঢ় নিবন্ধ নিবন্ধ রহিয়াছে।

"জগদ্দুদ্দীপক ভাস্করের" মূর্ত্তি-চতুষ্টয়, কল্পনা-পথে আসিলেও হাস্য-সংবরণ হয় না। ইহাকে এক অদ্ভুত জীববৎ "আজ্‌গুবি চীজ্" বলিয়া ভ্রম হওয়া অসম্ভব নয়। মৌলবী বার আলি † এই চতুরঙ্গের নেতা। মৌলবী সাহেব নিশ্চয়ই রঙ্‌দার আদৃমি। আর, তাঁহার বাহনও তাই—ভারি রঙ্‌দার-মজাদার। রহস্য ছাড়িয়া দিয়া গম্ভীর ভাবে বলিতে গেলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তখনকার কালে এক জন মুসলমান ভদ্রলোকের চারি ভাষায় অধিকার যতদূর বিস্ময়ের বিষয় হউক না কেন, ওরূপ গুরুতর ব্যাপারের অনুরাগ যে অতিশয় প্রশংসনীয়, তৎপক্ষে বিন্দুপ্রমাণ সন্দেহও কাহারও মানস-পথে আসিতে পারে না। কিন্তু বলিতে কি,—ইনি নিজ নাম

১। সংবাদ প্রভাকর, ১২৫৯ সাল, ১লা বৈশাখ।
২। দূত, ১২৮২ সাল, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ।
* নিম্নে দুই ভাষায় চালিত ৮ আট খানি পত্রিকার নাম নির্দ্দেশিত হইল। যথা,—
১। সমাচারদর্পণ। ২। সমাচার সভারাজেন্দ্র।
৩। সংবাদ-সার-সংগ্রহ। ৪। জ্ঞানান্বেষণ।
৫। সত্যবাদী। ৬। সংবাদ-সৌদামিনী।
৭। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ৮। বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর।
† লঙ সাহেব "মৌলবী আলি" বলিয়া তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন।

অবর্থ করিতে পারেন নাই। জয়ডঙ্কা বাজাইয়া যদি অন্ততঃ ইনি কিয়ৎ কালও, স্বীয় মোহিনী মূর্ত্তিতে মানবীয় মন মোহিত করিতে সমর্থ হইতেন, তবে না জানি তাঁহার মধুর আকৃতি, কত উজ্জ্বল দেখাইত! আর তাহা হইলেই বসুন্ধরায় তাঁহার ভূমিষ্ঠ হওয়া সার্থক হইত। রবি-সুত-সদনে অল্পায়ুরা, অতি সত্বরই গিয়া থাকে। স্বল্প-জীবনী এই সংবাদ-পত্রখানিরও কালান্তক-নিলয়ে নিবাস করিতে যাইবার জন্য অধিক বিলম্ব ঘটাইতে হয় নাই।

৪০। মার্ত্তণ্ড।

(১২৫৩ সাল—১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ)

এই নামের সঙ্গে কত কথাই মনে পড়ে। মধ্যাহ্ন-ময়ূখ-মালা-ময় মিহির, কি প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড! সংবাদ-পত্র-ক্ষেত্রে কত সূর্য্যই এক একবার দেখা দিলেন, আর অল্প-ক্ষণ প্রভাপ্রকাশের অব্যহিত মুহূর্ত্তেই অস্তমিত হইলেন, একবার এইখানে তাহার আলোচনা করিতে আমাদের আকাঙ্খা হইতেছে। গণনা করিয়া দেখিতে হানি কি, ক্ষণকালের নিমিত্ত কয়টী আদিত্য, এ বিভাগে আবির্ভূত ও অন্তর্হিত হইয়াছেন। যথায় যখন দ্বাদশ আদিত্যের উদয়, তথায় তখনই প্রলয়—মহাপ্রলয় হয়। আর তাহাতে যুগ-বিলয় ঘটে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সমাচার-পত্র-সমাজ সপ্ত সূর্য্যের উগ্র বীর্য্য ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য সহকারে সহিয়াছে। ভাগ্যে আর পাঁচটীর সংযোগ ঘটে নাই, তাই রক্ষা। বিপদের নামেই ব্যামোহ কল্পনা করা অপেক্ষা বিপৎ-প্রতীকারে বদ্ধকটি হওয়াই প্রশস্ত পথ। তদ্দ্বারা আতঙ্কের আশঙ্কা আপনোদিত হইতে পারিবে। আনন্দ আসিলে—অশান্তি ঘটিলে, অসম্পৎ সময়ে ধীরতা—সহিষ্ণুতা, বৈর-দমনের শাণিত অসি। ধৈর্য্য বীর্য্য সহকারে তাই তীক্ষ্ণ-কর মিহির-দেবের সংখ্যায় মন দিলাম।

সপ্তসূর্য্যের তালিকা এই,—

১। "তিমির নাশক"।
২। "প্রভাকর"।
৩। "দিবাকর"।
৪। "অরুণোদয়"।
৫। "ভাস্কর"।
৬। "জগদুদ্দীপক ভাস্কর"।
৭। "মার্ত্তণ্ড"।

মার্ত্তণ্ডের অগ্রজ দাতা "জগদুদ্দীপক" ভাস্কর চারি-প্রকটিত হইয়া লোক-সমাজকে চমকিত করিয়াছিলেন। ইনি আবার তাহার উপর এক মাত্রা বেশী চড়াইলেন। পঞ্চ-আকৃতিতে ইনি আবির্ভূত হইবার বাসনা করিয়া তদ-বস্থাতেই দৃশ্যমান হইলেন। সুতরাং সাধটা, সখে পর্য্যব-সিত হইল; সখও খেয়ালে গিয়া দাঁড়াইল। সুতরাং দিন কতকের কারণ চৌতাল, ধামাল, ধ্রুপদ ইত্যাদিও চলিল। কিন্তু বেশী বাড়াবাড়ি নাকি ভাল নয়, এক মাস অতীত হইতে, সামাল সামাল পড়িয়া গেল। ফলতঃ, 'মার্ত্তণ্ড' নাম শুনিলে যে তেজঃপদার্থ মানসপটে প্রতিফলিত হয়, ইনি সেই মার্ত্তণ্ডদেব হইলে, সমাজের নানা অশান্তি, পরিজনের কায়-ক্লেশ, সামাজিক সাংঘাতিক পীড়া, পারিবারিক পাতিত্য—ইত্যাদি সকল বিষয়ই—অন্ততঃ একটা মা একটাও প্রতীকার প্রাপ্ত হইত। কিন্তু স্বল্প সময়ের মধ্যে যাহার লীলা সাঙ্গ—তাহার নিকট কিসের প্রত্যাশা? এক মাত্র কিরণ বিকিরণ করিবার পরেই "মার্ত্তণ্ডের" তিরো-ধান ঘটিল।

৪১। সমাচার জ্ঞান-দর্পণ।

(১২৫৩ সাল—১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ।)

সংক্ষিপ্ত নামে ইনি অনেকত্র পরিজ্ঞাত। কুত্রাপি নামের শেষার্দ্ধে (অর্দ্ধ নামে), আর কোথাও বা পূর্ণ নামেই ইনি পরিচিত। "কলিকাতা রিভিউ" 'জ্ঞানদর্পণ' নামে ইহাকে উল্লিখিত করিয়াছেন। "দূত" পত্রে "সমাচার জ্ঞানদর্পণ" এই সম্পূর্ণ সংজ্ঞার প্রসঙ্গ করিয়া গিয়াছেন। পাঠকের অদৃষ্টে সপ্তাহান্তে ইহাঁর সন্দর্শন ঘটিত। তাহাই যেন লাভজনক এক প্রলোভন-বস্তু বোধ হইত। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ (১২৫৭ সাল) পর্য্যন্ত ইহার আয়ুষ্কাল। উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য,—"সমাচার জ্ঞানদর্পণের" প্রাণদাতা; "ভাস্কর-প্রেস" উহার আকর; ঐ প্রেসে উহার নিবাস। পত্রিকার দর্শনী ৪।০ চারি টাকা চারি আনা মাত্র।

৪২। পাষণ্ড-পীড়ন।

(১২৫৩ সাল, ৭ই আষাঢ় হইতে ১২৫৪ সাল, ভাদ্র পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ, ২০শে জুন হইতে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্টের শেষার্দ্ধ ও সেপ্টে-ম্বরের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত।)

স্বনামন্য বঙ্গীয় কবিকুলকেশরী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই "পাষণ্ড-পীড়নের" জনক। "পাষণ্ড-পীড়ন" প্রত্যেক-সপ্তাহে পামর-পীড়নার্থে দেখা দিতেন। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকার অধিক নয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যে কেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই সূত্রে "প্রভাকরে" এবং "ভাস্করে" বিলক্ষণ সাহিত্য সমর চলিত। "ভাস্করযন্ত্র" হইতে যেমন একটী কার্য্য হইল, "প্রভাকর-যন্ত্র" হইতেও তেমনই তাহার অনুকরণ অনিবার্য্য। আর যদি "প্রভাকর প্রেস" কোন কর্ম্ম অগ্রে করিয়া ফেলেন, "ভাস্কর প্রেস"—তৎক্ষণাৎ দণ্ড পল বিলম্ব না করিয়া তাহার অনুকরণ ও প্রতিশোধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। "ভাস্কর যন্ত্রালয়" হইতে "সমাচার-জ্ঞানদর্পণ ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। অতএব তাহার

দেখাদেখি "প্রভাকর-যন্ত্র" "পাষণ্ড-পীড়ন" প্রসব করিলেন। দুইটী যন্ত্রালয়, যেন দুই সপত্নী।

যে যে প্রবন্ধে "পাষণ্ড-পীড়নের" অঙ্গ সুসজ্জিত থাকিত, সজ্জন-সমাজে তাহাদের সমাদরের সীমা ছিল না। গুপ্ত মহাশয়ের নিজের, বন্ধু-বান্ধবের—বিশেষতঃ তাঁহার সাহিত্য-শিষ্যদের রচনাই "পাষণ্ড-পীড়নের" আভরণ। দ্বারকানাথ অধিকারী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, মনোমোহন বসু প্রভৃতি ঐ শেষোক্ত শ্রেণীস্থ যুবকগণ। দীনবন্ধু মিত্রের "মানবচরিত্র" প্রবন্ধ কবিতা উহাতে মুদ্রিত হইয়াছিল। ঐ পদ্যটী অতিশয় মনোহর। বঙ্কিম-চন্দ্রও যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

"পাষণ্ড-পীড়নের" প্রকাশক "সীতানাথ ঘোষ" নামক এক ব্যক্তি। ঐ ব্যক্তি ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে "পাষণ্ড-পীড়নে"র হেড চুরি করিয়া পলায়ন করে। তদবধি উহার প্রচার রহিত হইয়া যায়। ঐ ঘোষ, উক্ত পত্র "ভাস্করে"র করে দিয়া পাতরে আছড়াইয়া নষ্ট করিল। * যে কারণে "পাষণ্ড-পীড়ন" মরণ ক্লেশ সহ্য করিল, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। পুনরায় হেড প্রস্তুত করিয়া পত্রিকা চালান কি এতই গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহা কার্য্যে পরিণত করা একান্ত অসাধ্য কাণ্ড, না অঘটন-ঘটনা?

বাঙ্গলা-ভাষার লেখক।

ন

(২)

——নবীনচন্দ্র সেন। জনক ৺ গোপীমোহন রায়। জননী ৺ রাজরাজেশ্বরী। জন্ম ১৭৬৮ শকাব্দ, ২৯শে মাঘ বুধবার।

নব্যবঙ্গের মহাকবি শ্রীনবীনচন্দ্রের জীবনী বিস্তৃতভাবে আলোচনা করি ইচ্ছা; কিন্তু জন্মভূমিতে সে স্থান নাই। সুতরাং আপাতত মনের ইচ্ছা মনেই রাখিতে হইল।

পিতৃভক্ত নবীনচন্দ্র তাঁহার 'অবকাশ-রঞ্জিনী' নামক কাব্যে, 'শশাঙ্ক দূত'-শীর্ষক কবিতায়, তাঁহার পিতার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

"সমাজের শিরোমণি সদ্‌গুণ-ভাণ্ডার,
বিপদে প্রসন্ন-মুখ, মোহন-আকার।
সরল হৃদয়, পরদুঃখে ম্রিয়মাণ,
প্রীতিরসে নেত্রদ্বয় সদা ভাসমান।
চতুর, মধুরভাষী, সাহসে অতুল,
এদেশে দুজন নাহি তাঁর সমতুল।"

নবীনচন্দ্রের মাতা অতি স্নেহময়ী এবং যার-পর-নাই সরলা ছিলেন। দশের বেশী তিনি গণিতে জানিতেন না। নবীনচন্দ্রের পিতা জজ আদালতের সেরেস্তাদার—অথবা তদানীন্তন জজ, তারপর মুন্সেফ.—তাহাতেও ব্যয় সঙ্কুলন হয় না বলিয়া উকীল হইয়াছিলেন। তাঁহার পরোপকারিতা এবং দানশীলতা চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রবাদের মত প্রচলিত।

এমনি মহাপ্রাণ জনক জননীর পুত্রও যে দুর্লভ কবি-জীবন লাভ করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি? ফলতঃ—

"শ্রীমদ্ভানুগত্যোত্তরায়ণে সৌরমাঘস্যোনত্রিংশদিবসে বুধবাসরে তমিস্রপক্ষে দশম্যাং তিথাবহনি * * * বহুতর-শুভযোগেষু জাতঃ।" ইহা সার্থক হইয়াছে। ইহার একটি ফল এই,—

"সুখী সুবেশী সুজনানুরাগী
সুদারযুক্তো গুণবান্ ধনাঢ্যঃ।
শাস্ত্রে সুবুদ্ধিঃ স্বকুলপ্রদীপঃ
শুক্রে চ কেন্দ্রে চিরকালজীবঃ॥".

—ইহাও হইয়াছে।

এইবার নবীনচন্দ্রের বংশপরিচয় কিছু দিব। যে দুই বৈদ্যবংশ চট্টগ্রামের হিন্দুসমাজের উপর এত কাল আধি-পত্য করিয়া আসিতেছে, নবীনচন্দ্র তাহারই অন্যতরের সুসন্তান। ইহাঁর পূর্ব্ব পুরুষগণ 'রাঢ় ভঙ্গের' সময়—অনুমান ষোড়শ শতাব্দীতে, হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীর সন্নিকটস্থ কোন গ্রাম হইতে উঠিয়া গিয়া চট্টগ্রাম অঞ্চলে উপনিবেশ সংস্থাপিত করেন। শ্রীযুক্ত * * * রায় নবা-বের রাজস্ব-ভার এবং শ্রীযুক্ত শ্যামরায় সৈন্যভার প্রাপ্ত হন। ঢাকার নবাব এখানে শিবিরে অবস্থান কালে, শ্যাম-রায়ের ক্ষমতা পরীক্ষার জন্যে, এক রাত্রিতে একটি দীর্ঘিকা খনন করিয়া, তাহাতে পদ্মফুল দেখাইতে আজ্ঞা দেন। সেই রাত্রিতেই শ্যামরায় নবাবের শিবির-সমক্ষে এক বিস্তৃত দীর্ঘিকা খনন করিয়া এবং অদূরস্থ "কর্ণফুলী" নদী হইতে জল লইয়া তাহা পূর্ণ করিয়া, তাহাতে পদ্মফুল ভাসাইয়া দেন। নবাব প্রভাতে নিদ্রোত্থিত হইয়া সপদ্ম সরোবর সন্দর্শন করেন। এই সরোবর এখনও চট্টগ্রাম সহরের উত্তরাংশে "কমল দহ" বলিয়া পরিচিত। শ্যাম-রায়ের এই অসাধারণ শক্তিতে, নবাবের দৃষ্টি শ্যামরায়ের উপর পড়িল। তারপর আর এক ঘটনা ঘটিল। একদিন "রোজার" সময় নবাব পুপ্পাঘ্রাণ লইতেছেন দেখিয়া, শ্যাম-রায় বলিলেন যে, তাঁহার রোজা ভঙ্গ হইয়াছে,—কারণ হিন্দুশাস্ত্রমতে ঘ্রাণ অর্দ্ধেক ভোজন। নবাব ইহার পাল্টি জবাব দিবার জন্য 'রমজানের' দিন সপলাণ্ডু মহামাংস রন্ধন আরম্ভ করাইয়া, শ্যামরায়কে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। শ্যামরায় নাকে কাপড় দিয়া আসিতেছেন দেখিয়া, নবাব তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসিলেন। শ্যামরায় বলিলেন, কি এক দুর্গন্ধ অনুভব করিতেছেন। নবাব বলিলেন, উহা গো-মাংসের গন্ধ,—ঘ্রাণ অর্দ্ধেক ভোজন, অতএব তোমার জাতি

* সংবাদ প্রভাকর, ১২৫৯ সাল, ১লা বৈশাখ দ্রষ্টব্য।

গিয়াছে। এইরূপে শ্যামরায় আপন অস্ত্রে আপনি আহত হইয়া, মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। উপস্থিত তাঁহার বংশধরগণ চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুসলমানগণের অগ্রণী।

শ্যামরায়ের ভ্রাতা ***রায় চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত নয়াপাড়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তিনি একজন আস্থাবান্ হিন্দু এবং সিদ্ধ ভক্ত ছিলেন। এক এক সময়ে তাঁহার স্থাপিত দশভুজার সমক্ষে,—ইনি এখনও রায় পরিবারদিগের কুলদেবতা,—তিনি অহর্নিশ তদ্গতচিত্তে ধ্যান করিতেন,—এবং এইরূপ প্রবাদ, মাতা স্বপ্রকাশ হইয়া দর্শন না দিলে তিনি উঠিতেন না। এই অপূর্ব্ব ভক্তিবলে তিনি সমাজের আপামর সাধারণের বরণীয় হন। তাঁহাব সুযশে ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া, তাঁহার এক ভ্রাতা, দেবীপূজাকালে তাঁহাকে প্রণত অবস্থায়, অতি নিষ্ঠুররূপে খড়্গাঘাতে হত্যা করেন। তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কনকমঞ্জুরা প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাঁহার এই চণ্ডাল পিতৃব্যের মুণ্ড যদি তিনি দর্শন করিতে পারেন, তবে 'বাপ খুড়া' বলিয়া ক্রন্দন করিবেন,—অন্যথা অশ্রুপাত করিবেন না। কনকমঞ্জুরার অনুচরগণ তাঁহার পিতৃব্যকে হত্যা করিয়া, পিতৃব্যের ছিন্ন মুণ্ড আনিয়া কনকমঞ্জুরাকে দেখাইল, তবে তাঁহার ভীষণ প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল। শ্রীযুক্ত **** রায়ের দুই পত্নীর দুই অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ছিল। নানাকারণে রাজ্যে বিশৃঙ্খল উপস্থিত হইল। নবাব সেই দুই নাবালকের জন্য একটি মাত্র বৃহৎ জমিদারী রাখিয়া, বাকী সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলেন। এই জমিদারী আজিও অংশক্রমে রায় পরিবারে বিভক্ত হইয়া আছে। নবীনচন্দ্র এই মহানুভব রায়-বংশসম্ভূত। তিনি শ্রীযুত ** রায়ের দ্বিতীয় পত্নীর সন্তান, তাঁহারা নয়-পুরুষ, এই নয়াপাড়া গ্রামে বাস করিতেছেন। এই পুণ্যবান বংশের প্রায় প্রত্যেক পতি-পত্নীর নামে, নয়াপাড়া গ্রামে, এক একটি সরোবর কিংবা দীর্ঘিকা আছে।

চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত—এই নয়াপাড়া গ্রামেই নবীনচন্দ্রের জন্মস্থান। এই গ্রামখানি খুব বড়। ইঁহার চারিদিক হীরক-হারের ন্যায় নদীবেষ্টিত। এবং পূর্ব্বদিকে,—নদীর অপর পারে, তরুলতা-শোভিত শ্যাম পর্ব্বতমালা, প্রকৃতির এই নিভৃত নিকেতনে, প্রকৃতির প্রিয়-পুত্র,—নবীনচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন,—যাঁহার অপূর্ব্ব কাব্য-গ্রন্থ পাঠ করিয়া বাঙ্গালী নরনারী উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া রহিয়াছে।

কুলানুসারে নবীনচন্দ্রের জন্মপত্রিকায় নাম আছে,—শ্রীনবীনচন্দ্র সেন দাস। নবাব-দত্ত পৈতৃক উপাধিক্রমে শৈশবে হইলেন, তিনি,—শ্রীনবীনচন্দ্র রায়। তার পর ইস্কুলে পড়িবার বয়সে তাঁর এক খুড়তুতো ভায়ের পরামর্শে, ইস্কুলের রেজেষ্ট্রী খাতায় তিনি আপন নাম লেখাইলেন,—নবীনচন্দ্র সেন। ভ্রাতা তাঁহাকে উপদেশ দিলেন যে, সম্ভ্রমসূচক উপাধি নিজ নামে বসাইতে নাই। যাই হোক্, পঠদ্দশার সেই নামেই, আমাদের প্রিয় কবি, আপন প্রতিভাগুণে, এক্ষণে ভারতবিখ্যাত হইয়াছেন। সত্য,—বাঙ্গালীর মধ্যে নবীনচন্দ্র সেন বলিতে, আমাদের প্রিয় কবিকেই বুঝায়। প্রতিভায়, দ্বিতীয় নবীনচন্দ্র সেন বাঙ্গালীর মধ্যে আর নাই।

নবীনচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা,—দেশে গুরু মহাশয়ের পাঠশালে; তারপর দেশের বাঙ্গলা ইস্কুলে। ছেলেবেলায় তিনি বেজায় দুষ্ট এবং উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি ছিলেন। এমন খেলা নাই যে, তিনি খেলিতেন না,—এমন অস্ত্র নাই যে, তিনি চালাইতেন না,—এবং এমন লোক নাই যে, তিনি ক্ষেপাইতেন না। ফলতঃ নষ্টামি-দুষ্টামিতে তিনি সর্দ্দার সেরা ছিলেন। ইস্কুলের নিরীহ পণ্ডিত তাহার বাল্য-কীর্ত্তিতে উৎপীড়িত হইয়া বলিতেন,—"আহা! গোপী-বাবু মাঘ মাসের শীতে একগলা জলে তপস্যা করিয়া এমন পুত্ররত্ন পাইয়াছেন!"

কিন্তু এত দুষ্টুমী সত্ত্বেও, পরীক্ষার সময় তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও কৃতকার্য্যতা দেখিয়া লোকে চমৎকৃত হইত। তিনি চিরদিন প্রশংসার সহিত সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন।

ইংরেজী ১৮৬৩ সালে চট্টগ্রাম ইংরেজী ইস্কুল হইতে এনট্রান্স এবং তারপর ১৮৬৫ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ, এ, এবং শেষ জেনারল এসেম্‌ব্লি কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় নবীনচন্দ্র উত্তীর্ণ হন।

নবীনচন্দ্রের ধর্ম্মজীবনের পরিচয় তাঁহার নিজ মুখেই শুনুন :—"ভারত-বিখ্যাত সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ ৺ শঙ্করপুরীর কাছে আমি বারো বৎসর বয়সে দীক্ষিত হই। আমার চক্ষু না ফুটিতেই গুরুদেব জলন্ধরে সমাধিপ্রাপ্ত হন। আমার উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার কাছে অভিযোগ উপস্থিত হইলে, গুরুদেব তাহা ডিস্‌মিস্ করিয়া আমাকে আদেশ দেন,—"তোমারা ক্রিয়া-করম কুচ নেহি হায়।"

নবীনচন্দ্রের বিবাহ-ব্যাপার এক অদ্ভুত রকমের। তাহাতে দুইটি ফৌজদারী মকদ্দমা পর্য্যন্ত হইয়া যায়। এফ, এ পরীক্ষার একমাস পূর্ব্বে, নবীনচন্দ্র এই সাধের বিবাহ-বাসরে যান, এবং তাহার ফলস্বরূপ 'স্কলারসিপ'টি হারাইয়া, জেনারল এনেম্‌ব্লিতে বি, এ পড়িতে বাধ্য হন। তা হোক্—তাহাতে কিছু আসে যায় নাই। কবির চিরদিনের শান্তি-সুখ ত মিলিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট লাভ। বস্তুত, কবির পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী অশেষগুণে গুণবতী।

নবীনচন্দ্রের কর্ম্ম-জীবনের পরিচয়, পাঠক তাঁহার নিজ মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষাতেই শুনুন ;—"পিতা অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও দানশীলতাগুণে, আমার বি, এ পরীক্ষার তিনমাস পূর্ব্বে, আমায় কলিকাতায় পথের কাঙ্গাল করিয়া এবং শাখা-প্রশাখায় একটি বিপুল পরিবারের ভার আমার ক্ষুদ্র স্কন্ধে অর্পিত করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। রাজ-পুত্র পথের কাঙ্গাল হইলাম। প্রথম ভাগ "অবকাশরঞ্জনী"র 'পিতৃহীন যুবক ও শশাঙ্ক দূত' কবিতায়, আমার জীবনের

এ অঙ্ক প্রতিভাত হইয়াছে। কিন্তু পিতার অক্ষয় পুণ্যবলে, কয়েক মাসের মধ্যেই,—ইংরেজী ১৮৬৮ সালে, প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, এই ডেপুটীগিরি লাভ করি।"

এই ত নবীনচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী। কিন্তু প্রকৃত জীবনী কি ইহাই? ইহা ত অতি সাধারণ। কবির জীবনের সে অসাধারণত্বটুকু কোথায় পাইব? "প্রকৃত যাহা হৃদয়ের ইতিহাস, তাহাকেই আমি জীবনী বলি।" এখন কবির হৃদয়ের প্রকৃত ইতিহাস জানিব,—কি উপায়ে? এক যদি কবি উলঙ্গ প্রাণে নিজে নিজের জীবনী লিখেন, তবে তাহা সুসিদ্ধ হয়,—নয় কবির সহিত একমন একপ্রাণ হইয়া, দিনরাত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, তাঁহারা হৃদয়ের অতি গুহ্য-কথা কাণ পাতিয়া শুনিতে হয়। তাও আবার যে-সে লোক পারে না,—কবির হৃদয় লইয়া নিজে কবি হইয়া, সেই গূঢ় গোপনীয় কথা শুনিতে হয়। হৃদয়ে হৃদয়ে সংযোগ না হইলে, জীবনের হাসি বা কান্না, বুঝা যাইবে কেন? তোমার আমার সম্বল,—এই বহির্জ্জগৎ এবং বাহিরের খুটীনাটী ;—কিন্তু কবি এ দিকেও নয়,—তিনি অন্তরে অন্তরে একি অজ্ঞেয় স্বপ্ন-রাজ্যে বিচরণ করিতেছেন।—তোমার আমার কবির প্রকৃত জীবনী জানিবার সম্ভাবনা কোথায়? তোমার আমার সে বিশেষত্ব-বোধটুকু আছে কি?

নবীনচন্দ্র যথার্থই কবি। শুধু কেতাবের কবি নন,—অন্তরেও তিনি কবি। তাঁহার সহিত যিনি একটু প্রাণ দিয়া মিলিয়া মিশিয়াছেন, তিনিই জানেন,—কি অপূর্ব্ব সরলতায় তাঁহার প্রাণ গঠিত। আর যাঁহার সে সৌভাগ্য না হইয়াছে, তিনি একান্তমনে তাঁহার যে কোন একখানি কাব্য পাঠ করিবেন, তাহা হইলেও আমাদের এই কথার সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

সুবিখ্যাত "পলাশীর যুদ্ধ" নবীনচন্দ্রকে সর্ব্বত্র সুপরিচিত করিয়াছে। মাইকেলের পরলোকগমনের পরে এমন উদ্দীপনময়ী, তেজস্বিনী ও মর্ম্মস্পর্শিনী কবিতা,—কোন বাঙ্গালী কবির নিকট হইতে আমরা পাই নাই। তার পূর্ব্ব এক এক করিয়া, তিনি যে সকল অমূল্য কাব্য ও মহাকাব্য বাঙ্গালী পাঠককে উপহার দিয়া আসিতেছেন, তাহার তুলনা হয় না। তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি—'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্র' তাঁহাকে সাহিত্য-জগতে অমর করিয়াছে। প্রভাস, অমিতাভ, খৃষ্ট প্রভৃতি কাব্যও তাঁহার কবিপ্রতিভার ফল। তাঁহার গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ গুলিও তাঁহার সরল মধুর হৃদয়ের উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব। অনুবাদ হইলেও, লেখার ধাত তাঁহার নিজস্ব। তাঁহার অবকাশরঞ্জিনী, রঙ্গমতী, ক্রিওপেট্রা প্রভৃতি প্রথম বয়সের গ্রন্থগুলিও সুপাঠ্য এবং সরল। সকল লেখাতেই নবীনচন্দ্রের আন্তরিকতা ও সরলতা পরিলক্ষিত হয়। পড়িতে বসিলে মনে হয় না যে, বই পড়িতেছি, কি বাস্তব সেই চিত্র প্রত্যক্ষ করিতেছি। লেখার এই উন্মাদিনী শক্তি যাঁহার আছে, তিনি ধন্য। যাঁহার লেখা পড়িতে পড়িতে দেশকাল সকলই ভুলিয়া গিয়া, পাঠককে তন্ময় হইতে হয়, তাঁহার লেখনী-ধারণ সার্থক। আর যিনি অসাধারণ কল্পনাপ্রভাবে, সমগ্র জগৎ এবং মনুষ্য-জীবন তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া থাকেন, তিনি সকলেরই প্রীতির পাত্র। কবি নবীনচন্দ্র এই সকল দুর্লভ গুণেই, বাঙ্গালী পাঠকের এত প্রিয় হইয়াছেন। কাব্য-প্রিয় তাঁহার ভক্ত এ দেশে নাই কে? তবে যাঁহারা প্রকৃত কাব্য কি বুঝেন না, তাঁহারাই তাঁহার নিন্দা করিতে থাকেন।

নবীনচন্দ্র স্বভাবকবি, কষ্ট-কল্পনা বা জটিল চিন্তা তাঁহার তাহার কোন গ্রন্থে নাই। যেখানে তিনি গভীর দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন, সেখানেও অতি সরলভাবে এবং অতি সুন্দর প্রণালীতে তাহা বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। নিজে মনে জ্ঞানে বুঝিয়া লিখেন, তাই পাঠকও সহজে বুঝিতে পারেন। আর গোজামিল দিয়া, কতকগুলা মিছাকথা লিখিয়া গেলে, কিংবা শুধু লিপিকুশলতা ও বিদ্যার ভাণ দেখাইলে, জ্ঞানী তাহাতে ভুলিবে কেন? এ অংশে নবীনচন্দ্র বঙ্গে অদ্বিতীয়। তাঁহার উচ্ছ্বাসময়ী ভাষা,—নির্ম্মল নদীর জলের ন্যায়, ছল্ ছল্ কল্ কল্ করিয়া বাহিয়া যাইতেছে,—কোথাও এতটুকু অস্পষ্টতা নাই, পাশ কাটাইয়া গোজামিল দেওয়া নাই,—আর কষ্ট-কল্পনা ত নাই-ই। এমনভাবে কাব্য লিখিতে পারেন,—কয়জন লোক? এমনভাবে উচ্চ মহাকাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, বাঙ্গালায় আর কয়জন কবি? বস্তুতঃ মাইকেলের শূন্য সিংহাসনে, নব্যবঙ্গের কবিকুল-চূড়ামণি শ্রীনবীনচন্দ্রকেই আমরা বসাইতে চাই। কারণ তিনিই সম্পূর্ণরূপে এই আসনের যোগ্যপাত্র। বিশেষতঃ রাজ-কার্য্যের গুরুভারের মধ্যে থাকিয়াও, তাহার অমৃতময়ী লেখনীর বিরাম নাই। আজিও তিনি ভিন্ন ভিন্ন কাব্য-গ্রন্থ লিখিয়া, কাব্যামোদী ভাবুকবৃন্দকে মোহিত করিয়া আসিতেছেন। নারায়ণ তাঁহাকে শতবর্ষ পরমায়ু দিন,—বঙ্গীয় সাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

রাজকার্য্যে নানাস্থানে ঘুরিয়া, নবীন বাবু এক্ষণে চট্টগ্রামের কমিশনরের পার্শন্যাল আসিষ্টাণ্টের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। রাজপুরুষগণ তাঁহার ন্যায় যোগ্য ব্যক্তির আরও উন্নতি করুন,—ইহাই আমাদের কামনা।

* * * *

—নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়। জন্মস্থান বিক্রমপুর, পশ্চিম-পাড়া, থানা শ্রীনগর, জেলা ঢাকা। ইং ১৮৪৫ সালে জন্ম। ঢাকা হিন্দুসমাজের প্রসিদ্ধ পরিচালক ও জজ-আদালতের বিখ্যাত উকীল ৺ কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ইনি দ্বিতীয় পুত্র। বাল্যকালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন। উক্ত বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া ঢাকা কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন

করেন। কুড়ি বৎসর বয়স হইতে এ পর্য্যন্ত প্রথমতঃ ঢাকা পোগস্ বিদ্যালয়, তৎপর জগন্নাথ ও জুবিলি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ২১ বৎসর বয়সের সময় "ঢাকা জিলার ভূগোল ও ইতিহাস" নামক একখানা পুস্তক লিখেন। এই পুস্তক তৎকালীন স্কুল ইন্স্পেক্টার সি, বি, ক্লার্ক সাহেব অতি আদরের সহিত ঢাকা জিলার স্কুলসমূহে পাঠ্য নির্ব্বাচিত করেন। তৎপর "বাখরগঞ্জ জেলার বিবরণ" নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। উহাও বরিশাল জেলাতে পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হয়। বাঙ্গলা ভাষাতে এ দেশীয় জেলার বিবরণ সম্ভবতঃ নবকান্ত বাবুই প্রথম প্রকাশ করেন। নবকান্তবাবু-কৃত স্কুলবুক সোসাইটীর রিডার, রয়েল-রিডার, মরেলক্লাসবুক প্রভৃতি পুস্তকের ব্যাখ্যা-পুস্তক ছাত্রসমাজে আদৃত।

তারপর যে পুস্তক প্রকাশ দ্বারা নবকান্তবাবু বাঙ্গলার শিক্ষিত ও সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তিগণের নিকট বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছেন, তাহার নাম "ভারতীয়-সঙ্গীত-মুক্তাবলী"। সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনকারী প্রাচীন ও আধুনিক প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-রচয়িতৃগণের উৎকৃষ্ট সঙ্গীত ও তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনীপূর্ণ সংগ্রহ-গ্রন্থ, নবকান্ত বাবুর পূর্ব্বে এদেশে আর কেহ প্রকাশ করেন নাই। এই বৃহৎ-সঙ্গীত পুস্তক এ দেশের সর্ব্বত্র আদৃত হইয়াছে। সকলেই মুক্তকণ্ঠে এই সংগ্রহের প্রশংসা করিয়াছেন।

নবকান্ত বাবুর কৃত অন্যান্য পুস্তকের নাম,—"রাজা রামমোহন রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গীতাবলী"; "সরল-গৃহচিকিৎসা," "ভারতের জন্য ব্রাহ্মসমাজ কি করিয়াছেন?" "বিদ্যাসাগরের সংক্ষিপ্ত জীবনী" ও "বাল্যসঙ্গীত"। ইহা ব্যতীত ইংরেজী স্কুলে ছাত্রদিগের পাঠের উপযোগী চারি পাঁচখানা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। এক সময়ে নবকান্ত বাবু ঢাকাপ্রকাশ পত্রিকার একজন লেখক ছিলেন। প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে "মহাপাপ বাল্য-বিবাহ" নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। চারি মাসকাল ঢাকা "ইষ্ট" পত্রিকার সম্পাদকের কার্য্যও করিয়াছেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে ব্রাহ্মসমাজে ভুক্ত হইয়াছেন। ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত বিশেষ ভাবে সংসৃষ্ট আছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করাতে পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

* * * *

—নগেন্দ্রনাথ বসু। সুপ্রসিদ্ধ "বিশ্বকোষ" সঙ্কলয়িতা ও প্রকাশক এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুজ মহাশয় তাঁহার যে আত্ম-জীবনী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, আমরা সাদরে তাহাই পত্রস্থ করিলাম।

"আপনার প্রস্তাব মত আমার জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিয়া পাঠাইলাম। আমার জীবনে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা মোটামুটী জানাইতে হইলেও এক-খানি গ্রন্থ লিখিতে হয়। এজন্য এখানে সে কথা প্রকাশ করিলাম না। ভবিষ্যতে আমার সামান্য জীবনী লিখিয়া মনের দুঃখ মিটাইবার ইচ্ছা রহিল। অতি উচ্চ বংশে উচ্চ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া, সুখে পরম আদরে লালিতপালিত হইয়া, তৎপরে দারিদ্র্যের অসহ্য যন্ত্রণা,—আত্মীয়গণের নিকট অনাদর যে কিরূপ অপূর্ব্ব জিনিস, তাহা আমি বেশ জানিয়াছি। আবার উন্নতির পক্ষে অগ্রসর হইতে হইলে, কত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে হয়, তাহাতে আমি নিজে ঠেকিয়া বিলক্ষণ শিখিয়াছি। এ সকল কথায় এখন আর কাজ নাই। আমি মাহিনগর সমাজের মুখ্য কুলীন, পর্য্যায় ২৮।

"আমার পিতার নাম শ্রীনীলরতন বসু। আমার প্রপিতা-মহ মাহেশে বাস করিতেন। কিন্তু আমার পিতামহ প্রায়ই মেদিনীপুরের অন্তর্গত জক্‌পুরে তাঁহার মাতামহ ৺ শ্যামাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের ভবনে বাস করিতেন। তাঁহার এক ভগিনীর সহিত রাজা রাজবল্লভের পুত্র রাজা গৌর-বল্লভ রায়ের বিবাহ হয়। সেই সূত্রে তিনি কলিকাতায় আসিলেন। শোভাবাজারের সুবিখ্যাত মহারাজ নবকৃষ্ণের দৌহিত্র কালীকৃষ্ণ ঘোষের সহিত ছাতু বাবুর (৺আশুতোষ দেবের) তৃতীয় সহোদরা তারিণী দাসীর বিবাহ হয়। তারিণী দাসীর এক মাত্র কন্যা ক্ষেত্রমণিকে বিবাহ করিয়া পিতামহ ৺ তারিণীচরণ বসু কলিকাতাবাসী হইলেন। সেই অবধি আমরা কলিকাতাবাসী হইয়াছি।

"আমার কোষ্ঠীতে আমার জন্ম তারিখ এইরূপ লিখিত আছে;—"শকাব্দা ১৭৮৮। সৌরাষাঢ়স্য ত্রয়োবিংশদিবসে ভৃগুবাসরে অসিতপক্ষীয় নবম্যাং তিথৌ তুলালগ্নে ভার্গবস্য ক্ষেত্রে অশ্বিনীনক্ষত্রে মেষরাশৌ" ইত্যাদি। সুতরাং এখন আমার বয়স ত্রিশ বৎসর। ইহার মধ্যে পঞ্চদশ বর্ষ হইতে আমি সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করি-য়াছি। আমার সাহিত্য জীবনের এই পঞ্চদশ বর্ষ,—আবার কাব্যজীবন, নাট্যজীবন ও ঐতিহাসিক-জীবন এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমে কবিতা ভালবাসিতাম, কবিকা লিখিতাম, মাসিকপত্রাদিতে বেনামে ছাপাইতাম। এই সময় 'কর্ণসিংহ' নামে একখানি নায়িকা ময় নাটক লিখি। তাহার অল্পকাল পরেই আমরা কয়েক-জন বন্ধু বান্ধবে মিলিয়া 'তপস্বিনী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করি। তপস্বিনী' পত্রিকায় আমি 'অক্ষি-চাঁদ' নামে একখানি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করি। তাহা-তেই নাটকীয় জীবনের সূত্রপাত আরম্ভ হয়। সেই তপ-স্বিনী পত্রিকায় সেক্সপীয়রের বিখ্যাত নাটক "ম্যাক্‌বেথের" কিয়দংশ অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১২৯০ সালে এই অনু-বাদ সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু ছাপা হইয়া বাহির হইতে আরও এক বর্ষ সময় লাগে। ম্যাক্‌বেথের এই অনুবাদ 'কর্ণবীর' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। 'তপস্বিনী' অল্প দিন পরেই বন্ধ হইয়া যায়। ১২৯১ সালে আমারা ভারত নামে আর এক-

খানি মাসিক পত্রিকা বাহির করি। তাহাতে সেক্সপীয়রের 'হাম্‌লেট' নাটকের অনুবাদ খানিকটা করিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয়, নানা গোলযোগে অল্পদিনের মধ্যেই 'ভারত' অন্তর্হিত হইল। হামলেটের সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করি-বার আর অবকাশ হইল না। এই সময় শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল সরকারের আগ্রহে "দর্জিপাড়া থিয়েট্রিক্যাল্ ক্লবের" অভিনয়ার্থ 'শঙ্করাচার্য্য' নামে একখানি ধর্ম্মমূলক নাটক রচনা করি। শব্দকল্পদ্রুম কার্য্যালয় হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তৎপরে বন্ধুবর বিহারিলালের উৎসাহে 'পার্শ্বনাথ', 'হরিরাজ', 'লাউসেন',—এই কয় খানি পদ্য গদ্যময় নাটক রচনা করি। এই কয়খানির মধ্যে উক্ত থিয়েট্রিকেল্ ক্লবে কেবল 'পার্শ্বনাথের' অভিনয় হইয়া-ছিল। অপর দুইখানির আয়োজন হইয়াছিল মাত্র।

"শঙ্করাচার্য্য ও পার্শ্বনাথ রচনার বহুপূর্ব্ব হইতে আমার ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্তি জন্মে। লাউসেন রচনার পর কাব্য, নাটক প্রণয়নের ইচ্ছা এককালে তিরোহিত হইল। সেও প্রায় বারো বৎসরের কথা হইবে। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব আলোচনার সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্য-পাঠে বলবতী ইচ্ছা হয়। একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া 'পাণিনি' অভ্যাস করিতে থাকি।

"১২৯২ সালে শব্দেন্দু মহাকোষ (India Encyclo-pedia) নামে একখানি বৃহদ্‌ভিধান লিখিতে আরম্ভ করি। আমার পরম সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু এই মহাগ্রন্থের প্রকাশক হইয়াছিলেন। তখনও "বিশ্বকোষের" সূত্রপাত হয় নাই। প্রথম প্রথম আমি একাই 'শব্দেন্দু-মহাকোষ' লিখিতাম; কিন্তু কঠোর পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার উপক্রম হওয়ায়, আর দুইজন সহকারী গ্রহণ করি। এই সময় আমার আরাধ্য গুরু,—শোভাবাজারের ৺ আনন্দকৃষ্ণ বসুর সহিত আলাপ হয়। প্রথম আলাপেই তিনি আমাকে উপ-দেশ দিয়াছিলেন,—"ভারতীয় মহাকোষ" প্রকাশ করিতে হইলে,—ভারতের পুরাতত্ত্ব সকল উদ্ধার করিতে হইলে, ভারতের প্রধান প্রধান ভাষাগুলি অধ্যয়ন করা চাই। যে সকল বৈদেশিক ভাষায় ভারতীয় পুরাতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, সেই সেই ভাষাও শিক্ষা করা আবশ্যক।" তাঁহার সেই মহা উপদেশ আমি ইহজীবনে কখন বিস্মৃত হই নাই। তাঁহার উপদেশ মত, তাঁহার নিকট গ্রন্থ লইয়া প্রথমতঃ জার্ম্মণ ও ফরাসী-ভাষা শিখিতে আরম্ভ করি। তখন ছাতু-বাবুর ত্রিতল-গৃহে আমাদের বাস। এইখানে আমার পরম সুহৃদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। এই সময় একজন মৌলবী নিযুক্ত করিয়া তাঁহার নিকট পারসী পড়িতে আরম্ভ করি। তৎপরে কিছু-দিন নাগরী, হিন্দি ও উড়িয়া ভাষা পাঠ করি।

"যে দুইজন সহকারী লইয়া শব্দেন্দু-মহাকোষ চালা-ইতে ছিলাম, তাঁহাদেরই দুরভিসন্ধিক্রমে কিছুদিন পরে মহাকোষ বন্ধ হইল। 'অকারের' সিকি অংশ মাত্র ডিমাই চারিপেজী ফর্ম্মার চারি শত পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

"শব্দেন্দু মহাকোষ বন্ধ হইলে, ১২৯৩ সালে আমি শব্দ-কল্পদ্রুমের পরিশিষ্ট সঙ্কলন-কার্য্যে নিযুক্ত হই। এই সময় বঙ্গের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করি। শব্দ-কল্পদ্রুম কার্য্যে ব্রতী হওয়ায় আমার পরমলাভ হইল। এই কার্য্যে প্রায় আড়াই বর্ষ কাল, প্রতিদিন অনবরত আমি হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রীয় পুরাণাদি,—শত শত প্রাচীন পুঁথি পাঠ করিতে থাকি, ও সেই সেই প্রাচীন গ্রন্থ হইতে প্রয়োজনীয় শব্দ সংগ্রহ করিয়া রাখি। এ সময়ে কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটী ও মেট্‌কাফ হলেও অনেক সময় অতিবাহিত হইত। ভারতের পুরাতত্ত্ব-মূলক প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি সর্ব্বদাই অধ্যয়ন করিতাম। এখন সেই অধ্যয়নই আমার জীবনের নিত্য-সহচর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

"১২৯৬ সালে বিশ্বকোষের সম্পাদনভার আমার উপর পড়িল। বহু দিন হইতে যে সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করিতে-ছিলাম, এখন তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল ভাবিয়া যে, কি সুখী হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। বিশ্বকোষ আমার জীবন, বিশ্বকোষ আমার ধ্যান, বিশ্বকোষ আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব। এখন মাসিক-পত্রিকাদিতে আমার যে, দুই একটী প্রবন্ধ বাহির হইতেছে, তাহা এই বিশ্বকোষেরই এক একটী শাখা প্রশাখা মাত্র। আজ বহু দিন ধরিয়া যে পুরাতত্ত্ব-স্রোতে সাঁতার দিতেছি, তাহারই সামান্য হিল্লোল বিশ্বকোষ-মহাসমুদ্রে দুই একটী দেখা দিতেছে।

"১৩০১ সালে আমি এসিয়াটিক সোসাইটীতে যোগ-দান করিয়াছি। এ পর্য্যন্ত এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় 'সেনরাজগণের কালনির্ণয়' 'বিশ্বরূপসেনের তাম্র-শাসন,' 'চন্দ্রবর্ম্মার, শিলালিপি' দ্বিতীয় 'নৃসিংহদেবের তাম্রশাসন,' 'নাগরাক্ষরের উৎপত্তি' প্রভৃতি কতকগুলি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।"

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, নগেন্দ্র বাবু তাঁহার জীবন-ব্রত উদ্‌যাপিত করুন।—"বিশ্বকোষের" ন্যায় মহাগ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে, তিনি সাহিত্য-জগতে অমরত্ব-লাভ করিবেন এবং তাঁহার নাম জগদ্বিখ্যাত হইবে।

* * *

—নবীনচন্দ্র দাস, এম, এ, বি, এল। পিতার নাম ৺ মাগনদাস দাস। সাং চট্টগ্রাম। জন্ম সন ইংরেজী ১৮৫৪ সাল, ফাল্গুন মাস।

নবীন বাবু একজন সুশিক্ষিত কৃতী পুরুষ। ইংরেজী ও বাঙ্গলায় তাঁহার বিশেষ অধিকার আছে। তাঁহার কৃত রঘুবংশের পদ্যানুবাদ,—বঙ্গভাষার এক উজ্জ্বল রত্ন। ভাব ও ভাষার সমন্বয় করিয়া, মুল সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, অতি অপূর্ব্ব প্রণালীতে, রঘুবংশের যে বঙ্গানুবাদ তিনি সঙ্কলিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার লিপিকুশলতার

ও সৌন্দর্য্যবোধের বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। কয়েক বৎসর হইল, এই জন্মভূমিতে, রঘুবংশের সমালোচনা উপলক্ষে, আমরা এ কথা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্তও করিয়াছি। তখন রঘুবংশ খণ্ডাকারে উপহার পাইয়াছিলাম, এক্ষণে সম্পূর্ণ রঘুবংশ উপহার পাইয়া, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে সাধুবাদ দিতেছি। মহাকবি কালিদাসের অমরকীর্ত্তি রঘুবংশ ভাষান্তরিত করিয়া, বঙ্গের সুসন্তান, সুকবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস মহাশয়, কাব্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন,—বঙ্গীয় সাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

এই রঘুবংশের পদ্যানুবাদ ব্যতীত নবীন বাবু আরও কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার "আকাশ কুসুম কাব্যও" সরস এবং সুখপাঠ্য। ইহা ব্যতীত বুদ্ধদেবের পূর্ব্বজীবনী, মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র বিরচিত অবদান কল্পলতা ও বাল্মীকির সময়ের ভূবিবরণ নামক গ্রন্থত্রয় ইংরেজীতে প্রণয়ন করিয়া, নবীনচন্দ্র আপন গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। "Miracles of Buddha" নামক গ্রন্থের একশৃঙ্গোপাখ্যানে, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির জীবনের আভাষ পাওয়া যায়। নবীন বাবুর বাল্যবন্ধু,—চট্টগ্রাম কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ বিদ্যারত্ন মহাশয় উক্ত গ্রন্থ অবলম্বনে এক বাঙ্গলা নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন।

নবীন বাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর, সি, আই, ই,—তিব্বত, শ্যাম ও চীনদেশ পরিভ্রমণ করিয়া এবং তৎসম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিয়া সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়াছেন। ইহাঁরা দুই ভায়েই চট্টগ্রাম জেলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন। পঠদ্দশায় উভয় ভ্রাতায় মিলিয়া, "বিভাকর" নামে এক মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। কাগজ খানি প্রায় এক বৎসরকাল চলিয়াছিল।

নবীন বাবুর পঠদ্দশার ফল বড় সুন্দর। তিনি বরাবর এনট্রেন্স হইতে এম, এ পর্য্যন্ত বৃত্তিভোগ করিয়া আসিয়াছেন। ইংরেজী ১৮৭৫ সালে তিনি অনারে এম, এ পাস করেন। এবং ১৮৭৭ সালে বি, এল পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করিয়া, বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত হন।

১৮৭৮ সালে, নবীন বাবুরই যত্নে চট্টগ্রাম কলেজের "ল" ক্লাস স্থাপিত হয়, এবং নবীন বাবুই উক্ত কলেজের প্রধান আইনাধ্যাপক নিযুক্ত হন। তৎপরবৎসর তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পান এবং অদ্যাপি সেই রাজকীয় কার্য্যেই নিযুক্ত আছেন। উপস্থিত নবীন বাবু চট্টগ্রামে আছেন।

এই রাজকার্য্যের গুরু পরিশ্রমের মধ্যেও, অবকাশমত তিনি সাহিত্য-সেবা করিয়া থাকেন,—ইহাতে কাহার না আহ্লাদ হয়? আমরা আশা করি, নবীন বাবু রঘুবংশের ন্যায় কুমারসম্ভবেরও এক খানি উৎকৃষ্ট বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া অধিকতর যশস্বী হইবেন।

নবীন বাবুর বংশবিবরণ ও তৎসঙ্গে অন্যান্য কথা পাঠক তাঁহার নিজ মুখেই শুনুন;—

"প্রবাদ আছে যে, যে সময়ে মহামারিতে গৌড় নগর ধ্বংস হয়, সে সময় বহুলোক দেশ দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছিল। ঐ সময় আমার পূর্ব্বপুরুষ বৈদ্যবংশজ গোপাল দাস রায় (ইনি গোপাল ঠাকুর নামে পরিচিত) অন্যান্য লোক সমভিব্যাহারে, গঙ্গার পশ্চিম কূল হইতে চট্টগ্রামে আগমন করেন। তখন বঙ্গদেশে মোগল সম্রাট আকবর সাহের আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে, এবং মুলায়েন খাঁ বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন। রাজকর্ম্ম উপলক্ষে কিংবা ভূসম্পত্তির আশায়, অনেক ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ-পরিবার,—রাঢ় ও পশ্চিম-বঙ্গ হইতে অভিনব মোগল রাজ্যভুক্ত এই দেশে আসিয়া বসতি করেন। গোপাল দাস রায় তাঁহাদের অন্যতম। অদ্যাপি তাঁহার নামে এক দীর্ঘিকা,—চট্টগ্রাম জেলাস্থ পটিয়া থানার আলামপুর গ্রামে অবস্থিত আছে। তাঁহার পরবর্ত্তী ষষ্ঠ পুরুষ পার্ব্বতীচরণ দাস গুপ্ত সন্ন্যাসী হইয়া, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি ভারতের নানাতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া পঞ্চাশ বৎসরের পর দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। দেশস্থ জ্ঞাতি বন্ধুগণ বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়া, তাঁহাকে পুন-সংসার-ধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছিলেন। তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র,—আমার পিতৃদেব মাগনদাস দাস ও কনিষ্ঠ পুত্র নিত্যানন্দ দাস। আমি পিতার তৃতীয় পুত্র।"

* * * *

—নবীনচন্দ্র দত্ত। পিতা ৺ দীননাথ দত্ত। পিতামহ ৺ দুর্গাচরণ দত্ত। জাতি তন্তুবায়, গোত্র অলংঋষি। জন্ম সন ১২৪৩ সাল, ২০শে আশ্বিন; মঙ্গলবার; অসিত পক্ষ, দশমী তিথি। মকর লগ্ন; শনির ক্ষেত্রে; পুষ্যা কর্কট রাশি দেবগণ, বিপ্রবর্ণ।

৺ দুর্গাচরণ দত্ত হইতে ঊর্দ্ধে অষ্টম পুরুষ ৺ গণেশচন্দ্র দত্ত, সম্বৎ ১৭০০ অব্দের প্রারম্ভে বারেন্দ্রভূমি ত্যাগ করিয়া সূতা ও বস্ত্রব্যবসায়ী শেঠ ও বসাকদিগের সহিত বাণিজ্য উপলক্ষে গোবিন্দপুরে আসিয়া প্রথম বাস করেন। ইংরেজরাজ দুর্গনির্ম্মাণের জন্য ঐস্থান গ্রহণ করিলে, ৺গণেশ চন্দ্রের বংশধরেরা কলিকাতা বড়বাজার, পাথুরিয়াঘাটা, নিমতলাঘাট, শিমলা প্রভৃতি স্থানে উঠিয়া আসিয়া বাস করেন। ৺ দুর্গাচরণ দত্ত নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট মধ্যে, যেখানে এইক্ষণে ৺ রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশধরেরা বাস করিতেছেন, সেইখানে বাস করিতেন। পরে ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া প্রায় ৯০ বৎসর হইল, ঐ বাটী বিক্রয় করেন এবং যোড়াবাগান ৯ নং বাটী ক্রয় করিয়া বাস করেন। ঐ বাটীতেই নবীনবাবুর জন্ম হয়। এক্ষণে নবীন বাবু নিজে ৭৩ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে বাটী প্রস্তুত করিয়া বাস করিতেছেন।

নবীন বাবু গরাণহাটা গঙ্গাধর রায় বসু কোংর পাঠশালে ৺গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় গুরুমহাশয়ের নিকট প্রায় পাঁচ বৎসর শুভঙ্করী ও তৎকালীন বাঙ্গলা শিক্ষা করিয়া, ৺ গোপালচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট চাণক্যশ্লোক, হিতোপদেশ ও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ কিঞ্চিৎ শিক্ষা করেন, তারপর ফ্রিচর্চ্চ ইনিস্‌টিটিউসনে প্রবিষ্ট হন। এখানে এগার বৎসর বিদ্যাশিক্ষা করেন। প্রতি বৎসর প্রাইজ ও ক্লাসের নির্দ্দিষ্ট প্রাইজ ছাড়া, স্বতন্ত্র পুরস্কার পাইতেন। ডাক্তার ডফ, রেভারেণ্ড ইউয়ার্ট সাহেব ও লালবিহারী দে, ইহাঁকে বড় ভাল বাসিতেন এবং প্রশংসাসূচক পত্রও ইহাঁকে দিয়া গিয়াছেন। সন ১২৫৬সালে ইউয়ার্ট সাহেবের সুপারিস্ পত্রে, ৺ ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, সিভিল অডিটর অফিসে ইহাঁকে একটী ১৫ টাকা বেতনের কর্ম্ম দেন। বৎসর তিন বাদে ঐ আফিস বেঙ্গল একাউন্‌টেণ্ট আফিসের সহিত মিলিত হইয়া যায়। ঐ সময়ে বিস্তর কেরাণী কর্ম্মচ্যুত হন এবং নবীনবাবুর বেতন ৩০ টাকা হয়। পরে এই আফিসে ক্রমশঃ বেতন বৃদ্ধি হইয়া নবীন বাবু ক্রমে তত্ত্বাবধারকের পদ পান এবং তাঁহার বেতন ২০০ হইতে ২৭৫ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। সন ১২৯৭ সালে ৩২ বৎসর কর্ম্ম করিবার পর তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

পঠদ্দশায় নবীন বাবু প্রভাকর, ভাস্কর প্রভৃতি পত্রিকাদিতে মধ্যে মধ্যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ১২৬৫ সালে প্রভাকর পত্রে "পদার্থ বিদ্যা অনুশীলনের ফল" নামে প্রবন্ধ লিখিয়া বেশ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ঐ সালে তিনি নিজে "কলিকাতা পত্রিকা" নামে একখানি মাসিকী প্রচার করেন। ঐ পত্রিকাতে অনেকগুলি সন্দর্ভের মধ্যে "বাঙ্গালার অবস্থা" নামে একটী ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রচারিত হয়। পত্রিকাখানি দশ সংখ্যার পর বন্ধ হইয়া যায়।

১২৬৮ সালে "শিল্পকল্পলতিকা" ও রহস্য সন্দর্ভ নামে যে দুই খানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তাহাতেও নবীন বাবু কৃষি ও বিজ্ঞানবিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতেন।

১২৬৯ সালে কলিকাতা বহুবাজারস্থ প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ব্রজগোপাল ও নন্দগোপাল মতিলালদ্বয়ের দ্বারা যে "মঙ্গলোদয়" নামে সাপ্তাহিক সমাচার প্রকাশিত হয়, নবীন বাবু তাহাতেও প্রবন্ধাদি লিখিতেন।

১২৭৩ সালে নবীনবাবু 'খগোল-বিবরণ' প্রকাশ করেন। বাঙ্গলা শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয় এই পুস্তক খানির দুইশত খণ্ড ক্রয় করেন ও উহা নরম্যাল বিদ্যালয় সমূহে পাঠ্যপুস্তক মধ্যে পরিগণিত করেন। তখনকার প্রচলিত প্রায় সমস্ত ইংরেজী ও বাঙ্গলা সংবাদপত্রে ঐ পুস্তকের প্রশংসা ঘোষিত হইয়াছিল।

১২৭৬ সালে ব্যবহারিক জ্যামিতি, ক্ষেত্রব্যবহার জরীপ এবং সমস্থল প্রক্রিয়া নামে গ্রন্থ নবীনবাবু প্রকাশ করেন। এই পুস্তক খানি এ পর্য্যন্ত চারিবার মুদ্রিত হইয়াছে। বাঙ্গলা শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয় এ পুস্তকের ২০০ খণ্ড ক্রয় করিয়াছিলেন। এখানিতে বালকদিগের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

১২৭৯ সালে নবীনবাবু "সঙ্গীত রত্নাকর" নামে একখানি বৃহৎ সঙ্গীতগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক প্রণালীক্রমে সঙ্গীতের যাবতীয় মূলসূত্র ও স্বরসাধন এবং সেতার মৃদঙ্গ ও তবলা সাধনপ্রণালী বিবৃত হইয়াছে।

১২৮০ সালে "সাহিত্য মঞ্জরী" নামে নবীনবাবুর আর এক খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এখানিও কয়েকটী স্কুলে পঠিত হইয়া থাকে।

১২৭৯ সালে কলিকাতা ঝামাপুকুরনিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় "দূত" নামে যে সাপ্তাহিক পত্র ও "হেমলতা" নামে যে এক খানি পাক্ষিক পত্র প্রকাশ করেন, তাহাতেও নবীনবাবু লিখিতেন। "ধান্য ও ইহার উৎপত্তি প্রণালী" নামে একটী ক্রমশঃপ্রকাশ্য প্রবন্ধ এই দুই পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়।

১২৮০ সালে স্কুলবুক সোসাইটীর আদেশে নবীনবাবু প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক স্কট সাহেবের "নোট্‌স অন প্রাকটিকেল জিউমেট্রি ও নোট্‌স অন সর্ভেয়িং" পুস্তকদ্বয়ের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া ছিলেন। এই দুই খানি পুস্তক প্রাইমারি পাঠশালার পাঠ্য।

১২৮২সালে স্কুলবুক সোসাইটির আদেশমতে "হিন্‌টস্‌টু আমিন্‌স অন্ খসরা সরভে ইন বেঙ্গল" পুস্তক নবীনবাবু অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই পুস্তক খানি প্রাইমারি পাঠশালার পাঠ্য। ঐ সালে নবীনবাবু সচিত্র বর্ণবিবোধ প্রথম ভাগ ও "সোজা ও তকরারী জমাখরচ হিসাব অনুসারে মহাজনী দর্শন এবং জমীদারী ও বাজারহিসাব" প্রকাশ করেন। সোজা ও তকরারী জমাখরচ বালঙ্গায় এই শ্রেণীর প্রথম পুস্তক। এখানি বিষয়ী লোকদিগের বিশেষ উপকারী। ১২৮৩ সালে নবীনবাবু "গীতসারসংগ্রহ" নামে এক খানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহাতে তাঁহার নিজের রচিত অনেকগুলি গীত আছে।

নবীনবাবু "বামাবোধিনী পত্রিকার" একজন নিয়মিত লেখক। এই পত্রিকার জন্মাবধি তিনি ইহাতে প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। তন্মধ্যে হিন্দুবিবাহপ্রণালী, বারি বিজ্ঞান, ধ্বনি বা শব্দবিজ্ঞান, ভূমির সার, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া-রহস্য, পাঁচন ও মুষ্টিযোগ, হেঁয়ালীসংগ্রহ, বাদনপ্রণালী, স্বরসাধনপ্রণালী, গো-পরিচর্য্যা ও রত্ন,—এই গুলিই প্রধান।

নবীনবাবুর বয়স এক্ষণে ৫৯ বৎসর। কিন্তু এ বয়সেও তিনি পরিশ্রমপরাঙ্মুখ নহেন। "সঙ্গীত কল্পতরু" নামে একখানি বৃহৎ পুস্তক তিনি লিখিয়াছেন;—শীঘ্রই মুদ্রিত হইবার আশা আছে।

* * *

—নারায়ণদাস মৌলিক। পিতা ৺ গঙ্গাদাস মৌলিক। বারেন্দ্র শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ। সাং কারারিকোলা, জেলা পাবনা।

ইনি শিক্ষাপরিচর, সমীরণ প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন।

"দলিতকুসুম" নামে ইহাঁর একখানি উপন্যাস আছে। নারায়ণ বাবুর উপস্থিত বয়স ২৮।২৯ বৎসর।

নাম-ছাড়।

—উমেশচন্দ্র বৈতালিক। ইহাঁর বাসস্থান হাওড়া জেলার অন্তর্গত শ্যামপুর থানার অধীন কমলপুর গ্রামে। ইনি একজন সম্ভ্রান্ত লোকের সন্তান। পূর্ব্ব পুরুষানুক্রমে ইহাঁদের বংশে কবিকীর্ত্তির কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, সেইজন্য ইহাঁদিগের "বৈতালিক" উপাধি হইয়াছে,—কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন। ইহাঁদের তালুক প্রভৃতি আয়কর সম্পত্তি আছে।

উমেশ বাবু অতি শৈশবে মাতৃহীন হন। গণেশপুর গ্রামের ধনাঢ্য জমিদার ইহাঁর মাতামহ; তিনি স্নেহ-বশতঃ ইহাঁকে স্বগৃহে লইয়া যান। ইনি মাতুলালয়ে স্নেহময়ী মাতামহীর নিকটে থাকিয়া এবং পরে মাতুলের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া, বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত—বৃত্তি সহ উত্তীর্ণ হন, এবং উক্ত পরীক্ষায় বাঙ্গলা ভাষায় ও বাঙ্গলা রচনায় জেলার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া, শিক্ষিত-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক একটী রৌপ্যপদক পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। এই পরীক্ষার পূর্ব্ব হইতেও ইহাঁর কবিত্ব শক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল। "পদ্য পুষ্পাঞ্জলি" (প্রথম ভাগ) নামে ইহাঁর এক খানি কবিতা-পুস্তক আছে। ইনি বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তমোলুকের ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং সেখানে কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়া এনট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর কলিকাতার মেট্রোপলিটান্ ইন্‌ষ্টিটিউশনে এফ, এ ক্লাসে অধ্যয়ন করেন।

কবি ৺ রাজকৃষ্ণ রায়ের কবিত্ব-কিরণে উমেশচন্দ্র ফুটিয়া উঠেন। নবজীবন, এডুকেশন গেজেট, সারসংগ্রহ, দৈনিক, সুলভ দৈনিক, গ্রামবাসী, সমীরণ ও পুষ্পহারে ইনি কবিতা লিখিতেন। দুই বৎসর কাল যথানিয়মে "দৈনিক" পত্রে হাস্যরসোদ্দীপক কবিতা প্রকাশ করেন। দৈনিকের বার্ষিক সমালোচনায় ইহাঁকে স্বর্গীয় কবি রসিক চন্দ্র রায়ের উপযুক্ত দোয়ার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। হাস্যরসের কবিতায় ইহাঁর বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি "পুষ্পহার" নামে একখানি মাসিকপত্র প্রচার করিয়া এক বৎসর কাল পরিচালন করেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে পদ্য পুষ্পাঞ্জলি, সাধের তরি, সদানন্দ, তিনটী মেয়ে, বাঙ্গালী বাবু ও আচার্য্যদর্পণ প্রভৃতি কয় খানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এক্ষণে শিরোরোগে ও অন্যান্য রোগে বিশেষরূপে আক্রান্ত হওয়ায়, বৈতালিক মহাশয় মানসিক বৃত্তির পরিচালনায় এককালে ক্ষান্ত হইয়া, গৃহে বসিয়া আছেন। শিরোরোগের জন্য দিবারাত্রি ইহাঁকে মস্তকে শীতল জলের পটী দিতে হয়। ইহাঁর কবিতা সরল, সরস ও মধুর। চিররুগ্ন না হইলে ইহাঁর দ্বারা সাহিত্য-সমাজের বিশেষ উপকার সাধিত হইত।

* * *

—গোবিন্দদাস মৌলিক। পিতা ৺ গঙ্গাদাস মৌলিক। সাং কাবারিকোলা, জেলা পাবনা। পাবনা জেলার মধ্যে কাবারিকোলার মৌলিক বংশ অতি প্রাচীন বনিয়াদি বংশ। ইহাঁরা বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ। গত ১২৯২ সালে এই প্রসিদ্ধ বংশের ইতিহাস "দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকায়" প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাঁরা পূর্ব্বে বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার ছিলেন। গোবিন্দ বাবুর সাহিত্য বিষয়ে অনুরাগ আছে। বাঙ্গলা কবিতাদি তিনি অনেক লিখিয়াছেন, কিন্তু সে সমস্ত এখনও প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি "ভৈষজ্যসার" নামক একখানি চিকিৎসা-পুস্তক প্রকাশ করিয়া, ইনি বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন।

* * *

—অনুকূলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। আদি বাস শিকারপুর, জেলা নদীয়া। হাল সাং খাগড়া, জেলা মুর্শিদাবাদ। পিতার নাম শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। বয়স ২৪।২৫ বৎসর। বাঙ্গলা সাহিত্যে ইহাঁর অনুরাগ আছে। "হিন্দু-রঞ্জিকা" পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে ইনি লিখিয়া থাকেন। ঐ পত্রিকায় ইহাঁর রচিত ভূমিকম্প, 'আর ত বাঁচি না' শীর্ষক কয়েকটী পদ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

দুর্গামঙ্গল-কাব্য।

"সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা" প্রতি তৃতীয় মাসে প্রকাশিত হয়। বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক এই ত্রৈমাসিক পত্রিকা এখন সম্পাদিত! কলিকাতা, ১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট,—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয় হইতে এই পত্রিকা প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য তিন টাকা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা একটী বড় সৎকার্য্য করিতেছেন। যে সকল বাঙ্গলা কবির কাব্যগ্রন্থ সমূহ আজও হস্তলিখিত পুঁথি আকারে অবস্থিত, সেই সকল গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এই পত্রিকায় হইয়া থাকে। যথা,—উদ্ধবানন্দের রাধিকামঙ্গল, ভারতচন্দ্রের আদি বিদ্যাসুন্দর, রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল, সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গল, দ্বিজ রামচন্দ্রের দুর্গামঙ্গল, শীতলামঙ্গল ইত্যাদি। পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় লিখিত দুর্গামঙ্গল কাব্যের আলোচনা এইখানে প্রকাশ করিলাম ;—

দ্বিজ রামচন্দ্র একজন সৎকবি, তাঁহার দুর্গামঙ্গল কাব্যের কতিপয় কবিতা আমার নিকটে বড়ই মধুর বোধ হইয়াছিল, তজ্জন্য আমি এই কাব্যের বিষয়টী বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মাননীয় সভাপতি ও সভ্য মহোদয়গণের গোচরে আনয়নের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছি।

এই কাব্যখানি প্রাচীন, কিন্তু 'বাঙ্গালা-ভাষা ও বাঙ্গালা-সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব'-লেখক স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় এবং 'বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য' নামক গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ইহার বিষয় কিছু উল্লেখ করেন নাই, সম্ভবতঃ এই পুস্তকখানি উক্ত দুই গ্রন্থকারের হস্তগত হয় নাই। এই কাব্যখানি গোয়ালন্দ উপবিভাগের অন্তর্গত হমদমপুর পোষ্ট আফিসের অধীন মূলঘর-নিবাসী শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র আচার্য্য মহাশয়ের গৃহে হস্তলিখিত বহুসংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে চাপা পড়িয়াছিল, বিগত অগ্রহায়ণ মাসে আমি তাঁহার নিকট হইতে আনয়ন করিয়াছি। এই পুস্তকখানি তাঁহার পিতা স্বর্গীয় গোলকচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয় পাঠ্যাবস্থায় নবদ্বীপ কিংবা ত্রিবেণী হইতে নকল করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং কিঞ্চিৎ পূর্ব্বগামী হইয়াও ইহার ভাষা বিষয়ে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ১৭৪২ শকাব্দে বাচস্পতি মহাশয় ৭১ বর্ষ বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন, যদি তিনি পাঠ্যাবস্থায় ২৫ বৎসর বয়সে এই গ্রন্থখানি নকল করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও বর্ত্তমান সময় হইতে ১২৩ বৎসর পূর্ব্বে ইহার প্রতিলিপি প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

এই কাব্যের রচয়িতা কবিবর রামচন্দ্র আপন জন্ম সময় অথবা গ্রন্থ-রচনার কাল নির্দ্দেশ করেন নাই। এই গ্রন্থের লেখা হইতে যাহা অনুমান করা গিয়াছে, নিম্নে তাহাই বিবৃত হইল!

কবিবর রামচন্দ্র তাঁহার কাব্যের মধ্যে এক স্থানে ফিরিঙ্গী ও ফরাসী শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা ;—

"কামান পাতিয়া আছে ফিরিঙ্গী ফরাস।
দেখে কাঁপে কায়, যায় জীবনের আশ॥"

এখানে ফিরিঙ্গী শব্দে পোর্ত্তুগীজ, আর ফরাস অর্থে ফরাসী অথবা ফিরিঙ্গি-ফরাস্ বলিতে শুধু ফরাসী জাতিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, উহা ঠিক বুঝা যায় না। এই কাব্যের কোথাও ইংরেজ কিংবা ইংরেজ রাজত্বের বিষয় উল্লিখিত হয় নাই, প্রত্যুত যে ভাবে যবন শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে, উহাতে এই কাব্যখানি যে মুসলমান রাজত্বের সময়ে ফরাসীদিগের বঙ্গদেশে আগমনের পর বিরচিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান হয়। মুসলমান সম্রাট্ অরঙ্গজেবের অধিকার-কালে সায়েস্তা খাঁ বঙ্গদেশ শাসন করেন, তখন অর্থাৎ * ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা চন্দননগরে কুঠী স্থাপন করেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান, সময় হইতে ২২৫ বৎসর অথবা উহার ২।১ বৎসর পরে এই কাব্যখানি প্রণয়ন করা হইয়াছিল। উক্ত দুই পংক্তি পদ্য ও ভাষা দৃষ্টে বোধ হয়, দুর্গামঙ্গল কাব্যের রচয়িতা কবিবর রামচন্দ্র,—অন্নদামঙ্গল-প্রণেতা কবিবর ভারতচন্দ্রের অনেক পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কারণ উভয়েই যদিও সংস্কৃত কাব্য অলঙ্কার-শাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন, তথাপি পরস্পরের ভাষার অনেক তারতম্য আছে। কবিবর রামচন্দ্রের রচনা ভারত-চন্দ্রের রচনার ন্যায় সুমার্জ্জিত নহে। আর ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর† ১১১৯ সালে অর্থাৎ বর্ত্তমান্ সময় হইতে ১৮৫ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যদি অনুমান ৩০ বৎসর বয়সে অন্নদামঙ্গল রচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও বর্ত্তমান সময় হইতে ১৫৫ বৎসর পূর্ব্বে অন্নদামঙ্গল প্রণীত হইয়াছিল। অতএব এই কাব্য যে অন্নদামঙ্গল অপেক্ষা অনেক প্রাচীন, এ বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ হইতে পারে না। কবিবর রামচন্দ্র দুর্গামঙ্গল কাব্যের মধ্যে যেরূপে আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করিয়াছেন, নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল ;—

"গরিটি সমাজ ধাম, গোপাল মুখুটী নাম,
তার সুত দ্বিজ রামধন।
তাহার তনয় তিন, জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র দীন,
গৌরী-গুণ করিল রচন॥"

অন্য একস্থলে লিখিয়াছেন ;—

"জাহ্নবীর পূর্ব্বভাগ, মেদন-মল্লানুরাগ,
তার মধ্যে হরিনাভি গ্রাম।
তাতে কবি নিজ বাসে, শ্রীদুর্গামঙ্গল ভাষে,
দ্বিজ কুলে রামচন্দ্র নাম॥"

অপর একস্থলে লিখিত আছে ;—

"হরিনাভি ধাম, দ্বিজ বিনোদরাম, তাহার তনয়াসুত।
পাঁচালী প্রবন্ধে, কহে রামচন্দ্রে, সদাই বিনয়যুত॥"

এই সকল লেখা হইতে বুঝা যাইতেছে, কবি রামচন্দ্র অনুমান ২২৩।২২৪ বৎসর পূর্ব্বে ২৪ পরগণার জেলার অন্তর্গত ভাগীরথার পূর্ব্ববর্তীস্থ হরিনাভি গ্রামে রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মুখুর্য্যে কি মুখোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর পিতামহের নাম গোপাল মুখুটী, পিতার নাম রামধন মুখুটী। ইহাঁরা তিন ভ্রাতা ছিলেন,—তন্মধ্যে কবিবর রামচন্দ্রই জ্যেষ্ঠ। তাঁহার পিতামহ দ্বিজ বিনোদ-

---

* "সায়েস্তা খাঁ তিন বৎসর ব্যতীত ১৬৬৪ খৃঃ হইতে ১৬৮৯ খৃঃ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা শাসন করেন। তাঁহার সময়ে ফরাসীরা চন্দননগরে (১৬৭৩ খৃঃ) এবং ওলন্দাজেরা চুঁচুড়ায় কুঠী স্থাপন করেন।"
(রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস ৪১পৃঃ)

† "ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। ইনি ১১১৯ সালে (১৭১২ খৃঃ) বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত 'ভুরসুট' পরগণার মধ্যে পাণ্ডুয়া গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন।" (শ্রীযুক্ত বাবু কালীময় ঘটক প্রণীত চরিতাষ্টক)

রামও হরিনাভিতেই বাস করিতেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় বলেন, "পূর্ব্বে জাহ্নবী হরিনাভির পশ্চিমভাগ দিয়া প্রবাহিত ছিলেন, এখন মজিয়া গিয়াছেন, উহার সামান্য চিহ্নমাত্র আছে।" কবির পরিচয় এই জানা গিয়াছে।

এখন দেখা যাউক, এই কাব্যের 'দুর্গামঙ্গল' নাম কেন হইয়াছে? শাস্ত্রবাক্যে ও হিন্দুধর্ম্মে একান্ত আস্থাবান্ কবিবর রামচন্দ্র বঙ্গসমাজে পুরাণোক্ত দুর্গাপূজা ও দুর্গানবমী-ব্রতের উপদেশ প্রদানের নিমিত্ত এই কাব্যের নায়ক-নায়িকা-সংক্রান্ত ঘটনাবলীর মধ্যে দুর্গাপূজা ও দুর্গানবমী-ব্রতের বর্ণনা করিয়াছেন, এই জন্য কাব্যের দুর্গামঙ্গল নাম হইয়াছে।

এই কাব্যখানি হস্তলিখিত পুঁথির পাতার ১১৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত প্রসিদ্ধ নলোপাখ্যান অবলম্বনে মহাকবি শ্রীহর্ষ প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় 'নৈষধচরিত' নামে প্রসিদ্ধ মহাকাব্য রচনা করেন। কবিবর রামচন্দ্র ঐ বিবরণ অবলম্বন করিয়াই বাঙ্গালা ভাষায় 'দুর্গামঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছেন। এই কাব্যের উপাখ্যান মহাভারতে যেরূপ আছে, শ্রীহর্ষ মনোহর কল্পনার সাহায্যে উহাকে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ও নানাবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। কবিবর রামচন্দ্র উহার উপর আর একটু কল্পনা ও তদানীন্তন বাঙ্গালী সমাজের একটী নিখুঁত চিত্র সম্বলিত করিয়া 'দুর্গামঙ্গল' কাব্যের অবয়ব গঠন করিয়াছেন। শ্রীহর্ষ নলদময়ন্তীর বিবাহ-বর্ণন করিয়াই 'নৈষধচরিত' শেষ করিয়াছেন, কিন্তু শেষোক্ত কবি 'দুর্গামঙ্গল' কাব্যে নলোপাখ্যানের সমুদয় অংশই গ্রহণ করিয়াছেন।

বেদাচার এবং হিন্দুরীতিনীতি পরিভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগকে স্বধর্ম্মে আকর্ষণ করাই 'দুর্গামঙ্গল' কাব্য রচনার উদ্দেশ্য। 'নৈষধ-চরিত' প্রণেতা যে সময় তাঁহার কাব্য রচনা করেন, বোধ হয় তখন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সহিত হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছিল, শ্রীহর্ষ উহার একটী চিত্র 'নৈষধ-চরিতের' ১৭শ সর্গে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি কলির মুখে নাস্তিক ও বৌদ্ধগণের যুক্তি এবং দেবগণের মুখে আস্তিক ও হিন্দুগণের যুক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কলি বলিতেছে*,—কোনও বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি বেদের প্রামাণ্য অস্বীকারের নিমিত্ত যাহা সদ্বস্তু তাহাই ক্ষণিক, এই অনুমান দ্বারা জগৎকে অনিত্য বলিয়াছেন। আর বৃহস্পতি বলেন, অগ্নিহোত্র কর্ম্ম, তিন বেদ, মীমাংসা শাস্ত্র, ভস্ম দ্বারা তিলক, এ সমুদয় বিবেকপৌরুষহীন ব্যক্তিদিগের জীবিকার উপায় মাত্র। মহাবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের শ্রুতি স্মৃতির অর্থ গ্রহণ বিষয়ে ঐক্যমত হইতে পারে না, কেননা ব্যাখ্যা-বুদ্ধিবলের অপেক্ষা করে, যাহা সুখকর ব্যাখ্যা, উহা কোন প্রকারেই উপেক্ষা করা উচিত নহে। মৃত ব্যক্তি পরলোকে গিয়া স্বকীয় কৃতকর্ম্ম স্মরণ করে, তাহার শুভাশুভ কর্ম্ম পরলোকেও তাহার অনুসরণ করে, শ্রাদ্ধাদিতে ব্রাহ্মণভোজন করাইলে মৃতব্যক্তির তৃপ্তি হয়, এ সকল ধূর্ত্ততামূলক কথায় কাজ নাই। সেই পাণ্ডিত্যাভিমানী চাটুবাদকুশল পাণ্ডবদিগের কবি যে ব্যাস, তাঁহার কথায়ও শ্রদ্ধা করা উচিত নহে; যেহেতু পাণ্ডবেরা যাহাদিগকে নিন্দা করিয়াছেন, তিনিও তাহাদিগকে নিন্দা করিয়াছেন, পাণ্ডবেরা যাহাদিগকে প্রশংসা করিয়াছেন, তিনি তাহাদিগকেই প্রশংসা করিয়াছেন। কলি এইরূপ বহু তর্কের দ্বারা আস্তিক মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। উহার উত্তরে ইন্দ্রাদি দেবগণও অনেকগুলি যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাকবি শ্রীহর্ষ ইচ্ছা করিয়াই যেন ঐ সকল যুক্তিকে তত দৃঢ় করিতে চেষ্টা করেন নাই। দেবগণ বলিতেছেন,— হে নাস্তিকগণ! পুত্রেষ্টিযাগ করিলে যে পুত্র জন্মে, ইহা ত সাক্ষাৎ দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব ইহাদ্বারাও কি তোমাদের সন্দেহ নিরাস হইতেছে না? বেদোক্ত জল ও অগ্নি পরীক্ষাদিতে যে প্রত্যয়, উহাই ত তোমাদের নাস্তিকী বুদ্ধিকে গলহস্ত প্রদান করিয়া নিষ্কাশিত করিতেছে, অতএব তোমাদিগকে ধিক্। কোন ব্যক্তিতে ব্রহ্মদৈত্যাদি ভূতযোনি আশ্রয় করিয়া যে গয়াশ্রাদ্ধ যাত্রা করে, সকল দেশেই ত এ প্রমাণ পাওয়া যায়, ইহতে বিশ্বাস কর না কেন? নাম ভ্রমে কোন ব্যক্তিকে যমদূতেরা যমসদনে উপস্থিত করিলে, যম তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলেন, সেই ব্যক্তি পুনরায় স্বদেহে উপস্থিত হইয়া জীবনলাভ করতঃ প্রতিবেশীদিগের নিকটে যে যমলোকের কথা বলে, তাহাতেও কি তোমাদের পরলোকে বিশ্বাস হয় না?* দেবগণ এইরূপ অনেক যুক্তি নাস্তিক ও বৌদ্ধ মতাবলম্বী কলির নিকটে বর্ণনা করিয়াছিলেন। কবিবর

---

* "কেনাপি বোধিসত্ত্বেন জাতং সত্ত্বেন হেতুনা।
যদ্বেদমর্ম্মভেদায় জগদে জগদস্থিরম্॥
অগ্নিহোত্রং ত্রয়ী তন্ত্রং ত্রিদণ্ডং ভস্মপুণ্ড্রকম্।
প্রজ্ঞাপৌরুষহীনানাং জীবো জল্পতি জীবিকাঃ॥
শ্রুতিস্মৃত্যর্থবোধেষু নৈকমত্যং মহাধিয়াম্।
ব্যাখ্যা বুদ্ধিবলাপেক্ষা সা নোপেক্ষ্যা সুখোন্মুখী॥
মৃতঃ স্মরতি কর্ম্মাণি মৃতে কর্ম্মকলোর্ম্ময়ঃ।
অন্যভুক্তৈর্মৃতে তৃপ্তিরিত্যলং ধূর্ত্তবার্ত্তয়া॥
পণ্ডিতঃ পাণ্ডবানাং স ব্যাসশ্চাটুপটুঃ কবিঃ।
নিনিন্দ তেষু নিন্দৎসু স্তুবৎসু স্তুবতাং স কিম্॥"

* "পুত্রেষ্টিশ্যেনকারীরী মুখা দৃষ্টকলা মুখা।
নবঃ কিং ধর্ম্মসন্দেহ-সন্দেহজয়ভানবঃ॥
জলানলপরীক্ষার্দো সংবাদো বেদবেদিতে।
গলহস্থিতনাস্তিক্যাং ধিক্ ধিয়ং কুরুতে নতে॥
যাচতঃ স্বং গয়াশ্রাদ্ধং ভূতস্মাবিশ্য কঞ্চন।
নানাদেশে জলোপজ্ঞাঃ প্রত্যেষিনকথাঃ কথম্॥"
(নৈষধচরিত ১৭শ সর্গ।)

রামচন্দ্র ওরূপ বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পরস্পর বিতর্ক বর্ণনা না করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম, কি মুসলমান ধর্ম্ম-প্রচারে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহাই বর্ণন করিয়াছেন। প্রকারান্তরে হিন্দু সাধারণের স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম,—

নল শরীরে কলির প্রবেশ।

"কলির হইল বশ, ত্যজে ধর্ম্ম কর্ম্ম রস,
বিষম স্বভাব ভাবে ভূপ।
ক্ষণে ক্ষণে হয় ক্রোধ, ধর্ম্মপথ কৈল রোধ,
কামে চিত্ত মজে নল ভূপ॥
মুড়ায় মাথার কেশ, দেবকর্ম্মে সদা দ্বেষ,
পিতৃলোকে নাহি দেয় জল।
বলে ভণ্ড যত দ্বিজ, মিথ্যা কর কার পূজো,
প্রবঞ্চনা করয়ে কেবল।
মরা মাতা পিতা তরে, ভ্রমে লোক শ্রাদ্ধ করে,
সে কেবল বুঝিবার চুক।
মদনমঙ্গল গীত, শুনে সদা আর্দ্রচিত,
প্রজার হিংসায় নাহি সুখ॥
রাজার পাপেতে রাজ্য, বিষম হইল কার্য্য,
ধর্ম্ম নাহি মানে প্রজাগণে।
ব্রাহ্মণ আচারভ্রষ্ট, পাপেতে পূর্ণিত রাষ্ট্র,
বেদপাঠ করে শূদ্রগণে॥
স্বামিনিন্দা করে ভার্য্যা, কামিনী হইল পূজ্যা,
পর ভাবে জনক জননী।
মিথ্যাকথা প্রবঞ্চনা, ভ্রষ্ট নষ্ট সর্ব্বজনা,
কুলবধূ নীচেতে গামিনী॥
গোহিংসা ব্রাহ্মণদ্বেষ্টা, চৌর্য্যকর্ম্মে সদা চেষ্টা,
ব্রাহ্মণের যবন আচার।
যাগ যজ্ঞ সদা হীন, ধর্ম্মে রসবীর ক্ষীণ,
শূদ্রের তপস্যা ব্যবহার॥
নব বধূ ঘরে আসি, শাশুড়ীকে করে দাসী,
সুত পিতায় নাহি দেয় অন্ন।
ব্রাহ্মণে বেচয়ে দুগ্ধ, পরদারে সদা মুগ্ধ,
নাহি বাছে জাতিভেদ ভিন্ন॥
বিষম হইল নীত, দেখি কলি হরষিত,
সমুচিত ফল দিব নলে।
দ্বিজ রামচন্দ্র কয়, গৌরীগুণ সুধাময়,
রহ মন চরণ-কমলে॥"

উদ্ধৃত কবিতায় যে মস্তক-মুণ্ডন, দেবকর্ম্মে দ্বেষ, পিতৃশ্রাদ্ধাদিতে অবিশ্বাস প্রভৃতি যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উহা কোন্ কোন্ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া, ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে এক মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত বৌদ্ধভিক্ষু ও ভেকধারী বৈরাগীগণ মস্তক মুণ্ডন করেন, পিতৃশ্রাদ্ধাদি করেন না। কিন্তু এক বৌদ্ধ ভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে দেবকর্ম্মে দ্বেষ করিতে দেখা যায় না। আবার ২০০ বৎসর পূর্ব্বে যে বঙ্গদেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, এমতও অনেকে বিশ্বাস করেন না। কবি বৈষ্ণবসম্প্রদায় সম্বন্ধে কি মত পোষণ করিতেন, তাহাও অনুমান করা দুরূহ। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন;

'সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবপ্রিয়,
মহেন্দ্র সমান ক্ষিতিপতি।'

এখানে বৈষ্ণব অর্থে যদি বিষ্ণুর উপাসক বা বিষ্ণুভক্ত এই সাধারণ অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় শাক্ত কবি মহাত্মা চৈতন্যের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ভেকধারী বৈরাগীদিগকে লক্ষ্য করিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমান সময়ে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি লোকের যেরূপ শ্রদ্ধা, যখন এই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রথম অভ্যুদয় হয়, তখন সাধারণের এতদূর শ্রদ্ধা ছিল না।

কাব্যের সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় একরূপ বর্ণিত হইল, এখন এই কাব্যের উপাখ্যানাতিরিক্ত ঘটনা, নায়ক, নায়িকা, রস, গুণ, দোষ, রীতি ও অলঙ্কার প্রভৃতি সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

নিষধনগরের অধিপতি রাজা বীরসেন সন্তান না হওয়ায় দুঃখিত। প্রতিদিন মহাদেবের আরাধনা করেন। শিব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া পুত্র-বর প্রদান করিলেন, কিন্তু বর দিয়াই তাঁহার মনে চিন্তা হইল, সর্ব্বগুণান্বিত কোন্ ব্যক্তি ভূতলে জন্মগ্রহণ করিবে? একদা কুবেরপুত্র জয়ৎসেন স্বীয় প্রিয়তমা চন্দ্রমালার সহিত কৈলাসশিখরে মহাদেবের কাননে বিহার করিতেছিলেন, সেই সময় মহাদেব পার্ব্বতী সহিত সেখানে উপস্থিত, তিনি কুবের-পুত্রের চপলতা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি কৈলাসে অবস্থানের যোগ্য নহ, যেহেতু তুমি পাপে আসক্ত, অতএব ভূতলে গিয়া জন্মপরিগ্রহ কর।" অভিশাপ শ্রবণে কুবেরপুত্র কাঁদিয়া মিনতি করিতে লাগিলেন, তাহাতে পার্ব্বতীর দয়া হইল, তিনি জয়ৎসেনকে বলিলেন, 'বাছা ভয় নাই, তুমি ভূমণ্ডলে গিয়া জন্মগ্রহণ কর, তোমার কীর্ত্তি ভুবন-বিখ্যাত হইবে।' চন্দ্রমালাকেও বলিলেন, 'সতি! তুমি পৃথিবীতে জন্মিয়াও নিজ পতি প্রাপ্ত হইবে, তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি আমার ব্রত প্রকাশ করিও।' তাহার পর জয়ৎসেন ও চন্দ্রমালা যথাক্রমে নিষধদেশে ও বিদর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। নলোপাখ্যান সকলেই অবগত আছেন, সুতরাং বাহুল্যভয়ে এখানে উহার সমুদয় অংশ উদ্ধৃত করিলাম না। মহাভারতে আছে, দময়ন্তীর গর্ভে নলের ইন্দ্রসেন নামক পুত্র ও ইন্দ্রসেনা নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। 'দুর্গামঙ্গলে' আছে, নলের জয়ন্ত নামে পুত্র ও চন্দ্রমুখী নামে কন্যা জন্মিয়াছিল; জয়ন্তকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া নল ও দময়ন্তী কৈলাসে গমন করিয়াছিলেন।

এখন মহাভারতে ও নৈষধচরিতের সহিত এই কাব্যের কল্পনাগত যে সকল সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয়, উহার কিঞ্চিৎ বিবৃত হইতেছে। নলোপাখ্যানে আছে, বিরহাতুর নল বনমধ্যে সুবর্ণের ন্যায় সুন্দর কতকগুলি হংসকে দেখিয়া উহার একটী ধরিয়াছিলেন। নৈষধকার শ্রীহর্ষ স্বীয় কল্পনার সাহায্যে হংসগণের মধ্যস্থ একটী মাত্র সুবর্ণময় হংস তাহাদের স্বাভাবিক বিচরণস্থল কেলি-সরোবরে ক্রীড়া করিতেছিল, এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন। (১) এই হংসই নল রাজার বিবাহের ঘটক। কেন যে হংসের সুবর্ণময় দেহ হইয়াছে, তাহাও কবি হংসের মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন। (২) কবিবর রামচন্দ্র এ স্থলে কল্পনা-সঙ্গিনীর প্রিয়বন্ধু শ্রীহর্ষেরই অনুসরণ করিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন

"ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা সরোবর-তীরে।
অপূর্ব্ব হংসের মালা খেলা করে নীরে॥
লোহিত চরণ চঞ্চু সুবর্ণের পাখা।
সরোবরে খেলা করে নিরমল রাকা॥
হংস দেখি আনন্দিত নৃপসুত সুখে।
অল্পে অল্পে এক হংস ধরিল কৌতুকে॥"

আবার হংসের সহিত প্রথম কথোপকথনে কবি রামচন্দ্র শ্রীহর্ষের কথাগুলির প্রায় অবিকল অনুবাদ করিয়াছেন। নল হংসকে ধরিলে হংস বলিতেছে,—

"আমার দুঃখের কথা নাহি দিতে ওর।
পক্ষিজাতি বটি কিন্তু বহুপোষ্য মোর॥
জনক জননী জরাগতিশক্তিহীন।
নবীনপ্রসূতা বধূ অতি অল্পদিন॥
খুঁটে না খাইতে পারে যমক শাবকে।
আমার বিহনে সবে বাঁচিবে কি শোকে॥ (৩)
কাতরে কহিছে হংস শুন মহারাজ।
আমাকে বধিলে তোমার কিবা হবে কাজ॥
দেখিয়া সুবর্ণপক্ষ যদি বধ পাছে।
এ হেন সুবর্ণ তোমার কত পড়ে আছে॥
সশৈল কানন পৃথ্বী তব অধিকার।
লইতে আমার সোণা কিবা উপকার॥ (৪)

হংস দময়ন্তীর নিকটে গিয়া নলের রূপ গুণের বর্ণনা করিলে, দময়ন্তী মনে মনে নলকে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং যাহাতে নল নরপতি তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন, তজ্জন্য হংসকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু এখানে কবি রামচন্দ্র যে যে স্থলে নৈষধকারের কথার অনুকরণ করিয়াছেন, সেই সেই স্থলেই মনোহর বোধ হয়, অন্যান্য স্থলে শ্রীহর্ষের ন্যায় নায়িকার মনের গভীর আবেগ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। দময়ন্তী বলিতেছেন;—

"তোমারে করিয়া সাক্ষী করিলাম পণ।
সঁপিলাম তাঁর কাছে যৌবন জীবন॥
সেই নরপতি যদি নাহি পাই স্থির।
নাহি যদি মিলে মোর ত্যজিব শরীর॥
আপনি দেবেন্দ্ররাজ মোর কাছে আইসে।
করিলাম সত্য নাহি যাব তার পাশে॥
সময়বিশেষে কবে মনোযোগ রয়।
অসময়ে কহিলে বিফল পাছে হয়॥
যদি মুখ তিক্ত থাকে নাহি থাকে ক্ষুধা।
সকল বিরস লাগে যদি খায় সুধা॥
ক্রোধের সময় কিংবা অন্য মনে থাকে।
হেনকালে মোর কথা না কহিবে তাঁকে॥
স্বকার্য্য হইলে হংস কহে অতঃপর।
পূর্ণ হবে অভিলাষ পাবে তাঁর বর॥"

এই স্থলে নৈষধকার যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, নিম্নে টীকায় ঐ কয়টী কবিতা উদ্ধৃত করা হইল। (৫)

মহাভারতে আছে, স্বয়ংবর-সভায় ইন্দ্র, যম, অগ্নি, বরুণ এই চারি দেবতা নলের রূপধারণ করিয়া উপবেশন করিলে একাকৃতি পঞ্চপুরুষ বিলোকনে দময়ন্তী সন্দেহে আকুল হইয়া দেবগণের শরণাগত হইয়াছিলেন। পরে দেবগণ দময়ন্তীর কাতর-প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া স্ব স্ব রূপ ধারণ করিলে দময়ন্তী নলের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করেন।(৬) এ স্থলে নৈষধকার শ্রীহর্ষ দময়ন্তীর সখীরূপে সরস্বতীকে স্বয়ংবরস্থলে আনয়ন করিয়া সুন্দর কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। বাঙ্গালা মহাভারত-রচয়িতা কাশীরাম দাস লিখিয়াছেন, দময়ন্তীর প্রার্থনায় দেবগণ স্ব স্ব চিহ্ন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনিমিষ নয়ন, স্পন্দহীন দেহ এবং অঙ্গের ছায়া না দেখিয়া দময়ন্তী তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন ও তত্তৎ-চিহ্ন-বিহীন নলকে বরমাল্য দান করিয়াছিলেন। (৭) কবিবর রামচন্দ্র নৈষধকারের অনুকরণ করিতে গিয়া সরস্বতীর পরিবর্ত্তে ভগবতী কাত্যায়নীকেই দময়ন্তীর সখীরূপে স্বয়ংবর ক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়াছেন, যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত বর্ণনাগুলি উদ্ধৃত করা গেল—

"বাসব বরুণ বহ্নি যম চারিজনে।
ভীমের তনয়া প্রতি কোপ আছে মনে॥
যথায় বসিয়া আছে নল নরপতি।
বসিল দেবতা তথা নলের আকৃতি॥
একাকৃতি পঞ্চ নল বসিয়া সভায়।
দেখিয়া ভীমের কন্যা হইল বিস্ময়॥
একাকৃতি পঞ্চ নল সভা মধ্যে বসি।
ভাবিত হইল বড় হেরিয়া রূপসী॥
কারে দিব বরমাল্য কেবা হবে নল।
বুঝিতে না পারি আমি কে করিল ছল॥
শ্রবণে কহেন তার হরের গৃহিণী।
কি লাগিয়া অন্যমনা হইলা স্বজনি॥
পৃথিবীমণ্ডল মাঝে নাহি যার ছায়া।
কখন সে নল নহে দেবতার মায়া॥
সভা মাঝে বিরাজে নরেন্দ্র দক্ষ মুখে।
মাল্যদান কর সখি পরম কৌতুকে॥"

এতক্ষণ এই কাব্যের কল্পনাগত বিষয় সকল বিবৃত হইল। সংপ্রতি এই কবির বর্ণনা-শক্তি ও ভাষার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে। কবি রামচন্দ্রের রচনায় মাধুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদ এই ত্রিবিধ গুণই দৃষ্ট হয়। দুঃখের বিষয়, তাঁহার রচনার উৎকৃষ্ট অংশগুলি আদিরসে পরিপূর্ণ—সুতরাং ইচ্ছানুসারে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। মাধুর্য্য-গুণ-বিশিষ্ট বর্ণনা যথা,—

"এক দিন সখা সঙ্গে, দময়ন্তী মনরঙ্গে,
পুষ্প-বনে করিল প্রবেশ।
স্তবকে স্তবকে ফুল, ভ্রমে গন্ধে অলিকুল,
গন্ধবহ গমন-বিশেষ॥"
পাতিয়া অঞ্চল পাঁতি, তুলে পুষ্প নানা জাতি,
কেহ দিল খোপায় চম্পক।
বকুল কুসুমে মালা, গাঁথে হার কোন বালা,
কোন সখী তুলিল অশোক॥
কোন সখী গিয়া তুলে, মল্লিকা মালতী ফুলে,
হার গাঁথি পরিল গলায়।
কোন সখী হার নিল, দময়ন্তী গলে দিল,
কোন সখী সখীরে সাজায়॥
বদ্ধ ছিল হংস সত্যে, হেনকালে গেল মর্ত্ত্যে,
উপনীত দময়ন্তী কাছে।
হংস হেরি রাজকন্যা, সঙ্গে কেহ নাহি অন্যা,
ধরিতে ধাইল পাছে পাছে॥"

ওজোগুণের সামান্য উদাহরণ যথা,—

"উপনীত হইল গিয়া গড়ের দুয়ার।
মাতঙ্গ তুরঙ্গ বাঁধা হাজার হাজার॥
শেফাই সঙ্গীন চড়া পাহারা ফটকে।
কাওয়াজ আওয়াজ ঘন ধড়কে ধড়কে॥
কামান পাতিয়া আছে ফিরিঙ্গী ফরাস্।
দেখে কাঁপে কায় যায় জীবনের আশ॥
ঘন ঘন গোলা ছোটে চোটে ফাটে মাটী।
ক্ষণেকে ক্ষণেকে জয়ঢাকে মারে কাটী॥
দ্বিতীয় গড়েতে গিয়া দেখে নরপতি।
দুয়ারেতে দ্বারপাল বসিয়া সংহতি॥
রাহুত মাহুত কত শত রজপূত।
বিষম ভীষণ কায় শমনের দূত॥
মাথায় পাগড়ী টেড়ি লাল কালা পীত।
সঘনে মোচড়ে গোঁফ জুলপী-শোভিত॥
জবা জিনি দুই আঁখি আসবে আকুলি।
গভীর বচন সদা অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি॥
কটি-ধটি-ধরা যোড়া করে তলোয়ার।
ঢালি পাকি খেলে কেহ ঘুরাইয়া ঢাল॥
ঘন ঘন ফেলে লড় ঘুরায় মুদ্গর।
মালশাটে ফাটে মাটী ভেঙ্গে হয় চুর॥

---

(১) "স দদর্শ ততো হংসান্ জাতরূপপরিষ্কৃতান্।
বনে বিচরতাং তেষামেকং জগ্রাহ পাণিনা॥"
(মহাভারত বনপর্ব্ব)

(২) "পয়োধিলক্ষ্মীমুষি কেলিপল্বলে বিরংসুহংসীকলনাদসাদরম্।
স তত্র চিত্রং বিচরন্তমন্তিকে হিরণ্ময়ং হংসমবোধি নৈষধঃ॥"
(নৈষধচরিত ১।১১৭ শ্লোক)

(৩) "স্বর্গাপগাহেমমৃণালিনীনাং নালামৃণালাগ্রভুজো ভজামঃ।
অন্নানুরূপাং তনুরূপঋদ্ধিং কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে॥"
(নৈষধচরিত ৩।১৩ শ্লোক)

(৪) "মদেকপুত্রা জননী জরাতুরা নবপ্রসূতির্বটা তপস্বিনী।
গতিস্তয়োরেষ জনস্তমর্দ্দয়ন্ অহো বিধে ত্বাং করুণা রুণদ্ধি ন॥"
(নৈষধচরিত ১।১৩৫ শ্লোক)

(৫) "ধিগস্তু তৃষ্ণাতরলং ভবন্মনঃ সমীক্ষ্য পক্ষান্ ম হেমজন্মনঃ।
ভবার্ণবস্যেব তুষারশীকরৈঃ ভবেদমীভিঃ কমলোদয়ঃ কিয়ান্॥"
(নৈষধচরিত ১।১৩০ শ্লোক)

(৬) "অনৈষধায়ৈব জুহোতি তাতঃ কিং মাং কৃশানৌ ন শরীরশেষাম্।
ঈষ্টে তনূজন্মতনোঃ স নূনং মৎপ্রাণনাথস্তু নলস্তথাপি॥
তদেকদাসীত্বপদাদুদগ্রে মদীপ্সিতে সাধু বিধিৎসুতা তে।
অহেলিনা কিং নলিনী বিধত্তে সুধাকরেণাপি সুধাকরেণ॥
শুদ্ধান্তসন্তোগনিতান্ততুষ্টে ন নৈষধে কার্য্যমিদং নিগাদ্যম্।
অপাংহি তৃপ্তায় ন বারিধারা স্বাদুঃ সুগন্ধিঃ স্বদতে তুষারা॥
ত্বয়া নিধেয়া ন গিরো মদর্থাঃ ক্রুধা কদূঢ়ে হৃদি নৈষধস্য।
পিত্তেন দূনে রসনে সিতাপি তিক্তায়তে হংসকুলাবতংস॥
ধরাতুরাসাহি মদর্থযাচ্ঞা কার্য্যা ন কার্য্যান্তরচুম্বিচিত্তে।
তদার্থিতস্যানববোধনিদ্রা বিভর্ত্ত্যবজ্ঞাচরণস্য মুদ্রাম্॥
বিজ্ঞেন বিজ্ঞাপ্যমিদং নরেন্দ্রে তস্মাৎত্বয়াস্মিন্ সময়ং সমীক্ষ্য।
আত্যন্তিকাসিদ্ধিবিলম্বিসিদ্ধ্যোঃ কার্য্যস্য কার্য্যস্য শুভা বিভাতি॥"
(নৈষধচরিত ৩।৭৯-৮০,৯৩-৯৬ শ্লোক)

"তান্ সমীক্ষ্য ততঃ সর্ব্বান্ নির্বিশেষাকৃতীন্ স্থিতান্।
সন্দেহাদথ বৈদর্ভী নাভ্যজানন্নলং নৃপম্॥
শ্রুতানি দেবলিঙ্গানি তর্কয়ামাস ভারত।
দেবানাং যানি লিঙ্গানি স্থবিরেভ্যঃ শ্রুতানি মে॥
তানীহ তিষ্ঠতাং ভূমাবেকস্যাপি ন লক্ষয়ে।
সা বিনিশ্চিত্য বহুধা বিচার্য্য চ পুনঃপুনঃ॥"
শরণং প্রতি দেবানাং প্রাপ্তকালমমন্যত।
নিশম্য দময়ন্ত্যাস্তু করুণং পরিদেবিতম্।
যথোক্তং চক্রিরে দেবাঃ সামর্থ্যং লিঙ্গধারণে॥"
(মহাভারত বনপর্ব্ব।)

"সাক্ষাৎকৃতাখিলজগজ্জনতাচরিত্রা তত্রাধিনাথমধিগত্য দিবস্থথা সা।
উচে যথা স চ শচীপতিরভ্যধায়ি প্রকাশি তস্য ন চ নৈষধকায়মায়া॥"
(নৈষধচরিত ১৩শ সর্গ।)

(৭) "বৈদর্ভীর নির্ণয় জানিয়া দেবগণ।
আপন আপন চিহ্ন করান দর্শন॥
অনিমিষ নয়ন যে স্পন্দহীন কায়া।
অম্লান কুসুম অঙ্গে নাহি অঙ্গছায়া॥
বৈদর্ভী জানিলা তবে এ চারি অমর।
নল নরপতি দেখে ভূমির উপর॥"
(কাশীরামদাসের মহাভারত—বনপর্ব্ব।)

গগনে উড়ায় বাঁশ ঘন ঘন লোফে।
কিলাকিলি হুড়াহুড়ী পরস্পর কোপে॥
ক্রমে ক্রমে সাত থানা করিল পশ্চাৎ।
পুরী মাঝে উপনীত হইল নরনাথ॥"

প্রসাদ গুণের উদাহরণ যথা,—

"নিদ্রাচ্যুত রূপবতী, নিকটে না দেখি পতি,
দময়ন্তী হইল বিস্ময়।
রাজ্ঞীর কম্পিত তনু, রাহুগ্রস্ত যেন ভানু,
শুকাইল সরস হৃদয়॥
আছিলাম একসাথ, কোথা গেলে প্রাণনাথ,
ভয়ে প্রাণ স্থির নহে ধড়ে।
শরীর হইল ক্ষুণ্ণ, চারি দিকে দেখি শূন্য,
মোহ হয়ে ভূমিতলে পড়ে॥
ডাকে রামা অবিশ্রান্ত, কোথা গেলে প্রাণকান্ত,
শান্ত কর দেখা দিয়ে মোরে।
ক্ষমা কর পরিহাস, যায় হে জীবন-আশ,
মরি আমি কানন ভিতরে॥"

কাব্যের গুণের কথা বলা হইল। এখন ইহার দোষের কথা কিছু উল্লেখ করা যাইতেছে। এই কাব্যে মধ্যে মধ্যে ২।৪টী ব্যাকরণ-দোষ দৃষ্ট হয়, যথা :—

১—প্রসব হইল কন্যা শরদের কান্তি।
২—দময়ন্তী হইল বিস্ময়।
৩—মোহ হয়ে ভূমিতলে পড়ে।
৪—পাপেতে পূর্ণিত রাষ্ট্র।

উদ্ধৃত স্থলসমূহে "প্রসব, বিস্ময়, মোহ" প্রভৃতি বিশেষ্য পদগুলি বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে না। "পূর্ণিত" এই পদটী ব্যাকরণদুষ্ট। কারণ পূর ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে, পূরিত আর পূর্ণ এই দুই পদ হইবে। এতদ্ভিন্ন এই কাব্যে অশ্লীলতাদোষও যথেষ্ট, তবে এই কবি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের স্থলবিশেষের বর্ণনার ন্যায় কুত্রাপি অনবগুণ্ঠন আদিরসের অবতারণা করেন নাই। অনেক স্থলে অতি সুন্দর কবিত্বপূর্ণ কবিতাগুলি অনাবশ্যকীয় আদিরসে কলুষিত করা হইয়াছে। আর এই কাব্যের নায়িকা দময়ন্তীকে অত্যন্ত তরলমতির ন্যায় বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি বিরহে অধীর হইয়া কোকিল ভ্রমর প্রভৃতির উপর বড়ই মর্ম্মান্তিক তিরস্কার করিয়াছেন, সে তিরস্কারের বর্ণনা অতি দীর্ঘ এবং উহার ভাষাও অত্যন্ত বিরক্তিকর এবং লজ্জাজনক, এ সমুদয়ই নৈষধকাব্যের অনুকরণের ফল।

বলা বাহুল্য, এই কাব্য আদিরস-প্রধান। ইহাতে গৌণভাবে করুণরস প্রভৃতির বর্ণনা আছে। এই কাব্যের নায়ক নল। অলঙ্কারশাস্ত্রে ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীর-প্রশান্ত এবং ধীরললিত নামে যে চারি শ্রেণীর নায়কের বিষয় বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে নল ধীরপ্রশান্ত নায়কের লক্ষণাক্রান্ত। কবি নায়কের চরিত্র বেশ কোমল ও উদারতাপূর্ণ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইনি কোন অবস্থাতেই আপন মহত্ত্ব পরিত্যাগ করেন নাই। নল দেবগণের দৌত্যভার গ্রহণপূর্ব্বক বিদর্ভরাজের অন্তঃপুরে গিয়া দময়ন্তীর নিকট দেবগণের প্রার্থনা জানাইলে তিনি কোন প্রকারেই উক্ত প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না। তখন নল বলিতেছেন,—

"ঈষৎ হাসিয়া নল কহিছে বচন।
অতি অনুচিত কথা কহ কি কারণ॥
ইহলোকে যাগযজ্ঞ ব্রত লোক করে।
কামনা সবার অন্তে স্বর্গভোগ পরে॥
শত অশ্বমেধ ফলে হয় বজ্রধারী।
তাহার রমণী হবে মান ভাগ্য করি॥"

নল যাঁহার লাভের আশায় ব্যাকুলভাবে দ্রুতগামী রথে আরোহণপূর্ব্বক বিদর্ভ নগরে গমন করিতেছিলেন, দেবগণের দৌত্যকার্য্যে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহার সেই একমাত্র প্রিয়তমা দময়ন্তীর নিকটে দেবতাদের অসমক্ষে ঐরূপ অকপটভাবে প্রার্থনা করা অতি মহত্ত্বের পরিচায়ক। এই কাব্যের নায়িকা দময়ন্তী,—তিনি স্বীয়া নায়িকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। দোষের মধ্যে বড় প্রগল্‌ভা, যে সকল কথা সখীদের নিকটে বলিতে গিয়াও লজ্জায় মস্তক নত করা উচিত, তিনি অনায়াসে হংসের নিকটে ও দৌত্যকার্য্যে ব্রতী নলের নিকটে সেই সকল কথা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার সখীগুলি আবার ততোঽধিক নির্লজ্জ। নলের বিরহে দময়ন্তীর ভাবান্তর দর্শনে তাহারা উদ্যান হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাণীকে এমন ভাবে তিরস্কার করিয়াছিল যে, তাহাদের বয়সের অযোগ্য ঐ সকল কথা পাঠ করিতে আমার লজ্জা-বোধ হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দুর্গামঙ্গল-কাব্য-রচয়িতা একজন কাব্যশাস্ত্রে নিপুণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি এই কাব্যে অনুপ্রাস, উপমা, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, অর্থান্তরন্যাস প্রভৃতি অনেক অলঙ্কারযুক্ত পদ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এখানে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত হইল। এই প্রকার উৎপ্রেক্ষাকে মালারূপিণী উৎপ্রেক্ষা বলা যাইতে পারে। যথা,—

"সভা মধ্যে আসিয়া বসিল গুণাকর।
তারকার মাঝে যেন শোভে শশধর॥
পতঙ্গ উদয়ে যেন পতঙ্গ লুকায়।
গরুত্মান্-মাঝে গরুত্মান্ শোভা পায়॥
গর্দ্দভ নিকটে যেন তুরঙ্গের শোভা।
মক্ষিকা নিকটে যেন গুঞ্জে মধুলোভা॥
ছাতারিয়া মাঝে যেন খঞ্জনের নৃত্য।
প্রভুর অগ্রেতে যেন শোভা পায় ভৃত্য॥

খদ্যোতের তেজ লুপ্ত হয় দিবাভাগে।
কুরঙ্গের রঙ্গ ভঙ্গ কুক্কুরের আগে॥
নলের তেজেতে সবে হইল বিবর্ণ।
রাঙ্গ মাঝে রূপা যেন পিতলে সুবর্ণ॥
কাচ মাঝে হীরা যেন স্ফটিকে মুকুতা।
শেকুল কণ্টক মাঝে মালতীর লতা॥
সারসের শোভা ক্রৌঞ্চ কুমুদের মাঝে।
রাজহংস শোভা পায় কাদম্বসমাজে॥
হেন্তাল কানন মাঝে শোভে নারিকেল।
গাবের নিকটে যেন শোভা পায় বেল॥
গ্রহরূপ সভামাঝে শোভা পায় নল।
রামচন্দ্র কহে দুর্গা পদে দেহ স্থল॥

এই কাব্যের বর্ণনায় ছন্দের চাতুর্য্যও নিতান্ত অল্প নহে। পয়ার, ত্রিপদী, দীর্ঘত্রিপদী, লঘুত্রিপদী, ভঙ্গপয়ার, চৌপদী, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি অনেকগুলি ছন্দ এই কাব্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। বাহুল্যপ্রযুক্ত ছন্দের উদাহরণ উদ্ধৃত হইল না।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, এই কাব্যে দুইশত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালীসমাজের একটী সুন্দর চিত্র আছে। এখানে দময়ন্তীর বিবাহের বর্ণনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বর্ত্তমান সময়ের দুইশত বৎসর পূর্ব্বেও বর্ত্তমান সময়ের তুলনায় আচার ব্যবহারে বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না। আলিপনা দেওয়া, জলসাধা, গায়ে হলুদ, আইবড়ভাত, চেদিরাজ বসুর পূজা, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, সাতপাক প্রদক্ষিণ প্রভৃতি সমুদয়ই বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় ছিল। যথা,—

"প্রভাতে উঠিয়া, হুলাহুলী দিয়া,
চলিল সহিতে রাণী॥
হুলাহুলী মুখে রমণী কৌতুকে,
হেমঘট কার করে।
তৈল গুয়া পান, করিতে সম্মান,
চলে প্রতিবেশী ঘরে॥
আলিপনা দিয়ে, হেমঘট লয়ে,
জোড়-করে রাণী কয়।
কৃপা করি সবে, মোর বাড়ী যাবে,
দময়ন্তী-পরিণয়॥
গৃহস্থের নারী, ঘটে দিল বারি,
লৈল তৈল গুয়া পান।
হর্ষে রাজরাণী, লয়ে সয়া পানী,
নিজালয়ে পরে যান॥"

জলসাধার কথা শেষ হইল, বিবাহের বর্ণনার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে,—

"কদলীর তরু আরোপিল আগে আগে।
বসাইল দময়ন্তী তার মধ্যভাগে॥
সাতপাক প্রদক্ষিণ করি রামাগণে।
স্নান করাইল পরে মহাহর্ষ মনে॥
মঙ্গল আচার রমণীর কোলাকুলি।
বাজিছে শঙ্খের ধ্বনি জয় হুলাহুলি॥
দিবা অবসানকালে লগ্ন উপস্থিত।
নলের বরণ করে নৃপতি ত্বরিত॥
বরণ করিয়া নলে লৈল নিজালয়।
প্রাঙ্গণের মাঝে নল পীঠোপরি রয়॥
কুলবধূ কুলকন্যা লইয়া নৃপরাণী।
বরণ করিতে যায় করে হেম ঝারি॥
ধুতুরার ফলখণ্ডে প্রদীপ জ্বালিয়া।
কোন সহচরী লইল মাথায় তুলিয়া॥
গুড় চাল্‌ দিল অঙ্গে ঝালি ঝাড়া পাত।
বাঁধিল নলের মন দময়ন্তী সাথ॥
বরণ করিয়া নিছাইয়া ফেলে পান।
কোন কোন সহচরী পাক দিল কাণ॥
রাজার রমণী তবে খান মনকলা।
নলের নিকটে দময়ন্তী লয়ে গেলা॥
সাতপাক-ভ্রমি পরে নাড়িল ছায়নী।
বদল করিয়া মাল্য করিল ছাড়নি॥
বর কন্যা দোঁহাকে আনিল সভামাঝে।
রতির সহিত যেন অনঙ্গ বিরাজে॥
সতিল গঙ্গার জল কুশ দূর্ব্বা ফল।
আসন স্বাগত পাদ্য অর্ঘ্য আর জল॥
দধি দুগ্ধ মধুর সহিত মধুপর্ক।
বসন ভূষণ দিল যেন তুল্য অর্ক॥
অভয়ার প্রীতে রাজা কন্যা দান করে।
শেষে নল দময়ন্তী চাহে পরস্পরে॥"

বিবাহ শেষ হইল, এখন বাসর ঘরের রঙ্গরসের কথার দুই চারি পংক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। ইহাতে বিশেষ কোন অশ্লীলতা নাই, স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাসরঘর একপ্রকার নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছে। শিক্ষিতা বঙ্গমহিলারা এখন বড় আর বাসর ঘরে প্রবেশ করিতে চান না। অর্দ্ধ-শিক্ষিতারাও অনেক পরিমাণে গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। এখন অনেক প্রসিদ্ধ স্থান হইতেও নব-পরিণেতা অক্ষত কর্ণে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারেন। আজকাল যাহা কিছু আছে, ইহার পরবর্ত্তী কবিগণের এ বিষয়ে লেখনী পরিচালনের বোধ হয় কিছুমাত্র সুযোগ ঘটিবে না। যাহা হউক "মধুরেণ সমাপয়েৎ" এই বাক্যের অনুরোধে পূর্ব্বতন বাসরঘরের যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনামাত্র উদ্ধৃত হইল।

"অন্তঃপুরে নারীগণ করয়ে কৌতুক।
রাজার রমণী আসি দিলেন যৌতুক॥
ক্ষীরখণ্ড ভোজন করয়ে দোঁহে মিলি।
বাসরে বসিয়া বর কন্যা করে কেলি॥
কুসুম-শয্যায় নল জাগে বিভাবরী।
কৌতুক করিছে আসি যত সহচরী॥
আপনি রসিক নল তাহে রসকূপ।
রসিকা সহিত রসে ভাষে নলভূপ॥
রসিকা রমণী মেলি কেহ ধরে ঝুঁটি!
কোন কোন সহচরী দিল কাণমুটি॥
কর্পূর লবঙ্গ সহ তাম্বুল পুরিয়া।
কোন সখী নল করে দিলেক তুলিয়া॥
রমণী যুবতী যত রসিকা সাগর।
নল রাজা রসে ভাষে বিবাহ বাসর॥
এইরূপ নল রাজা জাগিল রজনী।
বিরচিল রামচন্দ্র ভাবিয়া ভবানী॥"

এইখানেই আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। *

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

* এই প্রবন্ধ যার মুদ্রিত হইয়াছে, এমন অবস্থায় মেট্রপলিটান্ কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই কবির সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, উহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—"প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হরিনাভি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা ৪ ভাই ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক ভাইয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এখনও জীবিত আছেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ৮৩ বৎসর হইবে। জয়ঘোষ নামে ইহাঁদের এক ধনাঢ্য শিষ্য ছিলেন, তাঁহার উৎসাহে রামচন্দ্র অনেক বাঙ্গালা কবিতাপুস্তক রচনা করেন। এই জয়ঘোষের পৌত্র এখন জমিদার। বাখরগঞ্জে তাঁহার জমিদারী আছে। জয়ঘোষের উৎসাহে যে সকল কবিতাগ্রন্থ রচিত হয়, তন্মধ্যে গৌরীবিলাস, দুর্গামঙ্গল (নলদময়ন্তী), মাধবমালতী (মালতীমাধব) প্রভৃতি কাব্য প্রধান। এই সকল কাব্য যাত্রারূপে গীত হইত এবং শিষ্য জয়ঘোষ সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। যদি কেহ তাঁহার গুরু রামচন্দ্রের কোন যাত্রা শুনিতে চাহিত, তাহা হইলে জয়ঘোষ তাহার বাটীতে আলোক প্রভৃতির সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। রামচন্দ্রও যাত্রা উপলক্ষে কাহারও নিকট হইতে কিছু লইতেন না। প্রায় ৫৫ বৎসর হইল, রামচন্দ্রের কাল হইয়াছে।" লোকের কথা ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া দ্বিজ রামচন্দ্র নামক প্রবন্ধে দুর্গামঙ্গল গ্রন্থের কালনির্ণয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্রপাঠে উহা ঠিক বলিয়া বোধ হইতেছে না, তবে পত্রের ১টী স্থলে সন্দেহ আছে। যাহা হউক, যদি এই পুস্তক মুদ্রিত হয়, তাহা হইলে উহার ভূমিকায় অনুসন্ধান করিয়া গ্রন্থকারের যথার্থ আবির্ভাব-কাল লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

জমিদার-নির্য্যাতন।

পূর্ব্বে একটী প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছিলাম, দিল্লীর একচ্ছত্র সম্রাট আকবর হইতে সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর পর্য্যন্ত সম্রাটগণের রাজত্বকালে বাঙ্গালার জমীদারেরা প্রবল-প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন; এমন কি এই সব জমীদারের মধ্যে কোন কোন সময় কোন কোন জমীদার বাঙ্গালার মস্‌নদের প্রতি হস্ত প্রসারণ করিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা বর্দ্ধমানের অন্যতম জমীদার শোভাসিংহের কার্য্য-কলাপ প্রকটিত করিয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা ইহারও উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালার কোন কোন প্রতাপশালী মুসলমান নবাব বাঙ্গালার শক্তিশালী ধনাঢ্য জমীদারদিগের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিতেন। এই অত্যাচার প্রকৃতই মুসলমান নবাববংশের ধ্বংসের অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অত্যাচারী নবাবদিগের অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া বঙ্গের অধিকাংশ জমীদার মুসলমান নবাবদিগের উচ্ছেদসাধনার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এ কথা অবশ্য অস্বাভাবিক ও অবিশ্বাস্য নহে। আমাদের মনে হয় যে, বঙ্গের নবাবেরা যদি অমানুষিক অত্যাচারে জমীদারদিগকে বিরক্ত করিয়া না রাখিতেন, তাহা হইলে নবাব সিরাজুদ্দৌলার অকালে এত নৃশংসভাবে অধঃপতন হইত না। যদি মুসলমান নবাবেরা প্রকৃত পক্ষে বঙ্গের জমীদারদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া রাখিতে পারিতেন, তাহা হইলে রাণী ভবানী, কি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং অন্যান্য বাঙ্গালার জমীদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সিরাজুদ্দৌলার বিপক্ষে কোনরূপ ষড়যন্ত্রের কল্পনা করিতেন কি না সন্দেহ। ইতিহাস পড়িয়া আমাদের যে ধারণা হইয়াছে, তাহাতে এইরূপ বুঝি, নবাব সিরাজুদ্দৌলা বঙ্গের জমীদারদিগের উপর অকারণ কোনরূপ অত্যাচার করিতেন না। তবে তাঁহার পূর্ব্বগত নবাবদিগের কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া বঙ্গের জমীদারগণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে জমীদারগণ অনেক সময় আপনাদের ন্যায্য কর প্রদান করিতেন না; পরন্তু মনে মনে মুসলমান নবাবদিগের ধ্বংশ-সাধনের জল্পনা-কল্পনা করিতেন। এমন কি, জমীদারগণ মুসলমান নবাবদিগের প্রতি এতদূর হতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহারা আলিবর্দ্দির ন্যায় সুশাসক, প্রজাপালক, বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ নবাবের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। এই কারণে নবাব সিরাজুদ্দৌলার প্রতিও তাঁহারা বিরূপ হইয়াছিলেন। নবাব সিরাজুদ্দৌলা জমীদারদিগকে উচ্ছৃঙ্খল ভাবিয়া কেবল তাঁহাদিগকে শাসনে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঢাকার কৃষ্ণদাস ন্যায্য কর প্রদান করেন নাই। নবাব সিরাজুদ্দৌলা তাঁহার নিকট হইতে ন্যায্য কর আদায় করিবার দাবী করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস এ দাবী গ্রাহ্য করেন নাই। অধিকন্তু তিনি নবাবের আদেশ উপেক্ষা করিয়াছিলেন। তাই নবাব তাঁহাকে বন্দী করিবার আদেশ করেন। কৃষ্ণদাস কলিকাতায় ইংরেজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সূত্রে ইংরেজের সহিত সিরাজুদ্দৌলার কলহ হইয়াছিল। আর সেই কলহসূত্রে সিরাজুদ্দৌলার অধঃপতন হয়।

জমীদারেরা পূর্ব্ব হইতেই মুসলমান নবাবদিগের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। এদিকে তাঁহারা বুঝিলেন যে, নবাব সিরাজুদ্দৌলা তাঁহাদিগের শক্তিবিস্তার সহ্য করিতে পারেন না; পরন্তু তাঁহাদিগকে শাসনে দমনে রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। এইজন্য তাঁহারা সিরাজুদ্দৌলার উচ্ছেদ কল্পনা করিতে লাগিলেন। সুযোগও ঘটিল। ইংরেজের সহিত নবাবের বিবাদ ঘটিল। এই অবসরে জমীদারদিগের ষড়যন্ত্র হইল। ষড়যন্ত্রের ফল আর বলিতে হইবে না। এখন মূল কথা হইতেছে, বাঙ্গালার মুসলমান নবাবদিগের অধঃপতনের অন্যতম কারণ, বাঙ্গালী জমীদারদিগের প্রতি মুসলমান নবাবদিগের অত্যাচার। নবাব মুর্সিদকুলি খাঁর সময় এই অত্যাচার চরম সীমায় উঠিয়াছিল। তেমন বীভৎস বিভীষণ অত্যাচারের কথা ইতিহাসে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। বিখ্যাত ইতিহাস-লেখক ষ্টুয়ার্ট সাহেবের বাঙ্গালা ইতিহাসে এই অত্যাচার-কাহিনী বিবৃত আছে। ষ্টুয়ার্ট সাহেব মুসলমান ইতিহাস হইতে এই অত্যাচারবিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা তাহার সারাংশ প্রকাশ করিলাম।

দ্বিতীয় জর্জ্জ যে সময় ইংলণ্ডের রাজা এবং আরাঙ্গীব যে সময় ভারতের সম্রাট ছিলেন, সেই সময়ে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে মুর্সিদকুলি খাঁ বঙ্গের মস্‌নদে অধিষ্ঠিত হন। আরাঙ্গীবের সময়ে ইনি শেষ নবাব। মুর্সিদকুলি খাঁ বহুগুণসম্পন্ন নবাব ছিলেন। দিল্লীর সম্রাটের প্রতি তিনি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। এমন কি, সম্রাটের প্রতি ভক্তি জন্য তিনি কখনও রাজকীয় নৌকায় উপবেশন করিতেন না। বর্ষাকালে সাধারণ্যে প্রদর্শিত হইবার জন্য, ঢাকা হইতে মুরশিদাবাদে সম্রাটের নৌকাসমূহ যাইলে, মুর্সিদকুলী খাঁ স্বয়ং সেই সব নৌকা দেখিতে যাইতেন; দেখিয়া তিনি নমস্কার করিতেন এবং যথাযোগ্য নজর দিতেন। পরে সম্মান-প্রদর্শনার্থ নৌকায় সম্রাটের উপবেশনাসনে চুম্বন করিতেন।

মুর্সিদকুলি খাঁ স্বয়ং পাণ্ডিত ছিলেন এবং পণ্ডিত ও পবিত্রচেতা সাধুগণের সম্মান করিতেন। তিনি স্বয়ং সুন্দর লিখিতে পারিতেন। তাঁহার সুন্দর হস্তাক্ষরের বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। তিনি অঙ্কবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিয়া সকল হিসাবপত্র স্বয়ং দেখিতেন।

মুর্সিদকুলি খাঁ ন্যায়পর ও সুবিচারক ছিলেন। তাঁহার নিকট ধনী দরিদ্র, মূর্খ পণ্ডিত, শত্রু মিত্র, আত্মীয় পর সকলেই সুবিচার পাইত। এমন কি, তাঁহার পুত্র আইন মানিয়া চলেন নাই বলিয়া, তিনি তাঁহার প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন। কেহ কর্ম্মচারীর নিকট সুবিচার না পাইয়া তাঁহার নিকট বিচার প্রার্থনা করিলে, তিনি স্বয়ং তাহার বিচার করিতেন। কোন কর্ম্মচারী কাহার প্রতি অত্যাচার করিলে তিনি তাহার দণ্ড দিতেন। তাঁহার শাসনের প্রারম্ভকালে হুগলীর কোতয়াল একজন মোগলের যুবতী কন্যাকে বলপূর্ব্বক লইয়া আসিয়াছিলেন। হুগলীর ফৌজদার আসন্-উল্লা এ ব্যাপার অবগত হইয়াও ইহার কোন প্রতিবিধান করেন নাই। যুবতী কন্যার পিতা নবাব মুর্সিদকুলি খাঁর নিকট অভিযোগ করেন। অনুরক্ত ভক্ত মুসলমান নবাব মুর্সিদকুলি খাঁ কোরাণের নির্দ্দেশানুসারে যুবতীর হরণকারী কোতয়ালকে পাথর ছুড়িয়া মারিয়া ফেলিবার আদেশ করেন। হুগলীর ফৌজদার আসন্-উল্লা কোতয়ালের জীবনরক্ষার জন্য নবাবের নিকট অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কোন ফলই হয় নাই।

দানে মুর্সিদকুলি খাঁ মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি নিত্য বহুসংখ্যক লোককে আহার করাইতেন। কেবল তাহাই নহে; তিনি ময়দানের পশু এবং আকাশের পক্ষীদিগেরও আহার যোগাইতেন। দেশে যাহাতে দুর্ভিক্ষ না হইতে পারে, তাহার জন্য তিনি প্রাণপণে প্রতিষেধ ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন। তাঁহার এই হুকুম ছিল, কেহ যেন ফসল একচেটিয়া করিয়া না রাখিতে পারে। বাজারে ফসলের দর কিরূপ, ইহা তিনি গোপনে সন্ধান লইতেন। যদি তিনি দেখিতেন, কেহ কোন অন্যায়াচরণ করিতেছে, তা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে শাস্তি প্রদান করিতেন। যদি কখনও সহরে কিম্বা নগরে ফসলের আমদানী কম হইত, তাহা হইলে তিনি গ্রামে লোক পাঠাইয়া গৃহস্থের গোলা হইতে ফসল আনাইতেন এবং সেই ফসল বাজারে বিক্রয় করাইতেন। মুর্সিদাবাদে তখন টাকায় চারি মন করিয়া চাউল বিক্রয় হইত। অন্যান্য দ্রব্যাদির ঐ হিসাবে দর ছিল। তিনি শস্যের রপ্তানী করিতে দিতেন না। হুগলীর ফৌজদারের প্রতি তাঁহার স্পষ্ট আদেশ ছিল যে, ইউরোপীয় কিম্বা অন্য কোন বিদেশীয় বণিক জাহাজে করিয়া আরোহীদিগের আহারীয় ব্যতীত বেশী শস্য লইয়া যাইতে পারিবে না। বিদেশীয় বণিকদিগের শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবার কোন প্রকার ক্ষমতা ছিল না।

মুর্সিদকুলি খাঁ সচ্চরিত্র ছিলেন। তিনি কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করিতেন না। তাঁহার বাই

খেমটা লইয়া আমোদ করিবার প্রবৃত্তি মাত্র ছিল না। তাঁহার একটী মাত্র পরিণীতা ভার্য্যা ছিল।

মুর্সিদকুলি খাঁ বড় স্বধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি নিত্য নিয়মিতরূপ ভগবানের উপাসনায় নিযুক্ত থাকিতেন; এবং প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত কোরাণ নকল করিতেন। প্রতি বৎসর তিনি নিজ-হস্ত-লিখিত কোরাণ সহ বহুমূল্য দ্রব্যাদি মক্কা, মেদিনা ও অন্যান্য স্থানে পাঠাইতেন। তিনি কোরাণ পড়িবার জন্য, মালা জপিবার জন্য এবং অন্যান্য ধর্ম্মকার্য্যের জন্য, দুই সহস্র লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহম্মদের জন্ম এবং মৃত্যু মাসের প্রথম বার দিন তিনি দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও ধনী সকল অবস্থার লোককে আহার করাইতেন। এই কয়দিন রাত্রিকালে মাহি নগর হইতে লালবাগ পর্য্যন্ত প্রায় দেড় ক্রোশের উপর পথ, আলোকমালায় বিভূষিত হইত। কোন আলোকে কোরাণের গাথা লিখিত হইত; এবং কোন আলোকে মসজিদাকারে কোন আলোক বৃক্ষাকারে ও কোন আলোক অন্য কোন আকারে প্রদর্শিত হইত। এই উপলক্ষে প্রায় এক লক্ষ লোক নিযুক্ত থাকিত। একটী কামানের আওয়াজ হইবামাত্র, মুহূর্ত্তে সমস্ত আলোক একেবারে দপ্ করিয়া জলিয়া উঠিত।

মুর্সিদকুলি খাঁ গুণী লোকের আদর করিতেন। হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, কিম্বা যে কোন জাতি হউক, যাহাকে গুণশালী দেখিতেন, তিনি তাঁহাকেই রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। হিন্দুরা বড়ই কার্য্যদক্ষ, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি হিন্দুকে প্রধান প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পছন্দ করিতেন। ভূপৎরায় নামক একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার কোষাধ্যক্ষপদে ও কিশোর রায় নামক অপর একজন ব্রাহ্মণ খাস-মুন্সীপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি, যে যেমন লোক, তাহার সেইরূপ মান-মর্য্যাদা রাখিতেন। বংশ-মর্য্যাদায় ও গুণগরিমায় বড়, এমন লোকদিগকে তিনি সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য দিতেন ও উৎসাহ প্রদান করিতেন।

এ হেন বহুগুণসম্পন্ন মুর্সিদকুলি খাঁ বঙ্গীয় জমিদারের প্রতি অত্যাচার করিতেন। অবশ্য তিনি অনেক সময় নিজে অত্যাচার করিতেন না বটে; কিন্তু তাঁহার কর্ম্মচারীরা যে অত্যাচার করিত, তাহা তাঁহার অনুমোদিত হইত। অবশ্য তাঁহার জমিদারদিগকে শাসন করিবার আবশ্যকতা ঘটিয়াছিল। কেন না, সে সময়ে বাঙ্গালার নবাবদিগের উচ্ছৃঙ্খল শাসনের সুযোগে জমীদারগণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিলেন। এমন কি, অনেকে অনেক সময় ন্যায্য কর প্রদান করিতেন না। ইহাঁদিগকে অবশ্য শাসন করা কর্ত্তব্য; কিন্তু ইহাঁদিগের প্রতি যেরূপ অত্যাচার হইত, তাহা সুশাসক প্রজাপালক ন্যায়পর ধর্ম্মপরায়ণ নবাব-চরিত্রের অনুচিত।

মুর্সিদকুাল খাঁ বঙ্গের মসনদে অধিষ্ঠিত হইয়া জমীদার-নির্য্যাতনে প্রবৃত্ত হন। জমীদারগণ প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া, সেই কর হইতে ন্যায্য দেয় রাজস্ব সম্রাটের প্রতিনিধি বঙ্গের শাসনকর্ত্তাকে প্রদান করিতেন। মুর্সিদকুলি খাঁ তাঁহাদিগের এইরূপ করসংগ্রহের ক্ষমতা অপহরণ করেন। নিজে কর আদায় করিলে, রাজস্ব বেশী হইবে ইহা বিবেচনা করিয়া, তিনি নিজের লোক দ্বারা কর আদায় করিতে কৃতসংকল্প হন। কি দরের কোন্ জমি, ইহা তদন্ত করিবার জন্য, তিনি বড় বড় জমিদারদিগকে কারাবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং কার্য্যদক্ষ আমিনদিগের হস্তে কর-সংগ্রহের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত আমিন প্রজার নিকট হইতে কর আদায় করিয়া রাজ-সরকারে জমা দিত। মুর্সিদকুলি খাঁ সমস্ত জমি পুনরায় জরিপ করিবার আদেশ করিয়াছিলেন। কোন্ গ্রামে কত পতিত ও অনুর্ব্বরা জমি ছিল, তাহা তিনি ঠিক করিয়া লইয়া অধিকাংশ আবাদ করিয়া লইয়াছিলেন। যে সকল আমিন কর সংগ্রহ করিত, তাহারা ঐ সকল অনুর্ব্বরা ও পতিত জমির আবাদ করিবার জন্য কৃষকদিগকে সরকার হইতে দান দিত। কৃষকেরা সেই টাকা হইতে হাল, গরু, বীজ প্রভৃতি ক্রয় করিত এবং ফসল হইলে তাঁহারা তাহার অংশ পাইত। বঙ্গের জমীদারগণ পথে দাঁড়াইলেন। কর-সংগ্রহের ভার যখন তাহাদিগের হস্তচ্যুত হইল, তখন আর তাহাদিগের কি রহিল? ক্রমে ক্রমে একে একে সকল জমীদারের শক্তি প্রতিপত্তি সম্পত্তি বৃত্তি লোপ পাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে প্রায় সকল জমীদারের শক্তি-দীপশিখা নির্ব্বাপিত হইল। মুর্সিদকুলি খাঁ জমীদারদিগের হস্ত হইতে সমস্ত শক্তি সম্পূর্ণরূপে কাড়িয়া লইয়া কেবল তাঁহাদিগের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য জমী বা মাসিক বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থাকেই "নন-কর" বলে। জমীদারেরা এতদ্ব্যতীত বনে কাষ্ঠ কাটিবার ও শীকার করিবার এবং নদী ও বিলে মৎস্য ধরিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। এই অধিকারের নাম "বনকর" ও "জলকর"।

দুইজন মাত্র জমীদার মুর্সিদকুলি খাঁর এই কঠোর ব্যবস্থা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। একজন বীরভূম ও অপর বিষ্ণুপুরের জমীদার। বীরভূমের জমিদার আদদ্ উল্লা অতি ধার্ম্মিক ও দয়াবান জমীদার ছিলেন। ইহাঁর উপর কঠোর শাসন করিলে পাছে মুসলমান সমাজে দুর্নাম হয়, এই আশঙ্কায় মুর্সিদকুলি খাঁ তাঁহাকে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরের জমিদার কেবল আপন জমিদারির গুণে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। তাঁহার জমিদারী বনজঙ্গল ও পতিত জমিতে পরিপূর্ণ ছিল। তথায় কর-সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে গেলে অনেক ব্যয় করিতে হয়; অথচ এই ব্যয় করিয়াও বিশেষ লাভ নাই, ইহাই ভাবিয়া মুর্সিদকুলি খাঁ বিষ্ণুপুরের জমীদারকে অব্যাহত দিয়াছিলেন। অব্যাহতি পাউন; কিন্তু উভয় বিষ্ণুপুর ও বীরভূমের জমীদার নিয়মিতরূপ কর পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ত্রিপুরা, কুচবিহার ও আসামের রাজারা কখনও কোন মুসলমান নবাবকর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন নাই। এজন্য তাঁহারা একাল পর্য্যন্ত স্বাধীনতার ছত্র রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন এবং নিজের নামে মুদ্রাঙ্কণ করিতেন; কিন্তু তাঁহারাও মুর্সিদকুলি খাঁর শক্তি ও ক্ষমতায় ভীত হইয়া বশ্যতা স্বীকারস্বরূপ মুর্সিদকুলি খাঁকে হস্তী, হস্তিদন্ত, হস্তীদন্তনির্ম্মিত দ্রব্য, মৃগনাভি এবং অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্যাদি উপহার পাঠাইয়াছিলেন।

যে যেমন প্রকৃতির লোক, তাহার সঙ্গোপাঙ্গও প্রায় সেইরূপই হইয়া থাকে। মুর্সিদকুলি খাঁ জমীদারদের উপর যেরূপ অত্যাচার করিতেন, তাঁহার কর্ম্মচারিগণ তাঁহা অপেক্ষা শতগুণে ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিত। নাজির আহম্মদ নামক এক ব্যক্তির উপর করসংগ্রহের ভার অর্পিত হইয়াছিল। এই নাজির আহম্মদ পূর্ব্বে একজন সামান্য সৈনিকের কার্য্য করিত। তাহার সঙ্গে করসংগ্রহের জন্য দুই হাজার অশ্বারোহী ও চারি হাজার পদাতিক সৈন্য থাকিত। ক্রমে তাহার ক্ষমতা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, তাহার নাম শুনিলে জমীদারগণ থর থর কম্পান্বিত হইতেন। যিনি তাহার হুকুম না শুনিতেন, তাঁহার রক্ষা থাকিত না। নাজির আহম্মদ মুহূর্ত্তে তাঁহার জমীদারি বাজে আপ্ত করিয়া ফেলিত। যিনি যেখানে যতদূরে পলায়ন করুন না, আহম্মদ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া আসিত।

কোন জমিদার বা ধনাঢ্য হিন্দু পাল্কী চড়িয়া যাইতে পারিতেন না। মুর্সিদকুলি খাঁর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে জমীদার ও ধনাঢ্য হিন্দুরা এমনই ম্রিয়মাণ হইয়াছিল যে, কোথাও যাইবার আবশ্যক হইলে, ডুলি ভিন্ন আর অন্য কোন যানে যাইতে পারিতেন না!

যদি কোন জমীদার রাজস্ব দিতে অবহেলা করিতেন, তাহা হইলে মুর্সিদকুলি খাঁ সেই জমীদার কিংবা তাঁহার মোক্তারকে বন্দী করিয়া আনিতেন। যে পর্য্যন্ত রাজস্ব আদায় না হইত, সে পর্য্যন্ত জমীদার বা তাঁহার মোক্তার অন্নজল পাইতেন না। একজন প্রহরী সদাসর্ব্বদা চৌকি দিত। প্রহরীরা শুষ্ক হইয়া কার্য্যে অবহেলা করিতেছে কিনা, জানিবার জন্য গোয়েন্দা নিযুক্ত হইত।

কোন জেলায় খাজনা বাকি পড়িলে, নাজির আহম্মদ সেই জেলার জমীদারকে বন্দী করিয়া রাখিয়া তাহাকে বিবিমতে কষ্ট দিত। কখনও বা পা বাঁধিয়া ঝুঁলাইয়া রাখিত, কখন বা বাঁশ দিয়া ডলিত, কখনও বা গ্রীষ্মের কাটফাটা রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া রাখিত; কখন বা শীত কালে উলঙ্গ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ঠাণ্ডা জল ছিটাইয়া দিত।

এ বা কি অত্যাচার, আর নাজির আহম্মদ বা কি অত্যাচারী? অত্যাচার দেখুন! অত্যাচারী দেখুন!

রেজা খাঁ নবাব মুর্সিদকুলি খাঁর নাত-জামাই। তিনি বাঙ্গালার নায়েব দাওয়ান হইয়াছিলেন। তিনি অনাদায়ী খাজনা আদায়ের কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, শুনুন।

একটী পুকুর কাটিয়া ইনি তাহা পুঁতিগন্ধময় আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতেন। সেই আবর্জ্জনার গন্ধে প্রাণীমাত্রেরই নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইত। হিন্দুর প্রতি ঘৃণা দেখাইবার জন্য, হিন্দুকে অবজ্ঞা করিবার জন্য, হিন্দুকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য, হিন্দুকে বিদ্রূপ করিবার জন্যই এই পুষ্করিণীর নাম রাখা হইয়াছিল, "বৈকুণ্ঠ"। জমীদারদিগকে নানাবিধ কষ্ট দিয়াও যদি কর আদায় করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে রেজা খাঁ এই পুষ্করিণীতে তাঁহাদিগকে নিমগ্ন করিতেন; এবং তাঁহাদের হাত বাঁধিয়া সেই সমস্ত পুঁতিগন্ধময় আবর্জ্জনার মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেন। কখন কখনও বা তাঁহাদিগকে ঢিলা ইজের পরাইয়া তাহার ভিতর জীবন্ত বিড়াল পুরিয়া রাখা হইত। বিড়ালগুলি সেই ইজেরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিবার জন্য আঁচড়-কামড় করিত। সে যে কি যন্ত্রণা, অনুভব করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। মুর্সিদকুলি খাঁর রাজত্বে জমীদারদিগের জীবন প্রকৃতই যন্ত্রণাময় হইয়াছিল! সে যন্ত্রণার তুলনা নাই। সে যন্ত্রণার উপমা নাই। এমন অত্যাচারের কথা আর কখন কি শুনিয়াছ?

মুর্সিদকুলি খাঁ এইরূপে জমীদারদিগকে পীড়ন করিয়া রাজ্যের রাজস্ব বাড়াইয়াছিলেন বটে; অধিকন্তু তিনি দিল্লীর দরবারে নিয়মিতরূপে রাজস্ব প্রেরণ করিতেন বটে; কিন্তু তাঁহার এ অত্যাচারকাহিনী, তাঁহার এ নৃশংস ব্যবহার, জগৎময় বিঘোষিত হইয়াছিল। তখনকার লোক মুর্সিদকুলি খাঁকে নর-রাক্ষস মনে করিয়া, তাঁহার নামমাত্রে শিহরিয়া উঠিত। তাঁহার এত গুণ এই এক কলঙ্কসাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল। তিনি এই অত্যাচারে বঙ্গে মুসলমান নবাবদিগের শাসনমূলে বিষবীজ বপন করিয়াছিলেন। এই বিষবীজ ক্রমে বৃক্ষে পরিণত হইয়া বঙ্গে মুসলমান রাজত্বের ধ্বংস-সাধন করিয়াছিল।

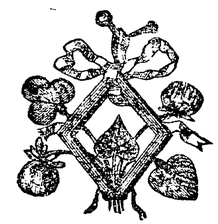

৺ কবি রসসাগরের জীবন-চরিত।

হুগলীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত শ্যামাধব রায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। মূল্য ॥০ আট আনা।

বহুদর্শী বিজ্ঞ বিচারক শ্যামাধব রায় রাজকার্য্যে গাঢ় পরিশ্রমের পর, যে একটু বিশ্রাম পান, সেই সময়টুকু তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যের আলোচনায় অতিবাহিত করেন,—ইহা আমাদের আহ্লাদের বিষয়। সেই আলোচনার ফল,—রসসাগরের জীবন-চরিত। উত্তম সংগ্রহ হইয়াছে। আমরা কয়েক স্থান উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে উপহার দিলাম।

"আনুমানিক প্রায় ত্রিশ বৎসর গত হইল, কৃষ্ণনগরে নবদ্বীপাধিপতি মহামতি মৃত গিরীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের সময়ে কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ি নামক একজন বারেন্দ্রশ্রেণীয় কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইনি জেলা নবদ্বীপের অন্তঃপাতী বাগয়ানের সান্নিধ্য বাঁড়িবাঁকা গ্রামে বাঙ্গালা ১১৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ভাদুড়ি মহাশয় কৃষ্ণনগরে বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই সূত্রেই তথায় বাস। তিনি অতিশয় সুচতুর, সুরসিক ও উপস্থিত বক্তা ছিলেন এবং তজ্জন্যই মহারাজের নিকট হইতে জগদ্বিখ্যাত "রসসাগর" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। কবিতা রচনা বিষয়ে ইহাঁর এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। যে ব্যক্তি যে সময়ে যে কোন প্রস্তাব করিতেন, ইনি তৎক্ষণাৎ কবিতা দ্বারা তাহা পূরণ করিয়া দিতেন।

তিনি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পারস্য ও উর্দ্দুতে ব্যুৎপত্তি ছিল এবং হিন্দি ও সংস্কৃততে তিনি পদ্য রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার এই রচনা শক্তিকে অসাধারণ শক্তি বলিতে হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি বাঙ্গালা ১২৫১ সালে ৫৩ বৎসর বয়ঃক্রমে বিগত-জীবন হয়েন। তিনি যে সকল কবিতা রচনা করিতেন, তাহা প্রণালীমত লিখিয়া রাখিতেন না, এজন্য কৃষ্ণনগর-নিবাসী লোকদিগের যাহা অভ্যস্ত ছিল, তাহাই নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করা হইল।

একদা শ্রীবন নামক কোন অট্টালিকার উপরে মহারাজা বাহাদুর চন্দ্রগ্রহণ দেখিবার নিমিত্ত রসসাগর মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া উঠিয়াছিলেন। সে দিবস চন্দ্রের সর্ব্বগ্রাস হয় নাই। তাহা দেখিয়া মহারাজা রসসাগরকে "খেতে খেতে খেল না" এই প্রশ্ন করায় রসসাগর তৎক্ষণাৎ নিম্নলিখিত উত্তর দিয়াছিলেন ঃ—

১ম পূরণ।

খেদে কহে বিরহিনী, মণিহারা যেন ফণী,
অভাগীর পক্ষে হিত, কেহত করিলে না।
অবলার ভাগ্যফলে, পশুপতির কোপানলে,
মদনেরে এককালে, দহিয়ে দহিলে না॥
সেতুবন্ধে নানা গিরি, উপাড়িয়া বাঁধে বারি,
হনুমান বলবান্, মলয়া ভাঙ্গিলে না।
হেদে বেটা চণ্ডালিয়ে, পূর্ণশশী মুখে পেয়ে,
গ্রহণেতে গ্রাসিয়ে, খেতে খেতে খেল না।

কোন সময় রসসাগর মহাশয় কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিতেছিলেন, এমন সময় ডাকহরকরা ঘাটে আসিয়া মুকুন্দ নামে ঘাটের মাঝিকে তাহার নাম ধরিয়া ডাকায় উক্ত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এক জন হঠাৎ রসসাগরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কবিয়াছিলেন, "মুকুন্দ মুরারে।" রসসাগর তাঁহার প্রশ্ন শ্রবণানন্তর তদ্দণ্ডে নিম্নলিখিত উত্তর করিয়াছিলেন ;—

২য় পূরণ।

পাপের পুলিন্দ বয়ে ভগ্ন হন পারে।
নিয়মিত ঘণ্টা মধ্যে যেতে হবে পারে।
নায়েতে নাহিক মাঝি ডাক রসনারে।
গোপাল গোবিন্দ কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারে॥

কোন সময় রসসাগর মহাশয় বারাণসী তীর্থ দর্শনে গমন করেন। মহারাজ গিরীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের খুড়া দিগ্বিজয়চন্দ্র রায় মহাশয় তৎকালে কাশীবাস করিতেন। রসসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি "ছি! ছি! অমৃতপান করেছিলাম কেনে?" এই প্রশ্ন করেন। রসসাগর মহাশয় অবিলম্বে নিম্নলিখিত উত্তর দেন ;—

৩য় পূরণ।

জলে কিংবা স্থলে মৃত্যু জ্ঞানে কি অজ্ঞানে।
মহামন্ত্র মহেশ আপনি দেন কানে॥
মোলে জীব হয় শিব যৎক্ষণে তৎক্ষণে।
দেবগণের আর্ত্তনাদ আত্ম-অভিমানে॥
ক্ষিতি মুক্তি বারাণসী মহিমা কে জানে।
অমর মরিতে চাহে আসি কাশীস্থানে॥
মলে হতাম দেবের দেব আনন্দ-কাননে।
ছি! ছি! অমৃতপান করেছিলাম কেনে?

মহারাজা সতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর ভূমিষ্ঠ হইলে, তাঁহার পিতামহ গিরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর পৌত্রের জন্মসংবাদে পরমানন্দিত হইয়া রসসাগরকে "মহি দূর কর্ হাম্ নৃত্য করি" এই প্রশ্ন করায় তিনি নিম্নলিখিত উত্তর দেন ;—

৪র্থ পূরণ।

রাজধানী নৃপনন্দন নন্দন চন্দ্রবংশ অবতার হরি।
চৌদ্দ ভুবন নাচত গাওত চৌখট যোগিনী তান ধরি॥
অপ্সর কিন্নর দশদিগধীশ্বর তরতর শ্রীল গিরীশ পুরী।
এতনক বোলে অহিরাজ কহে মহি দূর কর্ হাম্ নৃত্য করি॥"

জন্মভূমি।

অষ্টম ভাগ। } বৈশাখ। ১৩০৫। { ৫ম সংখ্যা।

মন্ত্রের সাধন।

নূতন উপন্যাস। শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। মূল্য ৸০ বারো আনা। ২৮৮ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

ভারতবর্ষে দুই জন প্রতাপ ছিলেন। একজন বঙ্গভূমে, সাগরতটে, সুন্দরবনে স্বরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ; অন্যজন রাজপুতানায়—মিবাররাজ্যে আপন বাহুবলে বীরত্বের বৈজয়ন্তী উড়াইয়াছিলেন। "বঙ্গের শেষবীর" নাম দিয়া যে উপন্যাস হারাণ বাবু কর্ত্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, প্রথমোক্ত প্রতাপকে অবলম্বন করিয়া সেই উপন্যাস লিখিত ; "মন্ত্রের সাধন" উপন্যাসে দ্বিতীয় প্রতাপের জীবনী অঙ্কিত। হারাণ বাবুর "মন্ত্রের সাধন" শুধু উপন্যাস নহে,—ইহা ইতিহাস, জীবনচরিত এবং কাব্য। এ গ্রন্থকে বঙ্গভাষায় অদ্বিতীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গ্রন্থকারের আন্তরিকতা, উচ্ছ্বাস, আবেগ, রচনা-নৈপুণ্য,—এই "মন্ত্রের সাধন" গ্রন্থে পূর্ণমাত্রায় পরিদৃষ্ট হয়। যাঁহারা শক্তি-মন্ত্রের উপাসক, তাঁহাদের পক্ষে এই "মন্ত্রের সাধন" গ্রন্থ,—নির্ব্বাণতন্ত্রের স্বরূপ। সাধক মাত্রেরই এই "মন্ত্রের সাধন" গ্রন্থ ক্রয় করা উচিত। গ্রন্থের বিষয় আর অধিক বলিব না। আমরা দুইটী স্থল উদ্ধৃত করিলাম,—রচনার সৌন্দর্য্য এবং ভাবের সৌন্দর্য্য,—পাঠক স্বয়ং পাঠ করিয়া বিচার করুন। যদি ভালো লাগে, তবে "মন্ত্রের সাধন" গ্রন্থকে পূজা করিয়া মাথায় রাখুন ; আর যদি মন্দ লাগে, তবে পাঠ এইখানে বন্ধ করুন,—আর অধিক অগ্রসর হইবেন না। এবার বিচার-ভার আপনাদিগের উপর অর্পণ করিলাম।

প্রথম,—"নরোজা" মেলায় দিল্লীশ্বরের দুর্নীতিবিষয়ক একটী চিত্র দেখুন ;—

* * * *

"বাহকগণ শিবিকা লইয়া দ্রুতপদে চলিল। তাহারা কা'র সঙ্কেতমত, রাজপথে না গিয়া, একটা সরু গলি ধরিল। তার পর আর একটা সরু গলি,—তার পর সুড়ঙ্গের মত একটা পথ। কিরণ শিবিকা-দ্বার ঈষৎ উন্মোচন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। মনে মনে তাঁহার বড় ভয় হইল। শিবিকা ক্রমে নিম্নমুখে প্রবেশ করিল, বাহকগণের গতি মন্দীভূত হইল,—কিরণ তাহা বুঝিলেন। চীৎকার করিয়া বা কাঁদিয়া এখন কোন ফল নাই, তাহাও তিনি বুঝিলেন। শাণিত ছুরিকাখানি দৃঢ়রূপে কটিতটে সংবদ্ধ করিলেন। মন প্রাণ দৃঢ় করিলেন। তাঁহার কপোলে স্বেদবিন্দু দেখা দিল। একবার ভাবিলেন, "মরিব কি?" আবার ভাবিলেন, "না, আত্মহত্যায় কাহারও অধিকার নাই।—তাহা হইলে স্বামীর নিকট অবিশ্বাসিনী হইব,—পৃথ্বীরাজও তাহা হইলে দুর্ব্বহ দেহভার লইয়া অধিক দিন পৃথিবীতে থাকিবেন না—না, আমার মরা হইবে না। মৃত্যু ত আছেই,—দেখি না, পরিণাম কি হয়?"

পরক্ষণে ভাবিলেন, "বাদসাহ-কন্যা ত আরও অধিকতর অপমান করিবার জন্য, আমার সহিত এরূপ চাতুরী করিতেছে না? তাহারা সব পারে। আমাকে ত জোর করিয়া যবন-অন্ন খাওয়াইবে না? অথবা—"

ভাবিতে ভাবিতে কিরণের মাথা ঘুরিয়া আসিল, তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। পরক্ষণে আবার বুকে বল পাইলেন। ভাবিলেন, "না, আমি বৃথা সন্দেহে অভিভূত হইতেছি! এরূপ ভাবনায়ও পাপ আছে। কেন, কি পাপে আমার সর্ব্বনাশ হইবে? মা জগজ্জননী আমার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। এই যে মা সতী-শিরোমণি, তোমায় দেখিতেছি! মা, মা, ভীত তনয়াকে অভয় দাও।

"আর যদি তাই হয়,—যদি সেই——ওঃ! সেই পাপ কাহিনী মুখে আনিতেও বাধিয়া যায়!—কিন্তু তাহাতেই বা আমার এত আশঙ্কা কেন? হস্তে এই গরলাধার অঙ্গুরী রহিয়াছে,—কটিতটে এই তীক্ষ্ণ ছুরিকা রহিয়াছে,—

ইহাতেও কি রাজপুত-রমণী আপন অমূল্যনিধি রক্ষা করিতে পারিবে না?"

বাহকগণ ক্রমে সেই সুড়ঙ্গময় পথ ত্যাগ করিয়া, একটি কক্ষ সম্মুখে আসিল। সেইখানে আসিয়া তাহারা শিবিকা নামাইল। সেই স্থানের চারিদিক উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা। কোন দিকে পথ নাই, লোকালয় নাই, জনপ্রাণী নাই। এবার কিরণ কিছু ক্রোধভরে, বিরক্তিসহকারে জিজ্ঞাসিলেন, "আমাকে এ কোথায় আনিলে? শীঘ্র আমাকে গৃহে লইয়া চল।"

সর্দ্দার-বাহক বলিল, "মায়ি! এই ঘরে যান,—এখানে আপনার স্বামী আছেন,—তিনি আপনাকে লইয়া যাইবেন।—তাঁহার আদেশমতই আমরা আপনাকে এখানে আনিয়াছি।"

নিরুপায় কিরণ তখন সাহসে ভর করিয়া, সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। অমনি ক্ষিপ্রগতিতে বাহির হইতে সেই দ্বার রুদ্ধ হইল।—অর্গল আঁটিয়া দিয়া, কে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। এতক্ষণে কিরণ বুঝিলেন, কে পথ ভুলাইয়া, তাঁহাকে এই বিষম বিপথে আনিয়াছে।

গৃহ অন্ধকার। উচ্চে দুই পার্শ্বে দুইটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ আছে বটে, কিন্তু সন্ধ্যা আগমনের সহিত, গবাক্ষের সেই ক্ষীণালোকও অন্তর্হিত হইয়াছে। যে দ্বার দিয়া কিরণ গৃহপ্রবেশ করিয়াছিলেন, প্রথমতঃ সেই দ্বার খুলিতে বা ভাঙ্গিতে অনেক চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা,—তাহাতে দ্বার ভাঙ্গিল না, কিংবা খুলিলও না—দুই চারিটা দুম্-দাম্ শব্দ হইল মাত্র।

রাজপুত-সতী তখন অসীম সাহসে বুক বাঁধিলেন। একান্তমনে পতিপদ ধ্যান করিলেন। জগজ্জননীকে মর্ম্মব্যথা জানাইলেন। শেষে কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "মাগো, তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!"

"কি ইচ্ছা পূর্ণ হইবে সুন্দরি!"—

কম্পিত কণ্ঠে, ভগ্নস্বরে,—কে, এই কথা বলিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দিল।

সেই কম্পিতকণ্ঠ ও ভগ্নস্বর,—সেই নির্জ্জন গৃহ প্রতিধ্বনিত করিল। দেওয়ালে দেওয়ালে তাহার রেশ আসিল। অতৃপ্ত কামনা ও ইন্দ্রিয়-লালসা যেন হো হো হাসিয়া উঠিল। কিরণের সর্ব্বশরীর তাহাতে রোমাঞ্চিত হইল। কিন্তু তিনি ভীত হইলেন না। বরং দ্বিগুণ সাহসে তাহার উত্তর দিলেন,—

"যে দুর্ম্মতি মন্দ অভিপ্রায়ে এই গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহার মস্তকে বজ্রাঘাত হোক্।"

সহস্র আঁখি বিস্তার করিয়া, সতী নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া আগুন জ্বলিতে লাগিল। সুকোমল দেহ দৃঢ় ও স্ফীত হইয়া উঠিল।

এবার সেই স্বর আরও নিকটবর্ত্তী হইল। আবেগভরে, কম্পিতকণ্ঠে পুনরায় কে বলিল,

"সে কি সুন্দরি, অমন কথা বলিও না!——যে মস্তক তোমার কুসুম-কোমল বক্ষে থাকিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিবে, তাহাকে বজ্রাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে বলিতেছ?—দেবতায় অমন নিষ্ঠুর কথা বলে না!"

আরও সাহসভরে, আরও দৃঢ়তার সহিত কিরণ উত্তর দিলেন,—

"দেবতার অভিসম্পাত কখন ব্যর্থও হয় না!"

"তুমি আমার প্রাণেশ্বরী!"

"আমি তোমার জীবনহন্তা যম।"

হঠাৎ সেই অপরিচিত কণ্ঠ, ক্ষুদ্র এক বাঁশীতে ফুঁ দিয়া, কি সঙ্কেত করিল। তৎক্ষণাৎ অমনি ছাদের উপরিভাগ হইতে, কৌশলে, কে সেই গৃহের উজ্জ্বল দীপালোক জ্বালিয়া দিল। সেই আলোকে সমস্ত গৃহ আলোকিত হইল।

কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তি বুঝিল,—অন্যরূপ। তাহার চক্ষে বোধ হইল,—যেন উজ্জ্বল দিবালোকের নিকট ক্ষুদ্র দীপালোক মিট্ মিট্ করিতেছে। লোকললামভূতা, অনুপমা সুন্দরী কিরণময়ীকে দেখিয়া,—সেই কামাতুর হতভাগ্য, উদ্‌ভ্রান্তপ্রায় হইল।——এই মূর্ত্তিকেই না কিরণ, পাপ 'নরোজা মেলায়' যবনিকা-অন্তরালে, চকিতের মত একবার দেখিয়াছিলেন?

সতীর অন্তর আর একবার কাঁপিয়া উঠিল।——"তবে কি এই,—সেই? স্বামী আমার দেবতা,—যা বলেন, তাই ফলে!"

মুহূর্ত্তের জন্য কিরণ স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন।——হরি হরি! ইহারই নাম কি দুর্ব্বোধ্য মানব-চরিত্র?

কামবিহ্বল মূঢ়,—কম্পিতকণ্ঠে, যোড়হস্তে, নীরব প্রার্থনা জানাইল। সতীর মুখপানে চাহিয়া, কথা কহিবার সাহস কি তাহার হইতে পারে?

বজ্রকঠিনস্বরে কিরণ গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—

"দূর হ—নরকের কীট!"

কথায় সাহস বাড়িল। কামোন্মত্ত পশু এবার নতজানু হইল। অতি কাতরভাবে বলিল,

"সুন্দরি, আর আমাকে বঞ্চিত করিও না। আমি তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়াছি। তোমার রূপের শিখায় আমার অন্তর-বাহির দগ্ধ হইতেছে। প্রাণ যায়,—রক্ষা করো প্রাণেশ্বরি! প্রেম-বারি দিয়া এ পিপাসীর প্রাণ রাখ,—প্রেমময়ি!——পৃথিবীর সম্রাট আজ তোমার চরণে প্রেম-ভিক্ষা করিতেছে!"

এবার কিরণ আরও বিস্মিত, আরও চমৎকৃত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,"তবে সত্যই কি এই,—সেই? এ্যাঁ——"

"এই,——কি সুলোচনে? দিল্লীশ্বর আজ তোমার চরণতলে,—তাই বিস্মিত হইতেছ? প্রেমময়ি, মনুষ্য-প্রকৃতি সর্ব্বত্রই এক ধাতুতে গঠিত!"

"রাম, রাম!"

কিরণ চমকিত হইয়া কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া, পশ্চাতে হটিয়া আসিয়া বলিলেন,

"রাম, রাম! তুমি? দিল্লীশ্বর? ভারত-সম্রাট? আকবর? তোমার এই কাজ?"

"আমারই এই কাজ! দেখ, রমণীরূপে দেবতারও পদস্খলন হয়,——আমি কোন্ ছার!"

"নরোজা-মেলা কি এই জন্য?"

"সত্য বলিব,—প্রধানতঃ এই জন্য।"

"কতদিন এ পাপ-পঙ্কে ডুবিয়াছ?"

"অনেক দিন।——পরকীয়া আস্বাদনের আমি বড় পক্ষপাতী। মহিলা-মেলায় আজ তোমাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী ও মনোহারিণী দেখিয়া, কৌশলে এখানে আনাইয়াছি।

"তাই বুঝি এ গুপ্তগৃহ?"

"তাই।——সুন্দরি, লোকলজ্জার ত ভয় আছে!"

"লোকের চক্ষে ধূলি দিতেছ, কিন্তু সেই সর্ব্বদর্শী—সর্ব্বান্তর্যামীর চক্ষে ধূলি দিবে কিরূপে?"

"তোমাকে সত্য বলিব,—আমি ও সব কিছু মানি না,—কেবল অজ্ঞ লোকের নিকট প্রতিপত্তি ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই আমি ধর্ম্মের ভাণ করি মাত্র।"

"তোমার পাপে মোগল-সাম্রাজ্যের পতন হইবে।"

"আমি মোগল-সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী করিব।"

"পাপীর কাজ কখন স্থায়ী হয় না।"

"বৈবাহিক সম্বন্ধে আমি হিন্দু মুসলমানকে প্রায় এক করিয়াছি।"

"মিথ্যা কথা!—হিন্দুর অন্তরের উপর তোমার এতটুকুও প্রতিষ্ঠা হয় নাই।"

"যাক্, ও নীরস রাজনৈতিক আলোচনা।——সুন্দরি! এখন আমার মনস্কাম পূর্ণ করো। তোমাকে পাইলে আমি আর এ জীবনে কাহাকেও চাহিব না।—দেখ, আমার সর্ব্বশরীর জরজর হইয়াছে!"

"দিল্লীশ্বর! সাবধান,—পুনরায় যেন ও পাপ কথা মুখ হইতে বাহির না হয়!—আমাকে শীঘ্র আমার স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দাও।"

"প্রেমময়ি, প্রেমিকার ত এ রীতি নয়।—শরণাগত প্রণয়-প্রার্থীর কামনা পূর্ণ করাই তাঁহার ধর্ম্ম। ক্রোধ করিও না,—সুন্দরি!—আ মরি মরি! তোমার ঐ ক্রোধোদ্দীপ্ত মুখমণ্ডলেও আমি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিতেছি।——চন্দ্রাননি! আর পারি না,—অধৈর্য্য হইয়াছি,—আত্মহারা হইয়াছি,—আমাকে রক্ষা করো। দিল্লীশ্বর আজ তোমার চরণে রাজ্য, রাজমুকুট, সিংহাসন, সম্ভ্রম, জীবন,—সকলই সমর্পণ করিতেছে!——তোমার ঐ শীতল বক্ষে এ তাপিত জনকে স্থান দাও,——আমি একবার ঐ অধর-সুধা পান করিয়া জীবন সার্থক করি। আমাদের এ গুপ্তপ্রণয় কেহ জানিতে পারিবে না।"

কম্পিত চরণে, টলিতে টলিতে, দিল্লীশ্বর দুই বাহু প্রসারিত করিয়া, সতী-প্রতিমাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল। ক্রোধোদ্দীপ্ত সিংহিনী গর্জ্জিয়া উঠিল,—

"মূঢ় যবন! যদি আর এক পদ অগ্রসর হইবি, ত প্রাণ হারাইবি—এখনও আপনার পদ, প্রভুত্ব, সম্মান স্মরণ কর্।——ওহো! 'দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা' কি এই?—রাম, রাম!"

প্রভাময়ীর সেই অনুপম লাবণ্য-প্রভার সহিত এই উদ্দীপ্ত রূপ-শ্রী মিশিয়া, বড়ই অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সে শোভায় উজ্জ্বল দীপালোক সত্য সত্যই নিষ্প্রভ হইল। সেই গৃহ, গৃহস্থিত সেই আস্বাব ও সেই পাপ বিলাস-শয্যা,—সত্য সত্যই যেন মলিন হইল। আর ওদিকে দেখ দেখি,—ঐ পুণ্যময়ী জীবন্ত-প্রতিমার সম্মুখে,—পাপ-কামনাজর্জ্জরিত, অতুল সম্পদের অধিকারী—সম্রাটের মুখখানা কেমন কুৎসিত কদাকার দেখিতে হইয়াছে!

কামোন্মত্ত আকবর বলিল, "সুন্দরি! যতই বলো না কেন, দিল্লীশ্বরের আশা পূর্ণ না করিয়া, আজ তুমি যাইতে পারিতেছ না।"

আকবর পুনরায় তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল।

এবার চক্ষের দৃষ্টি আরও স্থির করিয়া, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া, কিরণ বলিলেন,—"আবার!"

মূর্খ সম্রাট ভাবিল, "না, বিনয়ে কার্য্যোদ্ধার হইবে না,—ভয় দেখাইয়া, ইহাকে বশীভূত করিতে হইতেছে।"

প্রকাশ্যে বলিল, "হাঁ, আবার! কেন, ভয় দেখাইতেছ নাকি? জানো, তুমি এতক্ষণ কাহার সহিত কি ভাবে কথা করিতেছ?"

"হাঁ, জানি,——কপট, অধর্ম্মাচারী, কাম-কুক্কুর দিল্লীর বাদসাহের সহিত,—তাহারই উপযোগী ভাষায়, কথা কহিতেছি!"

"কি! তোমার গর্দ্দান হুকুম দিব——এখনও আমার প্রস্তাবে সম্মত হও!"

"হা মূর্খ!——কে বলে, তোকে চতুর ও রাজনীতিজ্ঞ? হিন্দু-রমণীকে তুই মরিতে ভয় দেখাস?"

"কিন্তু আমার হাত হইতে আজ তোমার পরিত্রাণ নাই!"

কামোন্মত্ত আকবর আবার সতীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। বার বার এইরূপ সতীত্বনাশের উদ্‌যোগ!

অসহায়া অবলা রমণী,—তখন সেই অগতির গতি অনাথনাথকে ডাকিতে লাগিলেন,—

"হে নাথ! হে ত্রিলোকের অধীশ্বর! আজ দাসীর প্রতি প্রসন্ন হও,—তাহার নারী-ধর্ম্ম রক্ষা করো। হে বিপদভঞ্জন, লজ্জা-নিবারণ! তুমি একদিন সেই পাপ কৌরব-সভায় বিবসনা দ্রৌপদীর লজ্জা রক্ষা করিয়াছিলে,—আজ এই পাপ মোগলগ্রাস হইতেও তোমার তনয়াকে

রক্ষা করো!—মাগো, সতীকুলশিরোমণি, আদ্যাশক্তি ভগবতি! তুমিই সতীর মুখ রাখ।"

সেই মূর্ত্তিমতী সতীপ্রতিমার চক্ষু হইতে অপাঙ্গ বহিয়া দরদরধারে মুক্তাফল বর্ষণ হইতেছে,—আর পাপ দিল্লীশ্বর তখনও কামকলুষিত দৃষ্টিতে—সতৃষ্ণ নয়নে সতীর সেই অভিনব রূপ-সুধা পান করিতেছে।

সহসা দীপালোক কম্পিত হইল। সহসা সে আলোক যেন নীলবর্ণ ধারণ করিল। সহসা যেন সে নীলালোকে শত শত বিভীষিকা আবির্ভূত হইতে লাগিল।—সতী গর্জ্জিয়া উঠিলেন। সহসা সিংহবাহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। চরণচুম্বিত কেশদাম আপনা হইতে কবরীভ্রষ্ট হইল। পরিধেয়-বসনাঞ্চল ভূমিতে লুটাইল। চক্ষের সেই স্থিরদৃষ্টি এবার সত্য সত্যই পলকহীন হইয়া রহিল। কটিতট-সংবদ্ধ সেই শাণিত ছুরিকাখানি দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া, সতীসাধ্বী কিরণময়ী,—নিশ্চল প্রতিমার মত স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। আ মরি মরি! সত্যই সে সিংহবাহিনীমূর্ত্তি আজ আমার চক্ষের সম্মুখে প্রকটিত। হায় মা!—

সম্মুখে সেই ভীমা ভৈরবী রুদ্রাণীমূর্ত্তি দেখিয়া,—যখন আকবর এবার ভীত, চকিত ও স্তম্ভিত হইল। তাহার কাম-লালসা কোথায় অন্তর্হিত হইল,—অন্তরে ভয় ও ভক্তির আবির্ভাব হইল।

সিংহবাহিনীমূর্ত্তি এবার কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,

"বল্,—বুকে হাত দিয়া উপরপানে চাহিয়া শপথ কর্, আর কখন কোন পর-রমণীর প্রতি পাপ-নয়নে চাহিবি না,——বলে, ছলে, প্রলোভনে,—আর কোন কুলবালার সতীত্ব নষ্ট করিবি না,—তবে তোকে এ যাত্রা ক্ষমা করি—নহিলে এই তীক্ষ্ণ ছুরিকা এখনি তোর বুকের রক্ত পান করিবে!"

ধর্ম্মের প্রবল প্রতাপে অধর্ম্ম চিরকালই ভীত ও কম্পিত;—মোগল-সম্রাট যেন একেবারে গলিয়া কাদা হইয়া গেলেন। কেন হইলেন, এ কৈফিয়ৎ কেহ লইবেন না,—সংসারে এমনি হইয়া থাকে। সৃষ্টি-রহস্যই এই। পুণ্য ও পবিত্রতার নিকট,—অধর্ম্ম ও পাপ, পরিণামে এইরূপ নতই হইয়া থাকে।

আকবর গলদশ্রুলোচনে, কম্পিতকণ্ঠে, "মা মা" বলিতে বলিতে, সতীপ্রতিমার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

ধর্ম্মের জয় হইল। সতী, ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।"

আকবর ভাবিয়াছিলেন, পৃথীরাজের পত্নীর সতীত্ব নষ্ট করিতে পারিলে, তাঁহার দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। ইন্দ্রিয়চরিতার্থ ত হইবেই,—তাহা ব্যতীত পবিত্র শিশোদীয়কুলে দুরপনেয় কলঙ্কও অর্পণ করা যাইবে। কারণ, পৃথীরাজপত্নী যে, মহারাণা প্রতাপসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্রী ও শক্তসিংহের কন্যা, আকবর তাহা জানিতেন! প্রতাপ যে, আজ অবধি কিছুতেই মোগলের নিকট মাথা নোঙাইলেন না,—ইহাতে সৌভাগ্যগর্ব্বে-স্ফীত আকবর মনে মনে বড়ই অসন্তুষ্ট। সুতরাং যে কোন উপায়ে হোক্, সেই প্রতাপসিংহের সম্মান নষ্ট করিতে পারিলেই তাঁহার আনন্দ হয়।—পৃথীরাজপত্নীর সতীত্ব নষ্ট করিবার এতটা চেষ্টা ও কৌশল,—আকবরের অন্যতম গূঢ় উদ্দেশ্য। তা উদ্দেশ্য যাহাই হোক্, ধর্ম্মের কলে পড়িয়া, আজ তাঁহাকে, সেই সতীলক্ষ্মীকে মাতৃসম্বোধন করিতে হইয়াছে। এ শিক্ষা এই তাঁহার জীবনের প্রথম। সোণার কিরণ, মোহান্ধ দিল্লীশ্বরের জীবনে, এই প্রথম ধর্ম্মের আলোক সঞ্চারিত করিয়া দিলেন।—কবি ও ঐতিহাসিকগণ, চিরদিন সেই মহামহিমময়ী, রাজরাজেশ্বরী, আর্য্যকুললক্ষ্মীকে দেবী বলিয়া বর্ণন করিবেন।"

দ্বিতীয়,—প্রতাপের একদিনের পদস্খলনের চিত্রটি কেমন, দেখুন;—

* * * *

—"পুণ্যবান প্রতাপের অমানুষিক দেব-চরিত্র এত কাল আলোচনা করিলাম, এইবার তাঁহার সাধারণ মানব-চরিত্র একটু আলোচনা করিব। মানুষ যখন মহত্ত্বের চরমশিখরে উঠিয়া, ইহলোকে অক্ষয় যশঃ ও পরলোকে অতুল পুণ্য সঞ্চয় করে,—তখন যেমন তিনি অবিসংবাদিতরূপে আপামর সাধারণের বরেণ্য ও পূজনীয় হন,—তেমনি মানুষ যখন আবার সাধারণ মানবভাবেই কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করে, তখন আবার তাহার সেই মানবীয় গুণসমষ্টির তেমনি তীব্র সমালোচনাও চলিয়া থাকে। বিশেষতঃ, মহৎব্যক্তির—প্রকৃত বড়লোকের একটু পদস্খলন হইলে, তাহা সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করে। পরন্তু সাধারণ লোকের তাহা অপেক্ষা গুরুতর পদস্খলনেও, কাহারও তেমন চিত্তচাঞ্চল্য, কৌতূহল কিংবা কষ্টানুভব হয় না,—বিস্ময় কাহারও হৃদয় উদ্রিক্ত করে না। কারণ সাধারণের ঐ পদস্খলন, সাধারণের সহ্য আছে,—জগতের উহা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু যাহার পদস্খলনের বিষয় মানুষ কখন কল্পনাও করে নাই,—'এরূপ হইতে পারে' বলিয়া, যাহা কখন কাহারও ধারণায়ও আইসে নাই,—তাহার সম্বন্ধে এরূপ ঘটিলে, প্রথমতঃ কেহ বিশ্বাসই করে না,—তারপর বিশেষ প্রমাণ পাইলে প্রথমতঃ বিস্মিত হয়, অবাক্ হয়, পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে, তারপর সেই বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন-আলোচনা করিয়া থাকে। ভক্তিতে বা চিরদিনের ধারণাতে আঘাত পড়িল, মানুষ এমনই দিশাহারা হয়।

প্রতাপের অমানুষিক কার্য্যাবলী দেখিয়া, এতকাল যাঁহারা প্রতাপকে দেবতার ন্যায় ভক্তির চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, হঠাৎ তাঁহারা প্রতাপের মানবীয় দুর্ব্বলতাটুকু দেখিয়া বিস্মিত, কিংবা তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ না হন, ইহাই আমাদের কামনা! কারণ, যতই হউক, প্রতাপ মানুষ,

—তাঁহারও আত্মবোধ আছে, তাঁহারও জীবধর্ম্ম আছে, তাঁহারও স্ত্রীপুত্র আছে, সুখ-দুঃখে তাঁহারও হৃদয়ে তরঙ্গ উঠে। তবে, এতদিন যে, তাঁহাতে সাধারণ মানবীয় দুর্ব্বলতাটুকু দেখি নাই, তাহার কারণ তিনি অনেক গুণের আধার,—অনেক গুণে গুণবান্,—প্রকৃত পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষ তিনি।

আজ সত্যের অনুরোধে সেই মহাপুরুষের চরিত্রে একটি কলঙ্ক-চিহ্ন দেখিব, একটি দুর্ব্বলতার দাগ্ দেখিব একটু সাধারণত্ব দেখিয়া স্বভাবের সঙ্গতিরক্ষা করিব।——যতই হউক, প্রতাপ মানুষ!

দুরদৃষ্ট যখন নির্ম্মম কঠিন হস্তে প্রতাপকে নিষ্পেষিত ও নির্য্যাতিত করিতেছিল;—যখন ভীষণ দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর কষাঘাত ও তীব্র জ্বালাময় উত্তাপ প্রতাপকে অস্থির উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিতেছিল;——যখন আকবর পুনঃপুনঃ চর পাঠাইয়া প্রতাপকে সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইতে ইঙ্গিত করিতেছিলেন, তখনও প্রতাপ ব্রতচ্যুত কিংবা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই,—পাঠক তাহা অবগত আছেন। কিন্তু আজিকার একটিমাত্র ঘটনায়, একটিমাত্র করুণ দৃশ্যে, তাঁহার হৃদয়-সমুদ্র উথলিত হইল,—তাঁহাকে চঞ্চল ও সঙ্কল্পভ্রষ্ট করিল।——যতই হউক, প্রতাপ মানুষ!

নিভৃত এক পর্ব্বত-কন্দরে বসিয়া, দুর্ভাগ্য রাজ-পরিবার অতি কষ্টার্জ্জিত সামান্য আহার প্রস্তুত করিতেছেন, আর প্রতাপ অদূরস্থ এক তৃণ-শয্যায় শায়িত থাকিয়া আপন অবস্থার বিষয় নিবিষ্ট চিত্তে ভাবিতেছিলেন। প্রতাপের সেই দীর্ঘ কেশ, দীর্ঘ নখর, মলিন বসন, বীরত্বব্যঞ্জক শীর্ণ দেহ,—এক দিকে যেমন তাঁহার সেই কঠোর ব্রতপালনের সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিতেছিল, অন্য দিকে মূর্ত্তিমান্ দারিদ্র্য ও রুধিরশোষক হাহা ভাব লেলিহান হইয়া, সহস্র লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া, সদাই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছিল। অভাগ্য রাজ-শিশুগণ বুভুক্ষু ভিক্ষুক-সন্তানগণের ন্যায়, পিতামাতাকে ঘেরিয়া, হিল্‌হিল্ কিল্‌কিল্ করিয়া বেড়াইতেছে। একটু খাদ্যসামগ্রী পাইলে, কাড়াকাড়ি-হুড়োহুড়ি করিয়া খাইয়া ফেলে; আবার তখনি হাহা করিয়া কাঁদিতে থাকে।—রাজরাজেশ্বর প্রতাপ রক্তমাংসের শরীর লইয়া, এ দৃশ্যও একাদিক্রমে চারি পাঁচ বৎসর দেখিয়া আসিতেছেন।

আজও তাহা দেখিলেন। নির্ব্বিকার নিবিষ্টমনে দেখিলেন। দেখিলেন, মহিষী পদ্মাবতী ভিক্ষুক-রমণীর ন্যায়, ছিন্ন-মলিন বসনে অঙ্গ ঢাকিয়া, অনশনে ও মনাগুনে আপনার সেই ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি মসীময়ী করিয়া, এক হস্তে চুল্লীতে ইন্ধন দিতেছেন, অন্য হস্তে সেই চুল্লীস্থ ক্ষুদ্র এক পাত্রের উপর কি সেঁকিতেছেন। আশে পাশে ক্ষুধাতুর শিশুগণ জননীকে ঘেরিয়া বসিয়া আছে। তাহারা সতৃষ্ণনয়নে একবার চুল্লীপানে চায়, আর বার আশানেত্রে চুল্লীপার্শ্বস্থ অপক্ক ভোজ্যদ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকে,—কতক্ষণে তাহা সিদ্ধ অর্দ্ধসিদ্ধ বা ঝলসিত হইয়া, যেমন তেমন রকমে পাত্র হইতে নামিবে! আর সেই ভোজ্যদ্রব্যটিই বা কি? না, অরণ্যজাত স্বাদগন্ধহীন একরূপ তৃণবীজ-চূর্ণ। সেই তৃণবীজ-চূর্ণে খানকতক রুটী প্রস্তুত করিয়া, প্রতাপ-মহিষী তাহাই আগুনে সেঁকিয়া লইতেছেন। তারপর, হয়—একটু লবণ, নয়—একটু শাকসিদ্ধ দিয়া মিবারেশ্বরী তাহাই জীবনধনগণকে খাইতে দিবে।

অদূরস্থ সেই তৃণশয্যায় শায়িত হইয়া অর্দ্ধ পৃথিবীপতি,—অনিষ্কম্পিত হৃদয়ে, এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। যেন বিরাট হিমালয় 'পদে পৃথী শিরে ব্যোম' লইয়া, ঝড়-বৃষ্টি-ঝঞ্ঝাবাতে দৃক্‌পাত না করিয়া, আপন ভাবে আপনি ভোর হইয়া আছেন।

তারপর প্রতাপ দেখিলেন, মহিষী অতি কষ্টে চক্ষের জল রোধ করিয়া, ক্ষুধাতুর সন্তানগণকে তাহা খাইতে দিলেন। চাঁদপানা মুখ করিয়া, অমৃতবোধে রাজ-শিশুগণ পরিতোষপূর্ব্বক তাহা ভোজন করিল। আর কিছু সঞ্চিত রহিল কি না,—আবার ক্ষুধা পাইলে খাইতে পাইবে কি না, কেহ কেহ সে সন্ধানও লইল। জননী যখন বলিলেন, 'না',—তখন যেন কেহ কেহ, 'একেবারে পেট ভরিয়া খাইল কেন' ভাবিয়া, মনে মনে একটু খুঁৎ-খুঁৎ করিতে লাগিল। ওরি মধ্যে প্রতাপের সাত আট বছরের একটি মেয়ে, তাহার ভোজ্য অংশের অর্দ্ধেক খাইয়া, অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ তুলিয়া রাখিল,—বড় ক্ষুধা পাইলে তখন খাইবে। সে অভুক্ত অর্দ্ধ ভোজ্যাংশে, বালিকার সবটা হৃদয়—আশা মমতা, অনুরাগ,—সমস্তই ন্যস্ত রহিল।——বড় দুঃখে পদ্মাবতী এবার কাঁদিলেন। সমবেদনা পাইবার আশায়, অদূরস্থ তৃণ-শয্যায় শায়িত স্বামীর পানে চাহিয়া একটু কাঁদিলেন।—কঠিন হিমালয় একটুও নড়িল না।

নড়িল না,—বাহ্যদৃষ্টিতে; কিন্তু তাহার ভিতরে কি একটা মহাকম্পন উপস্থিত হইল, তাহা তুমি আপন মন দিয়া বুঝিতে পারো।——যতই হউক, প্রতাপ মানুষ!

তার পর আর এক ঘটনা ঘটিল।—বালিকা তাহার সেই বড় আশার সেই অভুক্ত তৃণবীজ-চূর্ণের আধখানি রুটি,—সযত্নে একটা গর্ত্তের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া, মায়ের কাছে বসিয়া, মধুমাখাস্বরে, রোরুদ্যমানা মায়ের সেই রোদনের কারণ জিজ্ঞাসিতেছিল,—এমন সময় একটা বন্য-বিড়াল আসিয়া, বালিকার সেই অতি-বড় আশার সামগ্রী,—সেই আত্ম-শোণিততুল্য আধখানি রুটী, মুখে করিয়া পলাইয়া গেল। অর্দ্ধভুক্তা বালিকা যেমন তাহা দেখিতে পাইল, অমনি পাষাণভেদী করুণকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। পার্শ্বোপবিষ্টা মাতা 'কি কি' বলিয়া যতই কারণ জিজ্ঞাসা করেন, অবোধ বালিকা ততই লুটোপুটি হইয়া কাঁদিতে থাকে!

এইবার হিমালয় নড়িল! মহাসমুদ্র আলোড়িত হইল।

সতীর মৃত্যুসংবাদে ধূর্জ্জটির প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।——প্রতাপ থর থর কাঁপিতে লাগিলেন।

সেই তৃণশয্যায় শায়িত, মর্ম্মাহত, সহস্র সহস্র বৃশ্চিক-দংশনে জর্জ্জরিত, সহিষ্ণুতার অবতার, মহাপ্রাণ প্রতাপ,—এতক্ষণ একদৃষ্টে নিবিষ্টচিত্তে এই করুণ দৃশ্য দেখিতে-ছিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রাণে বাড়বানল জ্বলিয়া উঠিতেছিল। অনেক কষ্টে তিনি সে অস[illegible]জ্বালা সহ্য করিতে[illegible]ন। অতীতের সহিত বর্ত্তমানের অনেক কথা,—একে [illegible]কে তাঁহার স্মৃতিমাঝে জাগিতেছিল। প্রাণ-পুত্তলি শিশুকন্যার সেই অভুক্ত আধখানি রুটী সঞ্চিত করিয়া রাখা এবং সে দৃশ্যে তাঁহার পানে চাহিয়া মহিষীর রোদন,—বিষাক্ত শল্যের ন্যায় তাঁহার বক্ষে বাজিতেছিল;—তথাপি সে অরুন্তুদ যন্ত্রণা তিনি কাহাকে জানিতে দেন নাই। কিন্তু তার পর, বন্যবিড়ালে রুটী লইয়া পলাইয়া যাওয়ায়,—বালিকার সেই পাষাণভেদী করুণ ক্রন্দনে, তাঁহার সেই মহা যোগাসন টলিল,—হৃদয়-সমুদ্র মথিত হইল,—হিমালয় সদৃশ কঠিন প্রাণ থর থর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন, তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীও যেন ঘুরিয়া গেল। কন্যার ক্রন্দনের সহিত, প্রতাপও সহসা উন্মত্তের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন।

সে ক্রন্দনে বালিকার ক্রন্দন থামিল, পদ্মাবতীর রোদন দূর হইল,——সকলে সভয়ে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল।—সুখদুঃখের অতীত শ্মশানচারী সদাশিবের চক্ষে আজ জল কেন?

যতই হউক —প্রতাপ মানুষ!

মানুষ বলিয়াই, তিনি স্বাভাবিকতার হাত এড়াইতে পারিলেন না। মানুষ বলিয়াই, তাঁহার হৃদয়-সমুদ্র আজ উথলিয়া উঠিল।——এবং তার পর সেই সমুদ্রতুল্য হৃদয়, যে দিকে ধাবিত হইল, সহস্র চেষ্টায়ও কেহ তাহার গতিরোধ করিতে পারিল না।——প্রতাপ, আকবরের নিকট সন্ধিপ্রার্থনা করিলেন।

সেই জীবন-সহচর বীর চন্দাবৎ আসিল, অমর আসিল, স্বয়ং মহিষী পদ্মাবতী আসিলেন,—বিস্মিত হই-লেন, বুঝাইলেন, মিনতি করিলেন, বাধা দিবার চেষ্টা পাইলেন;—কিন্তু সমুদ্র-স্রোত রোধ করিতে কে সমর্থ হইবে? ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা,—কার সাধ্য, লঙ্ঘন করে? সকলে ভয়ে ভয়ে প্রতাপের সম্মুখ ছাড়িয়া দাঁড়াইল।

ইতিপূর্ব্বে, সন্ধির প্রস্তাবে, প্রতাপ যখন 'না' বলিয়া-ছিলেন, কে তখন তাঁহাকে 'হাঁ' বলাইতে সক্ষম হইয়াছিল? আর আজ 'হাঁ' বলিয়াছেন,—কার সাধ্য তাঁহাকে 'না' বলায়?—মহাজীবন সর্ব্বত্র, সকল সময়েই একরূপ।

রাজলক্ষ্মী।

তৃতীয় ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গ্রীষ্মকাল। বৈশাখ মাস। এক হিন্দুস্থানী যুবক প্রয়াগে, গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম-তীর্থে উপনীত হইয়া, সন্ধ্যার সময়, অতি ধীরে ধীরে, যেন অবসন্ন হইয়া, অঞ্জলি পুরিয়া জল-পান করিতেছে। যুবক বড় দরিদ্র। যে কাপড়খানি সে পরিয়া আছে, তাহা মলিন, তিন হাতের অধিক লম্বা হইবে না। বস্ত্রখানি স্থানে স্থানে ছিন্ন, কষ্টে লজ্জা রক্ষা হয়। যুবকের চুল ঝাঁকড়-মাকড়। তাহাতে তৈল কস্মিন্-কালে পড়িয়াছে কি না সন্দেহ। অঙ্গও রুক্ষ। হাতের নখ বড় বড়। পদতল ফাটা ফাটা। যুবকের দাড়ি আছে। তৈলাভাবে, পরিমার্জ্জনাভাবে, সে দাড়ি কেমন কটা-কটা হইয়া গিয়াছে।

হিন্দুস্থানী যুবক অঞ্জলিপূর্ণ জল পান করিয়া, যেন কিছু তৃপ্ত হইয়া, বালুকা-ভূমে আসিয়া বসিল। প্রয়াগের পাণ্ডা-দিগের যেখানে ধ্বজা-পতাকা উড়িতেছে, যুবক সেখানে না বসিয়া, দূরে বালুকা-ভূমে বসিয়া রহিল। অধিকক্ষণ বসিতে পারিল না। হিন্দুস্থানী যুবক শুইয়া পড়িল। বুঝি মূর্চ্ছিত হইল! একি মৃগীরোগ, না—হিষ্টিরিয়া? না, সে সব কিছুই নহে। এ ব্যাধি,—ক্ষুধাব্যাধি। যুবকের আজ প্রায় দুই দিন কাল আহার হয় নাই।

আকাশে পূর্ণিমার শশধর উঠিল। ক্ষুধার্ত্ত মূর্চ্ছিত যুবকের গায়ে যেন একখানি জ্যোৎস্নারূপ চাদর ঢাকা পড়িল। গঙ্গা যমুনা দেবীদ্বয়, জ্যোৎস্নার ওড়নায় বিভূষিত হইয়া অধিকতর হাস্যময়ী হইলেন। ধরিত্রী দেবীও সেই সঙ্গে পোষাকী জ্যোৎস্না-বসনখানি পরিধান পূর্ব্বক বিরাজ করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা আসিয়াছে। জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। তীর্থস্থান নীরব হইয়াছে। পাণ্ডাদল দিবসের কার্য্য সমাধা করিয়া আপন আপন গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। কোন কোন বৃদ্ধ পাণ্ডা গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম-জলে হাঁটু পর্য্যন্ত নিমজ্জিত করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক আরম্ভ করিলেন। কেহ বা গঙ্গার নিকটে গিয়া মৃদুমন্দ সমীরণ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে মধুর-কণ্ঠে 'ভজন' গান গাহিতে লাগিলেন।

রাত্রি যত বেশী হইতে লাগিল, জ্যোৎস্না-ফুল ততই বেশী ফুটিতে লাগিল। সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া একজন বৃদ্ধ পাণ্ডা গৃহাভিমুখে যাত্রাকালে দেখিলেন, অদূরে এক ব্যক্তি মৃতের ন্যায় ভূতলে বালুকা-ভূমে পতিত আছে। তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মিল। তিনি নিকটে গিয়া জিজ্ঞা-

সিলেন, "তু কৌন হায়? মুর্দ্দেকে মাফিক কেঁও পড়া হায়?—উঠ্, ঘর জা।"

সেই ভূপতিত মূর্চ্ছিত যুবক কোন উত্তর দিল না। বৃদ্ধ পাণ্ডা আবার তাহাকে ঐরূপ কথা বলিলেন, তথাচ সে কোন উত্তর দিল না। তখন বৃদ্ধ পাণ্ডা সেই যুবকের অতি নিকটে গমন করিলেন। আপাদ-মস্তক তীব্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলেন। মনে মনে কহিলেন "না, এ লোক এখনও মরে নাই, মৃত্যুলক্ষণ কিছুই দেখিতেছি না, বোধ হয় মূর্চ্ছিত হইয়া থাকিবে।" গৃহে গমনোদ্যত কয়েক জন পাণ্ডাকে তিনি ডাকিলেন,—"ভাইয়ো! ইধর তো আনা। ইহাঁকা হাল জরা দেখ্ লো।" দেখিতে দেখিতে দশ বার জন পাণ্ডা, সেই বৃদ্ধের আহ্বানে, সেই পতিত যুবকের নিকটবর্ত্তী হইল। তাহারা সেই যুবককে বেষ্টন করিয়া এক মহা গোলযোগ আরম্ভ করিয়া দিল। কেহ বলিল, "মরিয়াছে"; কেহ বলিল, "মূর্চ্ছিত হইয়াছে"; কেহ বলিল, "ভূতে পাইয়াছে"। সকলকে থামাইয়া একজন বলিল, "আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এ লোকটা বিষপানে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।" একথার প্রতিবাদ করিয়া অন্য একজন পাণ্ডা কহিলেন, "এ লোকটা মরেও নাই, বিষপানও করে নাই, মূর্চ্ছিতও হয় নাই, কেবল কল্লা করিয়া পড়িয়া আছে। লোকটা,—দেখিতেছ না, ঠিক যেন টাট্‌কা, সজীব রহিয়াছে। মরিলে ত এতক্ষণ দুর্গন্ধ উঠিত।" অন্য একজন এই কথার অনুমোদন করিয়া বলিল, "হাঁ ভাই, তুমি ঠিক বলিয়াছ। লোকটা চোর; আমরা চলিয়া গেলে, এখানকার আসবাব-পত্র ও আমাদের ধ্বজাগুলি চুরি করিয়া লইয়া যাইবে। শুন নাই কি, আজ দশ বৎসর পূর্ব্বে, এক রাত্রিতে আমাদের সমস্ত ধ্বজাগুলি চুরি গিয়াছিল? ও বেটা চোর, খুব মারো দেখি, এখনি কথা কহিবে।"

এইরূপ যত গোলযোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, লোক-সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। বহু লোকের সম্মতিক্রমে পাণ্ডা-বুদ্ধিতে শেষে ইহাই স্থির হইল যে, প্রথমতঃ লোকটাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া বসাও, অথবা দাঁড় করাও। দেখা যাক্, এ লোকটা বসিবার কালে বা দাঁড়াইবার কালে ঢলিয়া বা টলিয়া পড়ে কিনা? কিন্তু সহসা লোকটাকে ছুঁইতে কেহ সাহস করিল না। যদি লোকটা সত্য সত্যই মরিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে, ছুঁইলেই স্নান করিতে হইবে,—হয়ত সৎকারও করিতে হইবে। এমন কাঁচা-কাজ করিতে সহসা কেহ সম্মত হইল না। সুতরাং লোকটাকে কেহ উঠাইয়া বসাইতে প্রস্তুত হইল না। তখন সেই বৃদ্ধ পাণ্ডা অন্য সকল পাণ্ডাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমরা একটু সরিয়া দাঁড়াও, আমি যেরূপ লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে আমার নিশ্চয় ধারণা, এ ব্যক্তি মরে নাই। ইহার উদর দেখিতেছ না, যেন ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে। বোধ হয়, এ লোকটা দুই তিন দিন খাইতে পায় নাই। তাই জঠরজ্বালা আর সহ্য করিতে না পারিয়া,—এইস্থলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। আমার এখন স্মরণ হইতেছে, এই লোকটাই একঘণ্টা পূর্ব্বে সঙ্গমে গিয়া অঞ্জলিপূর্ণ জলপান করিয়াছিল। তখন এত মনে ভাবি নাই, কে জলপান করিতেছে,—করুক; ঐ লোকটাই তারপর ঐখানে গিয়া বসে এবং বোধ হয়, ক্ষুধার জ্বালায় খানিকপরে [illegible]ড়িয়া মূর্চ্ছিত হয়। তোমরা এক[illegible] সরিয়া দাঁড়াও দেখি,—ভিড় কমাও দেখি,—লোক[illegible] গায়ে বাতাস লাগিতে দাও। আর ঠাণ্ডা জল যদি তোমাদের নিকট থাকে ত এক ঘটি আমাকে দাও।"

বৃদ্ধের আদেশ অনুসারে শীতল সলিল আসিল। বৃদ্ধ স্বহস্তে সেই লোকটীর নাকে, মুখে, চোখে, কাণে, কপালে ধীরে ধীরে জলবিন্দু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ সেবা-সুশ্রূষায় সেই লোকটী চক্ষু মেলিল; ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল; হস্তপদের ঈষৎ গতি হইতে লাগিল। বৃদ্ধ কহিলেন, "আহা, দেখিতেছ না, এই দীর্ঘ বাহু, এই দীর্ঘ পদদ্বয়, অন্নরসাভাবে শুষ্ক হইয়া, কাষ্ঠখণ্ডবৎ নীরস হইয়াছে। তোমাদের মধ্যে যাহার বাটী নিকট, সে এখনি দৌড়িয়া গিয়া অর্দ্ধসের দুগ্ধ লইয়া আসুক।—চিনি বা মিছরি কিছু লইয়া আসুক।"

বৃদ্ধের আদেশে দুইজন পাণ্ডা লম্বা লম্বা লম্ফে দৌড়িয়া গিয়া, অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে, দুগ্ধ, চিনি ও মিছরি আনিয়া দিল।

ধীরে ধীরে দুগ্ধপানে, ধীরে ধীরে চিনি ও মিছরির সরবৎ-পানে, সেই লোকটী সচেতন হইল। বৃদ্ধ তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "বেটা, তু কৌন্ হায়? তেরা ঘর কঁহা হায়?"

সেই লোকটী ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল, "ম্যয় বীকানেরকা রহনেবালা হুঁ। মেরা ভাগ ফূটা হায়। এঁহা কুছ কার ন বনা। যো কুছ সাথ্ থা, চুক গয়া। কুলিকা কাম কর্ কিসী তরহ পেট চলাতা থা। য়োঁহী কলকেত্তে যাকর দেশবালোঁকী মেহেরবানীসে কুছ কার করণেবালা থা। দো তিন দিনসে ন কুলিকা কাম মিলা, আউর ন ভীখ হী মিলী। অব ইয়ে দশা হায়।"

ঐ লোকটী আরও কিছু বল পাইলে, বৃদ্ধ পাণ্ডা তাহাকে আপন গৃহে ডুলি করিয়া লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। হিন্দুস্থানী যুবক কহিল, "ডুলির আবশ্যক নাই; আমি এখন ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতে পারি।"

যুবক, পাণ্ডার সহিত ধীরে ধীরে গমন করিয়া, পাণ্ডার গৃহে পঁহুছিয়া, সে রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই হিন্দুস্থানী যুবক, প্রয়াগী পাণ্ডার চাকর হইল। সেই যুবা পুরুষ, সেই বৃদ্ধ মনিবের কার্য্য সকল, অনুরাগ-ভরে, তৎপরতার সহিত সম্পন্ন করিতে লাগিল।

সেই যুবকের নাম—অমরসিংহ। জাতি—ক্ষত্রিয়। নিবাস ঠিক বিকানীয়রে নহে,—সেই প্রদেশের নিকটবর্ত্তী কোন পল্লীগ্রামে। বয়স আটাশ বৎসরের অধিক হইবে কি?

যুবক,—গৌরাঙ্গ। শক্তিসম্পন্ন এবং সুপুরুষ। মুখকমল নবোদিত গোঁপদাড়ি দ্বারা ভূষিত। যেন প্রফুল্ল পঙ্কজে ভ্রমর-পঙ্‌ক্তির সমাবেশ।

বৃদ্ধ পাণ্ডা অতি প্রত্যূষে উঠে। যুবক কিন্তু তাহার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে উঠে। যখন একটু রাত থাকে, যখন কাক-কোকিলও ঘুমায়, তখনি যুবক উঠে। উঠিয়াই "বম্ বম্ হর হর, শিব শঙ্করী" বলিয়া ধ্বনি করে। তারপর যুবক কোমর বাঁধিয়া কাপড় পরে। আখড়ায় গিয়া কুস্তি করে, বীরনাটী মারে, দহন টানে, মুগুর ভাঁজে, ধূলায় গড়াগড়ি দেয়। বিশ মিনিটকাল মধ্যে এইরূপ ব্যায়াম-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, যুবক গায়ের ধূলা ঝাড়ে, কাপড় একটু লম্বা করিয়া পরে, আবার ভদ্রলোক হয়। তারপর যুবক ঝাড়ু লইয়া গৃহ পরিষ্কার করে; ব্রাহ্মণ-পাণ্ডার বাসন মাজে, কাপড় কাচে; এবং জঞ্জাল-পূর্ণ ঝুড়ি মাথায় করিয়া, দূরে গৃহ-জঞ্জাল ফেলিয়া আসে। প্রয়াগী পাণ্ডা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই, বেণীঘাটে যায়। আর তাহার ভৃত্য অমরসিং মাথায় এক প্রকাণ্ড মোট লইয়া, কাঁধে এক বাঁক লইয়া, প্রভুর পিছু পিছু চলে। প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে অমরসিং বেণীঘাটে গিয়া যাত্রী ডাকাডাকি করে; যাত্রীকে মিষ্ট কথায় বশ করে; যাত্রীর গঙ্গা-যমুনা-পূজার আয়োজন করিয়া দেয়। যাত্রীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন করে।

অমরসিংহের গতি নক্ষত্রবৎ ছিল। বৃদ্ধ পাণ্ডা যদি বলিত, "অমর, ডাক-ঘরে চিঠি দিয়া আইস," অমর অমনি চিঠী লইয়া দৌড়িত।—দৌড়নই তাহার চলন ছিল। বাগানের এক কাঠা জমি খুঁড়িতে বলিলে, অমরসিং দুই কাঠা জমি খুঁড়িয়া ফেলে। অমরসিং ডুবুরি হইয়া কূপ হইতে মনিবের ঘটী তুলে; নৌকার দাঁড় টানে, গুন্ টানে ও গাছে উঠিয়া আম পাড়ে, তাল পাড়ে। অমরসিং বৃদ্ধ প্রভুর নাতিগুলিকে কোলে পিঠে করে। কোলে একটী ছেলে, মাথায় এক মণ চা'ল;—এইরূপে অমরসিং বাজার হইতে আইসে। প্রভু পাণ্ডার মুখের আদেশ-কথা বাহির হইতে না হইতে অমরসিং সেই কাজ তদ্দণ্ডেই করে বা করিতে চেষ্টা করে। অমরসিং ক্রমশঃ এরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও প্রভুপ্রিয় হইয়া উঠিল যে, প্রভু আগুনে ঝাঁপ দিতে বলিলে, অমরসিং আগুনে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত; বাঘের মুখে যাইতে বলিলে, অমরসিং তাহাতেও প্রস্তুত। ডাকাতের দল আগুলিতে বলিলে, অমরসিং তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হয়। যৌবনপ্রাপ্ত শার্দ্দূলের ন্যায় অমরসিংহের বিশাল বিক্রম দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। প্রতিবেশী পাণ্ডাগণের চক্ষু অমরসিংহের প্রতি পতিত হইল।

এইরূপে দুই মাস অতীত হইল। অমরসিং মনিবের কাজকর্ম্ম করে, আর থাকে। এবং উদর পূর্ণ করিয়া দুই বেলা রুটী খায়। প্রত্যহ রুটী খাইবার সময়, কি জানি কেন, অমরসিং একটু ভাবে, একটু ইতস্ততঃ করে, তার পর ধীরে ধীরে রুটী খাইতে আরম্ভ করে।

অমরসিংহের কার্য্যকারিতা, বুদ্ধি এবং বলবিক্রম দেখিয়া, বৃদ্ধ পাণ্ডার আর আনন্দ ধরে না। তিনি ভাবিতেন, জানি না, কোন্ পুণ্যে আমার এ সাগর-ছেঁচা-ধন মাণিক মিলিল!" অমরসিং সর্ব্বগুণে গুণান্বিত হইলেও লেখাপড়া জানিত না। ঊর্দ্দু, হিন্দী বা ইংরেজী,—কিছুই জানিত না। প্রভু পাণ্ডা একদিন তাহাকে কহিল, "অমর, তুমি একটু হিন্দী শেখ; হিন্দী শিখিলে আমি তোমাকে আমার যাত্রিগণের খাতা-পত্র রাখিতে দিয়া নিশ্চিন্ত হই।—খাতা-পত্র অন্যের হাতে দিয়া আমার বিশ্বাস হয় না।" অমরসিং বলিল, "যে আজ্ঞা প্রভু! কল্য হইতে শিখিতে আরম্ভ করিব।"

পঞ্চম বর্ষে, শিশুর হাতে খড়ি হয়; অমরসিংহের হাতে খড়ি হইল,—আটাশ বৎসর বয়সের পরে। অমরসিংহ আরম্ভ করিল,—ক কা, কি কী, কু কূ, কে কৈ, কো কৌ, কং কঃ—ইত্যাদি।

পাণ্ডার একটী নবমবর্ষীয় পুত্র অমরের শিক্ষক হইল। অমরের ভুল হইলে, পাণ্ডাপুত্র ছাত্রের কাণ মলিয়া দিত। অমর হাসিত; পাণ্ডাপুত্রও হাসিয়া অমরের গলা জড়াইয়া ধরিত। শিশুর হাসির সহিত যুবকের হাসি মিশিত। এইরূপ হাসি-কৌতুকের রঙ্গভঙ্গে অমরসিংহের লেখা-পড়া চলিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অমরসিংহের চাকরি যথানিয়মে এইরূপে তিন মাস কাল চলিল। অমরসিংহের মাহিনা কত ধার্য্য হইল, অদ্যো তাহা ধার্য্য হইল কিনা, তাহা কেহ জানে না। অমরসিংহ মাহিনা চাহে না; মাহিনার কথা বলে না,—কেবলই কাজ করে এবং থাকে। প্রভু পাণ্ডাও খোরাকী ব্যতীত, কাপড় ব্যতীত, নগদ পয়সা একটীও এপর্য্যন্ত অমরসিংহকে দেয় নাই। তথাপি অমরসিংহের প্রভুর কার্য্যে বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই ঔদাসীন্য নাই, কার্পণ্য নাই, তাচ্ছিল্য নাই, বিরক্তিভাব নাই,—সদানন্দ-মনে সদাই সহাস্যবদনে স্ফূর্ত্তির সহিত অমরসিংহ প্রভুর কার্য্য করিতে থাকে।

প্রয়াগী পাণ্ডার কোনও ভৃত্যের সাধারণত সে সময় মাহিনা ছিল না। ভৃত্যগণ যাত্রীদের নিকট হইতে প্রত্যহ দুই চারি আনা যাহা আদায় করিত, তাহাই মাহিনা বলিয়া গণ্য হইত। সেই হিসাবে, বৃদ্ধ পাণ্ডা অমরসিংহের মাহিনা ধার্য্য করেন নাই। কিন্তু যখন পাণ্ডা দেখিলেন, অমরসিং সর্ব্বকর্ম্ম-দক্ষ এবং অতীব প্রভুভক্ত;—যখন পাণ্ডা আরও দেখিলেন, অমরসিং অল্প দিন মধ্যে পরিষ্কার লিখিতে শিখিয়াছে এবং উত্তমরূপ পড়িতে শিখিয়াছে;—যখন পাণ্ডা বুঝিলেন, শীঘ্রই অমরসিং যাত্রিগণের খাতা-পত্র রাখিতে সক্ষম হইবে, তখন পাণ্ডার একটু ভয় হইল। ভাবিল, মাহিনা ধার্য্য না করিলে যদি অমরসিং পলায়, তাহা হইলে আমার বড়ই ক্ষতি হইবে এবং শেষে বড়ই আপশোষ থাকিবে। অতএব শীঘ্রই ইহার মাহিনা ধার্য্য করা কর্ত্তব্য।

মাহিনা-ধার্য্যের পূর্ব্বে, বৃদ্ধের আর একটী বিষয় জানিবার জন্য সাধ জন্মিল। অমরসিং সাধু না চোর,—ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। বাহ্যদৃষ্টিতে যেরূপ বুঝা যায়, তাহাতে উহাকে মুনি-ঋষির ন্যায় সাধু বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু উহার ভিতরে কি আছে,—উহার মুখে মধু, অন্তরে বিষ কিনা,—ইহা জানা চাই। যে তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বৃদ্ধ পাণ্ডা বৈঠকখানায় বসেন, এক দিন সেই তাকিয়ার নীচে বৃদ্ধ একটী টাকা রাখিয়া দিলেন। বৃদ্ধ রাত্রে অন্দরে উঠিয়া গেলেন, তাকিয়া তুলিবার ভার, অমরসিংহের উপর ছিল। অমরসিং সেদিন তাকিয়া তুলিয়াই টাকা দেখিতে পাইল; এবং টাকাটী লইয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধকে দিল।—বৃদ্ধ অবাক্ হইলেন। সমস্ত জিনিস-পত্র খরিদের ভার ক্রমশঃ অমরসিংহের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। বৃদ্ধের ধারণা ছিল যে, অমরসিংহ বাজার করিতে গিয়া, নগদ টাকা চুরি না করুক, দস্তরি নিশ্চয়ই লয়; কারণ দস্তরি লওয়া একরকম প্রথা। অমরসিংহ দস্তরি লয় কিনা, অথবা বাজারের টাকা পয়সা চুরি করে কিনা, ইহা পরীক্ষা করিতে, বৃদ্ধ প্রস্তুত হইলেন। প্রয়াগের পাঁচ সাত জন প্রসিদ্ধ দোকানদারের সহিত, বৃদ্ধ এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন, পরামর্শ স্থির হইলে, বৃদ্ধ অমরসিংকে কহিলেন। "অমুক অমুক দোকানদার ভালো; অমুক অমুক দোকানদারের জিনিস ভালো, স্বভাব ভালো;—অতএব আটা হোক্, ডাল হোক্, কাপড় হোক্,—অমুক অমুক দোকান হইতে লইয়া আসিবে।—অন্য দোকানে কিনিবে না।"

অমরসিং নির্দ্দিষ্ট দোকানে আটা কিনিতে গেল। দোকানদারের সহিত দরের কষাকষি আরম্ভ হইল। অমরসিংহের নিকট বাজারের দর ছাপা ছিল না। আটার দর ঠিক ঠিক অমরসিংহের মুখে শুনিয়া, দোকানদার আশ্চর্য্যান্বিত হইল। দোকানদার শেষে কহিল, "তুমি এইরূপ দর-কষাকষি করিলে আমি তোমাকে দস্তুরি দিতে পারিব না।" অমরসিং ধীরভাবে উত্তর দিল, "আমি দস্তুরি চাহি না।" দোকানদার পুনরায় কহিল, "তুমি কি রাগ করিতেছ? রাগ করিও না, দস্তুরি তোমাকে দিব।" অমরসিং কহিল, "দস্তুরি লওয়া আমার ব্যবসা নহে।—আমি কস্মিন্‌কালে কোন দোকানদারের নিকট হইতে দস্তুরি লই নাই; সুতরাং রাগও করি নাই। আমি ষোল আনা টাকা দিব, ষোল আনা জিনিস লইব। মনিবের এক পয়সা আমার বুকের রক্ত-স্বরূপ। অতএব দস্তুরি-লোভ আমাকে দেখাইও না। যদি ঠিক-দরে আমাকে আটা দিতে পারো, তবে দাও; নচেৎ আমি মনিবকে গিয়া একথা জানাইব।" দোকানদার অমরসিংকে পরাস্ত করিতে গিয়া নিজে পরাস্ত হইল। নির্দ্দিষ্ট ঠিক-দরে, অমরসিং দেড়মণ আটা খরিদ করিল এবং তাহা মাথায় করিয়া প্রভুর বাটীতে আসিল। কহিল, "আপনি এই দোকানদারকে ভালো বলিয়া ছিলেন; কিন্তু কিছুতেই আমার ভালো বলিয়া বোধ হইল না।—এ ব্যক্তি দস্তুরিরূপ ঘুষ আমাকে দিতে চায় এবং আমাকে মহার্ঘ্যদরে আটা লইতে বলে।" প্রভু পাণ্ডা প্রকৃত কথা গোপন রাখিয়া উত্তর দিলেন, "তবে তোমার যে দোকানে ইচ্ছা, সেইখান হইতে আমার জিনিস-পত্র লইও।—তুমি যাহাকে ভালো বুঝিবে, তাহারই নিকট হইতে জিনিসপত্র লইও।"

এইরূপ এবং অন্যরূপ অনেক পরীক্ষা করিয়া, পাণ্ডা বুঝিলেন, অমরসিং চোর নহে,—সাধু; অমরসিং ঝুটা নহে,—সাচ্চা; অমরসিং গিল্টি নহে,—খাঁটী সোণা; অমরসিংকে তখন মাহিনা দিয়া, যত্নে রাখা, বৃদ্ধ যুক্তি-সিদ্ধ বোধ করিলেন। একদিন অমরসিংকে বৃদ্ধপাণ্ডা কহিলেন, "তুমি যাত্রিগণের নিকট হইতে মাসিক কি পাও?—প্রত্যহ গড়ে তোমার কয় আনা করিয়া রোজগার হয়?" অমরসিং কহিল, "কৈ, যাত্রিগণের নিকট হইতে ত আমি কিছু লই না?—আমার রোজগার ত কিছুই নাই।"

বৃদ্ধ। সেকি কথা! যাত্রিগণের নিকট হইতে পাণ্ডার ভৃত্যগণ প্রত্যহ কিছু কিছু লইয়া থাকে।

অমর। আমি কিছুই লই না, অন্য ভৃত্যগণ যে লয়, তাহাও জানি না। এরূপ লওয়া যে প্রথা, তাহাও শুনি নাই। বিশেষতঃ, আপনার যখন এসম্বন্ধে কোন আদেশ ছিল না, তখন ত আমি লইতেই পারি না। আর এক কথা যাত্রীদের নিকট হইতে এরূপভাবে পয়সা লইতে আমি ইচ্ছুকও নহি।

বৃদ্ধ। কেন, কেন? তুমি যাত্রীদের জন্য মোট বও, ঘর পরিষ্কার করিয়া দাও, ফুল-তুলসীপত্র আনো, বাজার করো, যাত্রিগণকে পথ চিনাইয়া লইয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াও,—যাত্রিগণের তুমি এত কাজ করিতেছ, অথচ যাত্রিগণের নিকট হইতে পয়সা লও না,—এ কেমন কথা?

বিদায়ের সময় যাত্রিগণকে বলিলেই ত তাহারা তোমাকে কিছু কিছু দিয়া যায়;—তুমি লও না কেন?

অমর। আমি যাত্রিগণের যে কার্য্য করি, সে ত আপনার আদেশে। এক হিসাবে দেখিতে গেলে, আমি ত যাত্রিগণের কোন কাজ করি না, সে কাজ ত আপনার।

বৃদ্ধ। সে যাহা হোক্, এখন হইতে তুমি যাত্রিগণের নিকট আপন অংশ আদায় করিয়া লইও।

অমর। (জোড় হাতে) প্রভু! ঐটী আমাকে ক্ষমা করিবেন। পয়সার জন্য যাত্রীকে আমি মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিব না।

বৃদ্ধ। আচ্ছা, মুখ ফুটিয়া বলিতে না পারো, যদি কোন যাত্রী আপনা হইতে তোমাকে কিছু দেয়, তাহা হইলে ত তুমি লইতে পারিবে?

অমর। হাঁ! আপনা হইতে যদি কোন যাত্রী কিছু দেয়, তাহা অবশ্যই লইব; এখনও লইয়া থাকি; কিন্তু সে পয়সা আমি নিজে লই না; আপনাকে দিয়া বলি,—যাত্রিগণ য়াগিয়াছে।—আপনি তাহা লন।

বৃদ্ধ। ও বটে, বটে! তুমি আমাকে মধ্যে মধ্যে চারি আনা, আট আনা দিয়া থাক বটে! কিন্তু সে পয়সা যে তোমার প্রাপ্য, তাহা আমি জানিতাম না। যা হোক, এখন হইতে উহা তোমারই থাকুক।

অমর। (জোড় হাতে) প্রভু! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাত্রিগণের পয়সা আমি লইব না। যাত্রিগণের স্বেচ্ছা-প্রদত্ত পয়সা আপনারই থাকিবে,—আমি বাহক মাত্র।

বৃদ্ধ পাণ্ডা অন্তরে বড় প্রীতি পাইলেন।

বৃদ্ধ। অমর, তোমাকে স্থায়ীরূপে আমার সংসারে রাখিব, ইচ্ছা।—মাসিক কত টাকা বেতনে তুমি থাকিতে পারো?

অমর। প্রভু, দয়া করিয়া আমাকে যাহা দিবেন, তাহাতেই আমি থাকিব। আপনি দয়া করিয়া আহার দিয়া আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছেন,—আপনি যাহা দিবেন, তাহাতেই আমি থাকিব। যদি কিছু না দেন, তাহা হইলেও আমি থাকিব।

বৃদ্ধের চক্ষু-কোণে জলবিন্দু দেখা দিল। চোখের জল সংবরণ করিয়া বৃদ্ধ কহিল, "তুমি ধন্য-পুরুষ!—তোমাকে আমি উপযুক্ত বেতনই দিব।—কি দিব, এখন আমি বলিব না। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি কিছুদিন জীবিত থাকো, এবং আমার এই বিস্তৃত বিষয়-কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করো। তোমার মত সাধু, সচ্চরিত্র এবং ক্ষমতাবান্ লোক ইহজীবনে আমি আর কখন দেখি নাই।—তুমি জীবিত থাকো। তোমার সন্তান-সন্ততি নাই যে, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিব, তাহারা চিরায়ু হোক্। তবে তোমাকে পুনঃপুনঃ আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি চিরায়ু হও। আর উপযুক্ত পাত্রী খুঁজিয়া এই প্রয়াগ ধামে তোমার বিবাহ দিব। তোমাকে গৃহবাসী করিব।—আশীর্ব্বাদ করি, তুমি কিছু দিন জীবিত থাকো।"

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া, যুবক অমরসিং একবার আকাশ পানে চাহিল। চাহিয়া চাহিয়া, আকাশ দেখিয়া দেখিয়া, যুবক বলিল, "আমার চোখে কি পোকা পড়িয়াছে।" অমনি অঞ্চল দিয়া চোখের জল মুছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রয়াগের এ বৃদ্ধ পাণ্ডার নাম—কেশবরাম। ইনি একজন ধনবান্ পাণ্ডা। জমিদারীর আয় বার্ষিক কুড়ি হাজার টাকার অধিক নহে বটে; কিন্তু ইহাঁর নগদ টাকা, লক্ষ কি কোটী, তাহা কেহ স্থির করিতে পারিত না। তাহাকে কেহ বলিত, লক্ষপতি; কেহ বলিত, ক্রোড়পতি। তেজারতি ব্যবসায়ে ইহাঁর আয় বিলক্ষণ ছিল। এবং যাত্রীর আয়ও ইহাঁর অনেক ছিল। কতকগুলি রাজা, জমিদার,—ইহাঁর বাঁধা-যজমান ছিল। ইহা ব্যতীত গৃহস্থ যজমানও ইহাঁর বহুসংখ্যক ছিল।

কেশবরাম বাল্যকাল হইতেই পাণ্ডা। পঞ্চম বর্ষ বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। সুতরাং তিনি এখন পাণ্ডা-গিরিতে পাকিয়া, একেবারে ঝুনা হইয়া আছেন। মধুর বাক্যে যাত্রী বশ করিতে, তাঁহার মত কেহ আর তখন সক্ষম ছিল না। যাত্রীদের প্রতি তাঁহার যত্ন, ভালবাসা, খুবই ছিল। তাঁহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তিনি সর্ব্বদা দেখিতেন। তবে তাঁহার দোষ ছিল বা গুণ ছিল,—একটী। যাত্রীর বিদায়-কালে, তিনি পয়সা লইয়া, বড়ই টানাটানি করিতেন। যাত্রীর সম্মুখে এমনি একটী লম্বা-চৌড়া ফর্দ্দ ধরিতেন যে, তাহা দেখিয়াই যাত্রীর চক্ষুস্থির হইত! পাণ্ডার অন্যদিকে ধর্ম্মকর্ম্ম অনেক ছিল; অতিথিগণকে নিত্য-নৈমিত্তিক দান-সেবা ছিল, ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে অন্নদান ছিল; ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণদায়ে মুক্ত করা ছিল; কতকগুলি অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু ব্যক্তির মাসিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল; দেব-দেবীর নিত্য পূজা দেওয়া ছিল; দেবতা-সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করা ছিল; সবই ছিল,—ছিল না কেবল, একটী। যাত্রীর বিদায়কালে, তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান থাকিত না। যে যেমন যাত্রী, তাহা বুঝিয়া, পাণ্ডা সেইরূপ ফর্দ্দ করিতেন। কাহারও নিকট হইতে কখন এক টাকা বাড়ীভাড়া লইতেন; সেই বাড়ীরই ভাড়া অন্য সময়ে অন্য লোকের নিকটে দশ টাকা চাহিয়া বসিতেন। শ্রাদ্ধে আট আনার থাল দিয়া দুটাকা লিখিতেন; পাঁচ সের চাউল দিয়া পঁচিশ সের লিখিতেন। যাত্রিগণ প্রথমে মহা সমাদর এবং অভ্যর্থনা পাইয়া, শেষে যখন ঐ বিরাট ফর্দ্দ দেখিত, তখন তাহাদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া যাইত। যাত্রিগণ বাদ-প্রতিবাদ করিলে, পাণ্ডা সে কথা কিছুতেই শুনিতেন না। যতক্ষণ না আপন কড়াগণ্ডা বুঝিয়া পাইতেন, ততক্ষণ তিনি যাত্রিগণকে ছাড়িতেন না; তবে তাঁহার এই গুণ ছিল,—

কোন যাত্রীর পুঁটুলি লইয়া তিনি টানাটানি করেন নাই, অথবা কোন যাত্রীকে এজন্য কখন প্রহারও করেন নাই। প্রথমতঃ যাত্রিগণকে মিষ্টকথা বলিয়া খুব আত্মীয়তা দেখাইয়া, ফর্দ্দ অনুযায়ী টাকা পাইবার তিনি চেষ্টা করিতেন; সে চেষ্টা যখন বিফল হইত, তখন তিনি মৃদু-মন্দ-মধুর ধমক দিতে আরম্ভ করিতেন। ধমকের চরমসীমা ছিল এইরূপ;—"টাকা চুকাইয়া না দিলে আমি তোমাদিগকে এখান হইতে উঠিতে দিব না।" তাহাতেও যে যাত্রী টাকা দিতে পারিত না, কেবল বসিয়া বসিয়া কাঁদিত, বৃদ্ধপাণ্ডা তাহাকে ছাড়িয়া দিতেন; তবে ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে, কোন কোন যাত্রীর নিকট তিনি এক আধটা হাণ্ডনোটও লিখাইয়া লইতেন। চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পাণ্ডা কেশবরাম এইরূপে সতেজে স্বকার্য্য চালাইয়া ছিলেন। চল্লিশের পর বয়স যখন পঁয়তাল্লিশে উঠিল, তখন মেজাজ কিছু নরম হইল। যাত্রীদের উপর সেরূপ উৎপীড়ন বারো আনা কমিয়া গেল। এখন তাঁহার বয়ঃক্রম ষাট বৎসর। কোনরূপ উৎপীড়ন এখন আর তাঁহার নাই। এখন তিনি সাধুপাণ্ডা বলিয়া প্রয়াগধামে সুবিখ্যাত।

ঐশ্বর্য্যে যেরূপ তিনি অতুলনীয় ছিলেন, কার্পণ্যেও সেইরূপ তিনি অতুল্য। সেই মোটা কাপড় পরিধান, হাঁটুর নীচে সে কাপড় কখন পড়ে নাই।—সেই প্রভাতে উঠিয়া খালি-পায়ে একটি ঘটী হাতে করিয়া প্রায় এক ক্রোশ পথ চলিয়া সঙ্গম-তীর্থে তিনি আসিতেন। তাঁহার জুতা ছিল কি না, তাহা কেহ জানে না। কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন, তাঁহার এক জোড়া জুতা আছে। তবে সে জুতা,—বারো বৎসর পূর্ব্বে, কি বাইশ বৎসর পূর্ব্বে খরিদ, তাহা কেহ বলিতে সক্ষম হইত না। জুতা প্রথমতঃ কাগজে মোড়া তাহার উপর নেকড়া দিয়া বাঁধা;—এক পৃথক্ প্রকোষ্ঠে, সযত্নে তাহা রক্ষিত ছিল। বৎসরের মধ্যে দুই দিন কি তিন দিন, সে জুতা পায়ে উঠিত কি না সন্দেহ। কোন দরবারে মাজিষ্ট্রেট সাহেব যদি নিমন্ত্রণ করিতেন, কেশবরাম সেই দিন সেই জুতা পায়ে দিতেন। বাজার করিতে গিয়া কেশবরাম এখনও দশ পনর সের মোট হাতে করিয়া লইয়া আইসেন। ভক্ষণ,—লবণ এবং আটার রুটী;—তাহার উপর যৎকিঞ্চিৎ ঘি যেদিন হইত, সে দিন সমারোহের আর সীমা থাকিত না। আবার উহার উপর যে দিন একটু ডাল হইত, সে দিন ত দান-সাগর ব্যাপার! এমনও বলিতেন, "এরূপভাবে ডাল এবং ঘি যদি প্রতিদিন নষ্ট হয়, তাহা হইলে সংসার অচল হইয়া পড়িবে।" একখানি গামছা তাঁহার তিন বৎসর যাইত। দু'খানি কাপড়ে তাঁহার বৎসর কাটিত। দান-ধ্যান যাহা ছিল, তাহা সমস্তই বাঁধাবাঁধি নিয়মে,—এক-চুল এদিক-ওদিক হইবার যো নাই। তাঁহার পিতার উইলে দানাদির নিমিত্ত মাসিক পঞ্চাশ টাকা ব্যয় করিবার কথা লিখিত ছিল;—বরং ঊনপঞ্চাশ হইত, তবু কখন একান্ন হইত না। তবে বয়স যখন তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর হইল, তখন শুনা যায়, তিনি নাকি কিছু মুক্তহস্ত হন। মুক্তহস্ত হইলেও, পায়ে জুতা ছিল না, গায়ে আঙরাখা ছিল না, পরণে লম্বা ধুতি ছিল না,—এই সময়ে তাঁহার আঁচলের খুঁটে চারি গণ্ডার পয়সা বাঁধা থাকিত।—গরীব দুঃখী দেখিলে তাহা স্বহস্তে দান করিতেন। কিন্তু এমনি স্বভাব যে, ঐ চারি আনা হইতেও আবার দুই আনা বাঁচাইয়া তাহা ঘরে লইয়া যাইতেন। যে ক্ষেত্রে পয়সা ব্যয় না হয়, সেইরূপ ক্ষেত্রে, তিনি দয়া দেখাইতে, সদা পরের উপকার করিতে,—সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার মেজাজ ক্রমশঃ মোলায়েম হইয়া আসিতে লাগিল। যখন ষাট বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তাঁহার মেজাজ বড়ই মিঠা হইয়া উঠিল। এই সময়েই তিনি অমরসিংহকে—ক্ষুধার্ত্ত অভুক্ত অমর-সিংহকে,—অন্ন দিয়া, জল দিয়া, দুগ্ধ দিয়া রক্ষা করেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভাদ্র মাসের ভরা-নদী দেখিতে বড় সুন্দর। নদীর এই অবস্থাকে কবিগণ নদীর যৌবনকাল বলিয়া থাকেন। স্ফূর্ত্তি, তেজ ও দম্ভের সহিত নানা স্থানের নানা নদ নদী এই কালে দুকূল ভাসাইয়া চলিয়া যায়। যখন ছোট ছোট তরঙ্গ উঠে,—মনে হয়, যেন পদ্মফুল নাচে। যখন বড় বড় ঢেউ উঠে,—মনে হয়, যেন নন্দনকানন নাচে। আর নাচে সেই পূর্ণিমা নিশিতে,—সেই নদী-জলের নীচে সেই আকাশের চাঁদ।

এই ভাদ্র মাসে, প্রয়াগ মহাতীর্থে, আকবরের সেই অপূর্ব্ব দুর্গোপরি দাঁড়াইয়া, কখন কি গঙ্গা যমুনার সম্মিলন দেখিয়াছ? ধরাধামে এরূপ শোভা আর আছে কি না, জানি না! সিংহ-গর্জ্জনের ন্যায় জলের গভীর গর্জ্জন,—বড়ই শ্রুতি-ভয়ঙ্কর। শ্রুতি-ভয়ঙ্কর না বলিয়া, শ্রুতিমধুর বলি না কেন? ভয়ঙ্কর ভাবের ভিতর মধুর ভাব কি জন্মিতে নাই? সর্পবিষও ত সুধার কাজ করে! দুর্গের উচ্চ শিখরে দাঁড়াইয়া, নদীর গভীর গর্জ্জন শুনিয়া, আমার ভয় কি? লৌহ-রেলিং-বেষ্টিত সিংহের গর্জ্জন শুনিয়াই বা ভয় কি? মনে করো না কেন, মেঘ রাগের আলাপ হইতেছে? স্বর্গে বিজয়-বাদ্য ধরাধামে বাদিত হইতেছে? মনের উল্লাসে গভীর বাদ্য শ্রবণ করো,—আর সঙ্গে সঙ্গে তাণ্ডবে উন্মত্ত হও না কেন ভাই!—ভয় কি? যদি ভয়ই করিতে হয়; ভয় ত সর্ব্বত্রই এবং সর্ব্বক্ষণই বর্ত্তমান। প্রস্তর-নির্ম্মিত যে দুর্গপ্রাকারে দণ্ডায়মান থাকিয়া, আপনাকে নিরাপদ ভাবিতেছ, সেই প্রাচীর যদি এখনি ভাঙ্গিয়া যায়! মনে করিও না যে, পাথরে নির্ম্মিত শক্ত প্রাচীর,—ভাঙ্গা বড় কঠিন; কিন্তু ঐ দূরে দেখ,—যমুনার জলরাশির

অজের ধাক্কায়,—ঐ দেখ, মোগলের প্রাচীর ভগ্ন-প্রায় হইয়া গিয়াছে। আবার ইংরেজ তাহা পুনঃনির্ম্মাণ করিয়া, ভগ্নদেহে নূতন শরীর যোজনা করিয়াছেন। মৃত্যু-ভয় কখন নাই? এখনি ত ভূমিকম্প হইতে পারে! অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইতে পারে। পর্ব্বত ভূগর্ভে প্রোথিত হইতে পারে। বজ্রাঘাতে মুহূর্ত্তমধ্যে যে, এখনি তোমার প্রাণ-ত্যাগ হইতে পারে! সদা সর্ব্বত্র মরণ নিশ্চয় জানিয়া, মৃত্যুকে কখন ভয় করিও না। যাহা সঙ্গের সাথী,—যাহা ছায়ার ন্যায়, সর্ব্বত্র অনুগমন করে, তাহাতে আবার ভয় কি? অর্দ্ধাঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী অপেক্ষাও, যে তোমাকে অধিক ভালবাসে,—তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে, যে একান্ত অনিচ্ছুক, তাহাকে আবার ভয় কি? যদি তুমি বুদ্ধিমান্ হও, ভাবুক হও, তবে সেই ভয়ের ভিতর, সেই ভয়ানকের ভিতর, কেবল মধুরতা সন্দর্শন করিতে চেষ্টা করো। ভীষণ ভাবের যে মধু, তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মধু বলিয়া, পৃথিবীতে পরিকীর্ত্তিত। তাই ত বলিতেছিলাম, বারিরাশির বিষম গর্জ্জন শ্রুতিভয়ঙ্কর না হইয়া, তোমার শ্রুতিমধুর হউক না কেন?—এবং উহা হওয়াই ত উচিত।

এই পরিপূর্ণ সঙ্গম-জলে, এমনি দিনে, যদি একখানি বা দুইখানি বা তিনখানি সারি সারি বৃহৎ বজরা ভাসে, আর তাহার উপর ষোড়শী কুলবালাগণ,—কখন দাঁড়াইয়া, কখন বসিয়া,—শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি করেন,—ফুলরাশি বেষ্টিত হইয়া মালা গাঁথেন, তোড়া গাঁথেন এবং মাঝে মাঝে রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমবিষয়িণী সঙ্গীত গাথা মধুরকণ্ঠে গাহিতে থাকেন,—তাহা হইলে কি হয়, বলো দেখি? নিরাপদ দুর্গ-প্রাকারে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারো? ভাদ্রমাস, বৃষ্টি যদি হয়, ত উঠিয়া কি পালাও,—না, ছাতা মাথায় দিয়া থাকো?

আবার এ একটি কি নূতন দৃশ্য? কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। এই যুবতীদল চন্দ্র-হট্ট মধ্যে, হঠাৎ একজন যুবক আসিয়া, কোন যুবতী বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া,—তাহার নয়ন-পদ্ম দুটি আপন করপদ্ম দ্বারা হঠাৎ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল,—এখানে উপমা কি দিব? বলিব কি, দুরন্ত রাহু সুধাকর চন্দ্র গ্রাসিল,—অথবা শরীরিণী স্বর্ণ-পঙ্কজিনীকে কাল-ভুজঙ্গ দংশিল;—উপমা পছন্দ হইতেছে ত? যদি পছন্দ না হয়, তবে আর অলঙ্কার-উপমায় কাজ নাই, মূল-আদি উপকরণ লক্ষ্য করিবেন চলুন। সম্মুখে মূল শ্রীমদ্ভাগবত উপস্থিত বঙ্গানুবাদ দেখিবার আবশ্যকতা কি আছে? আসুন পাঠক,—আমার সঙ্গে আসুন,—বজরা দেখিবেন চলুন! অভাবেই উপমা চলিতে পারে, যেখানে স্বভাব, সেখানে উপমার প্রয়োজন কি?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সেই বৃদ্ধ পাণ্ডা কেশবরাম আজ মহাবিব্রত। এক-খানি ছোট ডিঙ্গি করিয়া, কেশবরাম দল-বলসহ কখন সেই বজরায় যাইতেছেন, কখন ফিরিয়া আসিতেছেন। কেশবরাম কখন রাশীকৃত আতপ-তণ্ডুল আহরণ করিতেছেন, কখনও বিবিধ রকমের বহুসংখ্যক বস্ত্র সজ্জিত করিতেছেন, কখনও নানারূপ স্বর্ণ-রৌপ্যের দান-সামগ্রী এবং অলঙ্কারাদি আনিয়া গঙ্গা-তীরে রাখিতেছেন, কখন বা ভৃত্যবৃন্দকে ভর্ৎসনা করিতেছেন, আর কখন বা দুগ্ধ-দধি-ক্ষীর-মিঠাই-বিক্রেতাগণের সহিত সদালাপে নিযুক্ত আছেন;—ফল কথা, কেশবরাম আজ মহাবিব্রত।

বজরা তিনখানি। তন্মধ্যে একখানি খুব বড়। দুই-খানি ছোট। প্রত্যেক বজরার সহিত এক একখানি ডিঙ্গি সংলগ্ন আছে। প্রত্যেক বজরাখানি রঞ্জিত বস্ত্রে এবং ফুল্ল মালাদলে সজ্জিত। বজরার দাঁড়ী-মাঝিগণ সকলেই হিন্দু,—জল-আচরণীয় জাতি।

৺কাশীধামে দীনদয়াল নামে তখন এক বিখ্যাত সওদাগর ছিলেন। লোকে তাঁহাকে ধনকুবের বলিত। কলিকাতায়, পাটনায়, মুজাপুরে, এলাহাবাদে, কাণপুরে, দিল্লীতে, লাহোরে,—ভারতবর্ষের নানাস্থানে তাঁহার দোকান-আড়ত-কারবার ছিল। দীনদয়াল দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। কেবল নিজের কৃতিত্বের গুণে, এরূপ বড় সওদাগর হন। তাঁহার ব্যবসার মূল পুঁজি ছিল,—সততা। ইহার উপর পরিশ্রম ছিল, ধৈর্য্য ছিল, অধ্যবসায় ছিল, এবং একাগ্রতা ছিল। ব্যবসা আরম্ভের প্রথমকালে তিনি মোট বহন করিতেন,—ফেরিকর হইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া জিনিস ফেরি করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার দর ছিল,—এক। যে জিনিসের দর এক টাকা, ক্রেতাকে সেই জিনিসের মূল্য, তিনি এক টাকাই বলিতেন,—কখন পাঁচ সিকা, দেড় টাকা বা দুই টাকা বলিতেন না। এক টাকার যদি এক পয়সা কম কেহ বলিত, তাহা হইলে সে জিনিস তিনি তাহাকে দিতেন না। জোড়হাত করিয়া, মিষ্ট কথায় অভিবাদন করিয়া ক্রেতাকে কহিতেন, "মহাশয়, মাপ করিবেন,—আমার দর এক;—আমি ইহা, এক টাকার সিকি পয়সা কম বলিলে, বেচিব না।" এই কথা বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে অন্যত্র যাইতেন। ব্যবসায়ে এইরূপ নীতিতে প্রথম বৎসর বড়ই অসুবিধা ঘটিল। সাধারণতঃ লোকের অভ্যাস,—দর-দস্তুর করিয়া জিনিস লওয়া। যাঁহারা পরিপক্ক ক্রেতা,—দ্রব্যের মূল্য, বিক্রেতা যদি দুই টাকা বলিতেন,—তাঁহারা বলিতেন,—"বারো আনায় দিবে?" যাঁহারা কাঁচা ক্রেতা, তাঁহারা বলিতেন, "এক টাকা ছয় আনায় না দিলে ঐ জিনিসটী লইব না।" এইরূপে ক্রেতা-বিক্রেতায় আধ ঘণ্টাকাল, কখন বা এক ঘণ্টাকাল ধ্বস্তাধ্বস্তি চলিত। তার পর জিনিস খরিদ

হইত। বাক্যব্যয়, বাহ্বাস্ফোট, উচ্চ চীৎকার, গঙ্গাজলি, তামাতুলসী গ্রহণোদ্‌যোগ ইত্যাদি ব্যাপার ব্যতীত, কি ক্ষুদ্র জিনিস, কি বড় জিনিস,—কোন জিনিসেরই সওদা হইত না। এহেন কালে, দীনদয়াল যখন "আমার এক দর" এই কথা বলিতে লাগিলেন, তখন অধিকাংশ লোকে মনে করিতে লাগিল,—দীনদয়াল পাকা প্রবঞ্চক, বুজরুক, —ধড়িবাজ্। সুতরাং দীনদয়ালের জিনিস-পত্র অতি সামান্যই বিক্রীত হইতে লাগিল। এমন কি, কোন দিন বা কোন জিনিসও বিক্রয় হইত না। দীনদয়ালের কষ্টের অবধি রহিল না। জিনিস মাথায় করিয়া প্রতিদিন কাশী সহর অলি-গলি ঘুরিয়া বেড়ায়, কষ্টের সীমা থাকে না,—অথচ দিনান্তে গড়ে, প্রত্যহ আট গণ্ডা পয়সার জিনিস বিক্রয় হয় কিনা সন্দেহ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, একদিন দীনদয়াল চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে, মোট মাথায় করিয়া ঘরে আসিতে-ছেন। সমস্ত দিন কাশীসহর ভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এক-দর বলিয়া, সেদিন কেহই তাঁহার কোন জিনিস লয় নাই। সেদিন দীনদয়ালের এমন পয়সা ছিল না যে, এক পয়সার ছাতু-লঙ্কা খাইয়া প্রাণধারণ করেন। প্রত্যেক লোককে জিনিস দেখাইয়াছেন, প্রত্যেক লোককে "লউন লউন" করিয়া ধরিয়াছেন, কিন্তু কেহই কোন জিনিস লন নাই, কারণ দীনদয়ালের এক দর। দীনদয়াল কাঁদিতেছেন আর বলিতেছেন, "হা ধর্ম্ম! সত্য কথার কি এই পরিণাম? সততার কি এই পরিণাম?" দীন-দয়াল আপন কুটীরে গমন করিলেন, ভাবিলেন, "আজ সত্যপথ ছাড়িব। যে সত্যপথে উদরান্নের সংস্থান হয় না, যে সত্যপথে সকলেই আমাকে প্রবঞ্চক এবং মিথ্যাবাদী ভাবে, সে সত্যপথে থাকিয়া আর আমার ফল কি? আজ পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব; মৃত্যুকালে পিতার যে আদেশ-বাক্য,—তাহা অবহেলা করিব;—আমি সত্যপথ ছাড়িব,—কল্য হইতে একদরে বিক্রয় বন্ধ করিব,—এক টাকার স্থলে পাঁচ টাকা হাঁকিব";—এইরূপ ভাবেন, আর দীনদয়াল হাউ হাউ করিয়া কাঁদেন। মাতা বলিয়া-ছিলেন,"বাছা, সত্যপথে থাকিলে অর্দ্ধেক রাত্রে অন্ন হয়,—তুমি সত্যপথ কখন ছাড়িও না।—কিন্তু আজ এই সমস্ত-দিন গেল, রাত্রিও প্রায় অতিবাহিত হয়,—এক ছটাক আটাও ত আমার মিলিল না।" সে রাত্রে দীনদয়ালের আর ঘুম হইল না। অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই দীনদয়াল আবার মোট মাথায় করিলেন,—আবার ফেরি করিতে বহির্গত হইলেন।—"এতদিনের সত্যপথ হঠাৎ আজ ত্যাগ করা ভালো নয়,—আরও এক দিন, দুই দিন, তিন দিন,—দশ দিনই দেখি না কেন? দেখি না, শেষে কি ফল দাঁড়ায়? আমার মা নাই, বাপ নাই, স্ত্রী নাই, সন্তান-সন্ততি কেহ নাই, পোষ্যবর্গ কেহই নাই,—আমার এই একটা পেটের জন্য,—আমার প্রিয়তম প্রাণসম এই ধর্ম্ম-বিষকে বলি দিব কেন?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দীন-দয়ালের আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা জন্মিল।—"দশ দিন বলি কেন, আমার জীবনান্ত পর্য্যন্ত ধর্ম্মপথে থাকিয়া, যদি এরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তবে তাহাও করিব,—তথাপি ধর্ম্মপথ ছাড়িব না। গত কল্য খাইতে পাই নাই বটে, কিন্তু আজ কি কিছু বিক্রয় হইবে না? চার পয়সার সামগ্রী বিক্রয় হইলেও উদরপূর্ণ হইবে,—ভয় কি!"—অনাহারে শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে, তথাপি সেই মোট মাথায় করিয়া, সানন্দচিত্তে, ধর্ম্ম-মদিরায় উন্মত্ত হইয়া, দীনদয়াল ফেরি করিতে চলিয়াছেন।

চিরদিন কখন সমান যায় না। কভু বনে বনে ভ্রমণ, কভু রাজসিংহাসনে আরোহণ। এক বৎসরকাল দীন-দয়ালের এইরূপ কষ্টে অতিবাহিত হইল বটে; কিন্তু বৎসরান্তে দীনদয়াল দেখিলেন, তাঁহার খরিদদারের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। অর্থাৎ তখন কোন কোন লোক বুঝিতে পারিয়াছেন,—দীনদয়ালের দর একই বটে, তাঁহার কথাই সত্য। দ্বিতীয় বৎসরে দীনদয়াল দেখিলেন, তাঁহার খরিদদারের সংখ্যা এত বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, তিনি একা কার্য্য-নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম। তিনি নিজে একটি মোট লন, আর দুইটি ভৃত্য দুইটি মোট মাথায় লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করে। দীনদয়াল যে পাড়ায় মোট নামান, সেই পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তথায় উপস্থিত হন। দর-দস্তুর নাই, কথার বেচা-কেনা নাই, অভিনয়-আড়ম্বর নাই,—অতি অল্প সময়ের মধ্যে, একই দরে, দীনদয়ালের বহুসংখ্যক জিনিস একই স্থানে বিক্রয় হইতে লাগিল।

তৃতীয় বৎসরে দীনদয়াল দেখিলেন, সহরের প্রায় সমস্ত নগরবাসী তাঁহার খরিদদার। তখন আর ফেরি করা চলিল না,—দীনদয়াল একখানি দোকান খুলিলেন। ছোট দোকান ক্রমশঃ বড় দোকান হইল; একখানি দোকান,—ক্রমশঃ পাঁচখানি বড় দোকান হইল। দুই জন ভৃত্য ছিল, ক্রমশঃ পঞ্চাশ জন ভৃত্য হইল;—দীনদয়ালের দোকানে প্রত্যহ এত ভিড় হয় যে, তিনি জিনিস বেচিয়া উঠিতে পারেন না; টাকা গণিয়া লইতে যেন সময় কুলায় না। সততার ফল,—একদরে বিক্রয়ের ফল আজ সার্থক হইল।

দীনদয়াল যখন খুব বড় দোকানদার হইলেন, তখন কোন কোন লোক সন্দেহ করিতে লাগিল,—এখন ইনি পসার জমাইয়া বসিয়াছেন,—অতএব বেশী দরে জিনিস বেচিতেছেন। কিন্তু সে অগ্নিপরীক্ষায় দীনদয়াল সহজে উত্তীর্ণ হইলেন। পসার আরও বাড়িল। তার পর ভারতের নানা স্থানে দোকান-আড়ত প্রতিষ্ঠিত হইল। দীনদয়াল লক্ষ-পতি,—ক্রমশঃ কোটীপতি বলিয়া গণ্য হইলেন।

বলা বাহুল্য, সৌভাগ্যের উদয় আরম্ভেই দীনদয়ালের বিবাহ হয়। তিন পুত্র জন্মিল, দুই কন্যা জন্মিল,—

পঙ্গপালের ন্যায় পৌত্র পৌত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রী দেখা দিল। ভাগিনেয় ভাগিনেয়ী, মাসী-পিসী-মামী-খুড়ী-জেঠাই, দাদা দিদী, পিতামহ-পিতামহী নানা দূরদেশ হইতে নানা-রূপ গিরি-পর্ব্বত নদ-নদী এড়াইয়া দীনদয়ালের গৃহে আসিয়া উপনীত হইতে লাগিলেন। দীনদয়াল কাহাকেও অন্ন দিতে কখন কাতর ছিলেন না। যতই লোক আসুক,—অন্নদানে সকলকেই পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। দীনদয়ালের যখন ষাট বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তিনি ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন। কোথাও মন্দির-প্রতিষ্ঠা, কোথাও বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা, কোথাও অতিথিশালা-প্রতিষ্ঠা, কোথাও কূপপ্রতিষ্ঠা,—এইরূপ নানা সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। যখন তাঁহার বয়স পঁয়ষট্টি বৎসর, তখন তিনি তীর্থ-ভ্রমণে মনোযোগ দিলেন। গঙ্গা ও যমুনা নদীদ্বয়ের উপরিভাগস্থ বহু তীর্থ সন্দর্শন করিয়া আজ তিনি প্রয়াগে,—গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমতীর্থে বজরা আরোহণে উপনীত হইয়াছেন। সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী আছেন, পুত্র আছেন, কন্যা আছেন, জামাতা আছেন, পৌত্রী আছেন, দৌহিত্রী আছেন, নাতজামাই আছেন, বহুসংখ্যক কর্ম্ম-চারী আছেন,—যেন একটা গ্রামের সমস্ত লোক লইয়া দীনদয়াল এক মহাতীর্থে আসিয়াছেন। বজরা রক্ষার্থ এক-দল বন্দুকধারী প্রহরীও আছে। কারণ তখন ডাকাতের বড় ভয় ছিল। সেই বজরায় ছোট ছোট ছেলের সংখ্যা যে কত আছে, তাহা এখনও গণিয়া উঠিতে পারি নাই। ঐ দেখুন, বজরার ছাদে উঠিয়া, এক দিগের রেলিং ধরিয়া, সারি দিয়া বিশ পঁচিশটী ছেলে আছে না? আবার ওদিকে অন্য একটী বজরা দেখুন,—উহাতেও দশ বারটী ছেলে ঐরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া বোধ হইতেছে। তৃতীয় বজরা খানিতেও বালক বালিকার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ছয় মাসের শিশু হইতে আট দশ বৎসরের সন্তান পর্য্যন্ত চারিদিকে দৃষ্ট হইতেছে। ইহাতেই এক রকম বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে, বজরায় যুবক যুবতীর সংখ্যা কত। ছেলে গুলির পোষাকের বাহারই বা কি!—সোনা রূপা হীরা মুক্তা মণি মাণিক্য যেন পোষাকের উপর সদা ঝক্ ঝক্ করিতেছে। আর সুন্দর যুবক যুবতীগণের আগে রংএর বাহার দেখিব, না পোষাকের বাহার দেখিব,—বুঝিয়া ঠিক করা দায়। যদি আগে পোষাকের বাহার দেখ, তবে রং বলিবে,—'এই বার তুমি নিশ্চয় ঠকিলে!' চাঁদ ছানিয়া, জ্যোৎস্না ছানিয়া, চম্পককলি ছানিয়া যে রং প্রস্তুত, আর যে রংএর সহিত বসোরা-দেশজাত প্রফুল্ল গোলাপ পুষ্পের রংএর ঈষৎ সংমিশ্রণ হইয়াছে, বিধাতার সৃষ্ট সেই চরম শোভাময় রং না দেখিয়া, তুমি ও কি কৃত্রিম মানব-কারুকার্য্য দেখিতেছ? ওরূপ ওড়না, অলঙ্কার, মণি মুক্তা যাহা সচরাচর বাজারে দেখিতে পাও, ইচ্ছা করিলে ঘরে বসিয়াও যাহা দেখিতে পাও, তাহা দেখিয়া তুমি এত মুগ্ধ হও কেন?—ছি! তুমি বড় অরসিক! আবার আগে যদি তুমি রং দেখ, পোষাক বলিবেন, রং নশ্বর সামগ্রী, এই আছে এই নাই,—যৌবন ফুরাইল ত রং ফুরাইল।—যাহা নশ্বর, যাহা ক্ষণভঙ্গুর, যাহা জলবিম্ব প্রায়, রসিক সুজন তাহা সন্দর্শন করেন না। যাহা ক্ষণিক সুখ-প্রদ, পণ্ডিত ব্যক্তি তাহার কখন আদর করেন না।—কিন্তু এই যে মুক্তার মালা, এই যে হীরকের হার,—ইহা পর-পর শত যুবতীর যৌবনকালে কণ্ঠদেশে বিরাজিত হইলেও, মলিন হইবে না। তোমাদের রং-এর পরমায়ু সাড়ে তিন বৎসর, আর আমার এ হীরা মুক্তার পরমায়ু সাড়ে তিন শত বৎসর, অথবা সাড়ে তিনহাজার বৎসর।—অতএব বলো দেখি, কে ভালো?—কাহাকে আগে দেখিবে?

এখন কাহাকেও না দেখিয়া, সর্ব্বাগ্রে কি দীনদয়ালকে দেখা উচিত নয়? যিনি মালিক, যাঁহার সর্ব্বস্ব, তাঁহাকে কি একবার খুঁজিবে না? কৈ,—দীনদয়াল কৈ? তাঁহাকে ত কৈ, খুঁজিয়া পাইতেছি না? পঁয়ষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ,—কৈ, এমন মানুষ ত বজরায় দেখি না? খোঁজ। একজন বুড়া তীর হইতে ডিঙ্গি করিয়া বজরায় আসিতেছে বটে। সেই ডিঙ্গীতে কেশবরাম আছেন, আর তাঁহার সেই বিশ্বস্ত ভৃত্য অমরসিংহ আছে। এই বুড়া কি দীনদয়াল হইবে? না,—ইহার পায় জুতা নাই, সুতার মোটা কাপড় পরিধান,—তাহাও আবার হাঁটুর উপর উঠিয়াছে, গায়ে জামা নাই, কেবল মাথায় একটী টুপি আছে। সেই বুড়াই ডিঙ্গীর হাল ধরিয়া উপবিষ্ট। এ ব্যক্তি কখন দীনদয়াল হইতে পারে না,—একজন মাঝি হইবে। যাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য, যিনি কোটীপতি বলিয়া খ্যাত, তাঁহার কি ছাতা জুটে না, জুতা জুটে না? এ সকল না জুটুক,—একখানি বহর-ওয়ালা কাপড়ও কি থাকিতে নাই? যে দীনদয়ালের অগণ্য দাসদাসী, বহুসংখ্যক দাঁড়ী-মাঝি,—সে দীনদয়াল কি কখন হাল ধরে? নিশ্চয়ই এ দীনদয়াল নহে।

দেখিতে দেখিতে ডিঙ্গী বড় বজরায় আসিয়া লাগিল। সেই কর্ণধার,—সেই পঁয়ষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ,—ডিঙ্গির হাল ছাড়িয়া দাঁড়াইবামাত্র, বজরাস্থ সকলে যেন স্তম্ভিত হইল। সকলে জোড়-হাত করিয়া রহিল। তাড়াতাড়ি বজরার সিঁড়ী ডিঙ্গীতে সংলগ্ন করিল। বজরার গোলমাল হঠাৎ যেন যাদুমন্ত্রে থামিয়া গেল।

বৃদ্ধ পাণ্ডা কেশবরাম এবং সেই বৃদ্ধ মাঝি আর সেই বিশ্বস্ত ভৃত্য অমরসিং,—তিনজনে সিঁড়ী দিয়া বজরায় উঠিলেন। বজরার বৈঠকখানার উত্তম আসনের উপর কেশবরাম এবং বৃদ্ধ মাঝি উপবেশন করিলেন,—অমরসিং জোড়হাতে অদূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রকাণ্ড এক সুবর্ণের গড়গড়া আসিল। 'গড়গড়ার নল হীরা-মুক্তা খচিত। একি! ছ টাকা মাহিনার বুড়া মাঝির সোণার গুড়গুড়ি কেন? বৃদ্ধ মাঝি কহিল, "ছোট হুঁকা দাও; গড়গড়া রাখ।" একজন ভৃত্য একটী ছোট

খেলে-হুঁকা আনিল। এইবার কিন্তু সামঞ্জস্য রহিল না। হুঁকার ছিদ্রে হাতী-মুখো একটী সোণার নল আছে। হুঁকাটীর দাম তিন পয়সা হইবে, কিন্তু নলটীর দাম তিন সহস্র টাকার কম নহে। কারণ গজ-কুম্ভের উপর দু'খানি বড় বড় হীরা ঝক্ ঝক্ করিতেছে।—সামঞ্জস্য রহিল কি? সামঞ্জস্য ত গোড়া হইতেই নাই,—ঠেঁটিপরা এক বুড়ো মিনসে তিন পয়সা দামের খেলো হুঁকায় তিন হাজার টাকার এক নল লাগাইয়া তামাক খাইতেছে!—ইহা দেখিলেও যে, বিশ্বাস হয় না!

এ সকলই অসম্ভব দেখিতেছি। ঐ বুড়ো ঠেঁটিপরা লোকটা যে কার্পেটের উপর বসিয়া আছে, সেই কার্পেটের মূল্য আড়াই শত টাকা!

একবার সকলে মুদ্রিত নয়নে ভাবো দেখি,—তবে লোকটা কে? ইনিই সেই দীনদয়াল নয় ত?

হঠাৎ ঝুপ করিয়া একটা শব্দ হইল। সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে "বাপরে, গেল রে, ম'লো রে, ধর্ রে, রাখ্ রে" ইত্যাকার ধ্বনি উঠিল। দারুণ আর্ত্তনাদ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইল। কি হইয়াছে, তাহা কেহই জানেন না,—কেহই কোন কথার উত্তর দেন না। ক্রমশঃ বুঝা গেল, দীনদয়ালের জ্যেষ্ঠ পুত্রের ছোট ছেলেটী গঙ্গার জলে হঠাৎ পড়িয়া গিয়াছে এবং হঠাৎ ডুবিয়া গিয়াছে। সেই ঠেঁটিপরা বৃদ্ধ গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন,—তিনিই দীনদয়াল।

দীনদয়াল উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, "আমার পৌত্রকে আজ যে প্রাণদান করিতে পারিবে, তাহাকে আমি পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দিব।"

ভাদ্র মাসের ভরা গাঙ, খরস্রোতে নদী বহিতেছে, জলও গভীর,—দাঁড়ী মাঝিগণ নঙ্গর ফেলিয়া, প্রত্যেক বজরা এক এক জন সামান্য দাঁড়ীর জেম্মায় রাখিয়া, কর্ত্তার অনুমত্যনুসারে তীরে উঠিয়া প্রয়াগ-সহর দেখিতে গিয়াছে।

দীনদয়াল এই ঘোষণা আরম্ভ করিয়াছেন,—পুরস্কারের কথা তখন মুখ দিয়া ব্যক্তও হয় নাই,—কেবলমাত্র বলিয়াছেন, 'আমার পৌত্রকে যদি কেহ রক্ষা করিতে পারে,'—এমন সময় আর একটী ঝুপ করিয়া শব্দ হইল।—দেখ দেখ আবার কে পড়িল?—দেখা গেল, শুনা গেল, বুঝা গেল, অমরসিং উত্তমরূপ কোমর বাঁধিয়া, গায়ের আঙরাখা খুলিয়া ফেলিয়া, জয় গঙ্গামায়ীকী জয় বলিয়া, গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিয়াছে। ঝাঁপ দিবামাত্র, গঙ্গাজলে ডুবিয়া, গঙ্গার অতলতলে কোথায় যে ভাসিয়া গিয়াছে, তাহা কেহ স্থির করিতে পারিল না।

বাঙ্গলা-ভাষার লেখক।

ন।

(৩)

—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। পিতার নাম শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুপ্ত। আদিবাস—হালিসহর ২৪ পরগণা। বর্ত্তমান বাস বাঁকীপুর, পাটনা।

নগেন্দ্র বাবু একজন শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি। ইংরেজী ও বাঙ্গলায় তাঁহার বিশেষ অধিকার আছে। ফিনিক্স, লাহোর ট্রিবিউন প্রভৃতি ইংরেজী পত্রিকার তিনি একজন বিশিষ্ট লেখক। সময়ে সময়ে এই সকল পত্রিকার সম্পাদকতাও করিয়াছেন। বাঙ্গলার তিনি একজন শক্তিশালী সুলেখক। তাঁহার লিপিকুশলতা ও ভাষার সরলতা অতি সুন্দর। ভাষাকে লইয়া তিনি বেশ খেলাইতে পারেন। ঔপন্যাসিক বলিয়াও লেখক-সমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা আছে। তদ্বিরচিত অনেক ছোট গল্প,—মুক্তি, নূতন বাড়ী প্রভৃতি,—সাহিত্য নামে মাসিক-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। গল্পগুলি সরল, সরস ও সুখপাঠ্য। ভারতীতেও তিনি অনেক প্রবন্ধ, গল্প লিখিয়াছেন। আমাদের এই জন্মভূমিতে "তপস্বিনী" নামে তাঁহার একখানি ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উৎকৃষ্ট উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছিল। এতদ্ব্যতীত লীলা, অমরসিংহ প্রভৃতি তাঁহার আরও কয়েকখানি উপন্যাস আছে। নগেন্দ্র বাবুর ন্যায় কৃতিব্যক্তি বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত থাকিলে, ভাষার অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই।

* * *

—নিখিলনাথ রায়, বি, এল। সাং বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। ইনি প্রথিতনামা প্রত্নতত্ত্ববিৎ, স্বর্গীয় ডাক্তার রামদাস সেন মহাশয়ের জামাতা। সম্প্রতি বি, এল পাস করিয়া বহরমপুরে ওকালতী করিতেছেন। বাঙ্গলা ভাষায় নিখিল বাবুর বিশেষ অনুরাগ আছে। সেই অনুরাগের ফল,—তদ্বিরচিত উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক গ্রন্থ,—"মুর্শিদাবাদ-কাহিনী।" মুর্শিদাবাদ-কাহিনীর ন্যায় গবেষণা ও সংগ্রহ-পূর্ণ ইতিহাস-গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে বিরল। ইতিপূর্ব্বে আমরা "মুর্শিদাবাদ-কাহিনীর" এক বিস্তৃত সমালোচনা এই জন্মভূমিতে প্রকাশ করিয়াছি। ফলতঃ, নিখিল বাবুর ন্যায় কৃতবিদ্য উৎসাহশীল যুবক বাঙ্গলার ইতিহাস আলোচনায় নিযুক্ত থাকিলে দেশের অনেক কাজ করিতে পারিবেন। ওকালতীর মোহে ডুবিয়া থাকিয়া, তিনি তাঁহার সাধের সাহিত্য-সেবা বিস্মৃত না হন, আমাদের এই অনুরোধ।

* * *

—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পিতা ৺ দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য। (সংস্কৃত-সাহিত্য ও শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য ইহাঁর ভট্টাচার্য্য উপাধি।) দ্বারকানাথ ও তাঁহার পিতা

৺ দেবনাথ তর্কসিদ্ধান্ত বিশিষ্ট নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া গ্রামে ইহাঁদের বাস। নগেন্দ্র বাবুর জন্ম শক ১৭৬৫, ৬ই কার্ত্তিক। উপস্থিত বয়স পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইয়া কয়েক মাস হইয়াছে।

নগেন্দ্র বাবু কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের এক জন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম এবং প্রচারক। বাঙ্গলা বক্তৃতায় তাঁহার বিশেষ শক্তি আছে। তাঁহার জ্বলন্ত ও তেজস্বিনী বক্তৃতায় ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিধ্বনিত হইতে শুনিয়াছি। এক সময়ে রাজনৈতিক বক্তৃতায়ও ইনি লিপ্ত ছিলেন। জাতীয় ধনভাণ্ডার সম্বন্ধে কলিকাতা সিমলার অনাথ বাবুর বাজারে তিনি একবার বক্তৃতা করেন। সে উদ্দীপনময়ী বক্তৃতা শুনিয়া, অনেকেই ধন্য ধন্য করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজে মিশিয়া, নগেন্দ্র বাবু ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মজিজ্ঞাসা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, দুঃখী ও পাপীদিগের প্রতি ব্রাহ্ম-সমাজের কর্ত্তব্য, বাল্যবিবাহ, কর্ম্মসাধন, সময় ও সংস্কার, সুরাপান, আমাদের ধর্ম্মের বিশেষত্ব, সাকার ও নিরাকার উপাসনা গ্রন্থ,—ব্রাহ্ম-পরিবারে সাদরে পঠিত হয়। ইহা ব্যতীত থিওডোর পার্কার, বিবিধ সন্দর্ভ এবং রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত নামেও তাঁহার তিন খানি গ্রন্থ আছে।

শেষোক্ত গ্রন্থ খানি,—রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী,—নগেন্দ্র বাবুর প্রভূত যত্ন, পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও গবেষণার ফল। গ্রন্থখানি আকারেও যেমন বৃহৎ, বিবিধ বিষয়-সন্নিবেশে এবং বৈচিত্র্যেও তেমনি মনোহর। সম্প্রতি এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে। গ্রন্থে যুক্তি, তর্ক, প্রমাণ,—অনেক আছে। ফলতঃ, এরূপ সংগ্রহপূর্ণ জীবনী,—বঙ্গ-সাহিত্যে বিরল।

নগেন্দ্র বাবুর বাল্যজীবনী এইরূপ ঃ—বাল্যে স্বগ্রামে সে-কালের গুরুমহাশয়ের নিকট যথারীতি শিক্ষা; অতঃপর হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে ইংরেজী পাঠ; তারপর—কলিকাতার দক্ষিণ ভবানীপুর রসার স্কুলে,—তদানীন্তন টীপু-পরিবারদিগের ইংরেজী বিদ্যালয়ে এনট্রেন্স পর্য্যন্ত। অতঃপর তিনি কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে এনট্রেন্স পাশ করিয়া এফ, এ পাঠ করেন। এই এফ, এ পাঠ পর্য্যন্ত স্কুল বিদ্যার শেষ। এই সময় তিনি যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম হন। বাল্যে,—১৩।১৪ বৎসর বয়সেই তাঁহার ধর্ম্ম-মত পরিবর্ত্তিত হয়। তবে সে সময় স্বাধীনভাবে তিনি কোন কাজ করিতে পারেন নাই।

ষোল বৎসর বয়সে, হিন্দুমতে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। পঠদ্দশায়, ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ-প্রভাকরে তিনি মফস্বলের সংবাদাদি লিখিতেন। নগেন্দ্র বাবু বলেন সংবাদ প্রভাকর পড়িয়াই তাঁহার একেশ্বর বাদে আস্থা ও পৌত্তলিকায় অনাস্থা জন্মে। এবং সেই হিসাবে, গুপ্ত কবি ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার ধর্ম্মগুরু।

তদানীন্তন সাধুরঞ্জন পত্রে নগেন্দ্র বাবু 'বসন্ত বর্ণনা' প্রভৃতি পদ্য লিখেন। এবং কৃষ্ণনগর কলেজে পাঠকালে, প্রকাশ্য সভায় তিনি অনেক লিখিত-প্রবন্ধ পাঠ করেন।

অতঃপর নগেন্দ্র বাবু কৃষ্ণনগর এংগ্লোভার্ণকুলার স্কুলে শিক্ষিকতা করেন। দশ বারো বৎসর কাল তিনি এই কাজে নিযুক্ত থাকেন। স্কুলের ছুটীতে মধ্যে মধ্যে তিনি কলিকাতায় আসিতেন এবং প্রথিতনামা ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির সহিত আলাপ-পরিচয় করিতেন। কলিকাতার সিটীস্কুলেও তিনি কিছুদিন মাষ্টারি করিয়াছিলেন।

হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন্নগর ব্রাহ্ম-সমাজে নগেন্দ্রবাবু কিছু দিন আচার্য্যের কাজ করেন।

নগেন্দ্র বাবু বলেন, তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণে, তাঁহার মাতৃদেবী প্রথম প্রথম বড়ই মনঃকষ্টে কাল কাটাইয়াছিলেন। তারপর, যে কারণেই হউক, ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিল,—সময় সময় তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন এবং বক্তৃতাদিও শুনিতেন। তবে তাঁহার স্ত্রী,—চিরদিনই ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসবতী।

নগেন্দ্র বাবুর প্রথম বক্তৃতা,—কলিকাতার ট্রেনিং একাডেমির ইস্কুল-গৃহে। টাউনহলে "কুচবিহার-বিবাহ" প্রতিবাদ-সভায়ও নগেন্দ্র বাবু বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ভারত-সভার তরফ হইতে মফস্বল ভ্রমণকালে, বহরমপুরেও তিনি সিবিল সার্ভিস বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন।

আজ ষোড়শ বৎসর কাল নগেন্দ্র বাবু সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারকের কাজে নিযুক্ত আছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তজ্জন্য ইহাঁকে এক নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি দেন।

সঞ্জীব বাবু যখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক, সেই সময় নগেন্দ্র বাবু বঙ্গদর্শনে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আর্য্যদর্শনেও তাঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত সঞ্জীবনীতে তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বঙ্গবাসীর প্রথম অবস্থায়ও নগেন্দ্র বাবু বঙ্গবাসীতে প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন। উপস্থিত নব্যভারত মাসিক পত্রে, সময়ে সময়ে তিনি লিখিয়া থাকেন।

নগেন্দ্র বাবুর উপস্থিত বাসস্থান,—কলিকাতা, ৫।১ নং গোয়াবাগান লেন।

* * *

—নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল। সাং শান্তিপুর, নদীয়া। ইনি সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট লেখক। সাহিত্যে ইহাঁর লিখিত অনেক গল্প ও কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। লেখা গুলি চিন্তাপূর্ণ ও লিপি-কুশলতাময়।

জন্মভূমি।

অষ্টম ভাগ। } জ্যৈষ্ঠ। ১৩০৫। { ষষ্ঠ সংখ্যা।

রাজলক্ষ্মী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বালক ডুবিল,—সঙ্গে সঙ্গে অমরসিংহও ডুবিল। বজরায় হাহারব পড়িল। কয়েকটী স্ত্রীলোক উন্মত্তবৎ হইল। দুইটী স্ত্রী জ্ঞানশূন্য হইয়া, বুক চাপ্‌ড়াইতে চাপ্‌ড়াইতে, বালক অন্বেষণার্থ বজরা হইতে যেন জলে ঝাঁপ দিবার উদ্যোগ করিল। বজরায় কোনরূপ শৃঙ্খলা, নিয়ম বা পদ্ধতি রহিল না। স্ত্রীলোকগণ অবাধে, পুরুষের সাক্ষাতে, বজরার বাহিরে আসিতে লাগিল। পুরুষগণও স্ত্রীলোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে লজ্জা বোধ করিল না।

যে দুইটী স্ত্রীলোক অধীরা হইয়া উন্মত্তের ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন,—গঙ্গায় ঝাঁপ দিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একটী বৃদ্ধা, একটী যুবতী। বৃদ্ধা,—বালকের ঠাকুর মা। যুবতী,—বালকের জননী। তাঁহারা উভয়েই বজরার এক প্রান্তভাগে আসিয়া, "হায়! ছেলে কোথায় গেল,—হায়! ছেলে কোথায় গেল" বলিয়া, জলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিলেন। তাঁহারা আলুলায়িত-কেশা, অ লুথালু-বেশা। বৃদ্ধা কণ্ঠ হইতে এক হীরক-খচিত স্বর্ণহার খুলিয়া, গঙ্গাজলে ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন,—"মা গঙ্গা! তোমাকে আমি সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতেছি,—কণ্ঠহার তো সামান্য সামগ্রী,—তুমি আমার ছেলেকে ফিরাইয়া দাও।" শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর দেখা-দেখি, যুবতী বধূও গলদেশ হইতে এক অপূর্ব্ব মুক্তার মালা খুলিয়া জাহ্নবী-জীবনে নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন,—"মা! তুই এই মালা নে,—আর আমার যাহা আছে, সবই তোকে একে একে দিতেছি মা!—তুই কেবল আমার ছেলেকে এনে দে!"

স্ত্রীর এবং পুত্রবধূর এই উন্মত্ত অবস্থা দেখিয়া, বৃদ্ধ দীনদয়াল তাঁহাদিগকে বজরার ধার হইতে সজোরে আনিয়া, এক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করাইলেন। এমন সময় অদূরে এক শব্দ উত্থিত হইল,—'জয় গঙ্গা মায়ীকী জয়!'—দেখা গেল, সেই যুবা পুরুষ অমরসিংহ গঙ্গাজলে ভাসমান হইয়াছেন এবং তাঁহার বক্ষঃস্থলে তিন বৎসরের ছেলেটী রক্ষিত হইতেছে। বাম হস্তের সাহায্যে অমরসিং সাঁতার কাটিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু বজরার দিকে তিনি আসিতে পারিতেছেন না,—বিপরীত দিকে চলিয়াছেন। ভাদ্র মাসের ভরাগঙ্গা,—একটানা স্রোত,—তিনি তীরগতিতে স্রোতমুখে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছেন, আর মুখে সদা ধ্বনি করিতেছেন,—'গঙ্গা মায়ীকী জয়,—গঙ্গা মায়ীকী জয়!'

যখন একদিকে সুবিধা হয়, তখন সকল দিকেই সুবিধা হয়। বজরার দাঁড়ী-মাঝিগণ এমন সময় আসিয়া পঁহুছিল। বিশ্বস্ত প্রভুভক্ত বৃদ্ধ বৈজু মাঝি তীর হইতে দেখিয়াই সমস্ত ব্যাপার বুঝিল; কাহারও সহিত কথা কহিল না। নিমেষমধ্যে আটজন দাঁড়ী লইয়া, বজরাসংলগ্ন একখানি ডিঙ্গি খুলিয়া দিল।—'জয় গঙ্গা মায়ীকী জয়' বলিয়া, বৈজু ডিঙ্গি ছাড়িল।—"ভয় নাই, ভয় নাই,—মা-গঙ্গা রক্ষা করিবেন"—এই কথা বলিয়া, বৈজু মাঝি হাল ধরিয়া বসিল। নক্ষত্রবেগে ডিঙ্গি ছুটিল।

'তীর তারা উল্কা বায়ু শীঘ্রগামী যেবা,
বেগ শিখিবার তরে বেগে যাবে কেবা!'

অনিমেষ-লোচনে বজরার নর-নারীবৃন্দ সেই ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে ডিঙ্গি অমরসিংহের নিকট পঁহুছিল। অমরসিংহের শক্তি এবং সন্তরণপটুতা অতুলনীয়। সন্তরণ-কালে, এক হাতে জল কাটিয়া যাওয়া, ও এক হাতে একটী ছেলেকে রাখা যে, কতদূর কঠিন কার্য্য, তাহা ভুক্তভোগীই জানে। ডিঙ্গি নিকটে পঁহুছিল বটে, কিন্তু অমরসিংহ সহজে ডিঙ্গিতে উঠিতে পারিলেন না। অমরসিংহ ডিঙ্গির গাত্রস্পর্শ করেন-করেন,—এমন ভাব হয়,—আবার ডিঙ্গি একদিকে হটিয়া যায়,—সঙ্গে সঙ্গে অমরসিংহও একদিকে ভাসিয়া যান। অমরসিংহের

বলও ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। ছেলেটীকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা জলের উপর আর পূর্ব্বের ন্যায় তিনি রাখিতে পারিতেছেন না। এক একবার দক্ষিণ হস্ত ঈষৎ ডুবিতেছে, আর সেই সঙ্গে ছেলেটীও ঈষৎ ডুবিতেছে; বৃদ্ধ মাঝি বৈজু একটী দাঁড় লইয়া এবং দুই জন দাঁড়ি লইয়া, তখন জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। আর একটী দাঁড় অমরসিংহের উদ্দেশে ভাসাইয়া দিল। অমরসিংহ সে দাঁড় সহজে ধরিয়া ফেলিলেন। বিশ্রাম পাইলেন। বৈজু মাঝি সন্তরণ-কৌশলে অমরসিংহের নিকটে গিয়া পঁহুছিল এবং জলে চিৎ হইয়া রহিল। সেই ছেলেটী বৈজুমাঝির বুকে অমরসিং কর্ত্তৃক একবার স্থাপিত হইল। অমরসিং আরও বিশ্রাম পাইলেন। বিশ্রাম পাইয়া অমরসিংহের বল আবার সিংহের ন্যায় হইল। ডিঙ্গিও অতি নিকটে আসিয়া পঁহুছিল। তখন অমরসিংহ সজোরে ডিঙ্গির মুখ ধরিলেন, ডিঙ্গির সহিত ভাসিয়া ভাসিয়া যাইলেন। আর দুইজন দাঁড়ী, বৈজু মাঝিকে সাহায্য করিয়া, বৈজু মাঝির দুই পার্শ্বে সাঁতার দিতে দিতে ভাসিয়া চলিয়াছে। নৌকা নিকটে আসিল বটে, কিন্তু নৌকার উপর ছেলেটীকে তোলা বড়ই কঠিন হইয়া পড়িল। তখন অমরসিং উলঙ্গ হইলেন। আপনার লম্বা কাপড়ের এক প্রান্ত নিজে ধরিলেন এবং অপর প্রান্ত বৈজু মাঝির ধরিবার উদ্দেশে ছুড়িয়া দিলেন। লিক্ষিত মাঝি বামহস্ত দ্বারা খপ্ করিয়া তাহা ধরিয়া লইল। দৃশ্যটী তখন এইরূপঃ—দক্ষিণহস্তে অমরসিংহ নৌকার মুখ বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়াছেন, বামহস্ত দ্বারা কাপড়ের এক প্রান্ত ধরিয়া টানিতেছেন। কাপড়ের অপর প্রান্ত বৈজু মাঝির বামহস্তে ধৃত আছে। অমরসিংহের আকর্ষণে বৈজু মাঝি ক্রমশঃ নৌকার দিকে আসিতেছে। আর দাঁড়ী দুইজন বক্ষঃস্থিত সন্তানটী যাহাতে জলমধ্যে পতিত না হয়, তদুদ্দেশেই সদা কার্য্য করিতেছে। অতি অল্প-ক্ষণমধ্যে বৈজু মাঝি ডিঙ্গির অতি সন্নিকটে আসিল। তখন কাপড়ের খুঁট ছাড়িয়া, অমরসিংহ মুহূর্ত্তমধ্যে একেবারে ছেলেটীর দক্ষিণহস্ত ধরিলেন এবং কুস্তীগীরের ন্যায় কৌশলে, ছেলেটীকে ছুড়িয়া ডিঙ্গির উপর ফেলিলেন। ছেলেটীকে গ্রহণ করিবার জন্য, দাঁড়ীগণ হাত পাতিয়া ছিল,—হস্তের উপরেই ছেলে পড়িল। ছেলে ফেলিয়াই অমরসিং ডিঙ্গির উপর উঠিলেন। দেখিলেন, শিশুটী অচেতন। জীবিত কি মৃত, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কাহারও সহিত কথা না কহিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ছেলেটীর পদদ্বয় ধরিয়া, ঘুরাইতে আরম্ভ করিলেন। অমরসিং তখনও উলঙ্গ,—বাহ্যজ্ঞান-রহিত। বৈজু মাঝি এবং দাঁড়ীগণ সকলেই একে একে ডিঙ্গির উপর উঠিল এবং ডিঙ্গি বজরার দিকে চালাইতে লাগিল। ছেলেটীকে অমরসিংহ ঘুরাইতেছেন দেখিয়া, মাঝি বিরক্ত হইল এবং কহিল,—"এ কি করিতেছ?—ছেলে যে মরিয়া যাইবে! এখনি এরূপ ঘুরপাক দেওয়া বন্ধ করো।" অমরসিং মাঝির কথা শুনিলেন না, তিনি আপন মনে ছেলেকে ঘুরাইতে লাগিলেন। বৈজুনাথ ক্রোধ-কম্পিত-কণ্ঠে কহিল, —"ঠাকুর! ছেলে ছাড়িয়া দাও,—নচেৎ এখনি আমরা তোমাকে প্রতিফল দিব,—জীয়ন্ত ছেলেকে তুমি বধ করিও না।" অমরসিং কহিলেন, "যে ছেলের জন্য আমি প্রাণের মায়া না রাখিয়া জলে ঝাঁপ দিয়াছিলাম, সেই ছেলেকে আমি বধ করিতেছি,—বৃদ্ধ হইয়া এ কথা তুমি কেমন করিয়া বলিলে? দেখিতেছ না, ছেলেটী অচেতন, জল খাইয়া ইহার পেট ফুলিয়াছে?—এইরূপ না ঘুরাইলে, উদরের জল বাহির হইবে না, এবং ছেলেটীরও চেতনা হইবে না।—ইহাই উত্তম চিকিৎসা।" বৃদ্ধ মাঝি আর বাক্যব্যয় করিল না।

ডিঙ্গিখানি প্রথমতঃ খর-স্রোতে একটানায় ভাসিয়া আটজন দাঁড়ীর সাহায্যে পাঁচ মিনিট কালমধ্যে অমরসিংহের নিকট আসিয়াছিল; কিন্তু উজান ঠেলিয়া, বজরার নিকট পঁহুছিতে প্রায় একঘণ্টা কাল লাগিল! অমরসিংহ তখনও উলঙ্গ।—সন্তানটীর নাকে মুখে কাণে কখন ফুঁ দিতেছেন,—কখন ধীরে ধীরে, কখন জোরে সন্তানটীকে ঘুরাইতেছেন,—আরও কত রকম যে কি প্রক্রিয়া করিতেছেন, তাহা বর্ণনাতীত।

বজরার নিকট ডিঙ্গি পঁহুছিবামাত্র, এক কলরব করিয়া, প্রায় একশত নর-নারী বজরার ধারে আসিল। বজরা হেলিল। অমরসিংহ সকলকে নিষেধ করিলেন,—"আপনারা সকলে সরিয়া যান, বজরার একধারে সকলে এককালে আসিয়া যেন বজরা ডুবাইবেন না। বালকের জীবন আছে,—বাঁচিবারও সম্ভাবনা আছে,—আপনারা ভীত হইবেন না।"

এইবার বৃদ্ধ মাঝি বৈজুনাথ অমরসিংহের কোমরে কাপড় জড়াইয়া দিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পুত্র যখন জলে ডুবে, তখন পিতা মাতার মন কি রকম চঞ্চল হয়, বলো দেখি? আবার সেই পুত্র যখন জল হইতে উঠে, চেতনা লাভ করে, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজনের মন তখন কিরূপ প্রফুল্ল হয়, বলো দেখি?

পুত্রটী ডুবিয়াছিল, আবার উঠিয়াছে, জীবন পাইয়াছে, শয্যায় শুইয়া এক-আধ বার ঈষৎ মধুর হাসিও হাসিতেছে;—তথাচ তাহার মা কাঁদে কেন? সন্তানটীর সঙ্গে একটী বার কথা কন, সন্তানটীকে একটী বার হাসাইবার চেষ্টা করেন, আর মায়ের দুই চোখ দিয়া জল-বর্ষণ হয় কেন?

এদিকে গঙ্গাতীরে দানের ধুম লাগিয়াছে। বৃদ্ধ ব্যবসায়ী দীনদয়াল, পৌত্রের পুনর্জ্জীবন লাভ হইল দেখিয়া, দীন-দুঃখী-দরিদ্রগণকে অকাতরে অর্থ বিলাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। অকাতরে বলিলাম কেন? দান ত চির-দিনই স্বেচ্ছায় হইয়া থাকে,—কে কবে কাতর হইয়া দান করে? কাতর ভাবে অর্থ বিলায়? নিজের সামগ্রী, দান করা অথবা না করা, দাতার ইচ্ছার উপর নির্ভর। যে দান ইচ্ছার উপর নির্ভর, সে দান তো অকাতরে হইবারই কথা! কিন্তু একথা সত্য হইলেও, সকল সময় এনিয়ম খাটে না। দেখিয়াছি,—কোন কোন দাতা হাজার টাকা দান করিবেন, স্থির করিলেন। একটী একটী করিয়া টাকা গুণিয়া তোড়া পুরিলেন। তোড়া বাহিরে লইয়া গেলেন। বহির্দ্দেশে গিয়া, উপযুক্ত খাজাঞ্চির সহিত যুক্তি করিয়া আপনারই টাকা হইতে আড়াই শত টাকা কমিশন কাটিয়া রাখিলেন। স্ত্রীর নামে ঐ কমিশনের টাকা জমা হইল। কর্ত্তা মহাশয় এরূপ করিয়া সহ-ধর্ম্মিণীর স্ত্রী-ধন বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। কাঙ্গালিগণ পাইল,—অবশিষ্ট সাড়ে সাত শত টাকা। অকাতরে দানের সহিত, কাতর হইয়া দান করার এইরূপই পার্থক্য।

আরও একবার দেখিয়াছি,—স্বয়ং দাতা কাঙ্গালি-গণকে সরায় করিয়া মুড়ি দিতেছেন। পূর্ব্বে যে ব্যক্তির উপর মুড়ি দিবার ভার ছিল, সে এক সরা পূর্ণ করিয়া মুড়ি দিতেছিল। কর্ত্তা তাহার উপর ক্রোধ করিয়া স্বয়ং মুড়ি দিতে লাগিলেন। মুড়ি উঠিতে লাগিল,—আধ সরা করিয়া। অথচ কাঙ্গালির সংখ্যা অধিক নহে এবং মুড়িও প্রচুর পরিমাণে আছে। মুড়ি এত অধিক ছিল যে, কাঙ্গালি বিদায়ের পর রাশীকৃত পর্ব্বত-প্রমাণ মুড়ির স্তূপ গৃহ-মধ্যে দৃষ্ট হইয়াছিল। এইরূপ দানকে কি অকাতরে দান বলা যায়?

এমনও কতকগুলি লোক আছেন যে, দান করিবার কালে তাঁহাদের অসুখের অবধি থাকে না। অতিথি-শালা আছে, তথায় দৈনিক ঘৃত-আটার বরাদ্দও আছে, কিন্তু অতিথি দেখিলেই কর্ত্তা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠেন। এমন লোকও দেখা গিয়াছে যে, সন্ধ্যার সময় যদি তুমি তাঁহার নিকট পাঁচ শত টাকা গচ্ছিত রাখ এবং প্রাতঃ-কালে যদি সেই টাকা তুমি তাঁহার নিকট চাও, তবে সেই টাকা প্রত্যর্পণকালে তাঁহার বিশেষ মনঃপীড়া জন্মে।

আমরা একজনকে দেখিয়াছি,—যাত্রার পেলা দিবার জন্য দশটাকা তিনি লইয়া গিয়াছিলেন। আটটী টাকা প্যালা দিয়া শেষে দুইটী টাকা লুকাইয়া আপন ঘরে লইয়া আসেন। ইহাকেই বলে, নিজের জিনিস নিজে চুরি করা।

দীনদয়াল কিন্তু সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি সত্য সত্যই অকাতরে, অকুণ্ঠিত-চিত্তে, অদম্যনীয় উদ্যমে কাঙ্গালিগণকে অর্থদান করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে দশ সহস্র টাকা কোথায় উড়িয়া গেল! আবার পাঁচ হাজার টাকা দীনদয়াল বজরা হইতে আনাইলেন। সে টাকাও অল্পসময়ের মধ্যে ফুরাইল। নগরে ধন্য ধন্য রব পড়িল।

বৃদ্ধ পাণ্ডা কেশবরামকে দীনদয়াল কহিলেন, "আর এইস্থানে আমি থাকিব না। গয়াতীর্থে যে যে কার্য্য করিতে হয়, তাহা অদ্যই শেষ করিব। আহারান্তে, অপরাহ্ণে, বজরা করিয়া, ৺কাশীধাম পুনর্যাত্রা করিব।"

কেশবরাম একটু দুঃখিত হইলেন। এরূপ বড় মানুষ এবং সদাশয় যাত্রী,—সহজে কোন পাণ্ডার ভাগ্যে ঘটে না। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, দীনদয়ালকে এখানে অন্ততঃ তিন চারি দিন রাখিয়া, মিষ্টকথায় এবং মিষ্টান্ন ভোজনে পরিতুষ্ট করিয়া, তাঁহাকে চির-বাধিত করিয়া রাখিবেন। ভাবিয়াছিলেন, এইরূপ বাধ্য-বাধকতা জন্মিলে, দীনদয়াল তাঁহাকে অন্যূন সর্ব্ব রকমে পাঁচ সহস্র টাকার কম কিছুতেই দিতে পারিবেন না। কিন্তু এক্ষণে দীন-দয়াল গৃহগমনের নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন এবং হঠাৎ এই বিপদ ঘটায় তাঁহার মনও খারাপ হইয়াছে। পৌত্রটী পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া ছ বটে, কিন্তু দীনদয়ালের আতঙ্ক এখনও দূর হয় নাই। বিশেষতঃ, যে দীনদয়াল এইমাত্র এক-দমে, পনর হাজার টাকা দান-কার্য্যে ব্যয় করিয়া ফেলিয়া-ছেন, এবং হয়ত হঠাৎ এইরূপ অভাবনীয় দানে তাঁহার আনীত সমস্ত অর্থ একরূপ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে;—এমত অবস্থায় কেশবরাম আর কি পাইতে পারেন?

বৃদ্ধ পাণ্ডা অনেক কাকুতি-মিনতি করিল, অনেক জোড়হাত করিল,—দীনদয়াল আর একটী দিনও প্রয়াগে থাকিতে সম্মত হইলেন না। দীনদয়ালের পরিবারবর্গ, সঙ্গম-জলে একে একে স্নান করিয়া শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিল, —আপন আপন অধিকার অনুসারে বহু নরনারী মাথা মুড়াইল,—প্রত্যেকে আপন আপন সঞ্চিত অর্থ দরিদ্র-গণকে দান করিল।

অপরাহ্ণ। বিদায়-কাল উপস্থিত। এপর্য্যন্ত দীনদয়াল, বৃদ্ধপাণ্ডাকে একটী পয়সা দেন নাই। এক হাজার টাকা পূর্ণ এক একটী তোড়া,—এমন দশটী তোড়া আনাইয়া, দশ হাজার টাকা দীনদয়াল পাণ্ডাকে দিলেন। বলিলেন,—"এ ব্যাপারে আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দিব সঙ্কল্প ছিল; কিন্তু পৌত্রটী প্রাণ পাইল—এই নিমিত্ত আরও পাঁচ হাজার টাকা দিলাম।" বৃদ্ধ পাণ্ডা অবাক্ হইল।

অমরসিংহ নিকটে দাড়াইয়া ছিলেন। দীনদয়াল দাঁড়াইলেন। ধীরে ধীরে অমরসিংহের নিকটে গেলেন। অমরসিংহের গলা জড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন, "বাপ ধন!—"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধের নয়নযুগল হইতে বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল;—বৃদ্ধ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"বাপধন! তুমিই আজ আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ! তোমার ঋণ পরিশোধ দিবার নহে। আমার পৌত্র আজ এই খরতর বেগবতী গঙ্গায় পতিত

হইয়া ডুবিয়া গিয়াছিল। আমরা এই স্থানে প্রায় তিন শত লোক একত্র ছিলাম। পৌত্রের উদ্ধারার্থ গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে কেহই সাহস করে নাই।—বাপধন! তুমি কিন্তু আমার পৌত্রের জন্য আপন প্রাণের মায়া রাখ নাই। যেমন আমার পৌত্র ডুবিল, সঙ্গে সঙ্গে তুমিও গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে। বলো,—তুমি বলো, কি দিয়া আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করিব! আমার সহধর্ম্মিণী প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তিনি তোমাকে দিবেন। আমার সহধর্ম্মিণীর সম্পত্তি বড় অল্প নয়। আমার পুত্রবধূ তাঁহার সমস্ত বহুমূল্য বসন-ভূষণ তোমাকে দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সেই বসন-ভূষণের মূল্য অন্যূন এক লক্ষ টাকা হইবে। এক্ষণে তুমি আমাকে বলো,—তোমাকে আমি কি দিব?—তুমি যাহা চাহিবে, আমি তাহাই দিব।"

অশ্রুজলে বৃদ্ধের গণ্ডস্থল প্লাবিত হইল। অমরসিংহের চক্ষেও জল দেখা দিল। গলা ছাড়িয়া দিয়া বৃদ্ধ অমরসিংহকে কহিলেন, "বাপধন! তুমি ব'সো,—আমিও ঐখানে বসিতেছি।"

উভয়েই সেইখানে বসিলেন। বৃদ্ধ কহিলেন, "আমার স্ত্রী জানিতে চাহিয়াছেন, তোমার সহধর্ম্মিণী কত বড়। তোমার সন্তান-সন্ততি আছে কিনা? সন্তানগণের তোমার বয়স কত? তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছেন কিনা? তোমার ভাই-ভগিনী আছেন কিনা? তোমার পরিবারে আর কে কে আছে,—তৎসমস্তই তিনি জানিতে চাহিয়াছেন। এ সকল তত্ত্ব জানিবার সহধর্ম্মিণীর অভিপ্রায় এই যে, তিনি মনের মত করিয়া, তোমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, জননী, ভগিনীগণকে সাজাইবেন এবং যথোপযুক্ত অর্থ দিয়া তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিবেন।"

অমরসিংহ মাথা হেঁট করিলেন। কোন কথার উত্তর দিতে পারিলেন না।

দীনদয়াল পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, "বাছা! বাপধন! বলো,—বলো, লজ্জা কি? আমি বৃদ্ধ,—তোমার পিতৃতুল্য; আমার কাছে কোন কথা বলিতে তোমার লজ্জা কি?"

অবনতমুণ্ড অমরসিংহের চোখ দিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল এইবার ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসিলেন, "বাপধন! তুমি কাঁদিতেছ কেন?" অমরসিংহ যেন একটু অপ্রতিভ হইলেন। তিনি বীরপুরুষের ন্যায় মুখ মুছিয়া ফেলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিস্থ হইলেন। এবং বৃদ্ধের মুখের দিকে এইবার আপন মুখ রাখিয়া কহিলেন, "আপনার দয়া, বাৎসল্য এবং স্নেহ দেখিয়া, আমার চক্ষে জল আসিয়াছিল। এমন স্নেহময় মানুষ আমি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই।"

বৃদ্ধ। সে যাহাই হউক, তোমার কে কে আত্মীয়-স্বজন আছেন, তাহা বলো।

অমরসিংহ আবার পৃথিবীপানে চাহিলেন। পৃথিবীর নিকট সদুত্তর না পাইয়াই বুঝি তৎক্ষণাৎ আবার আকাশ-পানে চাহিলেন। অনন্ত আকাশও কোন সদুত্তর দিতে পারিল না। তিনি তখন সেই গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমস্থল,—সেই বিরাট মহাতীর্থ,—সেই ধরাধামে অপূর্ব্ব স্বর্গ,—সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। উত্তর দিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, বৃদ্ধ আবার কহিলেন, "বাপধন! বলো, বলো. তোমার কে আছে? তোমার মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন কে কোথায় আছে,—বাপধন! বলো, বলো,—আর বিলম্ব সহ্য হয় না।"

রঙ্গস্থলে পালোয়ানের কুস্তির ন্যায় অমরসিংহ এবার হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন। ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। সেই সঙ্গে তাঁহার বিশাল বক্ষঃ তালে তালে স্ফীত হইতে লাগিল। তাঁহার বিস্তৃত নয়ন আরও যেন বিস্ফারিত হইল। উজ্জ্বল নয়নতারাদ্বয় যেন ধক্-ধক্ জ্বলিতে লাগিল। তাঁহার দেহে যেন দৈববলের আবির্ভাব হইল। অমরসিংহ কহিতে লাগিলেন,—ধীরে ধীরে, তীব্রকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—"মহাশয়! আমি দীন-দরিদ্র! দরিদ্র ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন কেহ থাকে না! দরিদ্র ব্যক্তির মাতা থাকে না, স্ত্রী থাকে না, ভ্রাতা থাকে না, কন্যাও"—

'কন্যাও' এই কথা বলিবার সময় আবার তাঁহার মুখ হেঁট হইল। চোখ দিয়া জল পড়িল কিনা জানি না। আবার তৎক্ষণাৎ সেই হেঁটমুণ্ড তিনি উচ্চে উঠাইলেন। কহিলেন, "দরিদ্র ব্যক্তির কন্যাও থাকে না।"

অমরসিংহের গলার স্বর এবার কিন্তু ভাঙ্গা-ভাঙ্গা।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসিলেন, "তবে কি তোমার কেহই নাই?"

অমরসিংহ আবার উত্তর দিলেন, "দরিদ্র ব্যক্তির কেহই থাকিতে পারে না!"

বৃদ্ধ। তাহা হইলে তোমার কেহই নাই?

অমর। আমি দরিদ্র, মুটে-মজুর, কুলি,—আমার আবার কে থাকিবে? আমার সব শূন্যাকার। আমার ত্রিভুবন অন্ধকার।

নবম পরিচ্ছেদ।

এইরূপ কথা বার্ত্তা শুনিয়া, পাণ্ডা দীনদয়াল চমকিলেন। বুঝিলেন, অমরসিংহের ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে। অমরসিংহের ভৃত্যগিরি এইবার ঘুচিল, এইবার বুঝি সে রাজা হইল। দীনদয়ালের সহধর্ম্মিণীর সমস্ত বিষয় যদি অমরসিংহ পায়, তাহা হইলে ত সে সত্য সত্যই রাজা। শুনিয়াছি, বার্ষিক পঁচিশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দীনদয়াল আপন স্ত্রীর নামে লেখা পড়া করিয়া দিয়াছেন। প্রয়াগে দীনদয়ালের যে তুলার আড়ত আছে, তাহা ত তাঁহার স্ত্রীরই নামে। পার্ব্বতীর আড়ত বলিয়া ঐ তুলার আড়ত

বিখ্যাত। দীনদয়ালের স্ত্রীর নাম শুনিয়াছি,—পার্ব্বতী। ইহা ভিন্ন পার্ব্বতীর অলঙ্কার আদিরও দাম হইবে, অন্যূন দুই লক্ষ টাকা। এদিকে দীনদয়ালের পুত্রবধূ আপন যাবতীয় বসন-ভূষণ অমরসিংহকে দিবেন, বলিয়াছেন; তাহার দাম এক লক্ষ টাকার কম নহে। এত অর্থ দিয়াও দীনদয়ালের মনস্তুষ্টি হয় নাই,—তিনি বলিতেছেন,—"বাপধন, অমরসিংহ! তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই তোমাকে দিব।" আমার বোধ হয়, ইহার একটী কথাও, কোন কাজের কথা নহে। এত সম্পত্তি কি কেহ কাহাকেও দিয়া থাকে? আর দান ত পাত্র বুঝিয়া করিতে হয়। অমরসিংহ গরীব, খাইতে পায় না, পঞ্চাশ টাকা দানই উহার পক্ষে যথেষ্ট। একটী ক্ষুদ্র মাছিকে এক হাঁড়া মধুদান কখনই সঙ্গত নহে। বৃদ্ধ দীনদয়াল যাহা বলিতেছেন, তাহা ত একেবারেই অসম্ভব।—"তুমি যাহা চাহিবে, আমি তাহাই দিব"—ইহাই হইল দীনদয়ালের উক্তি। অমরসিংহ যদি বলে, স্থাবর অস্থাবর তোমার যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই আমাকে দাও তাহা হইলে,—তখন উপায়? দীনদয়ালকে যে একেবারে দুনিয়ার ফকির হইতে হইবে! আমার বোধ হয়, দীনদয়ালের এ সব কথা কোন কাজের কথা নহে। মনের আবেগে হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াছেন। বেগ একটু কমিলেই আপ্‌শোষ উপস্থিত হইবে। তখন তিনি আম্‌তা আম্‌তা বুলি ধরিবেন। দামের এখনও কোনরূপ পাকা কথা-বার্ত্তা হয় নাই। এই সময় দীনদয়ালকে আমার সতর্ক করা উচিত। বিশেষ অমরসিংহ যদি এককালে এত সম্পত্তি পায়, তাহা হইলে সে নিশ্চয় আমার চাকরি ছাড়িবে। আমি শুধু-শুধু এমন ভাল চাকরীটী হারাইব। ছেলেরা সেরূপ মানুষ হয় নাই। মনে ভাবিয়াছিলাম, অমরসিংহকে আমার বাড়ীর তত্ত্বাবধায়ক করিব। যেরূপ গতিক দেখিতেছি, বুঝি আমার সে আশা একেবারে দূর হয়।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধ পাণ্ডার ক্রমশঃ অমরসিংহের উপর একটু রাগ হইল। তিনি মনে মনে কহিলেন, "ছেলেটা বজরা থেকে প'ড়ে জলে ডুবেছিল, ডুবেই ছিল; তোর এত কি,—তুই জলে ঝাঁপ দিলি কেন? তোর উপর কি তোল্‌বার ভার পড়েছিল? আর, তুই-শুদ্ধ যদি তলিয়ে যেতিস্! তোকে তখন কে রাখ্‌ত? যত অহাম্মুক নিয়ে আমার ঘর-কন্না কিনা!"

পাণ্ডা কেশবরাম এইরূপ যতই ভাবেন, ততই তাঁহার রাগ বৃদ্ধি হয়। ক্রমে দীনদয়ালের উপরও তাঁহার রাগ হইল।—"আচ্ছা, সে লোকটাও কি পাগল হইল? তাহার স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, পুত্রবধূ আছে, পৌত্র আছে, তবু সে বলে কিনা, তুমি যাহা চাহিবে, আমি তাহাই দিব! নিশ্চয়ই তাহার মাথা খারাপ হইয়াছে। বেশ একটী বড় মানুষ যজমান পাইয়াছিলাম, সেই যজমানটীও বুঝি এইবার যায়! অমরসিংহকে যদি সমস্তই দান করিয়া ফেলে, তাহা হইলে দীনদয়ালের আর রহিল কি? তখন আর উহার পুরোহিত হইয়া আমারই বা লাভ কি? আর ইহাও এক বড় আশ্চর্য্য দেখিতেছি,—আমাকে সে দিল কেবল মাত্র দশ হাজার টাকা, আর আমার চাকরকে কিনা সে যথা-সর্ব্বস্ব দিতে চায়! সে ত আমার চাকর! আমার যখন সে মাহিনা খায়, তখন তাহার কৃতকর্ম্মের ফল আমি কেন না পাইব? অতএব যদি যথাসর্ব্বস্ব দীনদয়াল দেয়, তাহা হইলে আমাকেই দিক্; নহিলে তাহার ধর্ম্ম বজায় থাকিবে না!

"এযে বড় বিপদে পড়িলাম দেখিতেছি। এমন প্রভু-ভক্ত বিশ্বাসী চাকরটীও হাতছাড়া হইল। অথচ আমি বোধ হয় ইহার পরিবর্ত্তে পাই-পয়সাও পাইতেছি না। কি উপায়ে এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইতে পারি,—সদ্‌যুক্তি কি! সমস্যা বড় বিষম! অমরসিংহ অতি-দরিদ্র, একবারে এত অর্থ পাইলে, সে কখনই লোভ সাম্‌লাইতে পারিবে না। আমাকে যে, তখন পাই-পয়সা দিবে, এমনও বোধ হয় না। প্রতিশ্রুত বিষয় পাইলে, অমরসিংহ ত একবারে রাতারাতি রাজা হইবে। রাজা হইলে কি আর আমাকে তখন মনে থাকিবে? তখন সে আমাকেই হয়ত চাকর রাখিতে পারিবে!

"আমার কি দুরদৃষ্ট! এতদিন, যে আমার চাকর ছিল, আজ, আমাকে তাহারই চাকর হইতে হইল! অমরসিংহের চরিত্র যেরূপ উচ্চ ভাবিয়াছিলাম, এখন বুঝিতেছি, তাহা নহে। সে ব্যক্তি সাধুও নহে, তাহার প্রকৃতিও সৎ নহে। টাকা পাইলে সে নিশ্চয়ই তাহা লুকাইবে—আমাকে বলিবে, কিছুই পাই নাই। আর আমাকে তখন ফ্যা ফ্যা করিয়া বেড়াইতে হইবে। এখন সদ্‌যুক্তি এই,—অমরসিংহ যাহাতে টাকা-কড়ি না পায়, তাহারই চেষ্টা করা।

এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া, বৃদ্ধ পাণ্ডা কেশবরাম সম্মুখবর্ত্তী অমরসিংহকে কহিলেন, "তুমি আমার বাটীতে এখনই যাও, আমার পূজা করা ফুল ও তুলসীপত্র যাহা আছে, তাহা লইয়া আইস।"

অমরসিংহ জোড়হাতে "যে আজ্ঞা," বলিয়া, প্রভুর আদেশ পালনার্থ চলিল।

এই অবসর পাইয়া, বৃদ্ধ কেশবরাম, বৃদ্ধ দীনদয়ালের সহিত কথা আরম্ভ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

কেশবরাম। আমি পুরোহিত, আপনি যজমান। আপনার হিতাকাঙ্ক্ষা,—আমার একান্ত প্রার্থনীয়। আপনার মঙ্গল হইলেই আমার মঙ্গল। বিশেষতঃ আমি আপনার তীর্থগুরু। গুরু চিরদিন শিষ্যের কল্যাণ

কামনা করিয়া থাকেন। আপনার মত শিষ্য এ সংসারে বিরল। আপনার মত ধার্ম্মিক এবং সদনুষ্ঠান-রত,—সৎপাত্রে এবং সৎকার্য্যে দানশীল শিষ্য, আমি এ সংসারে কখন দেখি নাই। আমার অসংখ্য শিষ্য; কিন্তু সর্ব্বশিষ্য অপেক্ষা আমি আপনাকে অধিক ভালবাসি এবং স্নেহ করি।

ক্রোড়পতি দীনদয়াল বেশী-কথার লোক ছিলেন না। বিশেষ, আজে তর্ক-বিতর্ক করিবার তাঁহার সময়ও ছিল না। তিনি দুই এক কথার লোক ছিলেন। তিনি পাণ্ডা কেশবরামকে, বাহাড়ম্বর-পূর্ণ ঘোরতর ভূমিকা করিয়া ঐরূপ বক্তৃতা করিতে শুনিয়া, একটু রুক্ষভাবে বলিলেন, "এত কথার আবশ্যক কি? কি ঘটিয়াছে বলুন।"

কেশবরামকে কোনরূপ মনঃকষ্ট দিবার জন্য, তিনি ইচ্ছা করিয়া রুক্ষ কথা বলেন নাই। তাঁহার কথার ধরণই ছিল ঐরূপ। কিন্তু ইতর-সাধারণ ঐরূপ কথাকে রুক্ষ কথা বলিত।

দীনদয়ালের মুখে ঐরূপ কথা শ্রবণ করিয়াও, পাণ্ডা কেশবরাম আপন বক্তৃতা ছাড়িলেন না। তিনি আপন মনে কহিতে লাগিলেন,—"আপনারা আমার এক পুরুষের যজমান নহেন,—সাত পুরুষের যজমান; এবং আমরাও আপনাদের সাত পুরুষের গুরু। আপনার পিতার সহিত আমার বড়ই সদ্ভাব ছিল। তিনি কোনও কার্য্য আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া করিতেন না। যদিও আমি তখন ছেলে-মানুষ ছিলাম, তথাচ তিনি আমার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তিনি অতি অমায়িক এবং ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। তাঁহার মত সৎলোক এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আহা! তিনি এখন স্বর্গে! আহা!"—

এই কথা বলিতে বলিতে, বৃদ্ধ পাণ্ডা কেশবরামের চোখ ছল ছল করিতে লাগিল। জল পড়িবার উপক্রম হইল। স্বর ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হইল।—ক্রমশঃ তিনি যেন আর কথা কহিতে পারিলেন না।

ক্রোড়পতি দীনদয়াল এক একবার আকাশ পানে চাহিতেছেন, দেখিতেছেন, বেলা আর কত আছে। কারণ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই শুভক্ষণেই বজরা ছাড়িয়া দিবার কথা আছে। আর চাহিতেছেন দীনদয়াল,—রাজপথ পানে,—কেবল অমরসিংহের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছেন। অমরসিংহকে যাহা বলিবার, তাহা না বলিয়া তিনি কখনও যাত্রা করিতে পারেন না। সেজন্য ঘন ঘন পথ পানে চাহিয়া থাকিতে বাধ্য হইতেছেন। তাঁহার এখন লক্ষ্য,—দুইটী জিনিসের পানে;——একটী আকাশের আলো, অপরটী পৃথিবীর পথ। সুতরাং বৃদ্ধ পাণ্ডার বক্তৃতা তাঁহার ভালো লাগিল না। একে তিনি বাগাড়ম্বরের উপর চটা, তাহার উপর ঐ পথ এবং আলোক, তাঁহার চিত্ত হরণ করিয়াছে। কাজেই ক্রমশঃ পাণ্ডার বক্তৃতা তাঁহার বিরক্তিকর হইয়া উঠিতে লাগিল।

ক্রোড়পতি দীনদয়ালের পিতার নাম স্মরণ করিয়া, পাণ্ডা কেশবরামের নয়ন দিয়া নদী বহিবার উপক্রম হইল। কিন্তু স্বর্গীয় পিতার নাম শ্রবণ করিয়া দীনদয়ালের চোখে জল আসিলই না, অধিকন্তু বিরক্তির সহিত তিনি কেশবরামের পানে কটমট করিয়া একবার চাহিলেন। দীনদয়ালের ধারণা,—যাহারা বেশী বকে, তাহারা বেশী মিছা কথা কয়।

এরূপ কটমট করিয়া চাহিলেও কেশবরামের কথার নিবৃত্তি হইল না। তিনি দীনদয়ালের স্বর্গীয় পিতার সুযশঃ-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পিতার সুযশো-গান আধখানা গাহিয়া, অবশিষ্ট যেন হাতে রাখিয়া, বৃদ্ধ পাণ্ডা দীনদয়ালের পিতামহের কীর্ত্তি-কলাপ বর্ণন আরম্ভ করিলেন। তখন সূর্য্য-পানে চাহিয়া দীনদয়াল কেশবরামকে বলিলেন, "দেখুন, আর বেলা নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমাকে যাত্রা করিতে হইবে; আপনার যাহা বক্তব্য আছে, তাহা শীঘ্র বলুন,—সময় প্রায় হইয়া আসিল। অমরসিংহই বা এখন ফিরিল না কেন? যাত্রার পূর্ব্বে তাহার সহিত একবার আমার দেখা হওয়া আবশ্যক।"

কেশবরাম কহিলেন, "আপনাকে বড় ভাল বাসি।"

দীনদয়াল। আপনি যে আমাকে ভাল বাসেন, তা ত আমি জানি এবং এই কথা আপনি আরও দুইবার বলিয়াছেন। সুতরাং এসব পুরাণো কথার আবশ্যক কি আছে? কি ঘটিয়াছে, আমায় কেবল সেই কথাটী বলুন।

কেশবরাম। সে বড় গুরুতর কথা। ফল কথা, আপনার বিপদ্ দেখিতেছি। আপনি যদি বিশেষ বিচার-পূর্ব্বক কার্য্য না করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আপনার অমঙ্গলের,—এমন কি, সর্ব্বনাশেরও সম্ভাবনা আছে।

দীনদয়াল। আমার অমঙ্গলই হউক, আর সর্ব্বনাশই হউক, সেজন্য আমি অধিক ভাবি না। আমি জানি, ভগবান্ যাহা করিবেন, তাহা হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আপনাকে আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তাহার যথাযথ উত্তর না দিয়া, কেবল অন্য বাজে কথা বলিতেছেন। আপনার যদি প্রকৃত কোন কথা বলিবার থাকে, তবে শীঘ্র বলুন,—নচেৎ আমি অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইব। বজরা ছাড়িবার পূর্ব্বে আমাকে অনেক বন্দোবস্ত করিতে হইবে,—আমার তিলার্দ্ধ সময় নাই।

পাণ্ডা কেশবরাম কহিলেন, "দেখুন, এ সময় ব্যস্ত হইলে চলিবে না। বিপদের সময় ধীরভাবে কার্য্য করা উচিত। সম্মুখে আপনার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, অথচ আপনি সে কথা উপেক্ষা করিয়া, ব্যস্ত হইয়া, অন্য কাজ করিতে যাইতেছেন। ঘরের মটকায় যখন আগুন লাগে, গৃহস্বামী কি তখন সে আগুন অবহেলা করিয়া, বাহিরে অন্য কাজ করিতে যায়?"

দীনদয়াল। আঃ! আপনি যে আমাকে বড় জ্বালাতন করিতেছেন দেখিতেছি! কোথায় আমার সর্ব্বনাশ হইল, কোথায় আমার আগুন লাগিল, তাহা কিছুই বলিবেন না,—অথচ কেবল ঐ সর্ব্বনাশ হইল, ঐ অমঙ্গল হইল, ঐ দাবানল জ্বলিল,—কেবল এই কথাই বলিতেছেন! আমার ঘরে আগুন লাগে—লাগুগ, সর্ব্বনাশ হয়—হউক, (ভগবান্ যদি তাহাই করেন, তবে তাহার উপর আর হাত কি আছে!) আমি কিন্তু আপনার আর ভূমিকা শুনিতে অক্ষম।

কেশবরাম। আহা! অ হা! বড়ই শোচনীয় পরিণাম দেখিতেছি! যাহার প্রকৃতি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ছিল, আজ তাহার প্রকৃতি বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল হইল! যিনি স্বয়ং বৃহস্পতির তুল্য বুদ্ধিমান্, সহস্র সহস্র লোককে যিনি উপদেশ দিয়া থাকেন, ধৈর্য্যই যাঁহার সর্ব্বপ্রধান গুণ ছিল,—হায়! তাঁহার আজ কেন এই দুর্গতি হইল! মরণকালে মানুষের বিপরীত বুদ্ধি হয়,—মরণকালে রোগী ঔষধ খাইতে চাহে না,—অ-হ-হ!

বৃদ্ধ পাণ্ডার কোমরে চাদর জড়ানো ছিল। সেই চাদর তিনি কোমর হইতে খুলিলেন। খুলিয়া মুখ ঢাকিলেন। ঢাকিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

এমন সময় বৃদ্ধ মাঝী আসিয়া সংবাদ দিল,—"হুজুর! বজরা ছাড়িবার সমস্তই ঠিক হইয়াছে। হুকুম দিলেই এখন ছাড়িতে পারি। কিন্তু জামাই বাবু এখনও ফেরেন নাই।

দীনদয়াল। এখনও ফেরে নাই? বেলা তিনটার সময় আহারাদি করিয়া তাহারা বাহির হইয়াছে;—আমি এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরিতে লিখিয়াছিলাম—এখনও ফেরে নাই? হরগোবিন্দকে ডাকো।

বৃদ্ধের পুত্রের নাম হরগোবিন্দ।

পুত্র যোড়হাতে পিতার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। দীনদয়াল জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি ত সঙ্গে গিয়াছিলে! তাহারা ফিরিল না কেন?"

হরগোবিন্দ। বেলা অবসান দেখিয়া, আমি নন্দলালকে কহিলাম "চল, আর বেলা নাই। বজরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ছাড়িবে।" কিন্তু নন্দলাল আমার কথা শুনিল না। 'খুসরো বাগে'ই বেড়াইতে লাগিল। কহিল, "তুমি আগে যাও, আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ শীঘ্র যাইতেছি।" আমি ছেলে-দিগকে সঙ্গে লইয়া, বড় দিদি ও মেঝ দিদির সহিত দুইখানি একা করিয়া বজরায় চলিয়া আসিলাম। ছোট দিদি, একজন দাসী, একজন দরোয়ান এবং নন্দলাল,—'খুসরো-বাগে' রহিল। বোধ হয়, শীঘ্র আসিয়া পৌঁছিবে।

দীনদয়াল। সোহাগীকে তথায় রাখিয়া আসিয়া ভালো কর নাই। কারণ তাহার গায়ে অনেক টাকার গহনা আছে এবং সে ছেলে মানুষ। এলাহাবাদ বড় গুণ্ডার জায়গা। বিশেষ 'খুসরোবাগে' সে বৃহৎ কূপের নিকট কয়েকজন বদমায়েস সর্ব্বদাই থাকে।

হরগোবিন্দ। যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে না হয় উহাদের অনুসন্ধানে আমি যাই। দ্রুতগামী একা আছে,—আমি যাইব আর আসিব।

ক্রোড়পতি বৃদ্ধ দীনদয়াল আবার আকাশে সূর্য্যের পানে চাহিলেন। দেখিলেন, সূর্য্যদেব অস্তগামী হইবার আর বেশী বিলম্ব নাই। আবার পৃথিবীর পথপানে চাহিলেন। দেখিলেন, অমরসিংহের আসিবার তখনও লক্ষণ নাই। সম্মুখে দেখিলেন, বস্ত্র দ্বারা পাণ্ডা কেশবরাম আবৃত-মুখ;—সেই মুখ হইতে নিঃসৃত ক্রন্দনের সুর চাদর ভেদ করিয়া উঠিতেছে। তিনি পুত্রকে কহিলেন, "বৎস! আমি ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ইচ্ছা হয়, দ্রুতগামী একা করিয়া তুমি 'খুসরোবাগে' যাও; ইচ্ছা না হয়, যাইও না। তোমার উপর এ বিষয়ের বিচার-ভার অর্পণ করিলাম। তোমার যাহা উচিত বিবেচনা হয়, করো।"

হরগোবিন্দ, খুসরোবাগে গমন যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন। এবং দ্রুতগামী একায় আরোহণ করিয়া খুসরোবাগ অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

পরলোকগতা

সতী রাধাকিশোরী।

ণাকা-বিক্রমপুরের বহর গ্রামে রাধাকিশোরীর জন্ম হয়। রাধাকিশোরীর পিতা জাতিতে জুগী। রাধা নীচকুলোদ্ভবা, অশিক্ষিতা ছিল বটে; কিন্তু তাহার অপূর্ব্ব পতি-ভক্তি, দেবীদুর্ল্লভ চরিত্র-সৌন্দর্য্য, পবিত্র হৃদয়ের পবিত্র মাধুর্য্য, গৃহকর্ম্ম সম্পাদনে যত্ন, উৎসাহ ও নিপুণতা,—সৎ-কুল-সম্ভবা মহিলাদিগেরও শিক্ষণীয়। ফলতঃ, পুণ্যশীলা রাধাকিশোরীর ধর্ম্মপ্রিয়তা, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতা প্রভৃতি অসাধারণ চরিত্র-সম্পদের পর্য্যালোচনায় আমাদের কুলাঙ্গনাদিগের প্রভূত শ্রেয়োলাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

বহরের অতি নিকটবর্ত্তী শীলপাড়ান গ্রামে অপ্রত্যয় নাথের সহিত রাধাকিশোরীর বিবাহ হয়। অপ্রত্যয় সুশীল ও সংগীত-বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। বালিকা রাধা অনুরূপ পতিলাভে আপনাকে পরম সৌভাগ্যবতী মনে করিয়া আনন্দিত হইল। নবীনা বন-বৃততীর ন্যায় পতি-পাদপ আশ্রয় করিয়া, রাধা পরমসুখে বাল্যকাল যাপন করিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার পতিভক্তির উৎস প্রবলবেগে উথলিয়া উঠিতে লাগিল। পতির আরাধ্য পদযুগল ভক্তির নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া, রাধা জীবনের মধুর উষায় বুঝিতে পারিল, এই মনোহর পতিমূর্ত্তি অবলার একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র উপাস্য, একমাত্র ঐশ্বর্য্য; পতির ন্যায় সুখ মোক্ষ দাতা, পতির ন্যায় পরম হিতৈষী বন্ধু, নারী-জীবনে পতির ন্যায় সহায়,—জগতে আর নাই।

পতির তুলনায়, ব্রহ্মাণ্ডও অতি অকিঞ্চিৎকর। নারী-জীবনের যাহা কিছু গৌরব, যাহা কিছু সম্মান,—তাহা স্বামী। স্বামীহীনার জীবন শ্মশান হইতেও ভয়ঙ্কর ও দুঃখজনক। রাধার কোমল চিত্ত এই স্বর্গীয় ভাবে বিভোর হইয়া উঠিল; এই স্বর্গীয় বিশ্বাস তাহার অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হইয়া তাহাকে উন্নতির চরমসীমায় লইয়া গেল। অশিক্ষিতা রাধা পতিযজ্ঞে জীবন আহুতি দিয়া, নারীজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে লাগিল। রাধা পতিভক্তির প্রেরণায় সাংসারিক সকল সুখে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, স্বামি-সেবায় মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিল। রাধা সখীর ন্যায় পতির হিতকর্ম্ম সাধন, বন্ধুর ন্যায় সৎকার্য্যে উৎসাহ প্রদান, মাতার ন্যায় স্নেহমমতা, পরিচারিকার ন্যায় পরিচর্য্যা করে। পতি ভিন্ন রাধা কিছু জানে না, পতি ভিন্ন কিছু বোঝে না, পতি ভিন্ন অন্য কিছুরই চিন্তা করে না। রাধা যেন মূর্ত্তিমতী পতিভক্তিই ছিল।

রাধা যৌবনে পদার্পণ করিল। যৌবনালোকে তাহার পবিত্র চরিত্র শতগুণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পত্নীর মহনীয় চরিত্রের মধুর আকর্ষণে, অপ্রত্যয়ের চিত্ত আকৃষ্ট হইল। অপ্রত্যয়, গুণবতী ভার্য্যার সংসর্গে মানবজীবনের প্রকৃত সুখাস্বাদন করিতে লাগিল।

স্বামীর প্রতি রাধার যেরূপ অগাধ ভক্তি ও অপরিমেয় প্রেম, শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতিও তাহার তেমনি ভক্তি ও শ্রদ্ধা। সে তাহাদিগকে জনক জননীর ন্যায় সর্ব্বদা সম্মান, সমাদর ও ভয় করিত। তাহাদের অবাধ্য হইয়া কোন কার্য্য করিত না। অপ্রীতিকর বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাহাদের অন্তঃকরণে আঘাত করিত না। কিসে শ্বশুর শাশুড়ীর সন্তোষোৎপাদন হইবে, কিরূপে তাহারা সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিবে তৎপ্রতি রাধার বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ ছিল। শাশুড়ীকে গৃহকর্ম্মে লিপ্ত দেখিলে, রাধা মনে মনে যারপর নাই দুঃখিত হইত; এবং তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া স্বহস্তে সেই কার্য্য সম্পাদন করিত।

গৃহকার্য্যে রাধার দক্ষতা অপরিসীম। রাধা এক মুহূর্ত্ত বসিয়া থাকিত না, এক মুহূর্ত্ত গল্প করিয়া সময় নষ্ট করিত না। সে প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া, যাবতীয় গৃহকর্ম্ম সুন্দররূপে সম্পন্ন করিত। স্বহস্তে রান্না করিয়া, গুরুজনকে আহার করাইত। সমস্ত দিন অভুক্ত থাকিলেও গুরুজনের সেবা না হইলে, আপনি ভোজন করিত না। প্রতিদিন স্নান করিয়া পতির পাদোদক পান করিত। পতি উপস্থিত থাকিলে তাহার ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিত।

রাধা সারাদিন কার্য্য করিয়াও ক্লান্ত হইত না। গৃহ-কার্য্য সমাপন করিয়া, স্বহস্তে সুন্দর সুন্দর কাপড় প্রস্তুত করিত। এই ব্যবসায় ইহাদের এক আয়ের পথ।

রাধা কাহাকেও অন্যায় কার্য্য করিতে দেখিলে, রাগ না করিয়া মিষ্ট কথায় দোষ দেখাইয়া দিত। সে জীবনে কাহারও সহিত ঝগড়া করে নাই। কাহাকেও কটূবাক্য বলিয়া মনে দুঃখ দেয় নাই। যে কথা বলিলে, অপরের অন্তঃকরণে কষ্ট হইবে বুঝিতে পারিত, সে কদাচ সেরূপ কথার উল্লেখ করিত না। কেহ তাহাকে অপ্রিয় বলিলে, তাহাকে বিনয়ের ভাষায় লজ্জিত করিত। রাধা সর্ব্বদা হাস্যমুখে সকলের সহিত আলাপ ব্যবহার করিত। বৃদ্ধাদিগের প্রতি সর্ব্বদা সম্মান প্রদর্শন করিত। প্রতিবাসিনী দিগের সহিত সদয় ব্যবহার করিত, এবং সরল ভাবে তাহাদের সহিত মিশিত। তাহাদের সুখে, আনন্দিত,—দুঃখে ম্রিয়মাণ হইত। পরনিন্দা করিয়া রাধা জিহ্বাকলুষিত করিত না। কাহারও দোষের কথা শুনিলে সে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিত, "ভুল করিয়াছে"। কাহারও দুর্নাম শুনিলে তাহার আলোচনা করিয়া মতামত প্রকাশ করা স্ত্রীলোকদিগের এক কুঅভ্যাস। রাধা সে প্রকৃতির ছিল না। সে পরের দুর্নাম শুনিলে, আপনার দোষের চিন্তা ও উল্লেখ করিত।

রাধা, অপ্রত্যয়ের শুধু ভার্য্যা ছিল না, তাহার গৃহের লক্ষ্মী, এবং জীবনের দুর্গম পথে অদ্বিতীয় সুহৃদ্ ছিল। পতিহিতৈষিণী গুণবতী ভার্য্যার কার্য্যতৎপরতায় দরিদ্র অপ্রত্যয়রে দারিদ্র্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। অপ্রত্যয় যাহা কিছু উপার্জ্জন করিত, তদ্দ্বারা রাধা স্বচ্ছন্দ-ভাবে সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিত। কোন অভাব উপস্থিত হইলে, পাছে স্বামীর মনে কষ্ট হয়, তজ্জন্য রাধা সাবধানতার সহিত স্বামীকে অভাবের কথা জ্ঞাপন করিত। সংসারে অভাব অনাটনে, কত হতভাগ্য স্বামী, পত্নীর তিরস্কারে মর্ম্মাহত হইয়া, জীবন দুঃখময় দেখিয়া আকুল হয়েন। পতিহিতৈষিণী রাধা তাহা বুঝিত; বুঝিয়া দুঃখের ভার আপনিই বহন করিত,—স্বামীকে তাহা জানিতেই দিত না।

বর্ত্তমান যুগধর্ম্মে ভূষণপ্রিয়তা,—মহিলাদিগের একটা রোগবিশেষ হইয়া পড়িয়াছে। বসনভূষণের লালসায় কত কুলাঙ্গনা চিরপূজ্য পতির দুঃখ ও অশান্তির কারণ হইয়া, সহধর্ম্মিণী নাম কলঙ্কিত করিতেছেন। ভাগ্যবতী রাধা এই রোগের আক্রমণ হইতে মুক্ত ছিল। সে কদাচ বস্ত্রালঙ্কারের জন্য স্বামীকে উত্যক্ত করিত না। কেহ তাহাকে অলঙ্কারের কথা জিজ্ঞাসিলে, পতিপ্রাণা রাধা কপালের সিন্দূরের ফোঁটা দেখাইয়া দিয়া, গম্ভীরভাবে বলিত, "এইত আমার অমূল্য অলঙ্কার। আমি তুচ্ছ স্বর্ণালঙ্কারের কাঙ্গালিনী নই।"

সতীর শিরোমণি রাধার পতিসেবা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। রাত্রিযোগে সকলে নিদ্রাভিভূত হইলে, ভক্তিমতী রাধা, স্বামীকে কৃষ্ণ সাজাইয়া, ফুলের মালা পরাইয়া, পতির পাদপদ্মে পুষ্প-চন্দন উৎসর্গ করিয়া, পতিপূজা করিত। পতিপদতলে উপবেশন করিয়া, পতির প্রতিমূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে নিশাযাপন করিত। কোনদিন স্বামীকে

চন্দনে ভূষিত করিয়া, আপনি সান্নিধ্যে উপবেশন করিয়া সজলনয়নে পতির মুখপানে চাহিয়া থাকিত। কখন উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়া উঠিত। স্বামিসেবায় তাহার যে সুখ, যে আনন্দ, যে উৎসাহ, দেখা যাইত, বোধ হয় রাজরাজেশ্বরী হইলেও তাহার সে সুখ, সে উৎসাহ সে আনন্দ হইত না। রাধার কার্য্য-কলাপ পরিবেক্ষণ করিয়া ইহাই বুঝা যাইত যে, স্বামিসেবার জন্যই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

রাধার স্বামী রাধার পরমেশ্বর। রাধার অটল বিশ্বাস,—পতিরূপী ভগবানের উপাসনা ব্যতীত নারীজাতির অন্যবিধ ধর্ম্মকর্ম্ম নাই; ব্রত, দান, তপস্যা কিছুই স্বামিসেবার তুল্য নাই। রাধা সমবয়স্কাদিগকে উপদেশছলে বলিত, "সংসার ভয়ঙ্কর স্থান; এইস্থানে পাপ, মনুষ্যদিগকে প্রতিনিয়ত আক্রমণ করিতেছে,—পতিকে সেই পাপ প্রলোভনের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তই নারীজাতির সৃষ্টি। নারী পতিপূজা করিয়া জীবনের এই উদ্দেশ্য সংসাধিত করিবে।" পতিগতিপ্রাণা রাধা এই অমৃতময় উপদেশ নিজ জীবনে পালন করিয়া গিয়াছে।

রাধার হৃদয় বড় পবিত্র ও মধুর ছিল। অভিমান, অহঙ্কার, ক্ষুদ্রতা প্রভৃতি দুরপনেয় কলঙ্ক রাধার পবিত্র হৃদয়কে কখনও স্পর্শও করিতে পারে নাই। কত অভিমানিনী স্ত্রীলোক অভিমানের নাগপাশে বদ্ধ করিয়া, স্বামীরূপ ভল্লুককে স্বেচ্ছামত নৃত্য করাইতেছেন, কর্কশ বাক্যরূপ কশাঘাত করিয়া অভিলষিত বিষয়ে সফলকাম হইতেছেন। কিন্তু রাধা জীবনে কখনই স্বামীর প্রতি অভিমান করে নাই। অভিমানে স্ফীত হইয়া কিরূপে স্বামীর নিকট আবদার পাইতে হয়; রাধা তাহা জানিত না। রাধা জানিত, পতি পদতলে অবলুণ্ঠিত হইয়া, পতির পবিত্র মুখপানে তাকাইয়া থাকিতে। আর জানিত, হৃদয়ের হৃদয় খুলিয়া দিয়া পতিপদ অর্চ্চনায় ব্যাকুল থাকিতে। আরও জানিত, সুললিত কণ্ঠে, প্রীতিকর বাক্যে পতির চিত্তবিনোদন করিয়া তাহার কৃপাকণা লাভ করিতে।

রাধার স্বামী দরিদ্র। দরিদ্র হইলেও তাহার সুখের সীমা নাই। অপ্রত্যয় পথশ্রান্ত হইয়া গৃহাগত হইলে, তাহার করুণাময়ী ভার্য্যা, সসম্ভ্রমে নিকটে দাঁড়াইয়া ব্যজন করিত। অপ্রত্যয় পীড়িত হইলে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, তাহার সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিত। দরিদ্র অপ্রত্যয় অর্থের কাঙ্গাল হইয়াও বড় সুখশান্তিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছে। পত্নীর চরিত্রগুণে অপ্রত্যয়ের গৃহে বিবাদ বিসম্বাদ ছিল না; অশান্তি ছিল না, জ্বালাযন্ত্রণা ছিল না। আনন্দময়ী, সাধুশীলা পত্নীর চরিত্র-সৌন্দর্য্যে দরিদ্র অপ্রত্যয়ের গৃহ স্বর্গধাম রূপে লক্ষিত হইত।

এইরূপ সুখ স্বচ্ছন্দে ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলে, নিষ্ঠুর কাল সুখের হাট ভাঙ্গিবার নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ করিল। অপ্রত্যয় কনিষ্ঠ সহোদরের সহিত কার্য্যোপলক্ষে চান্দপুর নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিল। হঠাৎ ওলাউঠা রোগে অপ্রত্যয়ের মৃত্যু ঘটে। সতী সেই ভয়ানক বিপৎপাতের কথা কিছুই জানে না। মৃত্যুর দুই দিন পরে অপ্রত্যয়ের কনিষ্ঠ "ভাইরে ভাইরে" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলে, পতিপ্রাণা রাধা, হাহাকার করিয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল। তাহার আকুল রোদনে পাষাণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

দুই দিবস রাধা কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইল। তৃতীয় দিবস তাহার সামান্য একটু জ্বর হইল। চতুর্থ দিবস পাগলিনীর ন্যায়, ঐ স্বামী আমাকে ডাকিতেছেন, ঐ ত তিনি ওখানে দাঁড়াইয়া আমাকে ডাকিতেছেন। আমি যাই। প্রভো, আমাকে লও। হা কৃষ্ণ! তুমি কোথায়? এই রূপ নানা অসংলগ্ন বাক্য বলিতে লাগিল। আর পতির কাষ্ঠপাদুকা বক্ষে ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। দেখিতে দেখিতে রাধাকিশোরীর অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিল। নাড়ী ক্ষীণ হইল; কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া আসিল। সতী তখন মৃদুস্বরে, "হা প্রভো—হা কৃষ্ণ—হা প্রাণেশ্বর" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। নয়ন জলে উপাধান ভিজিতে লাগিল। তখন সাধ্বী ধীরে ধীরে পতির কাষ্ঠপাদুকা মস্তকে ধারণ করিয়া, জন্মের মত চক্ষু মুদ্রিত করিল। সকলে হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পতিব্রতা, ধর্ম্মৈকপ্রাণা রাধার পবিত্র আত্মা পতিশূন্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া পতিলোকে চলিয়া গেল!

চারি বৎসর রাধাকিশোরীর মৃত্যু হইয়াছে। রাধার অবলাপ্রকৃতির মনোহর আলেখ্য চিরকাল 'জীবিত" থাকিয়া, নারী শিক্ষার সহায় হইবে। ধন্য রাধা! ধন্য তোমার নারী-জন্ম! ধন্য তোমার পাতিব্রত্য! তুমি যথার্থই হিন্দু-পত্নী। তুমি পতিলোকে দাঁড়াইয়া, তোমার সেই হাসি মুখে হিন্দু মহিলাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, তাঁহারা যেন তোমার মত পত্নী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া, অক্ষয় স্বর্গসুখের অধিকারিণী হন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ধর।

নাটোর-রাজবংশ।

নাটোর-রাজধানীর বিস্তৃত পরিখা-চিহ্ন, বৃহৎ বৃহৎ দীর্ঘিকা, গভীরতোয়া পুষ্করিণী, জীর্ণ সৌধশ্রেণী, মহারাজ রামকৃষ্ণের যাগমণ্ডপ, তপস্যাস্থান, পুরাতন দেবমন্দির, মন্দিরমধ্যস্থ প্রাচীন দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি সন্দর্শন করিলে এবং অপরদিকে নূতন ধরণে নির্ম্মিত সুন্দর মন্দুরা, সুসজ্জিত সৌধাবলী, কমনীয় কুসুমোদ্যান প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিলে,

সহসা চিত্তক্ষেত্রে এইরূপ ভাবের আবির্ভাব হয় যে, প্রকৃতিদেবী বুঝি স্বীয় অনন্যসাধারণ শিল্প-কৌশল প্রদর্শন করাইবার নিমিত্ত যুগপৎ নূতন ও পুরাতন ভূষণ পরিধান করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিতেছেন। নিবিষ্ট-চিত্তে এই সমস্ত নিরীক্ষণ করিলে, বরেন্দ্রভূমির অসাধারণ গৌরব-নিকেতন, সর্ব্বসমাদৃত উক্ত প্রশস্ত রাজধানী যে-মহাত্মগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদিগের আদিপুরুষের নাম সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাসা না করিয়া বোধ হয়, কেহই চিত্তের ঔৎসুক্য নিবারণ করিতে পারেন না। সেই নিমিত্ত, এই- রাজবংশপ্রতিষ্ঠাতা আদিপুরুষের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রথমতঃ দেওয়া যাইতেছে।

এই বংশের প্রথম রাজা রামজীবন। তাঁহার পিতা কামদেব কাশ্যপগোত্র মৈত্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কামদেব সম্বন্ধে কিংবদন্তী এইরূপ যে, তাঁহার স্থিরতর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল না। তিনি নানাতীর্থে ও নানা দেবালয়ে সপত্নীক তপস্যা করিয়া কালযাপন করিতেন। পরে বার্দ্ধক্যে সুদূর বৈদেশিকতীর্থ পর্য্যটনে অসমর্থ ইহয়া সান্তোল-রাজের (১) আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক অধিক সময় তদীয় রাজধানীর সিদ্ধদেবালয়ে, কখনও বা ভাবতায় (ভবানী-পুরে (২) তপস্যায় কালাতিপাত করিতেন। কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাক বশতঃ কালক্রমে সন্তোলরাজ পাতকী বলিয়া অপবাদগ্রস্ত হওয়ায় কামদেব উক্ত রাজধানী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পুঁঠিয়া রাজবংশের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কেহ কেহ বলেন নাটোর-রাজধানীর সংলগ্ন উত্তর-দিক্‌স্থিত আমহাটীগ্রামে কামদেবের জন্ম হয়। এতদ্বিষয়ে ২।৪টী প্রমাণও পাওয়া যায়। অন্যেরা বলেন, পুঁঠিয়াই কামদেবের জন্মভূমি। যত প্রকার কিম্বদন্তী ও প্রাচীন স্মৃতির উদ্বোধক চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই জানা যায় যে, কামদেব প্রথমে সান্তোলরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরে কোন কারণ বশতঃ পুঁঠিয়া-রাজবংশের আশ্রয়ে আসিয়াছিলেন। রামজীবন ও রঘুনন্দন নামে অদ্বিতীয় সৌভাগ্যশালী অশ্বিনীকুমারোপম তাঁহার দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তদীয় উক্ত পুত্রদ্বয় হইতে বরেন্দ্রভূমি ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-কুল, বিশেষতঃ পুঁঠিয়া-রাজবংশ চিরস্থায়ী কীর্ত্তিগৌরব লাভ করিয়াছে।

কামদেব কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, নিশ্চয় জানা যায় না। তবে তাঁহার পুত্র রামজীবনের দত্তক রামকান্তের সহধর্ম্মিণী প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানী ১৬৭৫ শকে কাশীধামে শিবমন্দির (১) ও তৎকন্যা অদ্বিতীয় সুন্দরী তারাদেবী ১৭০০ শকে মুরশিদাবাদ—বড়নগরে গোপালমন্দির (২) নির্ম্মাণ করেন। এবং জেহেন্দার সাহা পাতশাহের সময়ে কথিত রামজীবন রাজ-সনন্দ প্রাপ্ত হন। ইহা দ্বারা অনুমিত হয়, ১৫০০ শকাব্দ হইতে ১০০ বৎসর মধ্যে কামদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহারাণী ভবানী কামদেব হইতে তৃতীয় পুরুষের পত্নী হইলেও সময়ের এত আধিক্য অনুমান করিবার হেতু এই যে, কামদেব ও তৎপুত্র রামজীবন অতি দীর্ঘজীবী ছিলেন! দ্বিতীয়তঃ, রামজীবনের কালীকুমার (কালকেঙর) নামে যে ঔরস পুত্র ছিল, বয়ঃপ্রাপ্তির পর ঐ পুত্রের লোকান্তর ঘটনা হওয়ায় রামজীবন দত্তকপুত্র গ্রহণের কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যতা পর্য্যালোচনায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়া দত্তক গ্রহণ করেন। সুতরাং ১৫০০ শকাব্দ হইতে ১০০ বৎসর মধ্যে যে কামদেবের জন্ম হইয়াছিল, এই কল্পনাই সুসঙ্গত।

কামদেবের তাম্রঘটময়ী পৈতৃক দেবতা মঙ্গলচণ্ডী বর্ত্তমানেও সর্ব্বমঙ্গলানামে অভিহিত হইয়া রাজধানীতে সেবিতা হইতেছেন। কথিত আছে, কামদেব সদাচার পূত সরলান্তঃকরণ, তপস্যানিরত, তীর্থাভিষেকপরায়ণ, ক্ষমাশীল, বিনয়ী, করুণহৃদয় ও নির্ম্মৎসর ছিলেন। তৎকালীন ব্রাহ্মণমণ্ডলীমধ্যে কামদেব প্রথম অভিবাদ্য ও দানের মুখ্যপাত্র ছিলেন। তৎসম্বন্ধে রাজকীয় কবি-নিবদ্ধ কয়েকটী শ্লোক নিম্নে লিখিত হইল।

বাণর্ষিবাণ ধরণী প্রমিতং শকাব্দ-
মারভ্য বৎসরশতং ক্বচনান্তরেণ।
শ্রীকামদেব ইতি কাশ্যপগোত্র মৈত্রো
বারেন্দ্রভূসুরকুলং সমলঞ্চকার ॥ ১ ॥
যঃ কশ্যপেন সদৃশোঽসদৃশো মনস্বী
স্বাচারপূতকরণঃ সরলস্তপস্বী।
বিদ্বান্ সদাব্রতরতো বিপুল প্রতিষ্ঠঃ
সত্যপ্রিয়ো মধুরগীঃ শুচিরীশনিষ্ঠঃ ॥ ২ ॥
শান্তো যথাবিভবদানপরো মহাত্মা
তীর্থাভিষেকনিরতো বিনয়ী তিতিক্ষুঃ।
আস্তিক্যবুদ্ধিবিশদ প্রতিভাপ্রদীপ্তঃ
সত্ত্বাতিশয্যকরুণোজ্ঝিত সর্ব্বহিংসঃ ॥ ৩ ॥
শ্রৌতাভিবাদনবিধৌ প্রথমাভিবাদ্যো
বিশ্রাণনস্য বিধিবোধিতমুখ্যপাত্রং।

(১) রাজসাহী ও পাবনার সন্ধিস্থলে সান্তোলনামে নগর পূর্ব্বে বরেন্দ্র-ভূমিতে সুবিখ্যাত ছিল, অদ্যাপি সেই নগরের ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়।

(২) বগুড়া জেলার অন্তর্গত করতোয়া নদীতীরস্থ কোন সিদ্ধাশ্রমকে ভাবতা বা ভবানীপুর বলিয়া থাকে। ভাবতা একান্নপীঠের অন্যতম পীঠ। এ বিষয়ে "অখিল ভুবনমধ্যে ভাবতায়াং ভবানী" ইত্যাদি বাক্য শ্রুত হয়।

( ) নিবাসনগরে শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথস্য সন্নিধৌ।
বাণব্যাহৃতিরাগেন্দুপ্রমিতে শকবৎসরে।
ধরামরেন্দ্রবারেন্দ্র গৌড়ভূমীন্দ্রভামিনী।
নির্ম্মমে শ্রীভবানী শ্রীভবানীশ্বরমন্দিরং ॥
(২) অশূন্যমিত্রশাকাব্দে ভবানীতনুসম্ভবা।
নির্ম্মমে শ্রীমতীতারা শ্রীমদ্‌গোপালমন্দিরং ॥

ধীরাগ্রণীর্ধরণিদেবগণে গরীয়ান্
আসীদ্‌গণেশ ইব দেবগণে স পূজ্যঃ ॥ ৪ ॥
শক্তিঃ শিবা ঘটময়ী জগদেকমাতা
যা সর্ব্বমঙ্গলপদাস্পদমদ্বিতীয়া।
পূর্ব্বৈঃ প্রতিষ্ঠিততমা কুলদেবিরূপা
সদ্মস্বধিষ্ঠিতবতী সমুপাসিতা সা ॥ ৫ ॥
আপন্নবৎসলতয়া স্বয়মন্নপূর্ণা
ভক্তিপ্রফুল্লহৃদয়াম্বুরুহে নিষণ্ণা।
রাজেন্দ্রলক্ষণযুতৌ কুশলৌ কুমারৌ
তস্মৈ সতে মতিমতে প্রদদৌ প্রসন্না ॥ ৬ ॥
কালেন তৌ দ্বিজসুতৌ ভগবৎপ্রসাদাদ্
বারেন্দ্রগৌড় সততোদয়পুষ্পবন্তৌ।
অন্যোন্যমপ্রতিরথাবনুকূলভাসৌ
কাশাম্বভূবতুরলং বুধশৌরিজুষ্টৌ ॥ ৭ ॥

ক্রমশঃ।

শ্রীশারদাপ্রসাদ শর্ম্মা।

যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ।

"যত্র ধর্ম্মোদ্যুতিঃ কান্তির্যত্র হ্রীঃ শ্রীস্তথামতিঃ।
যতোধর্ম্ম স্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততোজয়ঃ ॥"

যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ। যেখানে ধর্ম্ম—যেখানে ধার্ম্মিক—যথায় সদনুষ্ঠান, সদাচরণ, সৌজন্য—যেস্থানে অহিংসা, দয়া, প্রীতি, স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ও ভালবাসা বিরাজিত, সেই স্থানেই সুখ, শান্তি, আর সেই স্থানেই জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। ধর্ম্ম এই বিভীষিকাময় মর্ত্ত্য-মরুর মরীচিকা রূপ প্রহেলিকা নহে; ধর্ম্ম সংসার-সাগরোত্থিত হলাহলও নহে। ধর্ম্ম স্বর্গীয় পদার্থ। স্বর্গীয় ভাণ্ডার-চ্যুত ধর্ম্ম-সুধার ধারা এ সংসারে-মরুভূমির শোক-তাপ-দগ্ধ জীবের হৃদয়ে অজস্রধারে শান্তি-সুধা বিতরণার্থ মর্ত্ত্যভূমে সমাগত। সেই ধর্ম্ম যে হৃদয়ে বিরাজমান, সে হৃদয় ত স্বর্গীয় সুষমা-পরিশোভিত নন্দন-কানন-তুল্য দেবতা-বাঞ্ছিত। আর পরিণামে সেই হৃদয়বান্ মহাত্মারই ত জয় অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং যাহার হৃদয়ে অধর্ম্মের লেশমাত্র নাই—যাহার হৃদয়ে পাপের কলঙ্ক কালিমা স্থানলাভে সমর্থ হয় না, সে ত দেবপদ-বাচ্য। যাহার সংসর্গে অসংখ্য পাপী-তাপী তরিয়া যায়—যাহার উপদেশে অধার্ম্মিক ধর্ম্মাশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক আপন পাপভার লাঘব করে—যে সংসারের মঙ্গল কামনায় ব্যস্ত, সে কোথায় জয়লাভে অসমর্থ? কোন্ পিশাচের রঙ্গমঞ্চে—কোন্ পাপাচারীর হৃদয় ক্ষেত্রে তাহার জয়-পতাকা উড্ডীন না হয়? যবন-কুলোদ্ভব হরিভক্ত হরিদাস ভক্তিধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কি ভীষণ অত্যাচারই না সহ্য করিয়াছেন! আর তাঁহাকে কি কঠোর পরীক্ষাতেই না উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে! বনগ্রাম প্রদেশের তদানীন্তন দুর্দ্দান্ত ভূম্যধিকারী রাজা রামচন্দ্র খান হরিদাসের হরিভক্ত দেখিয়া মনে মনে হরিদাসকে ভণ্ড বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং হরিদাসকে লোক সমাজে অপমানিত করিবার জন্য, হরিদাসের শুভ্র শতদলরূপ চরিত্র ও সুনামে কলঙ্ক-কালিমা ঢালিবার জন্য, এক রূপ-যৌবন-সম্পদ-গর্ব্বিতা অভাগিনী বেশ্যাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া, তাঁহার অবিচলিত চিত্তকে বিচলিত করিতে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু হায়! পিশাচীর হৃদয়েও ভক্তির সঞ্চার হইল। তৃতীয় দিন হইতে হরিদাসের উপদেশে অভাগিনী মস্তক মুণ্ডন করিয়া ভিখারিণী সাজিয়া অহোরাত্র তিন লক্ষ হরিনাম কীর্ত্তনরূপ মহাব্রত অবলম্বন করিল; যে বেশ্যা ছিল, সে ধর্ম্মের প্রভাবে বহুলোকের মাতৃস্থানীয়া হইল;—আর পিশাচ রামচন্দ্র খাঁর রঙ্গমঞ্চে ধার্ম্মিক হরিদাসের জয়-পতাকা উড্ডীন হইল। * * *

গোড়াই কাজীর অভিযোগে যবনাধিপতি দুষ্ট, দুর্ব্বার-প্রকৃতি হুসেন শাহা হরিদাসকে পুনরায় যবন করিবার জন্য প্রথমে বিনয়, পরে ভয় প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু হরিদাসের ন্যায় উন্নতমনা মহাপুরুষ তাহা কি করিতে পারেন?—হরিনাম সুধা-রসের আস্বাদ পাইয়া, তিনি কি পুনরায় যবন হইতে পারেন? সুতরাং তাঁহাকে বাইশ-বাজারে বেত্রাঘাত করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল। * * *

হরিদাসের মৃত্যু-সংবাদ পঁহুছিল, ও কাজীর অনুমতি-ক্রমে তাঁহার মৃতদেহ গাঙে ভাসাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কিছুক্ষণ পরে পুনরায় রাষ্ট্র হইল যে, হরিদাস জীবিত আছেন! এইবার হুসেন শাহার প্রাণ টলিল—পাপাচারীর হৃদয়-ক্ষেত্রে ধর্ম্মের জয়-পতাকা উড্ডীন হইল। হুসেন শাহা গাঙ্গের তটে দিয়া হরি-প্রেম বিভোর হরিদাসের পদে লুটাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল। তবে বল দেখি মানব! যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে জয় আছে কিনা?

যথায় কালরূপ প্রেতমূর্ত্তি শাসন-দণ্ড হস্তে লইয়া মুহূর্ত্তে যেন ভবিষ্যতের অনন্ত যন্ত্রণা দেখাইয়া দিতেছে—যথায় মানবকে প্রতি পাদবিক্ষেপে শিহরিয়া উঠিতে হইতেছে; যে মাতার হৃদয় সর্ব্বদাই পুত্র-শোকে শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে—চির শোকে প্রাণ আকুল করিতেছে; যথায় অনন্ত বৈধব্য যন্ত্রণায় পতিহারা সতীর হৃদয় চিরাশ্রুধারায় প্লাবিত হইতেছে; যে হৃদয় স্তরে স্তরে জ্বলিয়া যাইতেছে—চিরসুখ ভস্মীভূত হইতেছে; প্রাণের নির্ব্বাণোন্মুখ আশা-দীপ হৃদয় আঁধার করিয়া নিবিয়া যাইতেছে, বল দেখি সেই স্থানের—সে হৃদয়ের শোক তাপ দূর করিয়া শান্তি প্রদান করিবে কে? প্রতিধ্বনি উত্তর দিবে—"ধর্ম্ম"। আর জগৎ কার্য্যকলাপে তাহার সত্য সাক্ষ্য প্রদান করিবে। তবে বুঝ দেখি, যাহার প্রতাপে শোক তাপ পলাইয়া যায়, যন্ত্রণা দূর হয় অশান্তি নিকটে আসিতে পারে না, সেই অমিয়ময় ধর্ম্মের যে অধিকারী,

তাহার পরাজয় কোথায়? তাই বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, ধার্ম্মিকপ্রবর, জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।—আর সেই ক্ষমতার বশে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়লাভ, পরে রাজ্যলাভ ও পরিণামে জীবনান্তে অনন্ত স্বর্গ-সুখ পর্য্যন্ত লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন! অধর্ম্মাচারী মূর্খ দুর্য্যোধন রাজ্যলাভার্থ কি অন্যায় আচরণ না করিয়াছে? কোন অধর্ম্মপথ না অবলম্বন করিয়াছে? জতুগৃহদাহ, কুলবধূ সতী দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভামধ্যে আনয়ন, অন্যায়রূপে দ্রৌপদীর সহ পঞ্চপাণ্ডবকে বনবাসে প্রেরণ, জয়দ্রথ দ্বারা দ্রৌপদী হরণের প্রয়াস, অভিমন্যুবধ প্রভৃতি,—পাষণ্ডদের এক একটী নির্দ্দয় ও ছলনাময় পৈশাচিক আচরণে কার না হৃৎকম্প উপস্থিত হয়? —কার শরীর না রোমাঞ্চিত হয়?—আর ক্রোধে কাহার শিরায় না তপ্তশোণিত প্রবাহিত হয়? কিন্তু উদার স্বভাব যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের জন্য সকলই নীরবে সহ্য করিয়াছেন। আপন অবস্থার প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই, শত্রুর অন্যায়াচরণের প্রতি লক্ষ্য নাই। সকল বিষয়েই তিনি উদাসীন। শত্রুমিত্রের প্রতি সমদৃষ্টি, তাই তিনি শত্রুপক্ষকে বিপদে রক্ষা করিয়াছেন। তাহারা পরামর্শ চাহিলে সৎপরামর্শ দিয়াছেন। তবে এহেন ধর্ম্মাশ্রয়কারীর সুখ না মিলিবে কেন?—জয়লাভ না হইবে কেন?

আর অভিমানী দুর্য্যোধন! এত করিয়াও ত সে প্রতিপদে লাঞ্ছনা, যন্ত্রণা, অনুতাপ, অপমান, শোক সন্তাপ ভোগ করিয়া ও পরিশেষে পরাজিত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইল।

প্রকৃত ধার্ম্মিকেরাই ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝেন। তাঁহারাই জানেন যে, যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়। তাই ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত হইয়াও দুর্য্যোধনকে বলিয়াছিলেন যে, যে পক্ষে ধর্ম্ম, সেই পক্ষেই কৃষ্ণ, আর যে পক্ষে কৃষ্ণ, সেই পক্ষেই জয়। এবং সেই জন্যই তিনি দুর্য্যোধনকে ভ্রাতৃবিরোধ করিয়া বংশক্ষয় করিতে বারংবার নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অবোধ মদগর্ব্বে গর্ব্বিত দুর্য্যোধন তাহা বুঝিল না। সেই সারবান্ উপদেশ তাহার হৃদয়ে স্থান পাইল না; তাই তাহার এই দুর্গতি—তাই তাহার পরিণাম এত বিষময়, এত মর্ম্মভেদী।

আর যাহারা কেবল সাজ-সরঞ্জামের পরিপাট্যে, হাঁকাহাঁকির ছটায়, গলা ছাড়িয়া, মিথ্যা কথার পসরা নামাইয়া, ক্রেতাগণকে প্রতারিত করিবার নিমিত্ত মিছরির ছুরী লইয়া বসিয়া আছে, তাহাদের প্রসার প্রতিপত্তি দুদিনের জন্য। দুদিন পরে যখন সকলে তাহাদের অধর্ম্মাচরণ বুঝিতে পারে, তখন অবশ্যই তাহারা দোকান-পাট গুটাইতে বাধ্য হয়। তাই বলি, যেখানে অধর্ম্ম, সেইখানেই পরাজয় নিশ্চিত।

যাহাদের কিছুই সম্বল নাই—যাহারা সকলই হারাইয়াছে—যাহারা প্রতিপদে পরমুখাপেক্ষী, বিপদে যাহাদের ক্রন্দনই সার ও একমাত্র অবলম্বন; ধর্ম্ম ভিন্ন সেই ভারতবাসীর এই অসহায় অবস্থার সহায় আর কে হইবে? ভারতীয়গণের এই বিপদ-সাগরে আর কে তাহাদের কূল দেখাইবে? তাই বলি, সকলেই ধর্ম্ম-তরীর আশ্রয় গ্রহণ কর, আর হৃদয়-স্তরে লিখিয়া রাখ, "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ"। তাহা হইলে এই বিপদ-সাগরে কূল পাইবে—তাহা হইলে আবার ভারত গৌরবান্বিত হইবে। জগৎ বুঝিবে যে, এই মুমূর্ষু অবস্থাতেও, এই অধঃপতনের সময়েও ভারতভূমি রত্ন প্রসবিনী।

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী।

রমণীগণের অবস্থা ও শিক্ষা।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

প্রথম প্রস্তাবে বিলাতী শিক্ষা ও রীতি-নীতির পক্ষপাতী বামা-হিতৈষী বক্তা ও লেখকগণের আরোপিত প্রথম দোষের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহাদের আরোপিত অপর একটী দোষের বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক। দেশীয় রমণীগণ কি বাস্তবিক ক্লেশময় কারাগারে বদ্ধ?

"রমণীগণ কারাগারে বদ্ধ" এই মত যে, এদেশের, দেশীয় সমাজের এবং জন-সাধারণের অবস্থা উত্তমরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া গঠিত হইয়াছে এমন মনে হয় না। তাহা না হইলেও কথাটা দূর-ব্যাপ্ত হইয়াছে। বিলাতের অনেক উন্নতমনা নর-নারী এজন্য দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিতেছেন! বিলাতের সভ্যতম সমাজের আদর্শে এদেশের অন্তঃপুর-বাস-প্রথা কারাবাসরূপে বর্ণিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

শিক্ষার প্রভাব অতি গুরুতর। তাহা সকল অবস্থাতে ও সকল সময়ে শুভাবহ হয় না এবং আমাদিগকে সত্য ও মঙ্গলের দিকে অগ্রসর করে না। শিক্ষা যেমন—চতুর্দ্দিকের অবস্থা যেমন—তাহার ফলও সেইরূপ হয়। একদেশব্যাপী, ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ, নীতি-নিরপেক্ষ শিক্ষা দ্বারা যে, মানুষ বিষম ভ্রমে পতিত হইবে—দিশাহারা হইবে—ইহা বিচিত্র নহে। আমাদের ইংরেজি শিক্ষার ফল কতকটা এইরূপ হইয়াছে।

আমরা ইংরেজি শিক্ষার বিরোধী নহি। ইংরেজি শিক্ষা দ্বারা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে আমাদের অনেক উপকার হইয়াছে,—আরও হইবার আশা আছে। কিন্তু যে ভাবে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ, নীতি-নিরপেক্ষ ও একদেশব্যাপী;—আমরা তাহার পক্ষপাতী নহি। এরূপ শিক্ষা দ্বারা অমঙ্গলও বিস্তর হইয়া থাকে। যে সকল লোক অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারা যে সকলেই আদর্শ-চরিত এবং সেই কার্য্যের উপযুক্ত,—ছাত্রগণের যথোচিত মানসিক বিকাশ সাধনের উপযুক্ত পাত্র, আমরা হিন্দু আদর্শে তাহা মনে করিতে পারি না।

ইংরেজি শিক্ষা দ্বারা সাধারণতঃ ইংরেজ গ্রন্থকারগণের ভাব,—দেশীয় লোকের মনে ক্রিয়াবান্ হয়, ইংরেজি সমাজ, ইংরেজি রীতি-নীতি আদর্শ-স্থানীয় হইয়া পড়ে। যে সকল লোক তাহার ভাল মন্দ নির্ব্বাচন করিতে পারেন,—উভয়-দেশীয় রীতি-নীতির গুণাগুণ বিচার করিতে পারেন,—এক দেশের রীতি-নীতি অন্য দেশের উপযোগী কিনা, তাহার মীমাংসা করিতে পারেন, তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প।

একদিকে একদেশব্যাপী ইংরেজি শিক্ষার প্রবলতা, অন্যদিকে উল্লিখিত বামাহিতৈষিগণের নিনাদ। ইহার ফলস্বরূপ (বিদেশীয় লোকের ত কথাই নাই) এদেশের অনেক লোকেও দর্শন ও বিচার-শক্তি-বিরহিত হইয়া "রমণী-কারাগার"-দুঃখে বিচলিত হইয়াছেন। এমন কি, ইহার প্রতিধ্বনি দূরস্থ পল্লিগ্রামেও প্রবেশ করিয়াছে। তাই গ্রাম্যকবি গাইয়াছেন;—

"কি অধর্ম্ম, নারীর জন্ম, যেন পিঞ্জরের পাখী"—

ঐ মত কতদূর সত্যমূলক, এখন তাহা দেখা যাউক।

যখন কোন ব্যক্তি তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন কোন স্থানে রক্ষিত হয়, যেখান হইতে সে আপনার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারে না, তখন তাহাকে "কারাগার-বদ্ধ" বলা যাইতে পারে। সেই কারাগারে যদি যাতনা ও পীড়ন থাকে, তবে তাহাকে "ক্লেশময় কারাগার" বলা যাইতে পারে। এই লক্ষণ দোষশূন্য নহে। ইহার সঙ্গে আরও দুই একটী কথা মনে রাখা নিতান্ত আবশ্যক। যেখানে স্বাধীন ক্রিয়া নাই, সেখানে যাতনার অস্তিত্ব অনুমিত হইতে পারে; কারণ স্বাধীনতার প্রবৃত্তি সাধারণ লোকের প্রকৃতি-সিদ্ধ। (বিশেষতঃ স্বাধীনতা-প্রবৃত্তি যে প্রকৃত হিন্দুর প্রকৃতি-সিদ্ধই নহে, সে কথা এখন ছাড়িয়াই দিতেছি)।

কিন্তু সমাজ মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা কাহারও নাই,—কোন ব্যক্তিই সম্পূর্ণরূপে আপন ইচ্ছানুযায়ী সকল কার্য্য করিতে পারে না। রাজশাসন, ধর্ম্মশাসন, সামাজিক শাসন এবং ব্যক্তিগত শারীরিক, মানসিক ও সাংসারিক অবস্থা ও চেষ্টা প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীন ক্রিয়ার প্রতিরোধক। স্বাভাবিক নিয়মের প্রতিরোধকারিতার উল্লেখ এখানে অনাবশ্যক। কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেই অন্যের ন্যায়ার্জ্জিত ধন হরণ করিতে পারে না। রাজনিয়ম ও ধনাধিকারীর ইচ্ছা ও চেষ্টা ইহার প্রতিরোধক। হিন্দুসন্তান ইচ্ছামত অসবর্ণে বিবাহ করিতে পারে না। ধর্ম্মনিয়ম ইত্যাদি বিষয়ের প্রতিরোধক। আর সমাজশাসন কত বিষয়ই আছে! দুর্ব্বল ইচ্ছা করিলে বলবানের ন্যায় মল্লযুদ্ধ করিতে পারে না। ইচ্ছা করিলে নিরক্ষর ব্যক্তি কালিদাসের ন্যায় কবিতা লিখিতে পারে না। ইচ্ছা করিলে দরিদ্র ধনবানের ন্যায় সুন্দর গৃহে বাস করিতে পারে না। সুতরাং উপরে যে "ইচ্ছামত" কার্য্য করার কথা বলা হইয়াছে, তাহা রাজনিয়ম, ধর্ম্মনিয়ম ও সামাজিক নিয়মের অনুমোদিত এবং ব্যক্তিগত শারীরিক, মানসিক ও সাংসারিক অবস্থার অনুযায়ী স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়া বলিয়া বুঝিতে হইবে।

এখন দেখা আবশ্যক যে,

(১) এদেশীয় রমণীগণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে আবদ্ধ কিনা?

(২) সমস্ত রমণী-সমাজ আবদ্ধ কিনা?

(৩) রমণীগণ রাজনিয়ম ও সামাজিক নিয়মের অনুমোদিত এবং আপনাদের অবস্থানুযায়ী স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়া সম্পাদনে সমর্থ কিনা?

প্রথমতঃ বঙ্গদেশে হিন্দু-স্ত্রীলোকের সংখ্যা দুই কোটীর ন্যূন নহে। কেবলমাত্র বাঙ্গালী হিন্দু-স্ত্রীলোকের সংখ্যাই প্রায় এক কোটী। ইহার মধ্যে কত রমণী "অন্তঃপুর-নিগড়ে" আবদ্ধ, তাহা নিরূপণ করিবার চেষ্টা বোধ হয় এ পর্য্যন্ত হয় নাই। নিম্ন-জাতির মধ্যে অন্তঃপুর-বাস-প্রথা নাই বলিলেই হয়। গোপ, সদ্গোপ, নাপিত, কৈবর্ত্ত, রাজবংশী, কপালী, জেলে, তেওর, ধোপা, কামার, কুমার, চাঁড়াল, বাগ্দী, হাড়ি, ডোম ও অন্যান্য নিম্ন-জাতির মধ্যে অন্তঃপুর-বাস-প্রথা নাই অথবা অতি মৃদুভাবে বিদ্যমান। নিম্ন-জাতীয় রমণীগণ বাহিরে গমনাগমন করে এবং সময়বিশেষে পুরুষগণের কার্য্যের সহকারিতা করে। কোন কোন জাতির মধ্যে কেবল অল্পবয়স্কা বধূগণকে অবগুণ্ঠনবতী হইতে হয়; কিন্তু অবগুণ্ঠন কারাগার নহে। ধনশালী হইলে নিম্ন-জাতির মধ্যেও অন্তঃপুরবাস-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়,—সম্ভ্রমসূচক বলিয়া প্রবর্ত্তিত হয়।

উচ্চ-জাতির মধ্যে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ইত্যাদি যে সকল জাতি 'ভদ্র' বলিয়া অভিহিত, তাঁহাদের মধ্যে,—অন্তঃপুরবাস ও অবগুণ্ঠন-প্রথা অপেক্ষাকৃত প্রবলভাবে দেখা যায়। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও সাংসারিক অবস্থার তারতম্যানুসারে ঐ প্রথার প্রবলতা বা মৃদুতা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ধনশালী ভদ্র-পরিবারে তাহা যেরূপ ভাবে দেখা যায়, মধ্যবিত্ত ও গরীব ভদ্র-পরিবারে তাহা তদপেক্ষা লঘুতর ভাবে বিদ্যমান। ইহার কারণ জটিল নহে। অন্তঃপুরবাস-প্রথা ব্যয়সাধ্য, দারিদ্র্য তাহার অনুকূল নহে। এই দারিদ্রপূর্ণ দেশের অধিকাংশ লোকই ক্লেশে জীবন যাপন করে। স্ত্রী ও পুরুষের বাসোপযুক্ত পৃথক পৃথক গৃহ অনেকের নাই। যেখানে অন্তঃপুর নাই, সেখানে অন্তঃপুর নিগড় অসম্ভব।

স্থানভেদেও অন্তঃপুরবাস-প্রথার তারতম্য দেখা যায়। সহর অপেক্ষা পল্লীগ্রামে স্বেচ্ছাধীন গমনাগমন

অনেক অধিক। সাধারণতঃ ভদ্রবংশীয় রমণীগণ তীর্থভ্রমণ, নদী বা পুষ্করিণীতে স্নান, প্রতিবেশীর গৃহে গমন, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর সমক্ষে আগমন ইত্যাদি অবাধে করিয়া থাকেন।

এক্ষণে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সমস্ত রমণী-সমাজ "অন্তঃপুর-নিগড়ে" আবদ্ধ নহে,—স্থানভেদে, বংশভেদে ও সাংসারিক অবস্থাভেদে ঐ প্রথার অনেক তারতম্য আছে।

দ্বিতীয়তঃ যে সকল জাতি ও পরিবার মধ্যে অন্তঃপুর-বাস-প্রথা মৃদু বা প্রবল ভাবে প্রবর্ত্তিত আছে, সেই সকল জাতীয় ও পরিবারস্থ রমণীগণের মুখে আমরা ত এপর্য্যন্ত অন্তঃপুর-কারাবাস-জনিত আর্ত্তনাদ শ্রবণ করি নাই। অন্তঃপুরবাসিনী হিন্দুরমণীগণ ত স্বেচ্ছাবিহারিণী হইতে চাহেন না,—তাঁহারা এরূপ কার্য্য ঘৃণিত ও অপমান-জনক মনে করেন। তাঁহাদের চক্ষে অন্তঃপুরবাস উচ্চ সম্ভ্রমের পরিচায়ক,—ক্লেশদায়ক কারাবাস নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বধূগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অবগুণ্ঠনবতী হইয়া থাকেন। পুরুষদিগকে এ সকল বিষয় শিখাইতে হয় না। সামাজিক নিয়ম, সমাজের ও পরিবারের অবস্থা আপনা আপনিই নারীগণকে সামাজিক ও সাংসারিক অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলে।

এদেশীয় ভদ্রসমাজে ধীশক্তি-সম্পন্না গুণবতী নারীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। সৌভাগ্যশালিনী, সদাশয়া, দানশীলা রমণীরও অপ্রতুল নাই। তাঁহারা দেশের হিত-কামনায় সময়ে সময়ে অনেক অর্থব্যয় করিয়াছেন। রাণী ভবানী, রাণী শরৎসুন্দরী, মহারাণী স্বর্ণময়ী এদেশীয় রমণী। কিন্তু এপর্য্যন্ত অন্তঃপুরবাস-প্রথার নিপাতনে কাহাকেও অভিলাষিণী দেখা যায় নাই। সত্য সত্যই যদি এই প্রথা তাঁহাদের পক্ষে বা তাঁহাদের চক্ষে যাতনা-দায়ক হইত বা অবমাননা-সূচক হইত, তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা তাহার উচ্ছেদ সাধনে যত্নশীলা হইতেন। বিশেষতঃ যখন দেখা যাইতেছে যে, সমাজমধ্যে এরূপ চেষ্টা করিতে সমর্থ স্ত্রীলোকের অভাব নাই। এতদ্দ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে যে, হিন্দু-ললনাগণ "ক্লেশময় কারাগারে" আবদ্ধ নহেন। কেবল কতকগুলি ইংরেজি-আচার-পদ্ধতি-পক্ষপাতী ব্যক্তি এবং স্থানবিশেষে তাঁহাদের বিদুষী রমণীগণ, বঙ্গীয় নারীসমাজের স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রতিনিধি হইয়া, হিন্দু-ললনাগণকে "ক্লেশময়-কারাগার"-মুক্ত করিবার কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু হিন্দুসমাজ তাঁহাদের মতে পরিচালিত নহে।

তৃতীয়তঃ রমণীগণ স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়া সম্পাদনে অসমর্থ কিনা,—একথার অর্থ কিছুই নাই। ইহা উল্লিখিত বামা-হিতৈষিগণের কল্পনা-রচিত। ইহা কে না জ্ঞাত আছেন যে, যে সকল কার্য্য রাজনিয়ম, ধর্ম্মনিয়ম, সামাজিক নিয়ম ও পারিবারিক অবস্থার অনুযায়ী, তাহা অবাধে মহিলাগণ সম্পাদন করিয়া থাকেন। গৃহস্থলীর সমস্ত আবশ্যক কার্য্য, তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং যেখানে পুরুষের যুক্তি বা সহায়তার প্রয়োজন, সেখানে তাহা গ্রহণ করেন। গৃহের অভ্যন্তরে রমণীর আধিপত্য অপ্রতিহতভাবে চলিয়া আসিতেছে। কখন কখন কোন কোন কার্য্য কেবল রমণীগণের মতানুসারেই পুরুষগণের মতের বিরুদ্ধেও সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহা দেখিয়া, রমণী পুরুষের 'ক্রীড়াবস্তু' কিংবা পুরুষ রমণীর 'ক্রীড়াবস্তু' ইহা বিষম সমস্যার বিষয় বলিয়া মনে হইতে পারে।

এক্ষণে বোধ হয় একথা বলা যাইতে পারে যে, হিন্দু-নারীগণ "ক্লেশময় কারাগারে" বদ্ধ নহেন।

আমাদের দেশের অবস্থা যেরূপ, চতুর্দ্দিকের অবস্থা যেরূপ, সমাজের অবস্থা যেরূপ, পুরুষগণের অবস্থা যেরূপ,—রমণীগণের অবস্থা তাহার অনুযায়ী। কেবলমাত্র ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার কথঞ্চিৎ ব্যতিরেক লক্ষিত হয়। ললনাগণ প্রায়ই পুরাতন রীতি অনুসারে হিন্দু-আচার-পদ্ধতিতে দীক্ষিত। কতকগুলি বালিকা স্ত্রী-বিদ্যালয়ে বা গৃহে বঙ্গভাষা, কদাচিৎ একটু ইংরেজিও শিক্ষা করিয়া থাকেন। কলিকাতা নগরীতে এদেশীয় বালিকাগণের বিলাতী আদর্শে শিক্ষার জন্য একটী কলেজ আছে। সেখানে অল্পসংখ্যক বালিকা ঐ আদর্শে শিক্ষা পাইয়া থাকেন। দুই চারিজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিও পাইয়াছেন। পক্ষান্তরে এদেশের বহুসংখ্য যুবক ইংরেজি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ইংরেজি গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইংরেজ গ্রন্থকারগণের মানসিক ভাব দ্বারা নিজ মনকে রঞ্জিত ও অনুশাসিত করিয়া থাকেন এবং ইংরেজ-জাতির বেশ-ভূষা, শিক্ষা, নীতি ও আচার-পদ্ধতির পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। সুতরাং স্বদেশীয় রীতি-নীতি ইত্যাদির প্রতি অল্প বা অধিক পরিমাণে বীত-শ্রদ্ধ হইয়া থাকেন। কারণ এই সকল বিষয় উভয় দেশে বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন কারণে প্রবর্ত্তিত হওয়াতে, তাহা অনেকস্থলে পরস্পর বিরোধী ও সৌসাদৃশ্য-বিহীন। ঐরূপ শিক্ষার ফল যে এরূপ হইবে, ইহাই স্বাভাবিক।

মানুষ আপনার মনের মত সহধর্ম্মিণী লাভের আকাঙ্ক্ষী চিরদিন। পরস্পর উপযোগিতাই স্বাভাবিক নিয়ম। বিলাতী আদর্শে শিক্ষিত যুবকগণ যে ঐ আদর্শে শিক্ষিতা রমণীর আকাঙ্ক্ষী হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। আপাততঃ তাহা সুলভ নহে; কাজে কাজেই ঐরূপ অধিকাংশ যুবকের বিবাহ প্রাচীন রীতি অনুসারে, দেশীয় রীতির অনুযায়ী শিক্ষিতা কন্যার সহিত হইয়া থাকে। বিলাতী-ভাব-প্রদীপ্ত স্ত্রীলাভ বাসনা পরিতৃপ্ত না হওয়ায় কত যুবক ভগ্নহৃদয় ও ডিস্পেপ্সিয়া-গ্রস্ত হইয়াছেন! ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়! ইহা শিক্ষা-বিভ্রাট ও আদর্শ-বিভ্রাটের অপরিহার্য্য ফল। যদি শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা হইত,—যদি

বিলাতী আদর্শের শিক্ষা একদেশব্যাপী, ধর্ম্মনিরপেক্ষ ও অসম্পূর্ণ না হইত,—যদি ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় ধর্ম্ম, সমাজ-নীতি ও তাহার উপযোগিতা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকিত,—যদি শিক্ষা যথার্থরূপে জাতীয় শিক্ষা হইত,—যদি সমাজতত্ত্ব আলোচিত হইত, তাহা হইলে ইংরেজি শিক্ষার ফল কখনই বিষময় হইত না, সে শিক্ষা চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থার সম্যক্ উপযোগী হইত।

কিন্তু অভাব ও পূরণের নিয়ম সর্ব্বত্র ক্রিয়াবান্। তাহা কেবল বণিক্‌গণের ক্রয়-বিক্রয়ে আবদ্ধ নহে। ইংরেজি-শিক্ষিত যুবকগণের বাসনার অনুযায়ী বালিকাও ক্রমে সমাজমধ্যে সমুদিত হইতেছে। তাই আজ স্থান-বিশেষে উচ্চ-জাতীয় হিন্দু-গৃহে প্রাচীন ক্রিয়াকলাপ লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে; বিলাতী সৌগন্ধ্যে, বিলাতী বিলাস-দ্রব্যে, বিলাতী আদর্শে লিখিত উপন্যাসে ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গৃহ আমোদিত ও সুসজ্জিত। এতদ্দ্বারা আমরা সুখী হইব কিনা, আমাদের মঙ্গল হইবে কিনা,—সমাজ ও দেশ উন্নত হইবে কিনা,—ইহাই বিশেষ বিবেচনার বিষয়। বিলাতী সভ্যতা প্রবলবেগে ভারতাভিমুখে আসিতেছে। অন্যান্য দোষ-গুণ যাহাই থাকুক, বিলাতী সভ্যতা যে ব্যয়সাধ্য, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ভারত দারিদ্র্য-পীড়িত। সে সভ্যতাপ্রভাবে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে না, আমরা উন্নত হইব,—তাহা স্বদেশের মঙ্গলকামী ব্যক্তি মাত্রেরই ভাবিয়া দেখা উচিত। বিলাতী সভ্যতার সংস্পর্শে পৃথিবীর নানা স্থানের আদিম অধিবাসিগণ বিলুপ্ত হইতেছে। আমরা ইংরেজ নহি,—আমাদের রমণীগণও "মেম সাহেব" নহেন। এ দেশের জলবায়ু বিলাতের ন্যায় নহে। বিলাতী সভ্যতা ও আচার-ব্যবহার এবং আমাদের সভ্যতা ও আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ বিভিন্ন অবস্থায় আবির্ভূত হইয়াছে সুতরাং তাঁহাদের সকল নিয়মই যে আমাদের অনুকরণীয় হইবে, ইহা সম্ভবপর নহে। তাঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ, অন্নবিচার, শ্রাদ্ধাদির নিয়ম, একান্নভুক্ত-পরিবার-প্রথা নাই;—আমাদের মধ্যে আছে। তাঁহাদের মধ্যে রমণীগণের অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে বিবাহ, অনেক পরিমাণে বিবাহ-স্বাধীনতা, অবস্থাবিশেষে স্ত্রী বা স্বামি-বর্জ্জন প্রভৃতি প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে;—আমাদের তাহা নাই। তাঁহাদের দায় ভাগ ও ধর্ম্মপ্রণালী আমাদের ন্যায় নহে। জাতি-বিশেষের বিশেষ বিশেষ আচার যে তাহাদের ধর্ম্মপ্রণালী ও অপরাপর সামাজিক আচার-ব্যবহারের সহিত সংসৃষ্ট, ইহা বলা বাহুল্য। এরূপ অবস্থায় আমাদের নৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী পরিবর্ত্তিত না হইলে, কি প্রকারে আমাদের রমণীগণ বিলাতী রমণীগণের ন্যায় হইতে পারেন?

কোন জাতীয় স্ত্রী বা পুরুষসমূহের অবস্থা, বা তাহাদের সামাজিক আচার-পদ্ধতি, তাহাদের ইচ্ছা-গঠিত নহে। ব্যক্তি-বিশেষের বা কতকগুলি লোকের ইচ্ছায় কোন জাতির মধ্যে অচিরাৎ কোন সামাজিক নিয়ম প্রচলিত হইতে পারে না। সমাজস্থ ব্যক্তিগণের অবস্থা ও সামাজিক নিয়মাবলী দৃশ্যমান ও অদৃশ্য এবং পূর্ব্ববর্ত্তী শত শত কারণের ফলস্বরূপ। যেমন ইচ্ছামাত্র সেই অবস্থা রূপান্তরিত হইতে পারে না, নূতন আচার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না,—সেইরূপ ইচ্ছামাত্র চিরাগত আচার পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইতে পারে না। যে সকল কারণ সমাচারে সেই অবস্থা বা আচার পদ্ধতি আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা অপসারিত না হইলে,—সেই সকল কারণজনিত লোকের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত না হইলে,—কখনই তাহা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না, দুই চারিটী বক্তৃতা বা প্রবন্ধ প্রভাবে তাহা দূর হওয়া দূরের কথা, অনেক সময় দণ্ডদায়ী রাজনিয়ম সত্ত্বেও সহসা তাহা বিদূরিত হয় না। সতীদাহ প্রবল দণ্ড-সংযুক্ত রাজ-নিয়ম দ্বারা নিবারিত হয়, কিন্তু ঐ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়ার পরেও পুনঃ পুনঃ সতীদাহ হইয়া গিয়াছে, এখনও কদাচিৎ হইয়া থাকে। বিধবা বিবাহ বিধিবদ্ধ হইয়াছে, অনেকগুলি বিধবার বিবাহও হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও তাহা সামাজিক নিয়মে পরিণত হয় নাই। উত্তর পশ্চিম দেশীয় কোন কোন রাজপুত জাতির মধ্যে কন্যা-হত্যারূপ নৃশংস প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। এই লোমহর্ষণ কার্য্য মানব-হৃদয়ের সম্পূর্ণ বিরোধী হইলেও এবং প্রবল রাজ-নিয়ম দ্বারা নিবারিত হইলেও, এখনও তাহার সম্পূর্ণরূপে অদর্শন হয় নাই।

হিন্দু রাজত্ব-সময় হিন্দুরমণীগণের অন্তঃপুর বাস প্রথা সম্ভবতঃ এখনকার ন্যায় ছিল না। তখন তাঁহারা প্রকাশ্য বাহির হইতে পারিতেন। রাজমহিষী সভামণ্ডলে রাজার পার্শ্বদেশে বসিয়া বিচারকার্য্যের সহায়তা করিতেন। মুসলমান রাজত্বকালে এই প্রথা প্রবলভাব ধারণ করে। ইহার অবশ্যই গূঢ় কারণ ছিল। নারীগণ স্বভাবতঃ দুর্ব্বলা। তাঁহাদের রক্ষার যথোচিত বিধান ব্যতীত তাঁহারা স্বাধীনভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারেন না। মুসলমান রাজত্বকালে তাহা ছিল না। সুতরাং ভদ্র-মহিলাগণ নিরন্তর অন্তঃপুরবাসিনী ছিলেন।—মহারাষ্ট্রীয়-গণের জাতীয় স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে রমণীগণের স্বাধীন গমনাগমন বর্জ্জিত হইয়াছিল। মুসলমান শাসন নেপাল ও মণিপুর স্পর্শ করে নাই—সেখানে রমণীগণের স্বাধীন গমনাগমন অনেক অধিক। অন্তঃপুর-বাস-প্রথা হিন্দু-জাতির প্রাচীন নিয়ম হইলেও মুসলমানগণের মধ্যে তাহা অধিকতর প্রবল। মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দু-সমাজে যে অন্তঃপুর-বাস-প্রথা প্রবলভাব ধারণ করিয়াছিল, রাজজাতির অত্যাচার তাহার প্রবল কারণ।—রাজজাতির অনুকরণ তাহার অন্যতম কারণ।

যাহা হউক, মুসলমান-শাসনের তিরোধানে এ সম্বন্ধে

অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইংরেজ-শাসন, শিক্ষা-বিস্তার, রেলওয়ে, ষ্টিমার, সুরক্ষিত রাজপথ, কার্য্যসূত্রে শিক্ষিত অশিক্ষিত বহুলোকের প্রবাস ইত্যাদি নানা কারণে পূর্ব্বাপেক্ষা অন্তঃপুরবাস-প্রথা মৃদুভাব ধারণ করিয়াছে—ললনাগণের স্বাধীন গমনাগমন অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহা যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতেও সুরক্ষা ব্যবস্থা হওয়া বিধেয়,—সমাজের ও চতুর্দ্দিকের অবস্থানুযায়ী তাহার একটী সীমা নিরূপিত থাকা আবশ্যক। কিংবা রমণীগণের পক্ষে বিলাতী আদর্শের স্বাধীনতাই আমাদের সমাজের পক্ষে শুভজনক হইবে, ইহাই বিবেচনার বিষয়। বিলাতেও সে স্বাধীনতার সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই এমন নহে, কিন্তু তাহার আকার-গত পার্থক্য অনেক। আমাদের মনে হয় যে, বিলাতী আদর্শে রমণীগণের অবস্থাগত পরিবর্ত্তন প্রার্থনীয় ও সমাজের পক্ষে শুভদায়ী হইতে পারে না। পরিবর্ত্তন, সামাজিক ও চতুর্দ্দিকের অপরাপর অবস্থার অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক, নতুবা মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। স্বাভাবিক নিয়মে তাহাই হইয়া থাকে।

ইউরোপীয় সাহসী বীর পুরুষগণ যেরূপে ললনাগণকে আকস্মিক বিপৎপাত হইতে রক্ষা করিতে পারেন, এ দেশীয় ব্যক্তিগণ যে সেরূপ করিতে সমর্থ, এরূপ বোধ হয় না। ইংরেজের বিচারালয়ে ইংরেজগণ যেরূপ সদ্বিচার লাভ করিতে পারেন, আমরা সর্ব্বদা সেরূপ সদ্বিচার লাভ করিবার প্রত্যাশা করিতে পারি না। বিশেষতঃ যখন ইংরেজ এক পক্ষ, দেশীয় লোক অপর পক্ষ, বিচারপতি ইংরেজ, তখন বাদী প্রতিবাদীর অবস্থাঘটিত ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচারের নিশ্চয়তা নাই। কারণ, ইংরেজ বিচারপতি অনেক সময়ে ইংরেজি আদর্শ মনের সম্মুখে রাখিয়া বিচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। তাঁহার পক্ষে অনেক সময়ে, দেশীয় লোকের মনের ভাব, সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি উত্তমরূপে বুঝিয়া কার্য্য করা কঠিন। এতদ্ব্যতীত, ঐরূপ অবস্থায়, দেশীয় লোকের পক্ষে ন্যায়-বিচার লাভের অপরাপর প্রতিবন্ধকও সময়ে সময়ে উপস্থিত হয়। ইংরেজি বিচারালয়ে, বিচারলাভ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। ধনহীন ব্যক্তির পক্ষে অনেক সময় বিচার প্রার্থনা করাই অসাধ্য। ব্যভিচার-ঘটিত ব্যাপারে এদেশীয় ব্যক্তিগণ—ইংরেজের বিচারালয়ে যাইতেই অনিচ্ছুক। সতীত্ব সম্বন্ধে ইংরেজ ও অপর কোন কোন ইউরোপীয় জাতির যেরূপ ধারণা, হিন্দু-জাতির সেরূপ নহে। হিন্দু-জাতির মধ্যে সতীত্বের সহিত ধর্ম্মের যোগ আছে। ইংরেজি নীতিতে কেহ বিধবার সতীত্ব কলঙ্কিত করিলে তাহার দণ্ডবিধান নাই। তাঁহাদের মধ্যে ব্যভিচার-জনিত বিবাহ-উচ্ছেদ (স্ত্রী বা স্বামি-ত্যাগ) প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে ;—উচ্চ হিন্দু-জাতির মধ্যে তাহা নাই। এরূপ অবস্থায় ইংরেজ ললনাগণের স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছা-বিহার হিন্দু-রমণীগণের আদর্শস্থল হইতে পারে না। অন্তঃপুরবাস-প্রথার মূলোচ্ছেদ করা হিন্দুসমাজের অভিমত নহে,—রমণীগণ স্বয়ং তাহা চাহেন না। ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় কোন কোন মহামনা ব্যক্তি এরূপ বিকৃত মতের পক্ষপাতী ছিলেন না।

স্বেচ্ছাবিহারিণী হইলেই যে সুখ ও উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ হইবে, তাহারই বা স্থিরতা কি? নিম্ন-জাতীয় রমণীগণ ত সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারে,—তাহাদের অবস্থাগত উন্নতি কোথায়? মহারাষ্ট্রীয় রমণীগণ ত বঙ্গীয় ললনার তুলনায় অবগুণ্ঠনবতী নহেন,—তাঁহাদেরই বা বিশেষ উন্নতি কি হইয়াছে? দেশীয় খৃষ্টান ললনাগণ ত অনেক পরিমাণে বিলাতী আদর্শে পরিচালিত,—তাঁহাদেরই বা বিশেষ উন্নতি কোথায়? পশ্চিমে ইউরোপে ত এদেশের ন্যায় অন্তঃপুরবাস-প্রথা নাই—সেখানে ত সভ্যতা মূর্ত্তিমান্—সেখানে ত ললনাগণের স্বেচ্ছা-বিহার অনেক পরিমাণে লক্ষিত হয়,—কিন্তু তথাপি সেখানে স্ত্রীজাতির অবস্থাগত বিশেষ উন্নতি কি হইয়াছে? তাঁহারা কেবল এই কারণে সমাজমঙ্গলকারী কোন্ গুরুতর কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছেন, যাহা এদেশীয় ললনাগণ করিতে সমর্থ হন নাই?—সেখানে কি ঐ কারণ বশতঃ মঙ্গল ও ধর্ম্মভাবের বিস্তার অধিক হইয়াছে?—সেখানে কি এই কারণে পারিবারিক সুখের আতিশয্য হইয়াছে? হা! ইউরোপ! হা! আদর্শ ইউরোপ! এত সভ্যতা সত্ত্বেও কেন একদিকে তোমার হৃদয়ে ভীষণ বিলাস তরঙ্গিত,—ইন্দ্রিয়ভোগের অদম্য পিপাসায় তোমার অঙ্গ জর্জ্জরিত; অন্যদিকে ভীষণ দারিদ্র্যের হাহাকার!—অদূরে সামাজিক বিপ্লব নৃত্য করিতেছে! ইহাই কি সুখ?—ইহাই কি উন্নতির ফল? যদি আদর্শ ইউরোপেই সামাজিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা, তবে সেখানকার বিদুষী রমণীগণ কেন বিলাপ-তানে বলিতেছেন,—"সকল বিষয়ই পুরুষের হস্তগত,—সকল বিষয়েই তাঁহাদের আধিপত্য,—আমরা কেন সকল বিষয়ে তাঁহাদের সহিত সমভাবে স্বত্ববতী হইব না?" যেখানকার সামাজিক অবস্থা এই, সেখানকার আদর্শে এদেশীয় সমাজ, এদেশীয় ললনা কিরূপে সেই প্রকৃত সামাজিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে,—ন্যায় ও ধর্ম্ম যে উন্নতির প্রাণ, মঙ্গল যে উন্নতির হস্ত, সুখ যে উন্নতির নিত্য সহচর! পক্ষান্তরে, মুসলমানগণের মধ্যে ত "অবরোধ" প্রথা প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল; সেভাবে প্রাচীন ভারতে ও ইউরোপে ছিল না। তথাপি তাঁহারা উন্নতির পথে অনেক পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছিলেন,—জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত হইয়াছিলেন,—ভারত ও ইউরোপে বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন।

শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র।

জন্মভূমি।

অষ্টম ভাগ। } আষাঢ়। ১৩০৫। { ৭ম সংখ্যা।

বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা।

(প্রভাসাবদান)

"অবদান কল্পলতা" একখানি অতি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত মহাকাব্য। শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, মহোদয় তিব্বতদেশ হইতে অন্যান্য বহু সংস্কৃত গ্রন্থের সহিত ইহা আনয়ন করিয়াছেন। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর-কর্ত্তৃপক্ষগণ এই অপূর্ব্বকাব্যের গুণ অবগত হইয়া পূর্ব্বোক্ত শরৎ বাবুর সম্পাদকতায় এই গ্রন্থ প্রকাশিত করিতেছেন। শরৎবাবু এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—তিনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে যখন তিব্বতের রাজধানী লামা-নগরীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময় তিব্বতের প্রধান লামার মুদ্রাযন্ত্রের অধ্যক্ষ পারপন্ (Tarpon) কাষ্ঠফলকে মুদ্রিত তিব্বতীয় অক্ষরে মূল সংস্কৃত ও উহার তিব্বতীয় অনুবাদ সহ ৬২০ পত্রবিশিষ্ট একখানি গ্রন্থ তাঁহাকে প্রদান করেন। যে মূল হস্তলিখিত গ্রন্থ হইতে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে, ঐ গ্রন্থ প্রধান-লামার মঠে অতি যত্ন ও সাবধানতা সহকারে রক্ষিত হইয়া থাকে, উহা অন্যের সম্পূর্ণ অনধিগম্য।

অবদান কল্পলতা তিব্বতদেশে অত্যন্ত সমাদৃত, ইহার প্রধান গুণ এই যে, ইহাতে বোধিসত্ত্বের দানশীলতা, নৈতিকচরিত্র, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, প্রণিধান্ ও উন্নত-জ্ঞানের অতি সুন্দর বর্ণনা আছে। এই মহাকাব্য কাশ্মীরের মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র ও তাঁহার পুত্র সোমেন্দ্র কর্ত্তৃক বিরচিত। সোমেন্দ্র গ্রন্থের যে একটী পদ্যময়ী ভূমিকা লিখিয়াছেন, উহা পাঠে জানা যায়, শাক্যকুলে প্রধান মন্ত্রী জয়াপীড়ের বংশে ভোগীন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র সিন্ধু। সিন্ধুর পুত্র প্রকাশেন্দ্র। প্রকাশেন্দ্র অতীব প্রতিভাশালী, বিদ্বান্ এবং বিবেকী ছিলেন। তাঁহার পুত্র মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র। প্রথমে কোন ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বের গুণাবলী বর্ণনা পূর্ব্বক মহাকাব্য রচনা করিবার জন্য ক্ষেমেন্দ্রের নিকট প্রস্তাব করেন, তাহার পর তাঁহার নফরনামা এক সুশিক্ষিত বন্ধুও ঐরূপ অনুরোধ করেন। তদনুসারে ক্ষেমেন্দ্র অবদান কল্পলতার প্রথম তিন পল্লব রচনা করিয়া অতি-বিস্তৃতিভয়ে বিরত হন। অনন্তর স্বয়ং তথাগত তাঁহাকে স্বপ্নে এই মহাকাব্য রচনা করিতে আদেশ করেন। মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র ১০৭ পল্লব রচনা করিয়া পরলোক গমন করেন, অনন্তর তাঁহার পুত্র সোমেন্দ্র "জীমূত বাহনাবদান" রচনা করিয়া এই মহাকাব্য ১০৮ পল্লবে পরিণত করেন। সোমেন্দ্র লিখিয়াছেন, যাঁহার হস্তে গিয়া সমুদয় শাস্ত্র বিশুদ্ধ হয়, সেই আচার্য্য সূর্য্যশ্রী এই গ্রন্থের লিপিকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। আর রাজা অনন্তদেব যখন কাশ্মীর মণ্ডল শাসন করেন, সেই সময় জিন জন্ম মহোৎসবে এই কল্পলতিকা গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

লক্ষ্মীকর নামক একজন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত তিব্বতে অবস্থিতিকালে সর্ব্ব প্রথম গ্রন্থের তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। তাহার পর ক্রমে ২৩ জনের অধিক তিব্বতবাসী পণ্ডিত এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের কাল নির্দ্দেশ লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়—এম্ সিল্‌ভিয়ান লেভি (M. Sylvain Levi) এবং অধ্যাপক বুলার্ (Prof. Buhler) কথাসরিৎসাগর প্রণেতা সোমদেব ভট্ট ও সোমেন্দ্রকে এক ব্যক্তি বলেন এবং এই গ্রন্থের রচনাকাল ১১শ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু আমরা কথাসরিৎসাগর ও অবদান কল্পলতা মিলাইয়া পাঠ করিয়াছি, উভয়ের ভাষাগত অনেক পার্থক্য। যিনি প্রণিধানপূর্ব্বক এই দুই গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তিনি কোন প্রকারেই এই উভয় গ্রন্থ এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হইবেন না। এই কাব্যের অনেকগুলি কবিতায় মহাকবি কালিদাস ও ভবভূতির রচিত শ্লোকের ভাব দৃষ্ট হয়, দুই এক স্থলে এমন কি,—ভাব, শব্দ, ছন্দ পর্য্যন্ত এক প্রকার। এই উপাদেয় গ্রন্থের অনুবাদ প্রায় সমুদয় পাশ্চাত্য ভাষাতেই হইতেছে। অতএব উদয়োন্মুখী বাঙ্গালা ভাষায়ও ইহার একটা অনুবাদ থাকা আবশ্যক, তজ্জন্য ইহার অনুবাদে

প্রবৃত্ত হইলাম। এইরূপ মহাকাব্যের বঙ্গানুবাদে যেরূপ গভীর পাণ্ডিত্য ও ভাষায় অধিকার এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকা আবশ্যক, আমার তাহা নাই, তথাপি যথারীতি ইহার মর্ম্ম প্রকাশ করিতে যত্ন করিব।

উপাখ্যান।

পুরাকালে ভূমণ্ডলে প্রভাবতীনামে নগরী ছিল। বহু সংখ্য বিদ্যাধর সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ নিরন্তর নগরীতে অবস্থান করায়, উহা পুণ্যাত্মাদিগের পুণ্যপ্রভাবে ভূতলে অবতীর্ণা অমরপুরীর ন্যায় শোভা বিস্তার করিত। দেবগণ সর্ব্বদা ঐ ভূপতির সমুজ্জ্বল কীর্ত্তিকথার আলোচনা করিতেন এবং সমস্ত নরপতিবর্গ শোভাময়ী কুসুম মালিকার ন্যায় উক্ত ভূমিপতির আজ্ঞা নিরন্তর নতশিরে বহন করিত। একদা নরেশ্বর সভামণ্ডলে উপবিষ্ট আছেন, ঈদৃশ সময়ে নাগবনের অধ্যক্ষ আসিয়া বিনীতভাবে জানাইল,—"মহারাজ, আমরা একটী অদ্ভুত দিব্যকান্তি হস্তী ধরিয়াছি, উহাকে দেখিলে মনে হয়, মহারাজের কীর্ত্তি-কথা শ্রবণে স্বয়ং ঐরাবত বুঝি ভূমণ্ডলে উপনীত হইয়াছেন। পৃথ্বীশ্বর, একবার আসিয়া ঐ করিবরকে প্রত্যক্ষ করুন, প্রভুর কৃপাদৃষ্টিতে ভৃত্যগণের শ্রম সফল হয়।" নরপতি উহা শ্রবণপূর্ব্বক অমাত্য ও সুহৃদ্বর্গে পরিবৃত হইয়া সেই গমনশীল শুভ্র কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় বিপুলদেহ গজরাজের নিকট আগমন করিলেন। উৎকট মদগন্ধে আকৃষ্ট ভ্রমর পংক্তি দ্বারা ঐ হস্তীর গণ্ডস্থল পরিব্যাপ্ত। ঐ গজরাজ যেন নিমিলিত লোচনে বিন্ধ্যপর্ব্বতের সেই কদলী ও শল্লকী কাননের শোভা স্মরণ করিতেছে। রাজা সুন্দর দণ্ডদ্বয় শোভিত করেণু-তনয়কে বিলোকন করিয়া বিস্ময় সহকারে বলিলেন,—"আহা! সংসারে নূতন নূতন বৈচিত্র-শালী কতই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পদার্থ প্রত্যহ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, সমুদ্রমন্থন ব্যতীত সমুত্থিত ঐরাবতের ন্যায় এই মহাগজকে কে সৃষ্টি করিল!"

অনন্তর নরপতি হস্তিশালার কর্ম্মসচিবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এই হস্তীকে সম্যক্‌রূপে শিক্ষাদি দ্বারা বিনীত কর।" তদনুসারে গজশিক্ষা-বিশারদ হস্তিশালার অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক সেই মহাগজ সর্ব্ববিধ শিক্ষা দ্বারা বশীকৃত হইল। সৎ শিষ্যের ন্যায় সুবোধ সেই হস্তিনন্দন পূর্ব্ব-জন্মের অভ্যাসপ্রযুক্ত সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাতেই কৃতকার্য্যতা প্রদর্শন করিল। নিরন্তর মদবারি ক্ষরণেও প্রমত্ত হইত না, তাহার দেহে যেমন অমিতবল ছিল, সে তেমনই অসাধারণ উৎসাহ প্রদর্শন করিত। বিপক্ষনাশে সে নরপতির তুল্য প্রভাবশালী হইয়া উঠিল। শিক্ষা শেষ হইলে সেই গজশিক্ষক রাজার সন্নিধানে গিয়া জানাইল,—"মহারাজ! এই হস্তী দম্যক্রিয়ায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।" রাজা সেই হস্তীকে অঙ্কুশাঘাতেও নির্ব্বিকার বিলোকন করিয়া তাহার পরীক্ষা প্রসঙ্গে মৃগয়ার্থ মহাবনে প্রবেশ করিলেন। সেই করিরাজ যখন বনমধ্যে গমন করিতে লাগিল, তখন তাহার রত্নকেয়ূরের উজ্জ্বল-প্রভায় চতুর্দ্দিক্ দীপ্তিময় হইয়া উঠিল, ভগবতী বনদেবতা হর্ষ ও বিস্ময়-সহকারে সেই মহাগজকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং প্রফুল্ল কুসুম সৌরভবাহী বিন্ধ্যসমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া সেই গজারূঢ় নরপতিকে সেবা করিতে লাগিল।

অনন্তর সেই গজরাজ যখন বিন্ধ্যপর্ব্বতের উপকণ্ঠে সমুপস্থিত হইল, তখন যদৃচ্ছা লব্ধ শাখাপল্লব ও পূর্ব্ব-বিলাসের বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে জাগরূক হওয়ায় তাহার চিত্ত-বৃত্তি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। ঈদৃশ সময় তাহার পূর্ব্ব প্রণয়িনী হস্তিনী ঘ্রাণ পাইয়া, দুরাচার নরপতি যেমন বিশুদ্ধ নীতিকে উপেক্ষা করে, তদ্রূপ সেই হস্তীও অঙ্কুশ যাতনার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সবেগে প্রধাবিত হইল। যেমন সংসারাসক্ত মানবেরা নিয়ত বিষয়বিষপানে প্রবৃত্ত হইলে (সহস্র উপদেশেও) বিরত হয় না, তদ্রূপ (উন্মার্গ-প্রস্থিত) সেই হস্তীও কোন উপায়েই ক্ষান্ত হইল না। রাজা—প্রভঞ্জনের ন্যায় বেগশালী সেই করিরাজের অবস্থা দেখিয়া সন্দিহান হইলেন এবং গজ-শিক্ষক সংযাতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ওহে সংযাত! তুমি যে হস্তীকে সুন্দররূপ শিক্ষা দ্বারা বিনীত করিয়া ছিলে, সে যে এখন অঙ্কুশতাড়নাও গ্রাহ্য করিতেছে না। দিঙ্-গুল যেন ভ্রমণ করিতেছে, পাদপ সকল উৎপাটিত প্রায়, ইহার পদভরে মেদিনী বিকম্পিত হইতেছে। অসময়ে দৈব প্রতিকূল হইলে যেমন কোন প্রকার পুরুষকারই সফল হয় না, তদ্রূপ এই হস্তীর প্রতি কোন চেষ্টাই ফলবতী হইতেছে না।

হস্তিপালক বলিল, "মহারাজ! আমি এই হস্তীকে সর্ব্ববিধ শিক্ষা দ্বারা বিনীত করিয়াছিলাম, কিন্তু আজ হস্তিনী গন্ধ পাইয়া, এ এই প্রকার উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। জন্তুগণ কামের বশ হইলে উপদেশ, নিয়ম, সরলতা বা সাধুতা কিছুই স্মরণ করে না। যেমন পর্ব্বতবাহিনী স্রোতস্বিনী যখন নিম্নাভিমুখে পতিত হয়, তখন তাহার গতিরোধ করা যায় না,—তদ্রূপ ভোগাভিলাষ সংযুক্ত জীবগণের বিষয়-লোলুপ চিত্তবৃত্তিকে সংযত করিতে পারা যায় না।—মহারাজ! আমরা কেবল শারীরিক নিয়ম শিক্ষাতেই নিপুণ, কিন্তু মনের নিয়ম শিক্ষায় ঋষিরাও পাণ্ডিত্য প্রকাশে অক্ষম। এই হস্তী অত্যধিক রাগপ্রযুক্ত আত্মসংযম বিস্মৃত হইয়া মূর্খের ন্যায় উৎপথে প্রধাবিত হইতেছে। অতএব রাজন্! বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া শীঘ্র ইহাকে পরিত্যাগ করুন, কুক্রিয়াসক্ত দুষ্ট ব্যক্তি কেবল স্বয়ং পতিত হয় না,—অন্যকেও পাতিত করে।"

রাজা সংযাতের সময়োচিত উপদেশ শ্রবণে, তাহার সহিত এক মহাতরুর শাখা অবলম্বন করিলেন। অনন্তর নৃপতি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া অশ্বারোহণে গৃহ গমন করিলে, সেই উন্মত্ত গজ সমস্ত অরণ্যানী অনুসন্ধান করিয়া হস্তিনীর সহিত গিয়া মিলিত হইল। তাহার পর সপ্তাহকাল করিণীসহ একত্র বাসে অনঙ্গ-জ্বর প্রশমিত হইলে, স্বয়ং আসিয়া পুনরায় সেই রাজার হস্তিশালায় আলান-স্তম্ভে বদ্ধ হইয়া রহিল। সংযাত সেই শিক্ষিত গজেন্দ্রকে পুনরাগত দেখিয়া রাজার নিকটে হৃষ্টচিত্তে নিবেদন করিল, "মহারাজ! যে হস্তী স্মরাতুর হইয়া অনুরাগ-রজ্জুর আকর্ষণে প্রস্থান করিয়াছিল, শিক্ষাগুণে সেই পুনর্ব্বার স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দেখুন, শল্লকী-শাখার আস্বাদন-পটু এই হস্তি জাতিকে শিক্ষাদ্বারা বাধ্য করিতে পারিলে, ইহাদের এতই বিনয় জন্মে যে, সঙ্কেত করিলে ইহারা তৎক্ষণাৎ সন্তপ্ত লৌহ-গোলক পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। মহারাজ! সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী প্রভৃতি যাবতীয় বলবান মহাজন্তুকেই দমন করিতে পারা যায়, কিন্তু অনুরাগ-মদিরায় প্রমত্ত বিষয়-লোলুপ অন্তঃ-করণকে কোন প্রকারেই দমন করিতে পারা যায় না।"

রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া ঈষৎ চিন্তা করতঃ বলিলেন, "সংযাত! তুমি যথার্থ বলিয়াছ, সংসারে এমন কি কেহ আছেন, যিনি শান্তি উপদেশ দ্বারা মনোরূপ প্রমত্ত হস্তীকে আত্ম-সংযম-আলানে বদ্ধ করিতে পারেন?" সংযাত রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া যেন দৈব-প্রেরিতের ন্যায় উত্তর করিল, "মহারাজ! জগতের ক্লেশরাশি নিঃশেষরূপে উন্মূলনের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর বুদ্ধগণই এই কার্য্যে সক্ষম। বিবেকের আলোকে আলোকিত হওয়ায়, তাঁহাদের হৃদয়ে বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, শান্তি ও সন্তোষ দ্বারা চিত্ত বৃত্তির সর্ব্বপ্রকার মালিন্য বিদূরিত হওয়ায়, তাঁহারা বিষয়-চিন্ত হইয়াছেন; অতএব সেই মনীষিগণই অজ্ঞান-নিদ্রায়-নিদ্রিত জগৎকে প্রবোধিত করিতে সমর্থ।"

রাজার চিত্তবৃত্তি ইতঃপূর্ব্বেই প্রবুদ্ধ ছিল, সংপ্রতি বুদ্ধের নাম শ্রুতমাত্র তাঁহার পূর্ব্বজন্মের অভ্যস্ত প্রণিধান উৎপন্ন হইল, তিনি বলিলেন, "মকরাদি হিংস্র প্রাণিপুঞ্জ পরিপূর্ণ সংসার-সমুদ্রে জগৎ নিমগ্ন প্রায়; অতএব কুশল সেতু নির্ম্মাণ দ্বারা ইহার উদ্ধার সাধন করিব।" অনন্তর গগনমণ্ডল হইতে "শুদ্ধাবাস-কায়িক" দেবগণ বলিলেন, "মহামতে! তুমি সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিয়াছ, অতএব সম্বুদ্ধ পদ প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর রজোগুণ বিরহিত-গণের অগ্রণী নরপতি তাহা শ্রবণমাত্র জাতিস্মর এবং দিব্য চক্ষু হইয়া বোধিসত্ত্ব ভাব প্রাপ্ত হইলেন॥ *

ইতি প্রথম পল্লব।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

* "অবদান কল্পলতা"র এক একটী উপাখ্যান অবলম্বনে এক একটী প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা; সুতরাং পরবর্ত্তী উপাখ্যানগুলি অপেক্ষাকৃত বিস্ময় ও কৌতূহলজনক হইলেও, ক্রমানুরোধে প্রথম আখ্যায়িকা হইতেই আরম্ভ করা গেল।

বাঙ্গলা ভাষার লেখক।

ন

(৪)

—নৃত্যগোপাল রায় কবিরত্ন। পিতা সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺ কালিদাস রায়। সাং কলিকাতা, হাতীবাগান, গ্রে ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল কবিরত্ন মহাশয়,—সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। তদ্বিরচিত কয়খানি অতি সুন্দর সংস্কৃত নাটক আছে। সম্প্রতি বাঙ্গলার নাট্য-আসরে ইনি নামিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'অন্নদামঙ্গল' ষ্টার থিয়েটারে এবং 'পরশুরাম' ও 'দরাফ খাঁ' বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইতেছে। সম্প্রতি সংস্কৃত "চণ্ডকৌশিকের" ভাব অব-লম্বনে তিনি "হরিশ্চন্দ্র" নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। ষ্টার থিয়েটারে তাহা দক্ষতার সহিত অভিনীত হইতেছে। সংস্কৃত রীতি-নীতি বজায় রাখিয়া, তিনি এই সকল নাট্য-কাব্য রচনা করিয়াছেন। সুতরাং এই ইংরেজী আদর্শের যুগে, কবিরত্ন মহাশয়, এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করি-য়াছেন বলিতে হইবে। তিনি নামের কাঙ্গাল নন, তাই কোন গ্রন্থে আত্ম-পরিচয় দেন নাই। তবে আমরা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে বসিয়া, তাঁহার সেই কৃতিত্ব গোপন রাখিব কেন?

নৃত্যগোপাল বাবু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও শক্তিশালী লেখক, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি সদালাপী, সামা-জিক ও পরোপকারী। কলিকাতার সিটী কলেজিয়েট স্কুলে কিছুকাল তিনি প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন। পিতৃবিয়োগ হইবার পর, পৈতৃক ব্যবসায় বজায় রাখিবার জন্য এবং অনুগত-আশ্রিতের প্রতিপালন জন্য, ইনি কবিরাজী করিতেছেন। এই কবিরাজী বিদ্যায়ও তাঁহার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা আহ্লাদের কথা এই যে, কবিরাজীর গুরু-শ্রমের পরও, তিনি যে একটুখানি অবসর পান, সেই সময়টীতেও বাঙ্গলা সাহিত্যের অনুশীলনে নিযুক্ত থাকেন, ভগবান্ তাঁহার উক্ত লক্ষ্যের সহায় হউন।

* * * *

—নগেন্দ্রনাথ ঘোষ। সাং ভবানীপুর, কলিকাতা। ইনি একজন গীতিনাট্য-লেখক। মণি-মন্দির বা মহা-শ্বেতা, বিমুক্ত বেণীবন্ধন প্রভৃতি ইহাঁর কয়েকখানি গীতি-নাট্য আছে। ভবানীপুরের সখের যাত্রা-সম্প্রদায়ে এক সময়ে ইহাঁর গীতিনাট্যগুলি অভিনীত হইত। সঙ্গীত-রচনায় ইহাঁর বেশ একটু শক্তি আছে।

* * * *

—নগেন্দ্রনাথ বসু। পিতা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বসু। সাং দক্ষিণ বারাসাত, জেলা ২৪ পরগণা। ইনি সচ্চরিত্র ও সুলেখক। জ্যোতিঃপ্রকাশ, ঋষি কুমারী, প্রেম-ভিখারিণী প্রভৃতি ইহাঁর কয়খানি গ্রন্থ আছে।

* * * *

—নরেন্দ্রনাথ বসু। সাং কলিকাতা, আহেরীটোলা। ইনি একজন সমজদার লেখক ও সমালোচক। ভূতপূর্ব্ব সাধারণী প্রভৃতি পত্রিকায় ইনি লিখিতেন। নটেন্দ্রলীলা প্রভৃতি ইহাঁর দুই একখানি গ্রন্থ আছে।

* * * *

—নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল। সাং কলিকাতা, বহুবাজার, শাঁখারিটোলা। ভূতপূর্ব্ব "সহচর" প্রভৃতি পত্রের ইনি একজন বিশিষ্ট লেখক—বিজ্ঞ, বহুজ্ঞ এবং চিন্তাশীল। "ভূ-বিদ্যা" প্রভৃতি কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ ইহাঁর আছে। নৃসিংহ বাবু বহু গুণে গুণবান।

—নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী। পিতার নাম ৺ ত্রৈলোক্য-নাথ চৌধুরী। আদি-বাস বারুইপুর, ২৪ পরগণা। সম্ভ্রান্ত কায়স্থবংশে নগেন্দ্র বাবুর জন্ম। বারুইপুরের চৌধুরীরা বুনিয়াদী কায়স্থ,—জমিদার। নগেন্দ্র বাবুর জন্ম সন ইংরেজী ১৮৬৯ সাল, আগষ্ট। অতি শৈশবে ইহাঁর পিতৃ-বিয়োগ হয়। তদবধি ইনি মাতুলালয়ে প্রতিপালিত। ইহাঁর মাতুল,—কলিকাতা-পাথুরিয়াঘাটার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার,—বিদ্যোৎসাহী, গুণী ও গুণগ্রাহী ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ ঘোষ মহাশয়।

নগেন্দ্র বাবুর বাঙ্গলা-সাহিত্যে অনুরাগ,—বিশেষ প্রশংসনীয়। কলিকাতা বিডন্‌ষ্ট্রীটস্থ সুপ্রতিষ্ঠ "চৈতন্য লাইব্রেরী",—দশ বৎসর পূর্ব্বে প্রধানতঃ নগেন্দ্র বাবু ও তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু,—সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেনের যত্নে,—প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলতঃ এই গৌরহরি বাবু ও নগেন্দ্র বাবুর যত্নে,—বাঙ্গলা-সাহিত্যবিষয়ক সাধারণ সভা-সমিতি বর্ষে বর্ষে প্রায়ই হইয়া থাকে। এজন্য ইহাঁরা উভয়েই আমাদের ধন্যবাদার্হ। উপস্থিত, নগেন্দ্রবাবু উক্ত চৈতন্য লাইব্রেরীর অবৈতনিক সম্পাদক।

নগেন্দ্রবাবু কলিকাতার মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সিকলেজে অধ্যয়ন করেন। বাল্যকাল হইতেই বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেবায় তাঁহার অনুরাগ।

১৩০২ সালে তিনি "হরিরাজ" নামে একখানি দৃশ্য-কাব্য প্রণয়ন করেন। গ্রন্থে তাঁহার নাম নাই। এই গ্রন্থখানি কলিকাতার ক্লাসিক থিয়েটারে দক্ষতার সহিত অভিনীত হইতেছে। গ্রন্থখানি মহাকবি সেক্সপিয়রের অপূর্ব্ব কবিত্ব-কিরণে উদ্ভাসিত;—হামলেট, ম্যাক্‌বেথ, জুলিয়াশ সিজার প্রভৃতির আংশিক ছায়া স্থানে স্থানে পরিদৃষ্ট হয়। দুই একস্থানে অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছে। সেইজন্য দুই এক স্থানের অনুবাদ এমন সরস ও স্বাভাবিক হইয়াছে যে, তাহাতে ভাবের জটিলতা, ভাষার অস্পষ্টতা ও কষ্ট কল্পনার লেশমাত্র নাই;—পড়িতে তাহা পাঠে মৌলিক বর্ণনাপাঠের প্রচুর আনন্দ লাভ হয়।—নগেন্দ্র বাবুর এই সাহিত্য-সেবা সফল হউক। তাঁহার সাহিত্যানুরাগ চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকুক;—ইহাই আমাদের কামনা।

প

(১)

—পঞ্চানন তর্করত্ন। পিতা ৺ নন্দলাল বিদ্যারত্ন। সাকিম ভট্টপল্লী, জেলা ২৪ পরগণা।

সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়,—বঙ্গীয় সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক, প্রত্নতত্ত্ববিৎ এবং প্রগাঢ় শাস্ত্রদর্শী সুলেখক। তদ্বিরচিত এবং তৎ-সম্পাদিত বহু শাস্ত্রগ্রন্থ, বহু পৌরাণিক-গ্রন্থ, বহু কথা-গ্রন্থ, বহু প্রবন্ধ,—বঙ্গবাসী পাঠক পাঠিকা পাঠ করিয়া আসিতেছেন। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, মহা-নির্ব্বাণতন্ত্র, কূর্ম্মপুরাণ, গরুড়পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, বিদ্যাপতি, রত্নাবলী, মালতী-মাধব প্রভৃতি বহু গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন, সম্পাদন, সঙ্কলন ও অনুবাদ করিয়া,—বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত বঙ্গবাসী সংবাদপত্রে এবং জন্মভূমি মাসিকপত্রে, তাঁহার নানা শ্রেণীর রাশি রাশি প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে। সেগুলি সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে, কয়খানি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়া, বঙ্গীয় সাহিত্যের সম্যক্ শোভা, শ্রী ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়।

তর্করত্ন মহাশয় তেজস্বী, সত্যনিষ্ঠ, সুরসিক, বুদ্ধিমান্, পরিশ্রমী এবং কার্য্যকুশল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজে এবং নিষ্ঠাবান্ হিন্দু-সমাজে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি-প্রতিপত্তি এবং সম্ভ্রম ও প্রাধান্য আছে। শাস্ত্রীয় বিচার বিতর্কে তাঁহার অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং প্রত্যুৎপন্নমতি পরিলক্ষিত হয়। তিনি চিন্তাশীল, ভাবুক, এবং প্রতিভাবান্। তাঁহার তুল্য তীক্ষ্ণ মেধাও কম পরিলক্ষিত হয়।

ভট্টপল্লীর বাটীতে তাঁহার টোল আছে। অনেকগুলি শিষ্য ও ছাত্রকে তিনি প্রতিপালন করেন, এবং নিয়মিত পাঠ শিক্ষা দেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বারকেশ স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি তাঁহার কয়টী বিশিষ্ট ছাত্র, ইতিমধ্যেই সফলকাম হইয়া, স্বনামে স্বগ্রামে টোল প্রতিষ্ঠা করিয়া, অধ্যাপনা কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতেছেন।

তর্করত্ন মহাশয় উচ্চ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকুলে, ধার্ম্মিকের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাই তাঁহার জীবনেও সেই ধর্ম্মের মধুর-মোহন-মূর্ত্তি দেখিতে পাই। গুণের আদর করিতে, গুণীকে উৎসাহ দিতে,—যথ-কথা কহিতে,—

তিনি কখনই পরাঙ্মুখ নন। এইরূপ এবং আরও অনেক-রূপ গুণগ্রামে, আমরা তর্করত্ন মহাশয়কে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি।

তর্করত্ন মহাশয়েরা,—পাশ্চাত্য বৈদিক গৌতম গোত্র। গৌতম গৌত্রীয় অল্লাল ভট্ট সিদ্ধপুরুষ। তর্করত্ন মহাশয়,—অল্লাল ভট্ট হইতে অধস্তন একাদশ পুরুষ। পূর্ব্বে ইহাঁ-দের বাসস্থান ছিল, যশোহর—ধুলিয়াপুর। এই ধুলিয়াপুর, —এক্ষণে খুল্‌না জলার অন্তর্গত। তর্করত্ন মহাশয়ের বৃদ্ধ প্রপিতামহ, ভট্টপল্লীর সন্নিহিত কাঁকিনাড়া গ্রামে আট বিঘা ভূমি দান প্রাপ্ত হন। তাঁহার শীঘ্রই মৃত্যু ঘটে। তদীয় নিঃসন্তান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কাঁকিনাড়ায় থাকিয়া, তাঁহার দুই পুত্রকে প্রতিপালন করেন। জ্যেষ্ঠ রামকানাই বাচস্পতি,—ভট্টপল্লীতে বাস করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র আনন্দচন্দ্র বিদ্যাপঞ্চানন ভট্টপল্লীর তাৎকালিক নৈয়ায়িক প্রধান এবং মহাকবি ছিলেন। তিনি হনুমৎসিদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত। বিদ্যাপঞ্চানন মহাশয়,—সর্ব্বজন-বন্দ্য মাতামহ রামকান্ত সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নামে "শ্রীরামলীলোদয়" নামক মহা-কাব্য রচনা করেন। ইহাঁর কনিষ্ঠ,—লম্বোদর তর্কবাগীশ ভট্টপল্লীর উৎকৃষ্ট স্মার্ত্ত। তর্কবাগীশ মহাশয়ের মধ্যম পুত্র ৺ নন্দলাল বিদ্যারত্ন মহাশয়,—অসাধারণ ধার্ম্মিক, ঋষিকল্প এবং সুপণ্ডিত ছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়,—এই মহাত্মার পুত্র। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র। জ্ঞানে, গুণে, ধর্ম্মনিষ্ঠায় ও বিদ্যাবত্তায়,—ইনি স্বর্গীয় পিতার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। তর্করত্ন মহাশয়,—দশম বর্ষ বয়সের মধ্যে, পিতার নিকট বর্ণশিক্ষা হইতে ব্যাকরণ পাঠ পর্য্যন্ত সমাপ্ত করেন। এখন তাঁহার যশোসৌরভে,—সমগ্র বঙ্গদেশ আমোদিত।

* * *

—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ। পিতার নাম শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম, ইংরেজী ১৮৬৭ সালের ডিসেম্বরে, শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে,—ভাগল-পুর নগরে। আদিবাস—হালিসহর, ২৪ পরগণা।

পাঁচকড়ি বাবু একজন কৃতবিদ্য উৎসাহশীল যুবক। অধ্যবসায়ী, উৎকৃষ্ট বোদ্ধা, বিচক্ষণ এবং কার্য্যকুশল। আজ প্রায় দুই বৎসরকাল তিনি বঙ্গবাসী সংবাদপত্রের প্রধান সম্পাদকের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি চিন্তাশীল, গুণজ্ঞ, সমাজতত্ত্বজ্ঞ, সূক্ষ্মদর্শী এবং শক্তিশালী সুলেখক। রাজনীতিক, সামাজিক, ধর্ম্মবিষয়ক এবং সাহিত্য-বিষয়ক,—সকল প্রবন্ধেই তিনি সিদ্ধহস্ত। গুণ তাঁহার অনেক আছে। তিনি মিষ্টভাষী, সুরসিক, সুহৃৎ-বৎসল ও লোক-চরিত্রে অভিজ্ঞ। তুচ্ছ যশঃ বা নিন্দা তাঁহাকে টলাইতে পারে না। সংসারের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখে তিনি বিচলিত হন না। এই অল্প বয়সেই তিনি বেশ উপেক্ষা করিতে শিখিয়াছেন। কর্ত্তব্য-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া তিনি সকল কাজ করেন। এটি তাঁহার মহৎ গুণ। তিনি অবিশ্রান্ত ও অতি দ্রুত লেখনী চালন করিতে পারেন। বঙ্গবাসীর জন্য তিনি অনেক করিয়াছেন এবং অনেক করিতেছেন। তাঁহার সম্বন্ধে অধিক বলিলে, এক হিসাবে, আমাদের আত্মপ্রশংসাই প্রকাশ পায়। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে, সবিশেষ লিখিবার ইচ্ছাসত্ত্বেও, এইখানে আমাদিগকে নিরস্ত হইতে হইল।

পাঁচু বাবু পিতামাতার একমাত্র সন্তান। বড় আদরে, বড় যত্নে, বড় সুখে তাঁহার শৈশব, কৈশোর এবং যৌবন অতিবাহিত হইয়াছে এবং হইতেছে। এই বত্রিশ বৎসর বয়সেও, তিনি পুণ্যপ্রাণ পিতা, স্নেহময়ী মাতার নয়নানন্দ স্নেহ-পুত্তলি হইয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে সকল সুখ, সকল সৌভাগ্য, সকল আবদার,—অর্জ্জন করিয়া থাকেন। তিনি পিতামাতার এক-চক্ষু, বংশের তিলক,—কীর্ত্তিমান্, বিদ্বান্, এবং গৌরবাস্পদ। ঈশ্বরেচ্ছায় এক্ষণে তিনি প্রবল শক্তির অধীশ্বর। বঙ্গদেশের প্রতিনিধি স্বরূপ,—সমগ্র হিন্দুর মুখপত্র স্বরূপ,—সুপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গবাসী সংবাদ-পত্রের পরিচালন-ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে,—ব্যাপার বড় সাধারণ নয়! আমাদের সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা,—তিনি যেন চিরদিন এই মহাশক্তির সদ্ব্যবহার করিয়া, রাজা-প্রজা উভয়েরই প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিতে সক্ষম হন।

পাঁচকড়ি বাবুর শিক্ষা, দীক্ষা,—সকলই ভাগলপুরে সমাধা হয়। তাঁহার পিতৃদেব কর্ম্মসূত্রে ভাগলপুরে অবস্থিতি করেন; সুতরাং পুত্র পাঁচকড়িকেও আশৈশব সেখানে থাকিতে হইয়াছিল। চিরদিন পশ্চিমে অবস্থিতি করায়,—তাঁহার শারীরিক স্ফূর্ত্তির সহিত মানসিক স্ফূর্ত্তি-রও সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। পাঁচুবাবু তেজস্বী, নির্ভীক, স্পষ্টবাদী ও আমোদপ্রিয়। হাসি-মস্‌করায়ও তিনি বিশেষ পারদর্শী।

ইহাঁরা বন্দীঘাটী গয়ঘড় রত্নেশ্বর ঠাকুরের সন্তান; ফুলিয়া মেলের কুলীন। বড় বড় সম্ভ্রান্ত ঘরে ইহাঁদের ক্রিয়া-করণ চলিয়া আসিতেছে।

পাটনা কলেজ হইতে পাঁচুবাবু বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুল ও কলেজের তিনি ভাল ছাত্র ছিলেন।

শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের সহিত এক সময়ে পাঁচু-বাবুর খুব মাখামাখি ভাব ছিল। শৈশবকাল হইতেই পাঁচুবাবু,—শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের দলে মিশেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের "ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা" এবং "সুনীতি সঞ্চারিণী সভার" জন্য পাঁচুবাবু এক সময়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। পাঁচুবাবু ইহা মুক্তকণ্ঠে বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের উৎসাহেই তাঁহার বাঙ্গলা লেখায় প্রবৃত্তি জন্মে। এবং তাঁহারই উৎসাহে তিনি "ধর্ম্মপ্রচারক" "বেদ-ব্যাস" প্রভৃতি পত্রে, ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করেন। কিছুদিন পরে, নানাকারণে শ্রীকৃষ্ণ-

প্রসন্নের সহিত তাঁহার মনের অকুশল ঘটে; তাই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে হয়।

ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের সহিত পাঁচুবাবু বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নিকট পাঁচুবাবু অনেক শাস্ত্রার্থ অবগত হইয়াছেন।

পাঁচু বাবু এই অল্প বয়সে বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, বহু লোকের সহিত মিলিয়া মিশিয়াছেন; বহু দেখিয়া শুনিয়া, ঠেকিয়া বুঝিয়া,—অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সকল অভিজ্ঞতা, সকল চিন্তা,—ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত সকল প্রবন্ধ একত্রিত হইলে, একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হয়।

বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর সাহেবের আপিসের উচ্চ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়,—পাঁচকড়ি বাবুর বিশিষ্ট বন্ধু ও হিতৈষী সুহৃদ্। পাঁচুবাবু বলেন, কিসে তিনি সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র হইবেন; কিসে তাঁহার স্বধর্ম্মে আস্থা ও স্বদেশের প্রতি টান হইবে;—উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় সদাই সেই চেষ্টা করিতেন। পাঁচুবাবু বলেন, "এমন অকৃত্রিম বন্ধু, এমন সর্ব্বসহ সখা, এমন ধর্ম্মভীরু পরামর্শ দাতা, এমন ভক্ত-সাধক সহচর,—বড় সহজে কাহারও ভাগ্যে ঘটে না।" প্রথিতনামা, বঙ্গ সাহিত্যের অন্যতম মহারথী,—শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও পাঁচুবাবুর সোদরোপম সখা,—ইহাও পাঁচুবাবুকে অনেকবার বলিতে শুনিয়াছি। সুতরাং বলিতে হইবে, পাঁচুবাবুর বন্ধু-ভাগ্য খুব ভালো।

উপসংহারে পাঁচুবাবুর কথাতেই পাঁচুবাবুর জীবন-কথা শেষ করি;—"সংসারের দুঃখ এখনও আমি জানি নাই, বুঝি নাই। আমার পিতা মাতা যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন আমি এমনি সুখে দিন কাটাইব। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করো, যেন আমার পিতামাতা জিরজীবী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমিও চিরসুখী হইব।"

* * * *

—প্রকাশচন্দ্র ঘোষ, বি, এ। পিতা ৺ মদনমোহন ঘোষ। সাং টাকী, ২৪ পরগণা। বঙ্গজ কায়স্থ। প্রকাশচন্দ্র,—সাহিত্য রথী ৺ অক্ষয়কুমার দত্তের অগ্রজের দৌহিত্র। মাতামহের ধার তিনি পাইয়াছেন। বয়স বড় জোর আটাশ উনত্রিশ। পরন্তু এই বয়সেই তাঁহার বিলক্ষণ কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। "রমণী" নাম্নী একখানি ক্ষুদ্রকাব্যে প্রকাশচন্দ্রের বেশ একটুখানি কবি-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ভূতপূর্ব্ব কর্ণধার, কল্পনা, ভারতী, বীণা প্রভৃতি পত্রিকায়ও তাঁহার কয়েকটী সুন্দর কবিতা প্রকাশ হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি অপরিচিত অজ্ঞাতনামা বটেন; কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, অনুশীলন করিলে, কালে ইনি বঙ্গের একজন প্রধান কবির আসন গ্রহণ করিতে পারিবেন।

* * * *

—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। পিতা ৺ মদনমোহন ঘোষ। সাং টাকী, ২৪ পরগণা। ইনি,—উক্ত প্রকাশচন্দ্রের অগ্রজ। ইনিও একজন সুলেখক এবং সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি। নব্যভারত, অনুসন্ধান প্রভৃতি পত্রে ইহাঁর কয়েকটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

* * * *

—প্রকাশচন্দ্র দত্ত। পিতা ৺ নরেশচন্দ্র দত্ত। সাং কলিকাতা, বহুবাজার। ইনি বিখ্যাত অক্রুর দত্তের বংশধর,—এবং "অশ্রুমতীর" কবি, সুবিখ্যাত লেখিকা শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। মাতৃগুণ পুত্রে বর্ত্তিয়াছে। গিরীন্দ্রমোহিনী যেমন বঙ্গীয়া লনাকুলের শ্রেষ্ঠ কবি, প্রকাশচন্দ্রও তেমনি অল্প বয়সে বাঙ্গালা ও ইংরেজী সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। প্রকাশচন্দ্র সচ্চরিত্র,—ধীর, স্থির, ও বিনয়ী। সাহিত্যে ও ভারতীতে তিনি মধ্যে মধ্যে দুই একটি কবিতা লিখিয়া থাকেন। অল্প বয়সে উপরি-উপরি দুই পত্নী বিয়োগে ও উপযুক্ত একটি ভ্রাতৃ-বিয়োগে তিনি বড় ক্লিষ্ট ও কাতর; তাঁহার মাতাও ততোধিক শোকাতুরা। ভগবান এই মাতা-পুত্রের হৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করুন,—বঙ্গীয় সাহিত্যের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

* * * *

—প্রাণকৃষ্ণ সরকার, বি, এ। পিতা ৺ মহেন্দ্রনাথ সরকার। সাং মজিলপুর, ২৪ পরগণা। প্রাণকৃষ্ণ বাবু বড় সত্যনিষ্ঠ সাধু প্রকৃতির লোক। তাঁহার চরিত্র যেমন নির্ম্মল, ধর্ম্ম-বিশ্বাসও তেমনি উদার ও প্রশস্ত। বিনীত, অহমিকাশূন্য ও স্নেহপূর্ণ হৃদয়গুণে, তিনি পরকেও আপনার করিতে পারেন। বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ আছে। কর্ণধারে এবং আরও কোন কোন কাগজে তাঁহার কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

* * * *

—পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পিতা ৺যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সাং কাঁটালপাড়া, ২৪পরগণা।

পূর্ণ বাবু,—বঙ্গীয় সাহিত্য-রথী, স্বনামধন্য-পুরুষ ৺বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর।—বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট। উপস্থিত ইনি ২৪পরগণা-আলিপুরে আছেন। এক সময়ে পূর্ণবাবু বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব "বঙ্গদর্শনে" তাঁহার অনেক লেখা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার "শৈশব-সহচরী" নামে উপন্যাস, মধুমতী নামে গল্প অনেকে আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীতও পূর্ণ বাবুর কয়েকটি ছোট গল্প ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। সে গুলি একত্রিত হইলে, একখানি সুন্দর গ্রন্থ হইতে পারে।

* * * *

—প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পিতার নাম শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত বাস,—কলিকাতা, ২২।২৩ নং বিডন ষ্ট্রীট। ইহাঁরা লর্ড পদ্মলোচনের বংশধর, সম্ভ্রান্ত বংশীয়। ৺ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়—গবর্ণমেণ্টের তোষাখানার দেওয়ান ছিলেন। তাঁহা হইতে প্রফুল্ল বাবু চারি পুরুষ অধস্তন। জ্ঞাতিবিবাদ নিবন্ধন প্রফুল্ল বাবুর পিতা পূর্ণ বাবু সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন এবং আত্মবলে এক্ষণে গণ্য, মান্য ও সম্ভ্রান্ত হইয়াছেন।

ইহাঁরা ঊর্দ্ধতন সাত পুরুষ গাহিয়ে। প্রফুল্ল বাবুও নিজে সুগায়ক, সুকবি ও সজ্জন-অনুরাগী। তাঁহার পিতৃদেব পূর্ণ বাবু অতি উত্তম ধ্রুপদ গায়ক ও উত্তম পাখোয়াজ বাদক। অধিকন্তু তিনি লোক-প্রতিপালক, সজ্জন, উদারচেতা ও পরোপকারী।

প্রফুল্ল বাবু কলিকাতার নর্ম্মাল স্কুলে ছাত্রবৃত্তি পাস করিয়া ইংরেজী পাঠে প্রবৃত্ত হন। বাল্যকাল হইতেই কবিতার প্রতি তাঁহার অতিরিক্ত অনুরাগ জন্মে। তাহার ফলে অধিক দিন বিদ্যালয়ে পড়িতে পারেন নাই। ১৩।১৪ বৎসর বয়সে প্রফুল্ল বাবু "অন্ধবিলাপ" নামে এক খানি পদ্যময় নাটক রচনা করেন।

প্রফুল্ল বাবুর এক ঠাকুরদাদা,—পূর্ণ বাবুর মামা,—৺আদ্যচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়,—সাধক-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজেও একজন সদাশয় সাধু ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কাশীদাসী মহাভারতের বড় অনুরাগী ছিলেন।—"দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি" ইতি সুবিখ্যাত কবিতাটি পড়িয়া তিনি মুগ্ধ হইতেন। বালক প্রফুল্লচন্দ্র বালক বয়সেই তাঁহার ঠাকুরদাদার সেই প্রিয়তম 'ভারত' গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। এক দিন কথাপ্রসঙ্গে, রঙ্গ-রহস্য করিতে করিতে, নাতি ঠাকুরদাদায় এক রচসা হয়। তাহাতে বালক প্রফুল্লচন্দ্র অভিমানে ফুলিয়া উঠিয়া, মুক্তকণ্ঠে প্রতিজ্ঞা করেন,—"যদি বাঁচিয়া থাকি, আমি এই অষ্টাদশ-পর্ব্ব মহাভারত পদ্যে প্রণয়ন করিব।"

তদবধি প্রফুল্লচন্দ্র মহাভারতরূপ মহাসমুদ্রে অবগাহন করিলেন। সেই হইতেই তাঁহার মহাভারত নাট্যকাব্যের সূচনা হইল। তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান, জীবনের প্রধান কার্য্য হইল,—মহাভারত। অদম্য অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রম, জীবন্ত উৎসাহ ও প্রচুর অর্থব্যয়ে তিনি বিরাট অষ্টাদশ-পর্ব্ব মহাভারত সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং আজ প্রায় পনেরো বৎসরকাল নিবিষ্টচিত্তে, সেই কার্য্যে রত আছেন।

এই বিরাট গ্রন্থ হইতে মধ্যে মধ্যে তিনি কয়খানি গীতিনাট্য এবং দৃশ্যকাব্য স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে, বিস্তৃতরূপে সঙ্কলন করিয়াছেন। তাঁহার অভিজ্ঞান-শকুন্তল, পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ ও দেবযানি প্রভৃতি ইহার পরিচয় স্থল। এ কয়খানি গ্রন্থেই প্রফুল্ল বাবুর কবিত্ব ও নাটকত্ব শক্তির পরিচয় আছে। কয়েকটি গানও তাঁহার বড় সুন্দর এবং সদ্ভাবপূর্ণ। ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দে এই সকল গ্রন্থ লিখিত। সমগ্র মহাভারতই প্রফুল্ল বাবু এই ভাঙা অমিত্রাক্ষরছন্দে লিপিবদ্ধ করিতেছেন। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে, প্রফুল্ল বাবু একটি মহতী কীর্ত্তি রাখিবেন। তিনি দীর্ঘজীবী হউন,—ইহাই আমাদের কামনা।

"ফুলমুন" প্রিণ্টিং ওয়ার্কস নামে প্রফুল্ল বাবুদের একটি ছাপাখানা আছে। সেই ছাপাখানাতেই তাঁহার মহাভারত মুদ্রিত হইয়া থাকে। "সংসারচক্র" নামে প্রফুল্ল বাবু একখানি সুন্দর উপন্যাস ও লিখিয়াছেন।

* * * *

—প্রমথনাথ মল্লিক। পিতা ৺ যদুলাল মল্লিক। সাং কলিকাতা, ৬৭ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট। প্রমথবাবু,—স্বর্গীয় সম্ভ্রান্ত যদুনাথ মল্লিক মহাশয়ের মধ্যম পুত্র;—পিতৃ-গুণে অলঙ্কৃত;—স্বধর্ম্মপরায়ণ, সদাচার-সম্পন্ন, বিনীত, অমায়িক ও সহৃদয়। বিপুল বিত্তের অধিকারী হইয়াও,—ইহাঁরা তিন সহোদর অহংমকশূন্য, সদালাপী ও পরদুঃখকাতর। জ্যেষ্ঠ,—রায় অনাথনাথ মল্লিক বাহাদুর,—বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও স্বদেশ-হিতৈষী। বাঙ্গলা-সাহিত্যের উন্নতি-কল্পে তাঁহার দৃষ্টি আছে। নিজে একজন নিয়মিত অধ্যয়নশীল, বাঙ্গলা-সাহিত্যে অনুরাগী ও বঙ্গ-সাহিত্য সে বীর পৃষ্ঠপোষক সুহৃৎ,—উদারচেতা ও উন্নতমনা। ভ্রাতা প্রমথনাথ নবীন লেখক;—উচ্চাশয়, বুদ্ধিমান্ ও চিন্তাশীল যুবক। চরিত্র নির্ম্মল, স্বভাব মাৎসর্য্য বিহীন। দেব-দ্বিজে শ্রদ্ধা, সদাচারে আস্থা, শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস,—ভগবৎ-তত্ত্বে আন্তরিক অনুরাগ,—প্রমথনাথ এই অল্প বয়সে অনেক গুণে গুণবান্। সম্প্রতি তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ-রচনায় ব্রতী হইয়াছেন। দুটি কথা ও দয়া নামে সম্প্রতি দুইখানি গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থের ভাব অতি উদার, উদ্দেশ্য অতি মহৎ। কালে তিনি একজন তত্ত্বদর্শী দার্শনিক-লেখক হইবেন,—এই দুইখ্যনি ক্ষুদ্র গ্রন্থ দেখিয়া সে আশা করা যায়। আমাদের সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা,—প্রমথনাথ আজীবন এই সাহিত্যানুশীলনে ব্রতী থাকুন। তাঁহার ন্যায় ধনবান্ ব্যক্তির এইরূপ সাহিত্যানুশীলনে অধিক ফল হয়। তাঁহার মহানুভব স্বর্গীয় পিতৃদেব,—নিঃস্বার্থ স্বদেশহিতৈষিতায়,—দুর্ভাগ্য কয়েদীগণের দুঃখ-বিমোচনে, আন্তরিক যত্ন ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন,—সহৃদয় উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণেরও বন্ধুত্বলাভ করিয়াছিলেন, আর পুত্র প্রমথনাথও জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিকল্পে দেশের ও দশের সহানুভূতিলাভ করিতে সক্ষম হইবেন,—সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। চরিত্রগুণে, ইহাঁরা তিন সহোদর এক একটি রত্ন বিশেষ। জ্যেষ্ঠ অনাথনাথ ইতিমধ্যেই সাধারণ্যে সুপরিচিত হইয়া উচ্চ রাজসম্মান-লাভ করিয়াছেন; মধ্যম প্রমথনাথ সাহিত্য-সেবায় ব্রতী

হইয়াছেন; আর কনিষ্ঠ মন্মথনাথও অচিরে এইরূপ কোন একটি সাধু অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়া আমাদিগকে সমধিক সুখী করিবেন আশা করি। ঈশ্বর এই উন্নতমনা ভ্রাতৃত্রয়কে চিরজীবী করিয়া রাখুন,—ইহাই আমাদের কামনা।

* * * *

—প্রমথচন্দ্র কর, এম, এ,। পিতা ৺হেমচন্দ্র কর। সাং কলিকাতা, শ্যামপুকুর। প্রমথ বাবু,—সুপ্রসিদ্ধ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ৺হেমচন্দ্র কর মহাশয়ের পুত্র। সম্ভ্রান্ত কায়স্থ। নিজে এক জন তীক্ষ্ণবুদ্ধি এটর্ণি এবং বাঙ্গালা ভাষার লেখক। "সাহিত্য" নামে মাসিক পত্রে, প্রমথ বাবু "বাঘের ন'খ" প্রভৃতি কয়টি ছোট গল্প এবং কবিতাদিও লিখিয়াছেন। তিনি এক জন লিপিকুশল সুলেখক। গল্পগুলি একত্রিত করিলে বেশ একখানি বই হয়। কলিকাতা হাইকোর্টে প্রমথ বাবু এটর্ণির কাজ করেন। তাঁহার নিজের আপিশ আছে। তিনি মিষ্টভাষী, সদালাপী, নিরহঙ্কার ও পরোপকারী।

* * * *

—পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য। নিবাস, ২৪পরগণার অন্তর্গত সোনারপুরের নিকট লাঙ্গলবেড়িয়া গ্রামে। জন্ম ১২৭০ সালের ২৭ আশ্বিন। পিতার নাম ৺গোবিন্দচন্দ্র সার্ব্বভৌম (ভট্টাচার্য্য। পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় একজন সদ্বংশজাত কৃতবিদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ। ইনি, ভট্টপল্লী নিবাসী ৺মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহোদয়ের প্রিয়তম ছাত্র, এবং শ্রীযুক্ত নন্দলাল ন্যায়রত্ন মহাশয় ইহাঁর স্মৃতি-শিক্ষক। স্বর্গীয় ভরচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় ইহাঁর বিশেষ নিকট-আত্মীয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক্ষণে হরিনাভি স্কুলের প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকের পদে ব্রতী আছেন। সাহিত্য প্রবেশ নামক ইহাঁর একখানি পুস্তক আছে। কিন্তু অর্থাভাবে এ পর্য্যন্ত তাহা মুদ্রিত করিতে পারেন নাই।

* * *

—পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য। কলিকাতা, চোরবাগান—মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটস্থ সুপ্রসিদ্ধ আর্য্যমিশন ইনষ্টিটিউসনের,—ইনি স্থাপয়িতা ও প্রবর্ত্তক। শুনিয়াছি, ইনি একজন সাধক ব্যক্তি এবং অনেক রাজা, মহারাজা, জমিদার,—এম এ, বি এল উপাধি ধারী অনেক স্কুলমাষ্টার এবং উকীল প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ইহাঁর শিষ্য। সুতরাং সমাজে ইহাঁর খুব পসার-প্রতিপত্তি আছে। ভগবদ্গীতা প্রভৃতির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ইনি প্রচার ও প্রকাশ করিয়াছেন। কয়টি ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন এবং দরিদ্র দুঃস্থ ব্যক্তিগণকে ঔষধাদি বিতরণ করিয়া দশের নিকট আপন প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধন্য হউন এবং তাঁহার চক্ষুষ্মান শিষ্য-শাখাগণেরও জয় হউক।

* * * *

—পূর্ণচন্দ্র মজুমদার। সাং বরদী, জেলা ঢাকা। ইনি ঢাকা-প্রকাশ সংবাদপত্রে মধ্যে মধ্যে সংবাদাদি প্রেরণ করিয়া থাকেন। পদ্যরত্নাবলী ও ব্যাকরণাঙ্কুর নামে ইনি দুইখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছেন; কিন্তু অর্থাভাবে তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না।

৲ * * *

—পূর্ণচন্দ্র বসু। ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে ২৪ পরগণা বারাসাতের অন্তর্গত মহেশ্বরপুর গ্রামে অগ্রহায়ণ মাসে পূর্ণিমা রাত্রে পূর্ণ বাবু জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া "পূর্ণচন্দ্র" নাম হয়। ইহাঁর পিতা ৺ রামচন্দ্র বসু। শৈশবে দুইবার মরণাপন্ন জ্বরে পূর্ণ বাবু আক্রান্ত হন। একবার ৩৪ বৎসর বয়সে, আর একবার ৮ বৎসর বয়সে। দ্বিতীয় বার পীড়ার পূর্ব্বে কলিকাতার গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেন। তৎপরে হিন্দুস্কুলে নিযুক্ত হন এবং বরাবর প্রথম পারিতোষিক পান। ষোল বৎসর বয়সে, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিলাভ করেন।

পূর্ণ বাবু যখন স্কুলে পড়েন, তখন হইতেই বাঙ্গালা ভাষার রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ছাপাখানা পূর্ণ বাবুদের সন্নিকট থাকায়, তিনি তথায় সর্ব্বদা যাতায়াত করেন। গুপ্ত মহাশয় পূর্ণ বাবুকে বড় ভাল বাসিতেন এবং বাঙ্গলা পদ্য রচনা করিতে উৎসাহ দিতেন। তাঁহারই উৎসাহে পূর্ণ বাবুর কতিপয় পদ্য রচনা,—"প্রভাকরে" প্রকাশিত হয়।

পূর্ণ বাবু যখন ফার্ষ্ট ইয়ার ক্লাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠ করেন, তখন তাঁহারা কয়জন বন্ধু সমবেত হইয়া "বামাবোধিনী পত্রিকা" প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমকার গদ্য রচনার প্রবন্ধাবলী ঐ বামাবোধিনীতেই প্রকাশিত হয়। উহাতে তাঁহার গদ্য পদ্য উভয় রচনা স্থান পাইত। এই সময় দর্শন শাস্ত্রের প্রতি পূর্ণ বাবুর অত্যন্ত অনুরাগ জন্মে। এমন কি, তিনি যখনই সময় পাইতেন, তখনি প্রেসিডেন্সি কলেজের লাইব্রেরীতে বসিয়া কতিপয় বন্ধুর সহিত নানা ইংরেজী দর্শন শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পাঠ করিতেন। পূর্ণ বাবু বলেন,—

তখন Hamilton's Lectures on Metaphysics বাহির হয়। আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সেই গ্রন্থাবলি লাইব্রেরীতে আসিবামাত্র পড়িতে আরম্ভ করি। দর্শনশাস্ত্রে এত অগ্রসর হইয়াছিলাম যে, এফ, এ এর নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য দর্শনগ্রন্থ বরাবর কিনিও নাই পড়িও নাই। এফ, এ পরীক্ষায় ৮। ১০ দিন পূর্ব্বে সেই গ্রন্থ কিনিয়া দুইবার পড়িয়া পরীক্ষা দিই। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি, এ পড়িতে আরম্ভ করি। মনে আছে, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের বাঙ্গলা এবং সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক নির্দ্দিষ্ট হয়েন। পরীক্ষায় বাঙ্গলা পাঠ্য

থাকিলেও তিনি বাঙ্গালীকে সংস্কৃত পড়াইতে আরম্ভ করেন। এইটি আমাদের উপরি-লাভ ছিল। এণ্ট্রান্স পাশ করিবার পূর্ব্বে বাড়ীতে শিক্ষক রাখিয়া প্রথম সংস্কৃত ভাষা শিখিতে আরম্ভ করি বটে; কিন্তু তাহাতে অধিক অগ্রসর হইতে পারি নাই, অধ্যাপক মহাশয়ের উৎসাহে সেই ভাষায় আমার অনুরক্ত হই। কিন্তু এই সময় সাংসারিক দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ আমার কলেজে পড়া বন্ধ হয়। গলায় সংসার ভার পড়ে। Forth year class হইতে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে সালখিয়া স্কুলে, পরে নড়াল স্কুলে হেডমাষ্টার পদে নিযুক্ত হই। যখন নড়ালস্কুলে থাকি তখন স্কুল ইন্‌স্পেক্টর ক্লার্ক সাহেব সেই স্কুল দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হয়েন এবং ঢাকায় গিয়াই আমাকে ফরিদপুরের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার অব স্কুলস নিযুক্ত করেন। ছয় মাস কাল সেই কার্য্যে নিযুক্ত আছি, এমন সময় বিখ্যাত কার্ত্তিকে ঝড় হইয়া গেল। তখন বৃদ্ধ পিতাঠাকুর বর্ত্তমান, আমি একাকী উপার্জ্জনশীল ও সংসার রক্ষক, তিনি সেই ঝড়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া যে কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ভয়ানক "পদ্মার" উপর সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, সে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিতে বলেন। পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়া আমি কলিকাতায় আসিয়া নির্ব্বিঘ্ন কেরানিগিরি চাকরীতে,—কলিকাতার জেনারল পোষ্টাফিসে নিযুক্ত রহিয়াছি। পুত্র সন্তাদি না থাকাতে আমার অধিক অর্থের প্রয়াস নাই; এজন্য আজিও কেরাণিগিরিতেই আবদ্ধ আছি। কলিকাতায় আসিবার পর আমার পূর্ব্বকার বাঙ্গালা রচনা করিবার প্রবৃত্তি দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। "ভারত সংস্কারকে" সমালোচকরূপে নানা গ্রন্থের সমালোচনা করি। তৎপরে আর্য্যদর্শনে লিখিতে আরম্ভ করিয়া তাহাতে বরাবরই নানাবিধ প্রবন্ধ প্রকাশ করি। "বঙ্গদর্শনে" লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়া দুই একটি প্রবন্ধ তাহাতেও প্রকাশ করি। এই সমস্ত রচনার ফল "কাব্যসুন্দরী"ও "সমাজচিন্তা"। তখন আমার ইংরেজী রুচি বড়ই প্রবলা ছিল। এবং সেই রুচি অনুসারেই সমস্ত প্রবন্ধ রচিত হয়। ("কাব্যসুন্দরী" বাঙ্গলা ভাষায় সমালোচন সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ। তাহাতে বঙ্কিমবাবুর সৃষ্টিচাতুর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে। "সমাজচিন্তা" বিলাতী রুচি অনুসারে হিন্দু সমাজের সমালোচনা।)

"কলেজে যখন First year ক্লাসে পড়ি, তখন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রাহ্মস্কুল খুলিয়া, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত ইংরেজীতে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। দর্শনশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ বশতঃ আমি তাঁহার অনেকগুলি লেক্‌চার শুনি এবং তাহার ফলে ব্রাহ্মদলের প্রতি কতকটা অনুরাগও জন্মে। আমার দুই চারিজন বন্ধু নাম-লেখান ব্রাহ্ম হয়েন এবং আমাকেও তদ্রূপ হইতে বিশেষ অনুরোধ করেন। কিন্তু আমি বলি, আমার সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন হইলেই নাম লেখাইব। আমার সন্দেহভঞ্জনও হইল না, নাম-লেখানও হইল না। বন্ধুবান্ধবেরা সন্দেহভঞ্জন করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সফলকাম না হওয়াতে নিরাশ হইয়া তাঁহারা আমাকে ছাড়িয়া দেন। সেই অবধি আমার Scepticism বরাবর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তাহারই ফলস্বরূপ আর্য্যদর্শনে আমি "নাস্তিকতা" সম্বন্ধে কতিপয় প্রবন্ধ প্রকাশ করি। তখনকার ব্রাহ্মগণের মুখ হইতে আমি যেরূপ "ঈশ্বরবাদ" শুনি, তাহা খৃষ্টানধর্ম্ম হইতেই গৃহীত হইয়াছিল, সেই ঈশ্বরবাদ আমাদের শাস্ত্রীয় ঈশ্বরবাদ হইতে স্বতন্ত্র। হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বর বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্র নহেন, কিন্তু অপর ধর্ম্মের ঈশ্বরবাদে বিশ্বকে ছাড়িয়া দিয়াছে। বিশ্বসত্তা হইতে ঐশীসত্তা পৃথক্ করিলে যে ঐশীসত্তা দাঁড়াইতে পারে না, আমি নাস্তিকতার প্রবন্ধাবলিতে তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করি। এই প্রবন্ধাবলি আমাদের শাস্ত্রীয় ঈশ্বরবাদের প্রতিবাদ নহে। প্রকৃতপক্ষে আমি কখনই নাস্তিক ছিলাম না, লোকে না বুঝিয়া আমায় অপবাদ দিত, এক্ষণে সেই অপবাদ দূরীভূত হইয়াছে। এই সময় হইতে হিন্দুধর্ম্মে অনুরাগ বশতঃ হিন্দুপুরাণ ও দর্শনাদি পাঠে মনোনিবেশ করি। হিন্দুশাস্ত্রে ও পুরাণাদি পাঠে আমার ইংরেজী রুচির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। "আর্য্যদর্শন" ও "বঙ্গদর্শন" বন্ধ হইলে পর, হিন্দুশাস্ত্রালোচনার ফলস্বরূপ আমি নানা প্রবন্ধ "নবজীবন" "বিভা", "সমীরণ", "পুরোহিত" এবং "সাহিত্যে" প্রকাশ করি। এই সকল পত্রস্থ কতিপয় প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া এক্ষণে "সাহিত্যচিন্তা" এবং "দেবসুন্দরী" প্রকাশ করিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মের Evidence দেখিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমি যেরূপ "প্রামাণ্য" প্রাপ্ত হইয়াছি, "নব্যভারতে" এক্ষণে তদ্বিষয়ক প্রবন্ধাবলি প্রকাশ করিতেছি। "গীতার প্রামাণ্য" নামক সুদীর্ঘ প্রস্তাবে তাহার কিয়দংশ আলোচিত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের মতামত সকল কেমন পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রচারিত হইয়া খৃষ্টধর্ম্মান্তর্গত হয়, তাহা "ভারত মিসর ও খৃষ্টধর্ম্ম" নামক বিস্তৃত প্রস্তাবে প্রকাশ করিয়াছি। এক্ষণে আমাদের দর্শনশাস্ত্রের মতামত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, বেদ বেদান্তানুযায়ী স্মৃতিতত্ত্ব কেমন আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সম্মত, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।"

পূর্ণ বাবু একজন প্রাজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি যেমন চিন্তাশীল ও ভাবুক, তেমনি সুলেখক ও সুদক্ষ সমালোচক। তাঁহার "সাহিত্য-চিন্তা"—একখানি অতি উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ পুস্তক। তাঁহার দেব-সুন্দরী,—একখানি প্রগাঢ় দার্শনিক গ্রন্থ। এই দুই গ্রন্থই তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সুমার্জ্জিত রুচি, ভূয়োদর্শন, সূক্ষ্মবিচার প্রভৃতি সকল গুণেরই পরিচয় পাওয়া যায়। সমালোচনায় তিনি একদেশদর্শী নহেন,—তাঁহার মত উদার, চিন্তা সুদূরব্যাপিনী, লিখন-ভঙ্গিমা সহানুভূতির উদ্দীপক। প্রাচ্য

ও পাশ্চাত্য দর্শনে তাঁহার সমান অভিজ্ঞতা; সমাজে ও সাহিত্যে তাঁহার দৃষ্টি প্রখরা,—সর্ব্বত্র তিনি সমদর্শী। তাঁহার লেখায় বাজে কথা নাই, উচ্ছৃঙ্খল কল্পনা নাই, কোথাও গোঁজামিল-দেওয়া নাই। তিনি মনে জ্ঞানে যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াসী। ফলতঃ, তাঁহার ন্যায় প্রগাঢ় দার্শনিক লেখক আজিকার দিনে বিরল। প্রবীণ লেখকগণের মধ্যে আজিও তিনি অশ্রান্তভাবে লেখনী চালনা করিতেছেন;—এজন্যও তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

নাম-ছাড়।

—তারিণীচরণ সেন। ইনি ১২৬৩ সালের ১২ আশ্বিন মঙ্গলবার ফরিদপুরের অন্তর্গত বল্লভদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বৈদ্যবংশসম্ভূত ৺কমলাকান্ত সেন মহাশয়ের ইনি তৃতীয় পুত্র। শৈশবে গ্রাম্য স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়া যথাকালে উচ্চ শিক্ষালাভ প্রত্যাশায় ঢাকায় যান; এবং ঢাকা কলেজে পড়িতে আরম্ভ করেন। সাহিত্য-জগতে উন্নতি লাভ করিবার প্রবলইচ্ছা বাল্যকাল হইতেই ইঁহার ছিল। পঠদ্দশাতেও ইনি 'ঢাকা-প্রকাশ,' 'হিন্দু-হিতৈষিণী' প্রভৃতি কাগজে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশার্থ পাঠাইতেন। পারিবারিক অভাব বিমোচনার্থ ইঁহাকে পাবনা জেলায় বিষয়-কার্য্যে লিপ্ত হইতে হয়। এই সময়ে ইনি 'বীণা', 'এডুকেশন-গেজেট' প্রভৃতি কাগজে প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিতেন। কিছুদিন পরে প্রচারিত কবিতাগুলি একত্রে সংগৃহীত করিয়া 'সুরতরঙ্গিনী' নামে একখানি খণ্ডকাব্য প্রচার করেন। জন সাধারণে উহার সমাদর দেখিয়া তারিণী বাবুর উৎসাহ ও উদ্যম দ্বিগুণতর পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাহার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আর দুই খানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাহার একখানি 'প্রেম-প্রতিমা' বা 'ভানুমতী',—অপরখানি 'অনাথিনী'।

এই সময় ইনি কলিকাতায় আগমন করেন। প্রথিতনামা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সেই সময় জেল হয়। তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্য তারিণী বাবু 'সুরেন্দ্রকারাগারে' নামে গ্রন্থের প্রচার করেন। উক্ত পুস্তিকার কবিতাগুলি পূর্ব্বে 'বঙ্গবাসীতে' প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার এক বৎসর পর 'ভারত-কোকিল' নামক একখানি স্বদেশানুরাগোদ্দীপক কাব্য প্রণয়ন করিয়া, ইনি সাধারণে প্রতিপত্তি লাভ করেন। এই সময় ইনি কলিকাতায় শিক্ষা বিভাগে কার্য্য করিতেছিলেন। অতঃপর ইনি বাঁকুড়া জেলার জনৈক স্কুল পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত হইয়া যান। তথায় ক্রমাগত ১২ বৎসরকাল অতীব প্রশংসার সহিত উক্ত কার্য্য সম্পাদন করেন। এবং উপরিতন কর্ম্মচারীগণের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন। এই সময়ে স্থানীয় সংবাদপত্র বাঁকুড়া-দর্পণে প্রবন্ধাদি লিখিয়া উহার গৌরব বৃদ্ধি করেন। এই সময়ে কবিতা-মুকুল' (সংযুক্ত অক্ষর-বর্জ্জিত) ও প্রথম শিক্ষা নামে দুইখানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ তারিণী বাবু প্রণয়ন করেন। পাঠ্যনির্ব্বাচনী সভা কর্ত্তৃক উহা অনুমোদিত ও ডিরেক্টরের লিষ্টভুক্ত হয়। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সোনামুখী-নিবাসী 'কানন' ও 'শিশুহার' প্রণেতা শ্রীযুক্ত রসিকলাল দে মহাশয় তারিণী বাবুর একজন বিশিষ্ট বন্ধু।

কিছু দিন হইল, 'বঙ্গজীবন' নামে একখানি মাসিক পত্র ইনি সম্পাদক ও প্রচার করেন। দুই বৎসর কাল এই "বঙ্গজীবন" চলিয়াছিল। উপস্থিত তারিণী বাবু—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-সভার সম্পাদক,—মনস্বী সমালোচক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি এল, মহোদয়ের 'কৃত্তিবাসীরামায়ণ-প্রচার-সমিতির জনৈক সহকারী।

লণ্ডন।

[কলিকাতা হাইকোর্টের বিজ্ঞ ও বহুদর্শী ব্যারিরার,—পৃথিবীর বহুদেশ পর্য্যটক,—শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় "ভূ-প্রদক্ষিণ" নামক একখানি বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে পৃথিবীর বহু স্থানের বহু বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সংগ্রহ এত সুন্দর ও বিশদ হইয়াছে যে, এই গ্রন্থকে অলৌকিক এবং অপূর্ব্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইতিপূর্ব্বে, এই জন্মভূমিতে আমরা এই গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়াছিলাম। আশা ছিল যে, অল্পকাল মধ্যে এই মহা-গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিতে পাইব। কিন্তু দুর্ভাগ্য দেশ,—আজিও গুণের আদর করিতে শিখে নাই। তাই আজিও এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ অবশিষ্ট আছে। যাঁহারা ঘরে বসিয়া পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ স্থানের প্রধান প্রধান বিবরণ অবগত হইতে চাহেন,—তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করুন। যাঁহারা নানা তত্ত্বে অভিজ্ঞ ও নানা বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই অভিনব ভ্রমণ-বৃত্তান্ত দেখুন। সাহিত্য-রসে যাঁহারা পুষ্ট, পুলকিত ও পরিতৃপ্ত হন,—তাঁহারা পাঁচটি টাকার মায়া ত্যাগ করিয়া, চন্দ্রশেখর বাবুর এই অলৌকিক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আগ্রহের সহিত পড়িতে থাকুন। পাঁচটি টাকা এক কালে ব্যয় করিতে কাহারও কাহারও কষ্ট হইতে পারে বটে; কিন্তু এই প্রকাণ্ড গ্রন্থ খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে, পাঁচিশ খানি গ্রন্থ পাঠের ফল হয়।—সুতরাং আশা আছে, সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই ইহার এক এক খণ্ড ক্রয় করিবেন। ইহাতে একাধারে উপন্যাস, কাব্য, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, জীবন-বৃত্তান্ত,—সমস্তই আছে। বস্তুতঃ, গ্রন্থখানি এমনি সংগ্রহপূর্ণ ও সারবান্। গ্রন্থ পাওয়া যায়,—কলিকাতা, ১৭ নং হ্যারিসন্ রোডে,—গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন বারিষ্টার মহাশয়ের নিকট। মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

"ভূ-প্রদক্ষিণের" সংগ্রহ কিরূপ অপূর্ব্ব ও সারবান্,—কিরূপ বিশদ ও শিক্ষাপ্রদ,—তাহা আমরা বেশী কিছু না বলিয়া, মূল গ্রন্থ হইতে, গ্রন্থকারের ভাষায়, কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক দেখুন, বুঝুন এবং তত্ত্ব-সংগ্রহ করুন। এক লণ্ডনের বৃত্তান্ত পড়িলেই চমৎকৃত হইতে হয়। স্থানাভাব বশতঃ, আমরা সেই লণ্ডনের কিয়দংশ মাত্র উদ্ধৃত করিলাম।]

আলবার্ট মেমোরিয়াল।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী ৺আলবার্ট মহাত্মার স্মরণার্থ চিহ্ন। ইনি ইংলণ্ডীয় প্রজাবর্গের হিতচেষ্টায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন বলিয়া, মহারাণী ও জনসাধারণ, হৃদয়ের শ্রদ্ধার সহিত, এই প্রকাণ্ড মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উপরে লেখা,—"মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার প্রকৃতিপুঞ্জের দ্বারা মহাত্মা প্রিন্স কনসর্ট আলবার্টের স্মরণার্থ প্রতিষ্ঠিত"। প্রায় দেড় লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে বিশ বৎসরে উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকস্থ চাতালের চারি কোণে প্রকাণ্ড চারিটী মূর্ত্তি—এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা। এশিয়া—প্রাচ্য রমণী, হস্তিপৃষ্ঠে সমাসীনা, পূর্ব্বদেশীয় সহচর ও সরঞ্জাম সহ বিদ্যমানা; ইউরোপ—বৃষ-বাহনে, বিলাতী সাজ ও সঙ্গী; আফ্রিকা—মিসরের সাজে, উটের উপর, মৈসর অনুচরবর্গ বেষ্টিতা; আমেরিকা—ঐ দেশীয় বন্যমহিষোপরে বিরাজিতা, অসভ্য সহচর সঙ্গে। বেদীর গায়ে চারিদিকে শ্বেত মর্ম্মরে পৃথিবীর সাহিত্য ও বিজ্ঞান রাজ্যের জ্ঞানী, পণ্ডিত ও শিল্পীদের মূর্ত্তি, প্রায় দুই শত। তাহার উপর চারি কোণে, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি ও ইঞ্জিনিয়ারির সদল মূর্ত্তি। মণ্ডপ মধ্যে গার্টর শ্রেণীর নাইটের পরিচ্ছদে একখানি রাজাসনে উপবিষ্ট আলবার্টের প্রকাণ্ড গিল্টিকরা ধাতুময়ী মূর্ত্তি। চূড়া সমেত মন্দিরের উচ্চতা ১৭৫ ফুট। ইহা কেন্সিংটন বাগানে স্থিত।

ইহার সম্মুখে পথের ওপারে

আলবার্ট হল।

ইহা একটী বৃহৎ গোলাকার মন্দির; কাচের গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। ইহাতে দশ হাজার লোকের বসিবার স্থান আছে। দুইলক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে তিন বৎসরে নির্ম্মিত। এখানে নৃত্য গীত বাদ্য প্রদর্শনী প্রভৃতি হইয়া থাকে।

হাইড্ পার্ক।

লণ্ডনে একুশটী পার্ক বা রমণোদ্যান আছে। ইহা অনেক বিষয়ে প্রধান, যদিও আয়তনে দ্বিতীয়—প্রায় ১২০০ বিঘা ব্যাপী। রাজা অষ্টম হেনরি দ্বারা সংস্থাপিত, কিন্তু বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে প্রাপ্ত। নয়টী ফটক আছে। উত্তরপূর্ব্ব কোণের ফটকটী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, ইহার নাম মর্ম্মর-খিলান, ভূপতি চতুর্থ জর্জ্জ প্রায় লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে ইহা নির্ম্মাণ করেন। এই পার্কে অনেকগুলি বিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড আছে। ইহার মধ্য দিয়া একটী সর্পাকার আঁকাবাঁকা কৃত্রিম নদী বহিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে দুই তিন শত বৎসরের বৃদ্ধ জরাজীর্ণ বৃক্ষ দণ্ডায়মান দেখা যায়। এই পার্কগুলি থাকাতে সময়ে সময়ে লোকে এখানে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। এই পার্কের এক কোণে কবি বায়রণের ও আকিলিসের মুরত আছে। স্পেনের ও ওয়াটার্লুর যুদ্ধে জিত কামান গলাইয়া শেষোক্তটী প্রস্তুত হয়। মহাবীর ওয়েলিংটন ও তাঁহার সহচরগণের স্মরণার্থ মহিলাগণ কর্ত্তৃক ইহা স্থাপিত।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম।

ইহা লণ্ডনের পুরাতন মিউজিয়ম, ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে আরব্ধ। সর্ব্বশুদ্ধ যে নয়টী মিউজিয়ম এখানে আছে, তন্মধ্যে অনেক বিষয়ে এইটী প্রধান। ইহার সম্বন্ধে পর্য্যটকদের মত, "পৃথিবীতে অতুলনীয়"; বাস্তবিক, কি চমৎকার সংগ্রহ! ভাবিলে জ্ঞান থাকে না। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ—মুদ্রিত পুস্তক, ইউরোপীয় হস্তলিপি, প্রাচ্য হস্তলিপি, জীবজন্তু, (স্থানাভাব বশতঃ এই বিভাগ অন্যত্র রক্ষিত হইয়াছে) প্রাচ্য প্রাচীন কীর্ত্তি, গ্রীক ও রোমাণ পুরাতন কীর্ত্তি, মুদ্রা ও মেডেল, ব্রিটিশ ও ইউরোপীয় মধ্য কালের কীর্ত্তি পৃথিবীর যাবদীয় জাতির ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি, ছবি ও ছাপা। প্রবেশ করিলে দক্ষিণ দিকে প্রকাণ্ড পুস্তকাগার দেখা যায়, আলমারি ঠাশা গ্রন্থাদি রহিয়াছে, বিপুল সংগ্রহ। এই ঘরের ভিতর দিয়া দ্বিতীয় হলে কাচ-ঢাকা ডেস্কে বহু লোকের হাতের লেখা সাজান রহিয়াছে।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম পুস্তকালয় ও পাঠাগার।

এই পবিত্র জ্ঞানমন্দিরে প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি লইতে হয়। টিকিট পাইলে পরিচালনা কার্য্যের জন্য নিযুক্ত জনৈক কর্ম্মচারী সঙ্গে করিয়া ভিতরে লইয়া যান। পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া একেবারে অবাক হইলাম। পরিচালক পাণ্ডা এই পুণ্যতীর্থের মাহাত্ম্য কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিলেন। কয়দিন পরে টিকিট যোগাড় করিয়া এখানকার পাঠক হই। কয়েক বৎসর ক্রমাগত এখানে থাকিয়া এই পুণ্যধাম সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লব্ধ হয়, তাহাই প্রকাশিত হইল।

এই গোল ঘরের বেড় ৩০০ হাত, এবং গম্বুজ প্রায় ৭০ হাত উচ্চ। রোমের গোল-মন্দির পান্থিয়ন ব্যতীত পৃথিবীতে এত উচ্চ গম্বুজ আর নাই। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে পাঠাগার স্থাপিত হয়, কিন্তু এই নূতন প্রশস্ত গৃহ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় দেড় লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রথমে (১৭৫৯) বিখ্যাত কবি গ্রে ও আর চারিজন লোক মাত্র নিয়মিত পাঠক হন। বর্ত্তমান সময়ে প্রাত্যহিক

পাঠক সংখ্যা ছয় শতের অধিক। পাঠকগণ মধ্যে অনেক জ্ঞানী পণ্ডিত গ্রন্থকার আছেন। গ্লাড্‌ষ্টোন, ডিজরায়লি প্রভৃতি দেশের সকল বড়লোক এক সময়ে এখানকার নিয়মিত পাঠক ছিলেন। উদারনৈতিক বৃদ্ধ রাজমন্ত্রী এখনও মধ্যে মধ্যে আসিয়া পাঠ করেন। এরূপ গম্ভীর দৃশ্য পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

প্রায় বিশ লক্ষ পুস্তকের প্রাচীরবেষ্টিত গৃহমধ্যে ন্যূনাধিক পাঁচ শত লোক (পাঠক ও কর্ম্মচারী) নিবিষ্ট মনে আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত, একটুও সাড়া শব্দ নাই,—মেজেতে রবারের চাদর পাতা। বিনামূল্যে জ্ঞান বিতরণের জন্য এরূপ সুবিধা ও আরামের স্থান আর একটী নাই;—বৈদ্যুতিক আলোক ও উত্তাপের অতি সুন্দর বন্দোবস্ত; বহু কর্ম্মচারী পাঠকদিগের গৃহভৃত্যের ন্যায় যথা-প্রয়োজন পুস্তকাদি যোগাইতেছেন। লিখন পঠনের জন্য কালি, কলম, ব্লটিং-কাগজ, টেবিল, গদি-আঁটা-চেয়ার পাঠ্য পুস্তক সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়া আরামের সহিত পড়িবার জন্য আধার, অন্যান্য গ্রন্থ রাখিবার বিশেষ স্থান প্রভৃতির পরিপাটি বন্দোবস্ত। যদিও পুস্তকসংখ্যা সম্বন্ধে এই পুস্তকালয় দ্বিতীয়—পারিস নগরের প্রধান পুস্তকালয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—কিন্তু এখানকার শৃঙ্খলাদি সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রায় পাঁচ হাজার মুদ্রিত তালিকা সুপ্রণালীগত ব্যবস্থায় সাজান আছে; তাহা হইতে পুস্তকের নাম লিখিয়া টিকিট খানি দিবার দশ-মিনিট কাল মধ্যে পুস্তক পাঠকের সম্মুখে হাজির। পারিস পুস্তকালয়ে কোন কোন গ্রন্থ সমস্ত দিন খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন।

এখানকার বন্দোবস্ত সর্ব্বপ্রকারে এত উত্তম যে, অনেকে স্বীকার করিয়াছেন, বড় বড় লোকের বাড়ীর পুস্তকালয়েও এমন আরাম ও এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা নাই। সংগ্রহের মধ্যে হিব্রু পুস্তক ১৫০০০; চীন গ্রন্থ ৩০০০; সাধারণ প্রাচ্য ১৫০০০; স্বর সংগীত বিষয়ক ১২০০০; যান্ত্রিক-সুর সম্বন্ধীয় ৭০০০; মানচিত্র ১২০০০০; প্রাচ্য দশ সহস্র সমেত হস্তলিপি ৬০০০০ মনন্দ প্রভৃতি ৫০০০০। ইংরাজী গ্রন্থ সম্বন্ধে এক কথায় এই বলা যায় যে, এক স্মিথ নামের ২৪০০ গ্রন্থকারের পুস্তক এখানে আছে। প্রত্যেক বৎসর পঁচিশ হাজারের উপর নূতন গ্রন্থ সংগৃহীত হইতেছে। কেবল বৃটীশদ্বীপে বৎসরে প্রায় ছয় হাজার নূতন গ্রন্থ ও সংস্করণ এবং দুই হাজারের উপর সংবাদপত্র বাহির হইতেছে, তাহার এক এক খানা আইনানুসারে এখানে আসিয়া থাকে। তদ্ব্যতীত মূল্য দিয়া দেশ বিদেশ হইতে নূতন পুরাতন পুস্তক ক্রয় হইতেছে। কর্ম্মচারিগণের বেতন, গৃহসংস্কারাদির ব্যয়, পাঠকবৃন্দের জন্য খরচ ব্যতীত বই বাঁধাই খরচ বার্ষিক ছয় হইতে দশ হাজার, পুস্তক ক্রয় জন্য দশ হাজার, হস্তলিপি সংগ্রহের ব্যয় দশ হাজার, ও টিকিট তালিকাদি ছাপা খরচ তিন হাজার পাউণ্ড লগিয়া থাকে।

ইংলণ্ড-বেঙ্ক।

প্রধান জ্ঞানভাণ্ডার হইতে এখন কোষাগারে যাওয়া যাউক, কারণ জ্ঞানের নীচেই অর্থের দরকার, বরং জ্ঞানাপেক্ষা আমরা অর্থেরই বেশী ভুক্ষা। নয় বিঘা জমীর উপর এই মন্দির স্থাপিত। শুদ্ধ জমীর ভাড়া ধরিলে বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড দাঁড়ায়। লণ্ডনের এই অংশের জমীর দাম শুনিলে বুদ্ধি লোপ হয়, সময়ে সময়ে ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের উপর কাঠা বিক্রয় হয়। বেঙ্কের বুলিয়ন-খণ্ডের প্রবেশ-দ্বার টেম্‌স্ ও গঙ্গানদীর মূর্ত্তি শোভিত। সোণা ওজনের জন্য বুলিয়ন আপিসে প্রকাণ্ড কাচাবরণের ভিতর একটী সাত ফুট উচ্চ, প্রায় ছাপ্পান্ন মণ ভারি তুলাদণ্ড আছে। এত বড় হইলেও এরূপ ঠিক যে, একের এক শত ভাগ তোলার অল্পাধিক্য পর্য্যন্ত সহজে ধরা যায়, একখানি ডাক টিকিটের ভরে উপরের কাঁটা ছয় ইঞ্চ নামিয়া পড়ে, এমনি সূক্ষ্ম ব্যবস্থা। পৃথিবীতে এরূপ আর একটী পাল্লা নাই; দুই সহস্র পাউণ্ড ব্যয়ে ইহা নির্ম্মিত। ইহার নাম "লর্ড চিফজষ্টিস্"। রূপা ওজনের জন্য আর একটা আছে, এত সূক্ষ্ম নয়; তাহার নাম "লর্ড হাই চান্সেলর"।

বেঙ্ক হইতে প্রত্যহ পঞ্চাশ হাজার কেতার উপর নোট বাহির হইয়া পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে আবার এখানে ফিরিয়া আইসে। কেবল একখানি নোট একশত এগার বৎসর বাহিরে ঘুরিয়া জন্মস্থানে পুনরাগমন করিয়াছিল। পাঁচ পাউণ্ডের কম নোট বাহির হয় না। একবার মাত্র ভুলক্রমে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে একখানি এক পেনি, অর্থাৎ দশ টাকায় এক পাউণ্ড হিসাবে তিন পয়সার কিছু কম মূল্যের নোট বাহির হইয়াছিল। ক্রমাগত প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী বাজারে ঘুরিয়া বিশ বৎসর হইল পুনরায় বেঙ্কে আসিয়া পড়ে এবং প্রাচীন দুর্লভ সামগ্রীরূপে তথায় নিলাম হইয়া পাঁচ পাউণ্ড বিক্রীত হয়।

নোটগুলি ফিরিয়া আসিবামাত্র বাতীল করা হয়; তার পর পাঁচ বৎসর রাখিয়া অগ্নি দ্বারা বিনষ্ট হয়। কেবল দশ লক্ষ পাউণ্ডের এক খানি, বেঙ্ক হইতে প্রথম যে নোট বাহির হয়, সেই পাঁচশত পাউণ্ডের কেতা এবং আড়াই শত পাউণ্ডের একখানি যাহা শতাধিকবর্ষ বেঙ্কে জমা আছে, এই তিন খণ্ড সযত্নে রক্ষিত। সাতকোটী সত্তরলক্ষাধিক কেতা একশত পঁচাত্তর কোটী পাউণ্ডের উপর মূল্যের বাতীল নোট বেঙ্কে মজুত থাকে। এই নোটগুলি চৌদ্দশত বাক্সে বস্তা করিয়া রাখা হয়; জোড়া দিলে প্রায় সাড়ে-বার শত মাইল লম্বা হয়; এক খানির উপর আর একখানি রাখিয়া সাজাইতে পারিলে সাড়ে-পাঁচ মাইল উচ্চ একটী স্তূপ হইবার কথা; এবং বিছাইলে এগারশত চৌষট্টি বিঘা জমী আবৃত হইতে পারে।

বেঙ্কের কোষাগারে সর্ব্বদা যে কত গাদা নোট ও কত থলি গিনি থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। নোট বাদে নগদ আটকোটী পাউণ্ড কেবল স্বর্ণমুদ্রায় মজুত থাকে। পৃথিবীতে এরূপ ধনপূর্ণ আর একটী ঘর নাই। এই বেঙ্ক "বেঙ্ক সমূহের বেঙ্ক", অর্থাৎ অন্যান্য বেঙ্ক-ওয়লারা এইখানে তাহাদের টাকা কড়ি ও মূল্যবান দ্রব্য কাগজ পত্র দলীলাদি জমা রাখে। বেঙ্কের সাহুকারীর কথা আর কি বলিব, একটী কথার দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা পাইব—একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক খাঁটি সোণা যে যেখান হইতে যখন এখানে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিবে, বেঙ্ক তাহা তৎক্ষণাৎ কিনিতে পার্লামেণ্টের আদেশানুসারে বাধ্য, নচেৎ "ফেল" ডাকিয়া কাজ বন্ধ করিতে হইবে। এখন পাঠক বুঝুন,—ইংলণ্ডের কিরূপ ধনবল!

এরূপ ধনাগার দস্যু, চোর, অগ্নি হইতে রক্ষাহেতু পুলিস, পণ্টন, বিদ্যুৎ ও জলের কি প্রকার বন্দোবস্ত, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। অর্থাৎ মানবীয় বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা যতদূর সম্ভব, তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি করা হয় নাই।

অগ্নিদগ্ধ বা অন্য কোন প্রকারে নষ্ট নোট উপস্থিত করিলে যদি তাহার মূল্যাদির সামান্যমাত্রও নিদর্শন থাকে, বেঙ্ক তৎক্ষণাৎ টাকা দিতে প্রস্তুত। এমন ঘটনা অনেক ঘটিয়াছে।

পৃথিবী পর্য্যটনকালে এখানকার নোট যেখানে দিয়াছি সবাই আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া বলিয়াছে, ইহা সুবর্ণমুদ্রারই মত বা ততোধিক। আর অন্যান্য দেশীয় নোট তত্তদ্দেশের সীমা অতিক্রম করিলেই কেহ পুছে না। ধন ও তদ্বিষয়ক সম্ভ্রম সম্বন্ধে ইংলণ্ডের স্থান এতই উচ্চে!

ট্রাফাল্‌গার স্কোয়ার।

এই মহাতীর্থের প্রধান দেবতা জগদ্বিখ্যাত নৌসেনানায়ক মহামতি নেল্‌সন্; প্রধান দৃশ্য তাঁহার স্মরণার্থ বিরাট স্তম্ভ। স্থানটী অতি মনোরম। মহাত্মা পীল এই রমণীয় স্কোয়ারকে ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃশ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন! চারিদিক সব রকমে মহা গুল্‌জার, মাঝখানে কয়েকটী মহাবীরের যথাযোগ্য স্মরণ-চিহ্ন—এক হৃদয়োন্মত্তকারী অভিনব দৃশ্য, সন্দেহ নাই। স্কোয়ারের দক্ষিণাংশের মধ্যস্থলে নেল্‌সন-স্তম্ভ। মাটী হইতে প্রায় ছয় হাত উচ্চ, সুপ্রশস্ত চাতালের চারিকোণে চারিটী প্রকাণ্ড ধাতুময়ী সিংহমূর্ত্তি, মধ্যস্থলে চব্বিশ হাত উচ্চ বেদী। বেদীর গায়ে চারিদিকে নীল, সেণ্ট ভিন্সেণ্ট, কোপেন্‌হেগেন এবং ট্রাফাল্‌গার, চারিটী মহাযুদ্ধের প্রতিকৃতি। প্রত্যেক যুদ্ধের পরাজিত শত্রুবর্গ হইতে অপহৃত কামানের ধাতুতে ছবিগুলি ঢালা হইয়াছে। এই বেদীর উপরে ১১৬ হাত উচ্চ স্তম্ভ, তাহার শীর্ষোপরি তেজস্বী মহাবীর নেলসনের ধাতব মূর্ত্তি দণ্ডায়মান।

পার্লামেণ্ট মহা সভাগৃহ।

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখে পুরাতন গৃহ অগ্নিদাহে বিনষ্ট হওয়ার পর, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রেল দিবসে ভিত্তি স্থাপিত হইয়া ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিশলক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে এই নূতন গৃহ নির্ম্মিত, ও ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হয়। এবার এমন মশলা দ্বারা ইহা প্রস্তুত হইয়াছে যে, ব্রহ্মার আর বড় দণ্ড স্ফুট করিবার যো নাই। সমগ্র ভবন একটা ক্ষুদ্র গ্রাম বলিলেই চলে, সাতাইশ বিঘা জমী ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান। নদীর ধারে ৯৪০ ফুট লম্বা। ক্লক-টাওয়ার উচ্চ ৩২০ ফুট। সভার অধিবেশন কালে এই উচ্চাংশে একটী বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতে থাকে। এখানে যে ঘড়ি আছে, তাহার মিনিটের কাঁটা সাড়ে এগার ফুট লম্বা! ইহার ঘণ্টাটী ওজনে ৬৮০ মণ; নিস্তব্ধ সায়ংকালে প্রায় সমগ্র লণ্ডনের লোক ইহার শব্দ শুনিতে পায়। এই বিরাট ঘণ্টার নাম "বিগ্‌বেন।" সাধারণ বাজা ঘড়িতে যেরূপ দুই প্রকার দম্ দিতে হয় ইহাতেও তাই; প্রভেদ এই যে, একটীতে দশ মিনিট ও অপরটীতে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে,—এই প্রকার সপ্তাহে দুইবার দম্ দেওয়া আবশ্যক। ইহা সময় এত ঠিক রাখে যে, দিবারাত্রিতে তিন চারি সেকেণ্ডের অধিক তফাৎ কখন হয় না, সময়ে সময়ে এক সেকেণ্ডরও কম হইয়া থাকে। সর্ব্বোচ্চ চূড়ার নাম "ভিক্টোরিয়া টাওয়ার।" উহা ৭৫ বর্গ ফুট আয়তন ও ৩৪০ ফুট উচ্চ। এই প্রকাণ্ড ভবনে লর্ডস্ ও কমন্‌স্ সভামণ্ডপ, মধ্য-হল, রাজ প্রকোষ্ঠ, ব্যতীত এগারটী চক, পাঁচশত প্রকোষ্ঠ, আঠারটী মহল আছে। এতদ্ভিন্ন সুসজ্জিত সুপ্রশস্ত বত্রিশটী কমিটী ঘর, পুস্তকালয়, আপিস, খানা-কামরা প্রভৃতি যে কত,—বলা যায় না। সুবিশাল বৃটীশ সাম্রাজ্যের শাসন-কার্য্যোপযুক্ত সভাগৃহ,—সন্দেহ নাই। প্রবেশানন্তর প্রথম হলের দুইধারে হ্যাম্‌ডেন, ফক্স, প্রভৃতি নয় জন রাজ-মন্ত্রীর মূর্ত্তি বিরাজমান। তারপর ৮০ ফুট উচ্চ অষ্টকোণ মধ্য-হল; ইহারই বাম দিক দিয়া কমন্-সভায় ও দক্ষিণ দিক দিয়া লর্ড সভায় যাইতে হয়। সভ্যদিগের চক্ষুর আরামের জন্য সভামণ্ডপের কাচের ছাদের উপর আলো জ্বালা হয়। একজন সভ্যের সুপারিস দ্বারা প্রবেশের টিকিট যোগাড় করিতে হয়। যে কয় দিন উপস্থিত ছিলাম, কোন বিশেষ ব্যপার সম্বন্ধে আলোচনা হয় নাই। কমন্-সভায় ছয়শত সত্তর জন সভ্য, কিন্তু মণ্ডপে চারিশত ছিয়াত্তর জনের মাত্র বসিবার ব্যবস্থা আছে; বিশেষ বিশেষ সময়ে (যেমন গ্লাড্‌ষ্টোনের হোম-রুল-বিলের সময়, স্বতন্ত্র চেয়ার আনিতে হয়।

বাইচের কথা।

নানাদিক হইতে নানারঙ্গের লোক নানাপ্রকার যানে ও পদব্রজে প্রাতঃকাল হইতে বাইচ-স্থলাভিমুখে ধাবমান।

বেলা ১০ টার মধ্যে পাট্‌নি হইতে মোর্‌লেক পর্য্যন্ত সাড়ে চারি মাইল নদীর দুইধার লোকে লোকারণ্য। বাইচের তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে ওয়েষ্ট্‌মিনিষ্টর সেতু, হইতে মোর্‌লেক পর্য্যন্ত পাঁচ ক্রোশ নদীবক্ষ নানা শ্রেণীর নানা সাজের বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবক, যুবতী, বালক, বালিকা পূর্ণ; বৈদ্যুতিক বাষ্পীয় হইতে গাধাবোট পর্য্যন্ত, নানা রকমের জলযানে আকীর্ণ। জলযান সমূহ মধ্যে, কেম্ব্রিজের এক খানি অক্স্‌ফের্ডের এক খানি, শালিস এক খানি ও সংবাদপত্রের এক খানি বিশেষ গাম্ভীর্য্যের সহিত ধীরে ধীরে উজান বাহিয়া মোর্‌লেকাভিমুখ যাইতেছে। ব্যবসায়িগণ বিজ্ঞাপন প্রচারোদ্দেশে নানা প্রকার নৌকা নানা ছন্দে সাজাইয়া লোকের চিত্তাকর্ষণে যত্নবান। তীরে সাত আট জায়গায় প্রায় বিশ হাজার দর্শকের জন্য দাঁড়াইবার ও বসিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে; দেখিতে দেখিতে সকল স্থান পূর্ণ হইয়া গেল; টিকিটের মূল্য চারি শিলিং হইতে এক গিনি।

নির্দ্দিষ্ট কালে বেলা ৪ টার সময় সুন্দর সুস্থ সবল ষোল জন দাঁড়ীসহ অতি পরিষ্কার দুইখানি ছোট ডিঙ্গি পাট্‌নি হইতে ছাড়িল। দশ মিনিটের মধ্যে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। যেরূপ শান্ত সমাহিত ভাবে গাম্ভীর্য্য ও মর্য্যাদার সহিত আসন রক্ষা করিয়া দাঁড় ফেলা হইতেছে, দেখিলে বোধ হয় না যে, কোন প্রকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। আমাদের দেশের বাইচে লগুশির উন্নীত করত দাঁতমুখ সিট্‌কাইয়া আসন হইতে এক হাত উচ্চে উঠিয়া সজোরে দাঁড়ে থাবা দ্বারা জল ছিটাইয়া নদী তোলপাড় না করিলে বিক্রম প্রকাশ হয় না। যেখানে বিধাতার কৃপা বর্ষে, সেখানে নিম্নও সুমিষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। অল্পক্ষণ পরে প্রচারিত হইল,—কেম্ব্রিজের জিত, দশ হাত আগে; পাট্‌নি হইতে মোর্‌লেক পঁহুছিতে বিশ মিনিট চৌদ্দ সেকেণ্ড লাগিয়াছে। যেমন শেষ, অমনি আমরা ঘরে ফিরিলাম। পথে দেখি বাইচের সমস্ত বৃত্তান্ত সহ বহু সংবাদপত্র বাহির হইয়াছে। দেখ, কি অসাধারণ এই উদ্যম।

এই জলে স্থলে চারি পাঁচ লক্ষ লোকের উৎসাহ, উদ্যম, বিমল প্রফুল্লতা দেখিয়া বড় আনন্দ পাইলাম। এরূপ বিরাট জনতার এপ্রকার আমোদ আহ্লাদ প্রকাশ দ্বারা দেশের যুবকবৃন্দকে শারীরিক ব্যায়ামাদির সম্বন্ধে যে পরিমাণে উৎসাহ প্রদান করা হইল, তাহার ফল অতি উপাদেয় এবং সেরূপ উৎসাহ সহস্র সহস্র পুস্তক বা উপদেশ দ্বারা কখন সম্ভবে না। আর একটী বড় সুখপ্রদ ভাব এই সময়ে মনে হইয়াছিল। শুনিয়াছিলাম, পুরীতে জগন্নাথের মন্দিরে পাণ্ডাদের বালকগণ দেবতার সম্মুখে করযোড়ে প্রার্থনা করে, "সংসার সুখী কর ঠাকুর।" বাস্তবিক ইহা অপেক্ষা উচ্চ কামনা মানুষ প্রকাশ করিতে পারে না। ব্যক্তিগত-স্বার্থপরতা-প্রধান দেশের বেদমন্দিরে "ধনং দেহি, পুত্রং দেহি" র স্থানে এরূপ উদার উন্নত প্রার্থনা সম্ভবে, পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল না; তাই সংবাদটী শুনিবামাত্র হৃদয়রাজ্যে এক অভিনব আনন্দ তাড়িত-বেগে সঞ্চারিত হইয়াছিল। কথাগুলি এত মিষ্ট লাগিয়াছে যে, যখন তখন মনে হয়, এবং প্রাণ ভরিয়া উচ্চারণ করিলে বিপুল সুখ পাই। এই প্রকাণ্ড জনতার সমারোহে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলাম, এত লোককে একত্রে পবিত্র সুখ সম্ভোগ করিতে দেখিলে নিজে কি অতুল অনির্ব্বনীয় সুখ পাওয়া যায়। যদি সমগ্র সংসার এই ভাবে চিরসুখী হয়, সুরলোক ইহার নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

কাচ-প্রসাদ।

ইহা থাশ-নগরের একটু বাহিরে সিডেন্‌হাম নামক উপনগরে স্থিত। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের মহাপ্রদর্শনী গৃহের মাল-মশলা দ্বারা নির্ম্মিত। এই বিরাট হর্ম্ম্য একটী সু-উচ্চ স্থানের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, ইহার উপর দাঁড়াইয়া মহানগরীর ও বহুদূর পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকস্থ পল্লিসমূহের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখা যায়। ইহা বিস্তৃত ও সুসজ্জিত উদ্যান মধ্যে দণ্ডায়মান; উচ্চতা ২০৮, দৈর্ঘ্য ১৬০৮ ও প্রস্থ ৩৮৪ ফুট এবং চতুর্দ্দিকস্থ উদ্যানাদি ছয় শত বিঘা। কাচ দ্বারা আচ্ছাদিত বলিয়া ইহার নাম কাচ-প্রসাদ। ইহা নির্ম্মাণ কালে এরূপ কাচের ঘর আর ছিল না বলিয়া এই নামে অভিহিত; কিন্তু আজকাল ইউরোপে বহু অট্টালিকাই কাচাচ্ছাদিত। প্রসাদের সমগ্র খণ্ডাদির দৈর্ঘ্য প্রস্থের পরিমাণ ৮ ফুটের গুণানুসারে; অর্থাৎ ৮, ১৬, ২৪, এই হিসাবে।

এই বিরাট ভবনের ভিতরকার কাণ্ড-কারখানা এক প্রকার বর্ণনাতীত। প্রত্যহ এখানে নানা প্রকার আমোদ হইয়া থাকে; তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তিনটী গ্যালারি আছে, যাহার এক একটীতে চারি হাজার লোকের সমাবেশ হয়। যেরূপ বিপুল ব্যবস্থা, তদুপযুক্ত একটী অতি-প্রকাণ্ড বাদ্যযন্ত্র আছে। অনেক গুলি প্রকোষ্ঠে পুরাকাল হইতে বর্ত্তমান যুগের স্থপতিকার্য্যের নকল রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন কয়েকটী প্রকোষ্ঠে শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ রক্ষিত।

লণ্ডন পুলিশ।

পুরাকালে যে টুকু সহর ছিল, সেই টুকুকে আজও "সিটি অব্ লণ্ডন" বলে। ইহার শাসন, বিচার, আয়-ব্যয় প্রভৃতি যাবদীয় কার্য্য স্বতন্ত্র। নগরের এই অংশ সম্পূর্ণরূপে লর্ড মেয়রের অধীন। তিনিই এখানকার কর্ত্তা, এমন কি স্বয়ং রাজশক্তিও ইহার চতুঃসীমা মধ্যে ইহার নিকট লঘু। অত্রত্য কয়টী পল্লী লইয়া "স্বাধীন নগর" গঠিত, যাহার "অনাধারী স্বাধীনতা" বিশেষ সম্মান স্বরূপ

দেশ বিদেশের খ্যাতাপন্ন ব্যক্তিগণকে প্রদত্ত হইয়া থাকে। সাধারণ ভাবে "স্বাধীন মর্য্যাদা পাওয়া,—জন্মাদি কয়েকটী বিষয়ের উপর নির্ভর করে। ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমান সময়ে যে নগর হইয়াছে, তাহাকে মেট পলিস বলে। ইহার কার্য্যভার একটী সভার হস্তে, তাহার নাম "লণ্ডন কউন্টি কাউন্সিল"। সিটি পুলিসের বার্ষিক প্রায় এক লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে নয় শতাধিক লোক, ও মেট্রপলিসে পনর লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে প্রায় চৌদ্দ হাজার লোক নিযুক্ত। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের তালিকায় জানা যায়, এই মহানগরী হইতে ঐ বৎসর ৩৯৬১ জন বয়স্থ ও ১২৮৭৮টী শিশু নিরুদ্দেশ হয়। তন্মধ্যে পুলিস কর্ত্তৃক কেবল ১২৪ জন বয়স্থ ও ১২টী শিশু বাদে সকলের ঠিকানা হইয়াছিল। পিতৃ-মাতৃ-সঙ্গচ্যুত রোরুদ্যমান শিশুকে কোমল ভাবে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে করিতে কনষ্টেবল বহু লোক পরিবেষ্টিত হইয়া ধীরে ধীরে চলিতেছেন, লণ্ডনের রাজপথে একটী হর্ষবিষাদযুক্ত দৃশ্য।

লণ্ডনের পুলিস বলেন, "লোকে আমাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ মনে করিয়া থাকে; যাহার যাহা প্রয়োজন আমাদের নিকট আইসে।" বাস্তবিক এরূপ পুলিস আর কোথাও দেখি নাই। কনষ্টেবলগুলি এরূপ ভদ্র ও তৎপর যে, নিতান্ত অপরিচিত বিদেশীয় আগন্তুকও ইহাদের নিকট যার-পর নাই মিষ্ট ব্যবহার পাইয়া থাকেন; ঠিক যেন এ বিষয়ে কঠিন পরীক্ষা দিয়া ইহারা উত্তীর্ণ। বেতন যেমন সপ্তাহে দেড় পাউণ্ড, তেমনি নানাগুণসম্পন্ন, হৃষ্টপুষ্ট, সুদীর্ঘ সবল, সুস্থকায়, পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চের কম লোক ভর্ত্তি করা হয় না। গন্তব্য স্থানাদির ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলে, হাজার দূরের জায়গা হইলেও, এরূপ শীঘ্র সঠিক উত্তর দিয়া থাকে, যেন সমগ্র লণ্ডন নগর দিবা রাত্রি ইহাদের চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছে। যথা ""Third turning on the left, then fifth turning on the right, then fourth turning on the left"—"বামে তৃতীয় মোড়, তার পর দক্ষিণে পঞ্চম মোড়, তার পর বামে চতুর্থ মোড়।"—সব রকমে ইহারা যে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুলিস, এ কথা পর্য্যটক মাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। অনেকের বিশ্বাস ও তালিকাদিতেও পাওয়া যায়, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় আইন প্রচার ও নিষ্কর্ম্মা লোকদের অনেক প্রকার ব্যবস্থা হওয়ার পর অপরাধীর সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইতেছে। সমগ্র ইংলণ্ডের পুলিস-চালানী মকদ্দমার তালিকাতে তাহা জানা যায়। ১৮৬৮-৬৯—১৯১৪৯; ১৮৭০-৭৯—১৫৮১৭; ১৮৮০-৮৯—১৪০৫৮। অর্দ্ধশতাব্দি পূর্ব্বে বর্ত্তমান লণ্ডনের উপনগরগুলিতে টাকাকড়ি লইয়া নিরাপদে যাওয়া অসম্ভব ছিল; এখন কোন ভয় নাই। তাহার কিছু পূর্ব্বে নগরের মধ্যে আপিসাঞ্চলে বেশ উপদ্রব ছিল। বেঙ্কের নিকট রাত্রিতে অনেককে ঘড়ি চেন ত্যাগ করিয়া রক্ষা পাইতে হইয়াছে।

পুলিসের প্রধান কার্য্যালয়ের নিকট অগ্নিনির্ব্বাপক কর্ম্মচারীদের হেড আপিস। এই বাড়ীতে একটী ১০৬ ফুট উচ্চ অষ্টকোণ টাওয়ার আছে; নগরের কোথাও আগুন লাগিবে হঠাৎ দেখিতে পাইবার জন্য উহা নির্ম্মিত। দমকল এঞ্জিনাদি সাজ সরঞ্জাম লইয়া যখন ইহাঁরা অগ্নিক্ষেত্রের অভিমুখে নক্ষত্রবেগে ধাবমান হন, লণ্ডন রাজপথের সে একটা দৃশ্য। নগর মধ্যে ইহাদের অনেক আড্ডা আছে। ইহাঁদের কার্য্যদক্ষতাদি ভুবন-বিখ্যাত। লণ্ডনে ছোট বড় অগ্নিকাণ্ড আছেই। চিম্নি সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা আইনাদিষ্ট থাকাতেও অনবধানতা বশতঃ অনেকের চিম্নির ঝুলে আগুন লাগে এবং তজ্জন্য গৃহস্থকে বেশ জরিমানা দিতে হয়। গৃহগুলির চারিদিকে ইট পাথরের দেয়াল, ভিতরে সব কাঠের কারখানা; আগুন লাগিলে মুস্কিল ব্যাপার। দুই চারিটী অগ্নিদাহ দেখিয়াছি,—ভীষণ কাণ্ড। বর্ত্তমান ব্যবস্থার ফোয়ার এঞ্জিন ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রচলিত হয়।

ডাকঘর।

ইভিনুর্ব্বে জেনারেল পোষ্ট-আপিস দুইটী প্রকাণ্ড গৃহে অবস্থিত ছিল; একটীতে খাশ ডাকঘরের কাজ, অপরটীতে প্রধান আপিসাদি ও টেলিগ্রাফ বিভাগ; এখন ইহার জন্য তিনটী বাড়ী হইয়াছে। গড়পড়তা দেড়শত কোটী পত্র, পঞ্চাশ কোটি পুস্তক ও সংবাদ পত্রের পুলিন্দা, বিশ কোটী পোষ্টকার্ড এবং আড়াই কোটী বাক্সি প্রতিবৎসর এখান দিয়া যাতায়াত করে। বড়দিনের সপ্তাহে এক এক দিন পঁচিশ ত্রিশ লক্ষ জিনিস উপস্থিত হয়; কিন্তু যথাসময়ে সমস্ত বিলি হইতেছে, এমনি সুন্দর বন্দোবস্ত। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় দিনের কাজ শেষ করিয়া যখন লোকে ডাকঘরে পত্রাদি দিতে আইসে, তখনকার দৃশ্য দেখিবার বিষয়। ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত ডাকঘরে হুলস্থুল ব্যাপার, ঠিক ৮ টার সময় সমস্ত পরিষ্কার হইয়া ডাক রওনা হওত পৃথিবীর চারিদিকে ছুটিতে আরম্ভ হয়। বড় ডাকঘরে এগার হাজার কর্ম্মচারী।

দ্বিতীয় গৃহে টেলিগ্রাফ অফিস। এখানকার পনর শত যন্ত্রে তিন হাজার লোক খাটে। লণ্ডনের সমস্ত তারের খবর এই খান দিয়া যায়। অল্প দূরের জন্য নিউমাটিক-টিউবের ব্যবস্থা আছে;—ছোট ডাকঘর সমূহ হইতে একটা চোঙ্গের মধ্য দিয়া একটী পুলিন্দায় একসঙ্গে ত্রিশ চল্লিশ খানা টেলিগ্রাম দুই মিনিটের মধ্যে আসিয়া পড়ে। প্রকাণ্ড বাষ্পীয়-কলসমূহ দ্বারা নলের বাত নির্ম্মাণ করত এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। লক্ষ্মীর কৃপা জনবুলের উপর যে এখনও মুষলধারে বর্ষিত হইতেছে, ইংরাজের বাণিজ্য বিস্তার তাহার লক্ষণ, এবং ডাকঘরের উন্নতি তাহার বিশেষ প্রমাণ। বর্ত্তমান দুই গৃহে স্থানাভাব বশতঃ তৃতীয় প্রকাণ্ড অট্টালিকা আমাদের সাক্ষাতে নির্ম্মিত হইয়াছে।

লণ্ডন মুদ্রাযন্ত্র।

লণ্ডন নগরে প্রত্যহ প্রত্যুষে আট খানি বড় ও দুই একখানি ক্ষুদ্র শ্রেণীর দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। তার পর বেলা দশটা হইতে ততোধিক বৈকালিক কাগজ বাহির হইতে আরম্ভ হয়। প্রাতঃকালীন গুলি টাইমস্ ব্যতীত সকলেরই মূল্য এক পেনি। টাইমস্ কলিকাতার ষ্টেটস্‌ম্যানের মত ষোল পৃষ্ঠা ছোট ছোট হরপে ছাপা, কাজেই তিন পেনি দাম। বৈকালিক সমস্ত আধ পেনি। ইহার এক একখানি প্রতিদিন সাত আট সংস্করণ বাহির হইয়া থাকে। এই কাগজ সমূহ মধ্যে দুই এক খানি দেড়শত বর্ষাধিক জীবিত। প্রাতঃকালীনগুলির মধ্যে একখানি "ডেলি টেলিগ্রাফ"—প্রত্যহ ন্যূনাধিক তিন লক্ষ বিক্রয় হইয়া থাকে। সাময়িক পত্রিকার মধ্যে সাপ্তাহিক ও মাসিক অনেক, ত্রৈমাসিক কম। এ গুলিরও এক একখানি সুদীর্ঘজীবী। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, আমাদের দেশে ওরূপ ভাবে কাগজ চলে না কেন? তাহার অনেক কারণ বিদ্যমান, কতক পাঠকগণের গোচর করিতে চেষ্টা পাইব। লণ্ডনের পথে চারিজন বন্ধু যাইতেছেন, চারি জনেই চারিখানি কাগজ কিনিবেন, বাড়ীতে পিতা পুত্রে হয় ত দুই জনে দুইখানি কাগজ কিনিবেন; আর আমাদের দেশে একখানি সাপ্তাহিক কাগজে গ্রামসুদ্ধ লোককে চালাইতে হইবে। এই কথা লইয়া ভারতবন্ধু হাণ্টার সাহেব কোন বক্তৃতা স্থলে একবার খুব হাসাইয়াছিলেন। এই ত গেল দৈনিক সাপ্তাহিক পত্রাদি সম্বন্ধে। সাময়িক পত্রিকা কতবার কত প্রকারের হইল, কেহই তিষ্ঠিতে পারিল না। এখানে কিন্তু কারণ অন্য প্রকার। বিলাতে সব রকম কাগজ যে প্রণালীতে চলে, এখানে সেরূপ চালাইলে বোধ হয় নষ্ট হইবার কথা নয়। সেখানে প্রত্যেক লেখক আপনাপন লেখার উপযুক্ত মূল্য পাইয়া থাকেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কেবল সংবাদ ও সাময়িক পত্রে লিখিয়া কত লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন, একা ব্রিটিশ মিউজিয়ম হইতে। আমাদের দেশে যেমন সব কাজেই ফাঁকি দিয়া সারিতে পারিলে একটা বাহাদুরী, ওদেশে তা নয়। আপনার সহোদর হইলেও কেহ কাহাকেও বিনা পারিশ্রমিকে খাটাইয়া তাহার নিকট হীন হইতে চাহেন না। এই জন্যই একটা কথা আছে,—"Nothing for nothing, little for six pence"—বিনা মূল্যে কিছুই হয় না, এবং অল্প মূল্যে সামান্য পাওয়া যায়। বিদেশীয়গণ ইহার অর্থ অনেকে অনেক রকম করিয়া ইংরাজের নিন্দা করিতে পারেন; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ নিয়ম পৃথিবীর কোথায় নাই? উপরন্তু এরূপ ভাবে চলিলে কাহারও কোন প্রকার নালিশের কারণ থাকে না। আমাদের দেশে যতগুলি সাহিত্য সম্বন্ধীয় কাগজ হইয়াছে, এই রোগেই মারা গিয়াছে। অবশ্য যদি এরূপ কোন দরিদ্র সম্পাদক থাকেন, যাঁহার কষ্টে উহার দ্বারা উদরান্ন চলিতেছে, তাঁহাকে সহৃদয় লেখক মাত্রেরই অর্থ ভিক্ষা না দিয়া ঐরূপ ভিক্ষা দেওয়া সমাচীন। কিন্তু যাঁহারা পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া ঐরূপ কাগজ দ্বারা যোত্রসম্পন্ন হইয়াছেন বা হইবার চেষ্টায় আছেন, তাঁহাদের উচিত নয় ওরূপ হীন ভাবে ভিক্ষা লওয়া। এই জন্যই যাঁহাদের লেখায় কাজ হয়, এরূপ লোক ভদ্রতার খাতিরে দুই একবার লিখিয়া যখন দেখেন কোন রূপ আর্থিক লাভের আশা নাই তখন কলম বন্ধ করেন; কাজেই কাগজেরও মৃত্যু উপস্থিত হয়। মুখ ফুটিয়া চাহিয়া বিলক্ষণ কয়েকবার তাগাদা ভিন্ন এ সকল স্থলে কিছু আদায় হওয়া কঠিন; সুতরাং কোন্ ভদ্রলোক মস্তিকাদির ব্যয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া এরূপ জঞ্জাল কিনিয়া আনিতে ইচ্ছা করেন? শুনিতে পাই, আজ কাল কোন কোন সম্পাদক "দয়া" করিয়া লেখকগণকে কিছু কিছু দিতেছেন; কিন্তু এ সম্বন্ধে লেখকের অভিজ্ঞতা বড়ই কটু। আমাদের ভাগ্যে ত কখন কিছু জুটে নাই। যাহা হউক কোন প্রকারে উপযুক্ত লেখকগণকে সন্তুষ্ট রাখিয়া এরূপ কাগজ রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক; উহা একটা জাতীয় শক্তি। গ্রাহকগণের নিষ্ঠুরতাও অনেক স্থলে প্রাণনাশের কারণ হয়। ভরসা করি আজ কাল সেটা অনেক কম হইয়াছে। সহৃদয় গ্রাহকগণের পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত, —এ সকল সামগ্রীর জীবন কি প্রকারে বাঁচে?

সেক্সপিয়র।

তৃতীয় ভাগ। সচিত্র। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত সঙ্কলিত। কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের ন্যায়,—সুলভ সংস্করণ ১।০, রাজসংস্করণ ৫৲ টাকা।

আকারে ও প্রকারে তৃতীয় ভাগ সেক্সপিয়র, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ অপেক্ষা বৃহত্তর। ডিমাই ৪২ ফর্ম্মা,—৩৩৬ পৃষ্ঠা। মূল্য কিন্তু সেই প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের ন্যায়। এই ভাগে জগদ্বিখ্যাত হ্যামলেট, জুলিয়াস্ সিজার, আণ্টনি-ক্লিওপেট্রা, রিচার্ড-থার্ড, কিং জন্, মিড সামার, মাচ আডু ও এজ ইউ লাইক,—এই আটখানি মহা উপন্যাস, নয় খানি উৎকৃষ্ট ছবি এবং "কবি-প্রতিভা" শীর্ষক একটি সুন্দর সমালোচনা আছে। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ উত্তম।

হারাণ বাবুর সেই সর্ব্বজন পরিচিত সেক্সপিয়র তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ যেরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল,—সেক্সপিয়র তৃতীয় ভাগও সেইরূপ হইয়াছে। ভাষা ও ভাব এরূপ সরল, মধুর ও মনোজ্ঞ হইয়াছে যে, পণ্ডিত ও পুর-মহিলায়,—সমান আগ্রহে ইহা পাঠ করিবেন। সেক্সপিয়র ইংরেজ কর্ত্তৃক লিখিত হইলেও, ইহা ইংরেজের একার নহে,—ইহাতে পৃথিবীর সর্ব্বজাতির সমান অধিকার আছে। চাঁদ কাহারও একার নহে,—সকলেরই।

জন্মভূমি।

অষ্টম ভাগ। } শ্রাবণ। ১৩০৫। { ৮ম সংখ্যা।

আমার সেই অমূল্য মণি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কি সুন্দর চুল!

"তাই আনিয়াছ তো, আমার সেই অমূল্য মণি?"

তুষার-আচ্ছাদিত মানসরোবর মাঝে নীলপদ্মসম চক্ষু দুইটী ঈষৎ বাঁকাইয়া যখন হরিমতী এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন পারিজাতবনবিহারিণী-দেবকামিনীকুলনিন্দিত তাঁহার সেই অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া মাধবের নয়ন সার্থক হইল। হরিমতীকে বালিকা বলিলেও চলে। বয়স কেবল চৌদ্দ বৎসর। তবে এক স্বামী ভিন্ন হরিমতীর পৃথিবীতে আর কেহ নাই। স্বামী নীলমাধবেরও পৃথিবীতে কেহ নাই। সুতরাং ভয়, লজ্জা, ঘোমটা, সে সব রাখিলে হরিমতীর চলে না। তাই তিনি সোহাগে স্বামীর স্কন্ধের উপর মাথাটী রাখিয়া চক্ষু দুইটী ঈষৎ বাঁকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি আমার সেই অমূল্য মণি আনিয়াছ তো?"

উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, গণ্ডদেশ হইতে লাল আভা যেন ফুটিয়া পড়িতেছে. ঠোঁট দুই খানি যেন আলতা দিয়া কে সদ্য রঞ্জিত করিয়াছে, টানা-টানা ভাসা-ভাসা চক্ষু দুইটী যেন ঢল ঢল করিতেছে—ফল কথা হরিমতীর রূপমাধুরিবর্ণনা করিতে আমাদের ক্ষমতা নাই। তাহার পর হরিমতীর চুল! এমন চাঁচর চিকুর নিবিড় নব মেঘের ন্যায় কেশ তো কখন দেখি নাই! তখনও হরিমতীর চুল বাঁধা হয় নাই। বাদল হইয়াছে, চুল তখনও শুষ্ক হয় নাই। মন্দ মন্দ মলয়া-মারুত সমুদ্র-বক্ষে ক্রীড়া করিলে যেরূপ ঈষৎ তরঙ্গ উত্থিত হয়, সেরূপই তরঙ্গের ন্যায় হরিমতীর চুলগুলি পৃষ্ঠে ও স্কন্ধে এলোথেলো হইয়া দোলায়িত হইতেছিল।

এক গোছা কেশ হাতে লইয়া নীলমাধব বলিলেন,—"কি সুন্দর চুল! বিধাতা কি তোমাকে একেবারে নিখুঁত করিবার জন্য অবশেষে এই কেশরাশি দিলেন?"

হরিমতী বলিলেন,—যাও! মিছা বকিও না। যদি তুমি রাত্রিদিন আমার চুলের প্রশংসা কর, তাহা হইলে গরবে আমার আর মাটিতে পা পড়িবে না। আর এই চুলের কথা বলিতেছ, এ কাহার কৃপায় আমি পাইয়াছি? তোমার কৃপায় নয়? তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—আমার সে অমূল্য মণি আনিয়াছ?"

নীলমাধব ও হরিমতী কলিকাতায় বাস করেন। নীলমাধব পূজার বাজার করিতে গিয়াছিলেন। একটী গাঁঠরি করিয়া নানাবিধ সামগ্রী আনিয়াছেন। ঘরে আসিয়া গাঁঠরিটী বিছানার উপর রাখিয়াছেন, সেই সময় স্ত্রী পুরুষে এইরূপ কথোপকথন।

নীলমাধব বলিলেন,—"তোমার সে অমূল্য মণি আনিয়াছি কিনা, গাঁঠরি খুলিয়া দেখনা কেন।"

হরিমতী তাড়াতাড়ি গাঁঠরি খুলিলেন। বহুমূল্য সাড়ি জামা প্রভৃতি দূরে নিক্ষেপ করিয়া হরিমতী গাঁঠরির ভিতর হইতে একটী শিশি অতি যত্নে তুলিয়া লইলেন। কাগজের আবরণ খুলিয়া ফেলিলেন। শিশির ভিতর হইতে লালবর্ণ তরল পদার্থের আভা বাহির হইতে লাগিল। বোধ হয় কোনওরূপ তৈল। তাহাই কি হরিমতীর অমূল্য রত্ন? হাঁ তাহাই বটে। এ সম্বন্ধে কিছু রহস্য আছে। পাঠকের কৌতূহলনিবারণের নিমিত্ত আমাদের এস্থানে গল্পটী করিতে হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাঘবের পুত্রবধূ।

হরিমতীর মাতুলের নাম রাঘব চক্রবর্ত্তী। ঠিক আপনার মামা নন্, কিছু দূর সম্পর্ক। রাঘব চক্রবর্ত্তীর বাস পল্লীগ্রামে ছিল। তিনি নিতান্ত ভাল মানুষ ছিলেন না। মোকদ্দমা লইয়া সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। একবার

একটী মোকদ্দমায় পড়িয়া তিনি সর্ব্বস্বান্ত হন। তাঁহার ভিটাটী পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া যায়। তখন রাঘবের বয়স প্রায় ষাটি বৎসর।

যাহা হউক, রাঘবের বিশেষ কোনরূপ সাংসারিক ঝঞ্ঝট ছিল না। বহুকাল তাঁহার গৃহ শূন্য হইয়াছিল। রাঘবের পরিবারের মধ্যে ছিলেন কেবল এক পুত্র। তাঁহার নাম গোপীকৃষ্ণ। গোপীকৃষ্ণ শ্বশুরালয়ে বাস করিতেন। শ্বশুর নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার দুই চারি বিঘা ভূমি ছিল। সেই ভূমি কর্ষণ করিয়া গোপীকৃষ্ণ জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, এক মুষ্টি অন্নের জন্য রাঘব বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের শ্বশুরালয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গোপীকৃষ্ণ রাঘবেরই তো বেটা! পিতৃভক্তি অপেক্ষা স্ত্রীভক্তি তাঁহার মনে কিছু প্রবল ছিল। বাপকে দেখিয়া তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি যদি একগুণ জ্বলিলেন, তাঁহার গৃহিণীটী দশগুণ খরতর কোপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। পুত্র ও পুত্রবধূর মনের ভাব রাঘব বিলক্ষণ বুঝিলেন। নিরুপায় হইয়া সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধের কিন্তু আর লাঞ্ছনার পরিসীমা রহিল না। পুত্র ও পুত্রবধূর ঘরে তাঁহাকে ঠিক চাকরের মত থাকিতে হইল। তাহার উপর গঞ্জনা, পুত্রটী বিশেষ কিছু বলেন না, কিন্তু পুত্রবধূর এক একটী কথা যেন এক একটী শক্তিশেল। সেই দারুণ বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইয়া অনেক দিন বৃদ্ধকে ভাত ফেলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া যাইতে হইত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নারিকেল নাড়ু।

পূজার সময় আসিল। জমি জোত ছাড়া গোপীকৃষ্ণ শ্বশুরের আর একটী বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্বশুর প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব করিতেন। পূজার সময় তিনি কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের কোন কোন বড় লোকের নিকট হইতে কিছু কিছু বার্ষিক পাইতেন। গোপীকৃষ্ণ সেই বার্ষিকের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু গোপীকৃষ্ণের পূজার খরচ ছিল না। এক খানি প্রতিমা, দুই ঝুড়ি ফুল বিল্বপত্র, কতকগুলি নারিকেল নাড়ু আর দুইটী ঢোল, ইহাতেই যা খরচ।

এবার পিতা ঘরে। এই সমারোহব্যাপারে পিতাকে তিনি কর্ত্তা করিলেন। পূজা সমাপ্ত হইল। কতকগুলি নারিকেল নাড়ু বাঁচিয়া রহিল। দশমীর দিন কর্ত্তাটী এক পেট নারিকেল নাড়ু খাইলেন। পুত্রবধূ তাহা জানিতে পারিয়া রাঘবকে অনেক ভর্ৎসনা করিলেন, আর বলিলেন,—"এ আমার বাপের বাড়ী। এস্থানে তোমার কোন অধিকার নাই। শীঘ্রই তুমি অন্যত্র গমন কর।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সঙ্গিনের খোঁচা!

চক্ষু মুছিতে মুছিতে রাঘব গিয়া বিছানায় শয়ন করিলেন। শয়ন করিয়া আপনার দুর্দ্দশার কথা ভাবিতে লাগিলেন। রাঘব ভাবিলেন যে,—"টাকাই হইল সকল সুখের মূল। যাহার টাকা আছে, তাহার সব আছে, যাহার টাকা নাই, তাহার কিছুই নাই। হে নারায়ণ! আমাকে কিছু টাকা দাও, যে এ দুষ্ট পুত্র ও পুত্রবধূর তাড়না হইতে আমি নিষ্কৃতি পাই।" ভগবানের কি কৃপা! রাঘবের সেই কাতরোক্তি শুনিয়া নারায়ণ স্বয়ং গরুড়ে চড়িয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। চমকিত হইয়া রাঘব আস্তেব্যস্তে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। নারায়ণ বলিলেন,—"রাঘব চক্রবর্ত্তি! যথা অভিষ্ট বর প্রার্থনা কর।" রাঘব উত্তর করিলেন,—"ঠাকুর! যদি আমার প্রতি কৃপা করিলেন, তবে আমাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করুন।" নারায়ণ বলিলেন,—"এই গরুড়ের পা ভাল করিয়া ধর। কলিকাতার টাকশালে গিয়া তোমাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিব।" রাঘব গরুড়ের পা ভাল করিয়া ধরিলেন। গরুড় আকাশ-পথে উড়িল। নিমিষের মধ্যে কলিকাতার টাকশালে গিয়া উপস্থিত হইল। রাশি রাশি টাকা দেখিয়া রাঘব বিস্ময়াপন্ন হইলেন। নারায়ণ বলিলেন,—"রাঘব! যত পার, টাকা লও, তাহার পর পুনরায় গরুড়ের পদদ্বয় ধারণ কর। শীঘ্র শীঘ্র স্বস্থানে প্রস্থান করিতে হইবে।" রাঘব গামছায় বাঁধিয়া ও কোঁচড়ে করিয়া অনেক টাকা লইলেন। টাকা লইয়া গরুড়ের পা ধরিলেন, আর বলিলেন,—"ঠাকুর চলুন! টাকা লইয়াছি।" গরুড় পাখা নাড়িয়া উড্ডীয়মান হইবার উপক্রম করিল। কিন্তু টাকার ভয়ে একেবারে অধিক উপরে উঠিতে পারিল না। প্রায় ছয় সাত হাত উপরে উঠিয়াছে, এমন সময় পাহারাওয়ালা শান্ত্রি জানিতে পারিল যে, কে টাকা লইয়া পলাইতেছে। সঙ্গিনসংযুক্ত বন্দুক ঘাড়ে করিয়া শান্ত্রি সে স্থানে দৌড়িয়া আসিল। কিন্তু চোর ধরিতে পারিল না। চোর তখন মাথার উপর ছয় সাত হাত উচ্চে গরুড়ের পা ধরিয়া ঝুলিতেছে। বন্দুক উত্তোলন করিয়া শান্ত্রি রাঘবের গায়ে সঙ্গিনের খোঁচা মারিতে লাগিল। রাঘব তখন কাতর স্বরে নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর সঙ্গিনের খোঁচায় আমার প্রাণ যায়।" নারায়ণ বলিলেন "সেপাহির মস্তকে তুমি বহির্দ্দেশ-গমন করিয়া দাও।" রাঘব বহির্দ্দেশ গমন করিতে লাগিলেন। এ কার্য্যে যেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ শব্দ হইতে লাগিল।

নিকটস্থ একটী ঘরে রাঘবের পুত্র ও পুত্রবধূ শয়ন করিয়াছিলেন। সেই শব্দে পুত্রবধূর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, শ্বশুর বিছানায় এক ঝুড়ি বহির্দ্দেশে গমন করিয়াছেন। শ্বশুরকে তিনি যাহা বলিলেন

তাহার উল্লেখের আবশ্যক নাই। "ভিক্ষা করিয়া খাই সেও ভাল, তবু আর এখানে থাকিব না।" এই বলিয়া রাঘব সেই রাত্রিতেই সে বাটী পরিত্যাগ করিলেন। বলা বাহুল্য যে, টাকশালের ঘটনাটী রাঘব স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাঘবের টাকা।

পথে যাইতে যাইতে রাঘবের মনে পড়িল যে, দূর সম্পর্কীয় তাঁহার একজন ভগিনী কলিকাতায় বাস করেন। কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভগিনীও দীন দুঃখিনী, দুই বৎসরের একটি শিশুকন্যা লইয়া কিছুদিন পূর্ব্বে বিধবা হইয়াছেন। তাঁহার শিশু-কন্যার নাম হরিমতী। আমাদের সেই অমূল্য রত্নের হরিমতী। যাহা হউক, রাঘব চক্রবর্ত্তী ভগিনীর ঘরে বাস করিতে লাগিলেন। এখন পুরোহিতের ব্যবসা অবলম্বন করিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। কার্ত্তিক ও সরস্বতীর প্রতি যাঁহাদের প্রগাঢ় ভক্তি, তাঁহাদের যাজনক্রিয়া করিয়া বিলক্ষণ দুই পয়সা উপার্জ্জন হইল। রাঘব চক্রবর্ত্তীর হাতে দিন দিন পয়সা জমিতে লাগিল। পুরোহিতগিরি ছাড়া, তিনি ঘটকালির কাজও আরম্ভ করিলেন। একজন বংশজ ব্রাহ্মণের সহিত একটী কাওরা-কন্যার বিবাহ ঘটাইয়া বিলক্ষণ দশ টাকা পাইলেন। তাহার পর বাটীর দালালি আরম্ভ করিলেন। আবার সোণা রূপা গহনার দোকানও করিলেন। ফল কথা, রাঘব চক্রবর্ত্তী এই বৃদ্ধ বয়সে একজন অর্থশালী লোক হইয়া উঠিলেন। নারায়ণ তাঁহার সহিত নিদ্রাবস্থায় যে খেলা খেলিয়াছিলেন, আজ জাগ্রৎ অবস্থায় সেই খেলা প্রকৃত প্রস্তাবে খেলিয়া দিলেন। সকল কালে সকল স্থানে অর্থবান্ লোকের আদর হইয়া থাকে। পুত্র ও পুত্রবধূ এখন রাঘবকে সোণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। দেশ হইতে কলাটা মুলাটা আখটা গুড়টা সর্ব্বদাই আনিয়া তাঁহাকে উপহার দিতেন। রাঘব উপহার গুলি লইতেন, আর মনে মনে হাসিতেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নেড়া মেয়ে।

হরিমতীর যখন সাত বৎসর বয়ঃক্রম তখন তাঁহার মাতার মৃত্যু হইল। হরিমতীর সংসারে আর কেহ ছিল না। কাজেই তাঁহাকে রাঘবের নিকট থাকিতে হইল। সত্য কথা বলিতে কি, রাঘব হরিমতীকে একটু স্নেহ করিতেন। ধীর, শান্ত, কথার বশ, মেয়েটীকে যে দেখিত সেই ভাল বাসিত। হরিমতী রাঘবের সকল কাজ করিতেন; রাঘব তাঁহাকে দুই বেলা দুইটী করিয়া খাইতে দিতেন, আর আপনার ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড় গুলি পরিতে দিতেন। সেই মলিন বেশেও হরিমতীর রূপে জগৎ আলো করিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, হরিমতীর মাথায় এক গাছিও চুল ছিল না। "কেশেই বেশ," অতুল সুন্দরী হইলে কি হইবে, এক চুল অভাবে হরিমতীর সব বৃথা হইয়াছিল। হরিমতীর ক্রমে দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইল, বিবাহের কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তবুও রাঘব তাঁহার বিবাহের নাম করেন না। বিবাহ দিতে টাকা খরচ হইবে, সে এক কথা। তাহার পর হরিমতী যাইলে তাঁহার সেবা করে কে? সে গেল দ্বিতীয় কথা। পাড়া প্রতিবাসী হরিমতীর বিবাহের কথা উত্থাপন করিলে, তিনি বলিতেন,—"ওর মাথায় চুল নাই, নেড়া মেয়েকে কে বিবাহ করিবে?"

তাঁহার একথা কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নহে। সেই নেড়া বালিকাকে বিবাহ করিবার জন্য অন্ততঃ একটী যুবক রাঘবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেই যুবকের নাম নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। নীলমাধব সাহেব উকীলের বাড়ী কর্ম্ম করিতেন। সামান্য বেতন পাইতেন। রাঘব কলিকাতায় একখানি বাটী ক্রয় করিয়াছিলেন, একটী ঘরে আপনি ও হরিমতী থাকিতেন, আর সব ঘর গুলি ভাড়া দিয়াছিলেন। নীলমাধব তাহার একটী ঘরে থাকিতেন। সুতরাং সর্ব্বদাই তিনি হরিমতীকে দেখিতেন। ময়লা কাপড়, মলিন মুখ, মেঘ ঢাকা শশির ন্যায় মেয়েটীকে দেখিয়া তাঁহার মন মোহিত হইয়াছিল। কিন্তু রাঘব চক্রবর্ত্তী বিবাহের কথায় সম্মত হইলেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বাবা সন্দেশ খাও।

এইরূপে কিছু দিন কাটিয়া গেল। একদিন হরিমতী আসিয়া নীলমাধবকে বলিলেন,—"মহাশয়! একবার মামাকে দেখিবেন চলুন। তাঁর আজ কয়দিন জ্বর হইয়াছে।"

নীলমাধব রাঘবকে গিয়া দেখিলেন। অতিশয় জ্বর, পেটের দোষও আছে। সেই দিন একবার পড়িয়া গিয়া অজ্ঞান হইয়াছিলেন। নীলমাধব বুঝিলেন যে, বৃদ্ধের এবার গতিক ভাল নয়। সে জন্য রাঘবের পুত্র গোপীকৃষ্ণকে তিনি সংবাদ দিলেন। তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে সত্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। "বাবা তোমার জন্য ভাল সন্দেশ আনিয়াছি, সন্দেশ খাও; বাবা, ভাল রসগোল্লা আনিয়াছি, খাও", এইরূপ নানা মিষ্ট বচনে রাঘব চক্রবর্ত্তীর তাঁহারা সমাদর করিতে লাগিলেন।

পীড়ার ক্রমশই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা নীলমাধব রাঘব চক্রবর্ত্তীর নিকট বসিয়া আছেন, তখন সে স্থানে আর কেহ ছিল না।

নীলমাধবকে লক্ষ্য করিয়া রাঘব মৃদু স্বরে বলিলেন—"খাও বাবা রসগোল্লা খাও। আর বাবা যখন এক মুষ্টি

অন্নের জন্য তোমাদের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন বাবাকে দূর দূর করিতে বাকি কর নাই। সেই দিন হইতে উঁহাকে আমি ত্যজ্যপুত্র করিয়াছি। একটী পয়সাও আমি উঁহাদের দিব না। সব হরিমতীকে দিব।" নীলমাধব বলিলেন,—"উনি আপনার পুত্র, আপনার ভাল মন্দ হইলেই উনি সব দখল করিয়া লইবেন। তখন হরিমতী কোথায় থাকিবে?" বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, "চির-কাল আমি মোকদ্দমা মামলা করিয়াছি। কিসে কি হয় আমি সব জানি। যাহা করিয়াছি তাহা এঘরের ভিতরও রাখি নাই। খিড়কিতে, যে স্থানে পাতকো ছিল, করবী গাছের—না, না, আমি এখন বলিব না, আমার সময় হয় নাই, আমি শীঘ্রই ভাল হইব।" সঠিক সংবা-দের নিমিত্ত উৎসুক হইয়া নীলমাধব বার বার জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ আর মুখ খুলিলেন না। সেই রাত্রিতেই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাহার পর তাঁহার মৃত্যু হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পুরাতন কূপ।

রাঘব চক্রবর্ত্তীর যে দিন মৃত্যু হইল, তাহার পর দিন সন্ধ্যাবেলা নীলমাধব গোপীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন যে, গোপীকৃষ্ণ ও তাঁহার স্ত্রী ঘর আতি পাতি করিয়া অনুসন্ধান করিতেছেন। কোনও স্থানে টাকা কড়ি দেখিতে না পাইয়া অবশেষে ঘরের মেজে খুঁড়িতেছেন। নীলমাধব বলিলেন,—"মহাশয়! আপনি বৃথা ঘর খুঁড়িতেছেন। আপনার পিতা সমুদয় বিষয় হরিমতীকে দিয়া গিয়াছেন। ঘর খুঁড়িবেন না, যাহা কিছু বাহির হইবে, তাহা হরিমতী পাইবে।" কথায় কথায় দুই জনে তুমুল ঝগড়া বাধিয়া গেল। মারামারি হইবার উপক্রম হইল। হরিমতী দুই জনের মাঝে পড়িয়া ছাড়াইয়া দিলেন। নীলমাধবকে গোপীকৃষ্ণ বাটী হইতে উঠিয়া যাইতে বলিলেন, আর হরিমতীকে সেই দণ্ডেই বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

রাস্তায় দাঁড়াইয়া হরিমতী কাঁদিতে লাগিলেন। এক দিন গিয়া যে, কোথায় থাকেন, তাঁহার এমন স্থান ছিল না। দ্বাদশ বৎসরের বালিকা, যৌবনের প্রারম্ভ, রূপে পৃথিবী আলো করিয়া রহিয়াছে। তাহা ব্যতীত এখন আর হরিমতী নেড়া নাই। কোঁকড়া কোঁকড়া ঘন কাল চুল এলো থেলো হইয়া ঘাড়ে ও পিঠে পড়িয়াছে। এ সোণার প্রতিমা আজ কোথায় যায়! নীলমাধব আস্তে আস্তে তাঁহার নিকট যাইলেন। গিয়া বলিলেন,—"হরি-মতি কাঁদিও না, এখন চল, আমার একটী বন্ধুর বাড়ী গিয়া থাকিবে। তাঁহার পরিবার অতিভাল লোক। তিনি তোমাকে যত্ন করিয়া রাখিবেন। তাহার পর যাহা ভাল হয়, তাহা করা যাইবে।"

হরিমতীকে বন্ধুর বাড়ীতে রাখিয়া নীলমাধব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বসিয়া বসিয়া কেবল ভাবিতে লাগিলেন,—"খিড়কিতে, যে স্থানে পাতকো ছিল, করবী গাছের—রাঘব চক্রবর্ত্তী এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। ইহার অর্থ কি? রাঘব চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর আবার খিড়কি কোথায়? বাড়ীর পশ্চাৎদিকে কেবল দুই হাত প্রশস্ত একটী গলি। তাহাই কি খিড়কি? তাহা খিড়কি হইলেও পাতকো কোথায়?"

তাহার পরদিন ঘোর রাত্রিতে, সকলে নিদ্রিত হইলে, নীলমাধব সেই গলির ভিতর গিয়া করবী গাছের নিকট খুঁড়িতে লাগিলেন। খুঁড়িতে খুঁড়িতে এক স্থানে পুরাতন একটী পাতকোর চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। পাতকো এখন নাই, মাটীতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু সেই পাতকোর পাট বাহির হইয়া পড়িল। প্রথম পাটের অল্প নিম্নে এক খানি টালি দেখিতে পাইলেন। টালিখানি তুলিয়া দেখি-লেন যে, তাহার নীচে একটী টিনের ক্যাশ বাক্স রহিয়াছে। আস্তে আস্তে নীয়ে বাক্সটী আপনার ঘরের ভিতর আনিয়া লুকাইয়া রাখিলেন।

প্রাতঃকালে বন্ধুর বাটীতে গমন করিয়া নীলমাধব হরিমতীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। হরিমতীকে বলি-লেন,—"তোমার আর ভাবনা নাই। আমি গত রাত্রিতে একটী বাক্স পাইয়াছি। সে বাক্স এখনও খুলি নাই। তাহাতে বোধ হয় রাঘব চক্রবর্ত্তীর সমুদয় টাকা কড়ি আছে। সে টাকা কড়ি সমুদয় তোমার। রাঘব চক্রবর্ত্তী মরিবার পূর্ব্বে আমার সমক্ষে তোমাকে সর্ব্বস্ব দিয়া গিয়াছেন। তবে তুমি এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। কারণ, রাঘব চক্রবর্ত্তী সে কথা কেবল আমার নিকট বলিয়াছিলেন। কিন্তু সে কাজের কথা নয়। গোপীকৃষ্ণ জানিতে পারিলে বাক্স তো কাড়িয়া লইবেই; তাহা ছাড়া আমার নামে চুরির নালিশ করিতে পারে।"

হরিমতী বলিলেন,—"মহাশয়! যে কাজের গোপন করিতে হয়, সে কাজ আমি কখনই করিব না। যে টাকা লইলে চুরির নালিশ হয়, সে টাকা আমি লইতে ইচ্ছা করিনা।"

নীলমাধব বলিলেন,—"হরিমতি! তুমি বালিকা বটে, তথাপি তোমার নিকট আজ আমি জ্ঞানশিক্ষা করিলাম।"

নবম পরিচ্ছেদ।

তাক্ তুড্ তুড্ তাক্।

যে বন্ধুর বাটীতে হরিমতী বাস করিতেছিলেন, নীল-মাধব সেই বন্ধুকে ডাকিলেন। আর একজন উকিল বন্ধুকে ডাকিলেন। তাঁহাদিগকে ও পাড়ার আর দুই চারি জন ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া, সেই টিনের বাক্সটী হাতে করিয়া

গোপীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন। কি করিয়া বাক্স পাইয়াছেন সে সমুদয় কথা তাঁহাকে বলিলেন। "এ বাক্স আমার পিতার" এই কথা বলিয়া গোপীকৃষ্ণ নীলমাধবের হাত হইতে কাড়িয়া লইতে যাইলেন। নীলমাধব বলি-লেন,—"তাহা হইবে না। উপস্থিত এই ভদ্রলোকদিগের সম্মুখে বাক্স খুলিতে হইবে। ইহাতে কোন কাগজ পত্র থাকিতে পারে।" গোপীকৃষ্ণ বিদেশী লোক। অগত্যা তাঁহাকে সে কথায় স্বীকার হইতে হইল। নীলমাধব উকিল বাবুর হাতে বাক্সটী দিলেন। সকলে মিলিয়া বাক্সটী ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন গোপীকৃষ্ণের স্ত্রী বাহির হইয়া বলিলেন,—"বাক্স ভাঙ্গিতে হইবে না। কর্ত্তার কোমরে আমি এই চাবিটী পাইয়াছি। বোধ হয় ইহার চাবি।" তাই বটে! বাক্সটী খোলা হইল। প্রথম কতকগুলি মোহর ও টাকা বাহির হইল। তাহার পর, এক তাড়া নোট বাহির হইল। উকিল বাবু একখানি ফর্দ্দ করিতে লাগিলেন। তাহার পর কয়খানি কোম্পানীর কাগজ বাহির হইল। সর্ব্বসমেত এক লক্ষ টাকারও অধিক সম্পত্তি। আর কোনওরূপ কাগজ পত্র বাহির হইল না।

নীলমাধবের দিকে চাহিয়া গোপীকৃষ্ণ বলিলেন,—"কেমন গো! এ সব সম্পত্তি এখন আমার তো? আর তো তোমার কোন কথা নাই?" নীলমাধব উত্তর করি-লেন,—"আজ্ঞা না, আমার আর কোন কথা নাই, আপনার পিতার সম্পত্তি। এখন এ সমুদয় আপনার।" এই কথা শুনিয়া গোপীকৃষ্ণ মনের আনন্দে সেই খালি টিনের বাক্সটী বাজাইতে লাগিলেন। হাতে বাজাইতে লাগিলেন আর মুখে বলিতে লাগিলেন,—"তাক্ তুড্ তুড্ তক্ তুড্ তুড্ তাক্! তাক্ তুড্ তুড্ তাক্ তুড্ তুড্ তাক্।" বাজাইতে বাজাইতে দৈবক্রমে বাক্সটী তাঁহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। ভূমিতে পড়িয়া বাক্সটী খুলিয়া গেল। বাক্সর এক দিকে অতি ক্ষুদ্র একটী বিভাগ লুক্কায়িত ছিল। সেই বিভাগের টিন খণ্ড টুকু খসিয়া পড়িল। তাহার ভিতর হইতে এক খানি কাগজ বাহির হইয়া দূরে পতিত হইল। গোপীকৃষ্ণ সত্বর কাগজ খানি তুলিয়া লইয়া উকিল বাবুর হাতে দিলেন,—"এই লউন আর একখানি নোট কি কোম্পানীর কাগজ।"

দশম পরিচ্ছেদ।

সুখে ঘর করা।

সে কাগজ খানি নোটও নয়, কোম্পানির কাগজও নয়। সে কাগজ খানি রাঘব চক্রবর্ত্তীর উইল। হরি-মতীকে সমুদয় বিষয় তিনি দিয়া গিয়াছেন, পুত্রকে এক পয়সাও নয়। গোপীকৃষ্ণের তাহার পর কিরূপ আনন্দ হইল, কিরূপ সমারোহের সহিত তিনি বাপের শ্রাদ্ধ করিলেন, তাহা আর প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে না। "তোমরা সব কলিকাতার জুয়াচোর। তোমাদের নামে নালিশ করিব, তোমাদের জেলে দিব।" এইরূপ সকলকে ভয় দেখাইয়া তিনি দেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাঘব চক্রবর্ত্তীর সমুদয় টাকা হরিমতী পাইলেন। কিছু দিন পরে নীলমাধব বন্ধুর বাটীতে গমন করিয়া হরিমতীকে বলিলেন,—"হরিমতি! তুমি এখন আর সে হরিমতী নও। তুমি এখন লক্ষ টাকার অধীশ্বরী! আমি এখন আর তোমার উপযুক্ত পাত্র নই। উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া আমার বন্ধু তোমার বিবাহ দিবেন। আমি আর এ দেশে থাকিব না! চির কালের নিমিত্ত তোমার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

হরিমতী কোন উত্তর করিলেন না। ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন। মুখ তাঁহার মলিন হইয়া গেল। চক্ষু দুইটী তাঁহার ছল ছল করিয়া আসিল। যাঁহার বাটীতে হরিমতী ছিলেন, সেই বাটীর গৃহিণী ঈষৎ হাসিয়া আপনার স্বামীকে বলিলেন,—"তোমাদের ও সব রঙ্গ আমার ভাল লাগে না। একটী ভাল দিন দেখ, দুই জনের চারি হাত এক করিয়া দাও।"

বলা বাহুল্য যে, তাহাই হইল। নীলমাধব ও হরি-মতী সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর কন্না করিতে লাগিলেন। তাঁহারা গোপীকৃষ্ণকে একেবারে বঞ্চিত করিলেন না। স্বইচ্ছায় সমুদয় সম্পত্তির অর্দ্ধেক ভাগ তাঁহাকে দিলেন। সেই টাকা পাইয়া তিনি হরিমতীও নীলমাধবের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। তাহাতে কিছু ফল হইলনা; কেবল যে টাকা গুলি হরিমতী তাঁহাকে দিয়াছিলেন, মোকদ্দমার ব্যয়ে তাহার আর একটী কপর্দ্দকও রহিল না।

হরিমতীর মাথায় এক গাছিও চুল ছিল না। কিন্তু তাহার পর এত নিবিড় কেশরাশি কোথা হইতে আসিল? এক্ষণ সে কথা বলি নাই। কারণ, কথাটী বড় সামান্য নয়। ভাল ঔষধ পাইলে কহ কাহাকে বলে না। যাহা হউক, এইবার বলিতে হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সে অমূল্য মণির নাম কি?

নীলমাধব সাহেব উকীলের বাড়ী কর্ম্ম করিতেন। হরিমতীর মত সাহেব উকিলের মাথায় চুল ছিল না। টাক পড়িয়া তাঁহার মাথাটী চোস্ত চক্-চকে হইয়া গিয়া-ছিল। সাহেব রবারের হউক কি চামড়ার হউক একটী স্থূল টুপি পরিতেন। সেই টুপির উপরে এরূপ সুন্দর ভাবে চুল সন্নিবেশিত ছিল যে, মাথায় পরিলে, কাহার সাধ্য বলে যে, সাহেবের মাথায় চুল নাই। ঠিক স্বাভাবিক এক মাথা চুল বলিয়া বোধ হইত। গ্রীষ্মের দিনে সাহেব মাঝে মাঝে টুপিটী খুলিয়া আফিসে কাজ করিতেন।

সুযোগ পাইলে নীলমাধব সেই টুপিটী নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেন, আর মনে মনে বলিতেন যে, "যদি হরিমতীর সহিত আমার বিবাহ হয়, তাহা হইলে তাহাকে আমি এইরূপ টুপি পরাইব। চুল কিসের উপর বসানো আছে, রবার কি চামড়ার উপর, তাহা দেখিবার নিমিত্ত, নীলমাধব তাহার চাকু ছুরীর সূক্ষ্ম অগ্রভাগটী সেই টুপিতে বসাইয়া দিলেন। ছুরির অগ্রভাগ টুপি ভেদ করিতে পারিল না। নীলমাধব আপনা-আপনি বলিলেন,—"এ রবার তাই ছুরি বসিল না।" আর একদিন সাহেব সেই টুপিটী মাথায় দিয়া চৌকিতে বসিয়া লিখিতেছেন, নীলমাধব পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছেন। নীলমাধবের হাতে ছুরি ছিল। সাহেবের মাথায় টুপি, তবু তিনি সেই টুপিতে ছুরি বসাইয়া দিলেন। ছুরি প্রবিষ্ট হইল না, সাহেব জানিতেও পারিলেন না।

এক বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল। তাহার পর আর এক দিন সাহেব সেইরূপ চৌকিতে বসিয়া লিখিতেছেন, নীলমাধবও সেইরূপ ছুরি হাতে করিয়া সাহেবের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছেন। আজ সাহেবের মস্তকের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া নীলমাধব অন্যরূপ কেশ দেখিতে পাইলেন। নীলমাধব ভাবিলেন যে, "সাহেব নূতন একটী চুলদার টুপি কিনিয়াছেন। এ নূতন টুপির উপর ছুরি বসাইয়া দেখি, ইহাতে কিরূপ হয়।" এইরূপ মনে করিয়া নীলমাধব সাহেবের মাথায় ছুরি বসাইয়া দিলেন। আশ্চর্য্য! আজ ছুরি বসাইতে না বসাইতে প্রবলবেগে রক্ত বাহির হইয়া পড়িল। "নরাধম! পাষণ্ড! আমাকে তুমি বধ করিবে?" এই বলিয়া সাহেব রুল লইয়া নীলমাধবকে মারিতে দৌড়িলেন। বিস্ময়ে, ভয়ে, নীলমাধব সাহেবের পায়ে গিয়া পড়িলেন। "মহাশয়! শুনুন, আমার একটা কথা শ্রবণ করুন, তারপর আমাকে রাখিতে হয় রাখিবেন, মারিয়া ফেলিতে হয়, মারিয়া ফেলিবেন।" নীলমাধব কাঁদিয়া কাঁদিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন।

সাহেবকে বিশেষ আঘাত লাগে নাই। তাহা ব্যতীত তিনি অতি দয়াবান্ পুরুষ ছিলেন। শীতল জল-প্রয়োগে মাথার রক্ত বন্ধ হইলে, তিনি নীলমাধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কি বলিবার আছে? তাহা বল।" নীলমাধব উত্তর করিলেন,—"মহাশয়! আমি একটী বালিকার প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছি, দুঃখের বিষয় এই যে, তাহার মাথায় চুল নাই। তাহার সহিত আমার বিবাহ হইলে আপনার মত টুপি পরাইব, এই বাসনায় আপনার টুপি আমি বার বার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে আরও দুই একবার ছুরি বসাইয়া দিয়াছি। কিন্তু তখন আপনাকে আঘাত লাগে নাই, রক্তও পড়ে নাই। এবার যে কেন এরূপ হইল, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।" সাহেব হাসিয়া উঠিলেন। নীলমাধবের অপরাধ ক্ষমা করিলেন, আর বলিলেন,—"এই দেখ, আমার মাথায় আর টুপি নাই। এখন আমার স্বাভাবিক চুল হইয়াছে। ইংরেজি ঔষধে আমি শত সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছি, তাহাতে কোন ফল হয় নাই। অবশেষে এই বঙ্গদেশের একটী সুগন্ধযুক্ত তৈলে আমার মাথার টাক গিয়াছে, মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ হইয়াছে, মাথায় আমার এই নিবিড় কেশরাশি হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া সাহেব নীলমাধবকে সেই তৈলের নামটী বলিয়া দিলেন। রাঘব চক্রবর্ত্তী জীবিত থাকিতে,—নীলমাধব সেই তৈল ক্রয় করিয়া হরিমতীকে মাখিতে দিলেন।

সেই তৈল মাখিয়া, মেঘের ন্যায় কোমল উজ্জ্বল, কাল রেশমের ন্যায় কোঁষা কোঁষা কেশ রাশিতে হরিমতীর মস্তকটী পরিপূর্ণ হইল। সেই জন্য হরিমতী আজিকার দিনে সেই শিশিটীর এত আদর করিলেন। মহামূল্য শাড়ি শেমিজ বডি জ্যাকেট ফেলিয়া সেই শিশিটীকে বুকে করিয়া লইলেন। ইহাই তাঁহার অমূল্য মণি। শিশিটী খোলা হয় নাই, তথাপি তাহার স্বর্গীয় সৌরভে সমুদয় বাড়ীটী আমোদিত হইল।

কিসের শিশি? এ মহামূল্য তৈলের নাম কি? প্রিয় পাঠক! এস, তোমাকে চুপি চুপি বলি। ইহার নাম ফুলেলা।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসন।

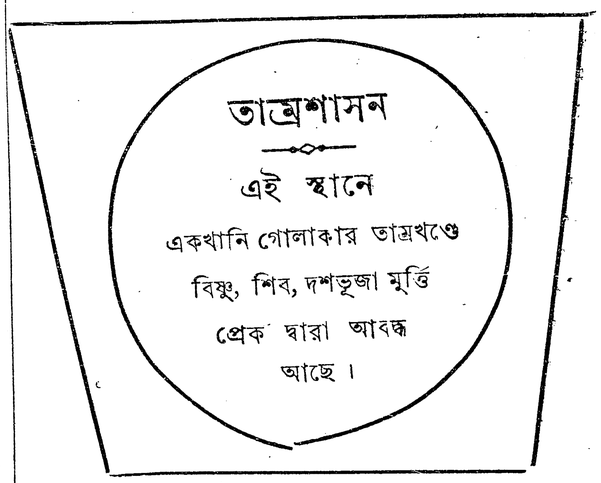

এই তাম্রশাসন খানি জেলা পাবনা মহকুমা সিরাজগঞ্জ ও ষ্টেসন রায়গঞ্জের অধীন মাধাইনগর গ্রামে রঘুনাথ সিংহ নামে একজন বুনা মৃত্তিকার নীচে প্রাপ্ত হয়। মাধাইনগর নিমগাছির জঙ্গলের অন্তর্গত স্থান। নিমগাছিতে বিরাট রাজার বাড়ী ছিল বলিয়া চির জনশ্রুতি আছে। আজও এই স্থানে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে

পাওয়া যায়। এই তাম্রলিপির শিরোভাগে যে বিষ্ণু, শিব ও দশভুজার মূর্ত্তি আছে, রঘুনাথের নিকট শুনিয়াছি যে, সে তাহার প্রত্যহ পূজা করিত। মামলা মোকদ্দমা উপলক্ষে রঘুনাথের সহিত আমার পরিচয় থাকাতে তাম্রলিপি প্রাপ্ত হওয়ার বৃত্তান্ত আমি তাহার নিকট অবগত হইয়া গত জ্যৈষ্ঠ মাসে তাম্রশাসন খানি তাহার নিকট হইতে লইয়াছি। এবং তাহার পাঠোদ্ধারের জন্য এই সিরাজগঞ্জের শ্রীযুত গোপীচন্দ্র সেন কবিরাজ মহাশয়কে উক্ত তাম্রশাসন প্রদান করি। তিনি বিশেষ পরিশ্রম করিয়া তাহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। এবং আমি ঐ সংস্কৃত পাঠ দৃষ্টে তাহার বঙ্গানুবাদ ও ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছি। এইক্ষণ প্রার্থনা, অনুবাদে কোন ভুল থাকিলে সকলেই অনুগ্রহপূর্ব্বক সে দোষ মার্জ্জনা করিবেন। নিবেদন ইতি ১৩০৫ সন তারিখ ২৩শে ভাদ্র।

এই তাম্রশাসনের প্রাপ্তি বৃত্তান্ত উপরোক্ত বিজ্ঞাপনে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। সিরাজগঞ্জের মুন্সেফী আদালতের উপরোক্ত উকিল শ্রীযুত দুর্গানাথ তালুকদার মহাশয় তাম্রশাসন খানি পাঠোদ্ধারার্থে বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে আমাকে প্রদান করেন। আমি উহার পাঠোদ্ধার করত তাহা মুদ্রিত করিয়া তৎসহ তাম্রশাসন খানি কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতে অর্পণ করিব এই সঙ্কল্প করিয়া পাঠোদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে ও তাম্র শাসন খানি দেবনাগর ও বাঙ্গালা অক্ষরের মধ্যবর্ত্তী এক প্রকার অক্ষরে লিখিত বিধায় পাঠোদ্ধার সমাপ্ত করিতে আমার বিলম্ব হয়। এই সময় পাবনার কালেক্টর মাননীয় শ্রীযুত মিঃ সি, এ, র‍্যাডিচ সাহেব বাহাদুর তাম্রশাসন খানি আমার নিকট হইতে লইয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাহার অধিকাংশ পাঠোদ্ধার করিয়াছি দেখিয়া পাঠোদ্ধার সমাপনার্থে কতিপয় দিনের জন্য উহা পুনরায় আমাকে অর্পণ করিয়াছেন। সম্প্রতি পাঠোদ্ধার সমাপ্ত হইয়াছে। এইক্ষণ উহা বাঙ্গালা ও ইংরাজি সহ পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া উক্ত শ্রীযুত কালেক্টর বাহাদুরের নিকট প্রেরণ ও সর্ব্বসাধারণের গোচর করিবার অভিপ্রায়ে মুদ্রিত করিলাম।

পরিশেষে বিনয়ের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, তাম্রলিপি খানির শেষ ভাগের কতিপয় পংক্তির লেখা সহসা দেখিয়া বোধ হয় যে, এককালীন নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে উহার সকল অক্ষরই পড়া যায়। যাহা হউক, কোন স্থানে ভ্রম হইয়া থাকিলে, যিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা সংশোধন করিবেন, তাঁহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ হইব। নিবেদন ইতি সন ১৩০৫ তারিখ ২৩শে ভাদ্র। বশম্বদ—

শ্রীগোপীচন্দ্র সেন কবিরাজ।
সিরাজগঞ্জ।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের প্রদত্ত

তাম্রশাসন।

(মাধাইনগরে প্রাপ্ত)

ওঁ নমো নারায়ণায়।

যস্যাঙ্কেঃ পরংষঃস্থো ঘোরসিতয়িন্নেত্যেকশো ধীশ্রিয়া।
যশোষন স্তীর দুগ্ধবহিঃ সমুদ্রং যস্যাতিথিঃ সংযযুঃ॥
আয়ুর্ব্বেদ্ দ্যুতিবোধন ত্রায়ন্তা সঘোর যুধানো মুরৈঃ
শ্রীবল্ল সেনৈকো ভূষণো নৃপস্য যঃ পূজ্যস্ত পঞ্চাননঃ।
স্বঙ্গাঙ্গাঙ্গুল পুণ্ডরীক মম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ধারা—
যজুযুদ্ধারস্ত সুস্কধায়ীস্বরোস্তিস্ম।
ক্ষিত্যলঙ্কারঃ সুস্কমণিঃ ক্ষীরাম্ভোনিধি প্রীতি—
ঝম্‌জৈমী বৃষৈ কশৈঃ স্রংসী কাঙ্কীবান্মন্মথো রাজা যঃ স্ম।
সুকর্ম্মজাল নিধি শুদ্ধধর্ম্মা নীতিপঃ স্বধনস্পৃষঃ সন্ধতিক্ষাক্রয়ৈ।
ক্রতুভির্ব্বরিষ্ঠঃ প্রদ্যুম্নাখ্যো রাজা যো অজনিষ্ম।
তদন্বয়েধৃতি ধীরাখ্যো রিপুবলীকৃচ্ছ্রো যোনরেন্দ্রাখ্যঃ
সৌরীক্ষিভিঃ সম্প্রাপ্তিঃ ঘোষিত গুণরাশেবীরসেনস্য।
সঙ্গাবান্ সত্যসন্ধঃ ক্রিয়াণামুক্ত নিষ্কলঙ্কো যষাম সামন্তসেনঃ
—কৃত্বানির্ব্বীর মুর্ব্বীতল মধীনতরং স্থৈর্য্যবারা।
বিদ্ধলক্ষ্যানি শ্লিষ্টৈর্যেন সূর্য্যাস্তেষু রুধিরকণাকীর্ণধারঃকৃপাণঃ
বীরাণামম্বেষৈস্তুষ্টো বিস্বরভ্রমানঃ।

ঊর্দ্ধং শল্যং ধ্বস্তং শল্যোনোর্দ্ধৈঃ সাম্যনীয়োহসৌ যমসীমা-দ্ধেমন্তসেনো ভবথুর্ধীয়ো মাঘধবাসঃ স বসুমতী সেব্যঃ। ওষধীশ যশোবদ্ যস্মে বসুনেব মৌলিমৌক্তি ইন্দ্রৌমসি যনঘুষ্যতি, অজনি বিজয়সেনস্তে কস্য বীরোস্ত। যস্যাশু সমরে ঝবাণ শ্রেয়সা মেক শেব। কৃতজ্ঞঃ সতি বিধিপোষণ বশস্তধবঃ ধ্রুবঃ সুকৃতি সুধীনাং। শিক্ষাশীলঃ সন্ধ্যা ক্ষমা সত্যং ক্রত্রিম যে তপোব্রতস্য প্রদ্যুম্ন সেনস্যাক্ষৌণিনাশা নিষ্ক্রিয়শস্য যশসঃ স্মরঃ। লক্ষ্যলব্ধ স্তীক্ষ্ণচাক্ষুষঃ স্তোকপ্রজ্ঞয়ঃ পুরংবঞ্চতি। ক্রিয়য়াবঙ্কো যস্যাম্বর যশো ক্ষীরসঙ্গাব্ধি যোধীজ্ঞবিঘ্নঃ। ধর্ম্মকার্য্যাধীনো ইষ্যতি যস্তীর্থাম্বস্তেষু ভূষণোহ সুরঘাতী বপুর্ব্বল্লালসেনোজজ্ঞে, হীনান্ধ ক্ষুব্ধ পামরস্য বন্ধুঃ। যশোবল নবজলাশয়ো নরেশ্বরাণামেকঃ স সলক্ষ্মীরম্বুধিঃ। হজ্ঞবৃত্তৌ সুরাসুর বিষ্ণুঃ যুদ্ধসিদ্ধি রুচ্চধর্ম্মা। ত্রৈলোক্যসুখায় কুলোজ্জ্বলে ঘোরস্তস্য প্রয়াসঃ, ক্ষুব্ধ শান্ত সুশীল ক্ষমা দক্ষ যুধিক্ষম যুদ্ধ বিধি বিঘর্ষণৈঃ। ভূপস্য প্রকৃষে র্ব্বন্ধশ্চমূঃ যেপ্যন্তর-স্থানি, বশীমল্ল কাপালিকমূর্ত্তিঃ যুদ্ধবিবক্ষা ক্ষমাবল ক্ষত্র প্রবুদ্ধৈঃ। ব্রহ্মণ্যধট্ কর্ম্মনিষ্ঠঃ স সুশীলঃ বিদ্বান্ বল্লক্ষ লক্ষ ক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষ, যমাধিক কুঞ্জরসমঃ মত্ত ক্ষত্রঃ প্রাজ্ঞো যুদ্ধধর্ম্মেষু। বিশ্বদোড়েশ্বরঃ শ্রীক্রমপুরং প্রকর্ম্মা, যস্যাসীমচক্রে নিষ্কর লোকো রাজা সর্ব্বে প্রীতির্ব্বশস্বন্ধঃ ক্ষণৈ ধনৈঃ। দূরং যস্য সুলক্ষ্যং যেনাসৌ কাশীরাজ্ঞঃ সমরেষ্বপি লিপ্সা রাজ্যবিধিক্ষর ধ্বংসে। ভীমসংগ্রাম সন্ধান স্তীক্ষ্ণৈস্ত। ভূশূরঃ প্রজ্ঞঃ কজ্ঞঃ প্রাণৈঃসমৈধ র্ম্মৈঃ প্রাণিণাংস্বকৈম নৈত্রধর্ম্মং রক্ষতি, প্রাজ্ঞসনে

বিক্রমপুরে বসন্ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে। ঐশ্বর্য্যং যস্যাসি সম্পাত্তি-র্ব্বধো নৃত্তুষ্ঠো ঋদ্ধিবর্ম্মো ক্ষুধাব্রুবঃ, শঙ্খংতকৃত্রিমূর্ত্তি শ্চরিযুগ্ধর্ম্মো বিধিঃ প্রজাপতিঃ। গুণ সিন্ধুক্রিয়া শার্দ্দূল স্ত্রিসন্ধ্যারাধাম ব্রহ্মকবচং বিজ্ঞ ধীর সুব্রাহ্মণ সুশিষ্য বৃন্দৈ ক্ষত্রবলাভিষিক্তঃ। বন্ধুর্ব্রহ্ম বৈরীঞ্চ ঘস্রঃ যো ব্রাহ্মণানাঞ্চ সুরি নিয়ন্তা, মহোপম নবধা কুল সম্বন্ধি বিষয়াচার বিনয়-কাদি ধর্ম্মঃ। লক্ষ্য সুখী লক্ষান্তরে লক্ষ্যং স্থাপ্য মবধি, সধর্ম্ম সুলক্ষ্যৈ যং স্তীক্ষ্ণ চক্ষুষা লক্ষ্মণোযধীজ্ঞো লক্ষ্যজ্ঞশ্চ ক্ষজ্ঞঃ। উর্ব্বীশঃ সুশাসকঃ সূক্ষ্মধীঃ সুশিক্ষঃ সুবিজ্ঞঃ সুযশস্বী ধর্ম্মবংশো ব্রহ্মকর্ম্মাস্বী ক্ষমালক্ষ্মী যুক্তো অশেষ প্রজ্ঞঃ। পরম সুধীর স্ত্রিসন্ধ্যাং ব্রহ্মকবচং ব্রহ্মগায়ত্রী মুপাসতে ব্রহ্মধৃতিঃ সুধন্যো অশেষ সুধী ব্রাহ্মণানাঞ্চ সঙ্ঘঃ। ঔষধ ধী স্বামী স্বধর্ম্ম পুষ্টকশস্ত্রঃ লক্ষ্যধীঃ কুর্য্যাদ্ধর্ম্মমূলং, ব্রহ্মণ্য কুলঞ্চ বল্লালস্য সুতো লক্ষ্মণ ধীরঃ। ব্রহ্মণ্যষট্‌ কর্ম্মবৃত্তিঃ সুখ্যাতি যনদ্যুতিঃ ক্ষমাবৃত্তিঃ, ক্ষধর্ম্ম ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম প্রযুক্তঃ সকল কল্যাণ হেতুঃ। শুদ্ধ সন্ধঃ বীরব্রতঃ রক্ষি-সৈন্যস্য রক্ষাকর্ম্ম বিধি নিযুক্ত ক্ষমঃ, রক্ষজ্ঞঃ স্বীয় কর্ম্মজ্ঞতা সুকাম যশঃ সম্বন্ধঃ। শুদ্ধনীতিজ্ঞঃ বসুব্রহ্মজ্ঞঃ ধর্ম্মসুখী কর্ম্মসুখী সর্ব্ব কর্ম্মেষু সুবিজ্ঞঃ, বরিষ্ঠ ক্ষসাধুঃ কেলিবিকলী কৃতকর্ম্মা। নির্লিপ্তধীঃ ব্রাহ্মধর্ম্মেষু তদ্ধন্যৈকঃ সম্বন্ধঃ ধর্ম্ম-ব্রহ্ম বিবিধজ্ঞঃ, ব্রহ্মমণ্ডলৈকশ্চক্রবর্ত্তী গৌড়েশ্বরো যশঃ সিন্ধুঃ। লক্ষ্মীশো বসুনাথো বিষয়সত্তমো ভূশূরো রঘু শ্রী লক্ষ্মোণো নিরাজ. শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেনঃ সেনস্য যো বিজয়ী লক্ষ সমুদ্রঃ। রসজ্ঞ ক্ষুধা ধরাসুরামঃ বিশালাক্ষো বর্ণ সংসক্ত শ্মশ্রুঃ, বিজ্ঞমুখাঃ স সুধীবরোসি ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম ধ্যক্ষঃ সত্যসন্ধঃ প্রবিশ্য বিক্রমপুরং সেনাপতিভির্দনৈর্ব্বাধিকৃতং স্বপুরং, লক্ষ্মণ ধন্যো বিক্রম সিদ্ধর্যজুষি কাম যজ্ঞেষতীব প্রবৃত্তঃ। ধর্ম্মজ্ঞস্য ঋক্‌কর্ম্মশাসী বসতি মংস্য বনেষু, দৌঃসাধিক দোষেষু অরণৈক মোষকো বসোর্ম্মধো ধার্ষ্ট্যঃ। তংবিধ্বংসৈ ক্ষাসৃষ্টকো যৌদ্ধিকো যন্ন শংসো নৈকষ গুণীয়কো, বিবর প্রাসী দক্ষাশ্চ সকল রাজস্য সেনা নিযুক্তাঃ। ক্ষব্রাহ্মণয়ো ক্ষপ্রবীরোক্তানি শাসিতৈঃক্ষমবপুঃ, সুযজ্ঞ স্যাম লক্ষ্মণ জপান্ ক্ষিপ্রকরান্ ব্রাহ্মণঃ সুবিজ্ঞঃ। ব্রাহ্মণৈস্তবান্ জপাংশ্রমাদ্‌ঘ্নন্তি রোধয়ন্তি সমাধিয়ন্তে, ব্রহ্মতম স্বভাবৈঃ ক্ষমন্তি জপাশিষ্যৈ গুরুশ্চ বপুজ্ঞঃ। তং ব্রহ্মশান্তি বরৈরাক্রান্তং যুদ্ধবৃত্তৈ রাবদ্ধবধেধিক্ষ্যামঃ, পূর্ব্বে বপুশাসা যাপকাঃ পশ্চীম ভূঃ সীমান্তাঃ। চন্দ্রকোণঃ বিরাট * নগরো উত্তর ভূঃ সীমা, পশ্চিমে সপ্তক্ষীরা যাসুকঃ, পূর্ব্ব ভূঃ সীমা উত্তরৈঃ সর্ব্বং তারাসো অগ্রসয়ো দক্ষিণ ভূঃ সীমা। উক্ত চতুঃসীমা বচ্ছিন্নঃ কাননাশেষ বিধ সুরাজ্যং শ্রীমাধব ব্রাহ্মণ পাল্যভূরস্ত। সবৃক্ষ ফলবতী ঋত্বিগার্থিকাভূঃ ঋত্বিগ্ গণৈঃ কর্ম্মৈঃ কৃত সর্ব্বজ্ঞ বনকর ঋত্বিকার্যৈঃ স্বস্তীশ্বরাণামৃক্‌কর্ম্ম সুসম্পাদনার্থং। ঘুড়াকা পাষাণিয়া যাসুক ভূয়া উদ্দিযুম নঙ্গপিল ভূশ্বর স্নযব সাধু বাকলা বেতিল ভূশয়ঞ্চ। ধৈর্য্যশীলঃ কর্ম্মশীলো বিজ্ঞো ধর্ম্মক্ষমাদ্যৈ স্তুষ্টঃ শুদ্ধংসঃ, প্রাজ্ঞোবিশুদ্ধ ক্ষিতিজ্ঞঃ সুশ্রাদ্ধ তর্পণ শান্তিজ্ঞো-বিষয়ধ্বাস্ত ক্ষয়জ্ঞঃ। বিষয়েষু বিজ্ঞো মুখ্যো র্যপশৈস্ত যুক্ত স্বৈয়ে রধ্যাত্মসিদ্ধায় শ্রীসর্ব্বেশ্বর দেব শর্ম্মণঃ পুত্রায় কৌশিকায় কৌথুমশাখায়ৈ বিশ্বামিত্রাপ্নুবদ্ যমদগ্নি-প্রবরায় ধর্ম্মশীল যশোদার্য্য শীলায় উপাধ্যায়িনে পাল্য ঋত্বিকে শ্রীমন্মাধব দেবশর্ম্মণে স্বস্তি ধর্ম্ম নির্ব্বন্ধৈর্ব্বর্ষ শক পূর্ব্বকং ভূর্দত্তা রবি মন্দরঙ্গসংজ্ঞকে শকাব্দামিতে। ধৈর্য্যশীলো ব্রাহ্মণশ্চ পুণ্যবান্ সদ্ভির্ব্বিবদ্ধার্ণবঃ পৃথিবীশ্বরাস্পষ্টসঙ্গো ক্ষত্রপর্ব্বলাভিষেকশ্চ। কর্ম্মজ্ঞা শুদ্ধাবৈদ্যা মহাপ্রাজ্ঞা ক্ষত্র ব্রহ্মবুধৈ র্ধীর কবি জয়দেব ধোয়িকাদি বীর ব্রহ্মক্ষত্রিয়ৈঃ প্রসিদ্ধঃ। ত্রৈলোক্যবশী ব্রহ্মমিব, ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ হিংস্রং হিংসাং কুর্য্যাং বৈধ হিংসাদিভিঃ যজ্ঞৈঃ প্রজাণাং মঙ্গলঞ্চ। করোতি আবিষ্ক্রিয়াং ধনংমহি বিজয় পুরীঞ্চ বিকরণ, লক্ষ্মণাবতীং যশোরেখাং। ধর্ম্ম গৌরব বর্দ্ধনকারী দ্বিজ ব্রাহ্মণানাং বিশ্বভুবনে লক্ষ্মণসেন রিহার্জ্জুনো, অর্জ্জুনস্য সমঃশস্ত্রেষু শিক্ষা, শীঘ্র কর্ম্মা মেঘ সমঃ, পীযূষ সমংবাক্যং, বিক্রম দক্ষঃ। ক্ষীরাম্বিকূল জয়কারী সুক্ষমণিঃ সুবঙ্গাধীপো বীর বিশেষো বীর তেজস্বী সুন্দরঃ সুবুদ্ধি লক্ষ্মণ সেনকো দেবশর্ম্মা সুব্রাহ্মণ নং শ্রীকৃষ্ণং সুস্মৃত্য পূজার্চ্চিন্তে সবিতুঃ পূজন পূর্ব্বকং বিস্মৃত্য স্বস্তি শ্রীবিষ্ণুং ওঁ হ্রীং ব্রহ্মণে নমঃ। বিষ্ণু বিষ্ণুঃ বিশ্বমূর্ত্তি স্ত্রিমূর্ত্তি উপরিতনঃ সহস্র শীর্ষঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষো সহস্রপাং খ ভূমি সন্নিধিং শান্তিঃ সাক্ষী শাস্তা। সুকর্ম্মা ব্রহ্মশক্তি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণো বৈদ্যবর্ণো বৈদ্যবৃত্ত্যা ক্ষত্রিয় ব্রহ্মবৃত্তি ধর্ম্ম সাক্ষী ব্রহ্মেশ্বরঃ স্বমিত্র ব্রহ্মবিদাং আশ্রয়ঃ স্বধর্ম্ম ক্ষত্রিয় ধর্ম্মজ্ঞো ব্রাহ্মণৈর্ব্রাহ্ম সন্ন্যাস ধর্ম্মৌষধৈ স্ত্রৈলোক্য লক্ষ্মীযুক্তঃ ধর্ম্মরাজ রাম রাঘব তুল্যো অশেষ বিজয় লক্ষ্মী ব্রাহ্মণানাং কুলীন বন্ধু নিবাসঃ স্বধর্ম্ম-সেব বিপ্রাণাঞ্চ লক্ষ্মণো ব্রাহ্মণঃ॥

পাঠোদ্ধারক

শ্রীগোপীচন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরাজ।

সিরাজগঞ্জ, পাবনা।

বঙ্গানুবাদ।

সুহ্ম নামক দেশে, অম্বষ্ঠ নামক ব্রাহ্মণবংশে শ্রীধল সেন নামে, নৃপতিগণের ভূষণস্বরূপ, পঞ্চানন সদৃশ পূজ্য এক রাজা ছিলেন। যাঁহার শরীর ও অঙ্গুলি সকল সুন্দর, শ্বেতপদ্মের বর্ণবিশিষ্ট ছিল। যাঁহার গভীর ধ্বনি সমুদ্রের অপর পারে এবং যাঁহার সুযশঃ অতিথিরূপে দুগ্ধসমুদ্রের অপর তীরে উপনীত হইত। যিনি নানা রত্নে বিভূষিত, মহা মহা ক্ষত্রিয় যোদ্ধাগণে বেষ্টিত ও আয়ুর্ব্বেদবেত্তাগণের একান্ত সহায় ছিলেন। এবং যিনি যজুর্ব্বেদকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

* তাম্রশাসনে বিরাট স্পষ্ট পাঠ আছে।

তাঁহার বংশে নরপতি মন্মথ সেনের জন্ম হয়। তিনি পৃথিবীর অলঙ্কার ও সুহ্ম দেশের মণিস্বরূপ ছিলেন। মন্মথ সেন মত্তবৃষের ন্যায় একাকী ঝম্ ঝম্ শব্দে প্রীতির সহিত ক্ষীর সমুদ্রে পতিত হইতেন এবং তিনি একান্ত সৎকার্য্যাভিলাষী রাজা ছিলেন। মন্মথ সেনের বংশে প্রদ্যুম্ন সেন জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সৎকার্য্যের সমুদ্র, বিশুদ্ধধর্ম্মা ও একান্ত নীতিপরায়ণ রাজা ছিলেন। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, সহিষ্ণু, ক্ষমা ও ক্রমশীল রাজা প্রদ্যুম্ন সেন, স্বীয় সম্পত্তির পুষ্টি সাধন ও যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মের দ্বারা নিতান্ত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

প্রদ্যুম্ন সেনের পুত্র নৃপতিশ্রেষ্ঠ বীর সেন, অশেষ গুণের আধার ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণের সহিত বাস করিতেন। তাঁহার গুণরাশি পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘোষিত হইয়াছিল। তিনি একান্ত শত্রু-হন্তা ছিলেন। বীর সেনের অপর নাম ধৃতি ও ধীর সেন। তাঁহার পুত্র সামন্ত সেন, তিনি নিতান্ত জ্ঞানবান্ সত্যপ্রতিজ্ঞ, সৎক্রিয়াশীল ও কলঙ্কবিহীন রাজা ছিলেন। সামন্ত সেন পৃথিবীকে বীরশূন্য করত শান্তিরূপ জলের দ্বারা ধৌত করিয়া স্বীয় অধীনস্থ করিয়াছিলেন। তিনি সূর্য্যাস্তের পরেও অনায়াসে লক্ষ্য বিদ্ধ (শিকার) করিতেন। তিনি রাত্রিতে রুধিরকণাকীর্ণ ধারবিশিষ্ট তরবারি গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করত বীরগণের অন্বেষণ করিতেন। সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন শত্রুগণের ঊর্দ্ধ-বিক্ষিপ্ত শল্যাস্ত্র স্বীয় শল্যাস্ত্র দ্বারা বিনষ্ট করত আপনাকে এবং সেনাগণকে মৃত্যু-মুখ হইতে রক্ষা করিতেন। হেমন্ত সেন মগধে বাস করিয়া বসুমতী ভোগ করিয়াছিলেন।

হেমন্ত সেনের ঔরসে নরপতি বিজয় সেন জন্ম গ্রহণ করেন। বিজয় সেনের তুল্য বীর পৃথিবীতে কেহই ছিলেন না। বিজয় সেন চন্দ্রের ন্যায় যশোবান্ ছিলেন। তাঁহার মস্তকে মণি চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় শোভা পাইত। সংগ্রাম সমুদ্রে তিনি ভীষণধ্বনি, বৃহস্পতিতুল্য বুদ্ধি, ইন্দ্র তুল্য অস্ত্র শিক্ষা ইত্যাদি অশেষ প্রকার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় প্রদান এবং সৎলোকের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেন। বিজয় সেন বিধি-পোষণ-বশদিগের, ঈশ্বর সুকৃতি ও সুধীগণের সত্যস্বরূপ ছিলেন। শিক্ষা, সন্ধ্যা ও ক্ষমাশীল বিজয় সেন সর্ব্বদা সত্য কথা বলিতেন ও তদীয় পূর্ব্ব পুরুষ নিতান্ত ক্রিয়াশীল রাজা প্রদ্যুম্ন সেনের অক্ষৌণীনাম যশঃসমুদয়কে সর্ব্বদা স্মরণ করিতেন।

বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন। যিনি লব্ধলক্ষ্য, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিশিষ্ট ও সকলের জ্ঞানদাতা ছিলেন। বল্লাল সেন স্বীয় রাজধানীতে থাকিয়া সর্ব্বদা যজ্ঞাদি সৎকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার অম্বরতুল্য বীরত্ব যশঃ ক্ষীরসমুদ্র তীরবর্ত্তী যোদ্ধগণেরও বীরত্বে বিঘ্ন উৎপাদন করিত। ধর্ম্মকার্য্যের অধীন তীর্থ-বিশ্বাসিব্যক্তিগণের তিনি ভূষণতুল্য ছিলেন। নরপতি বল্লালের শরীর অসুর বিনাশের একান্ত উপযুক্ত ছিল। তিনি নীচ জাতি, ক্ষুদ্র পাপিগণের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার যশঃ ও বল নূতন।

তিনি যজ্ঞ বৃত্তিতে সুরাসুর বিষ্ণুতুল্য ও উচ্চধর্ম্মা ছিলেন এবং যুদ্ধে নিশ্চয় জয়লাভ করিতেন। শুদ্ধ, শান্ত, সুশীল, ক্ষমা, দক্ষতা, যুদ্ধক্ষমতা, যুদ্ধবিধি প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিষর্বণের দ্বারা তিনি সর্ব্বদা পৃথিবীর হিত ও উজ্জ্বল কুল সাধনে একান্ত যত্নবান্ ছিলেন। তাঁহার ক্রোধ এবং নিতান্ত যুদ্ধ প্রবৃত্তির দ্বারা দূরস্থ শত্রু সৈন্যগণও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিত এবং যজ্ঞাদি ক্ষমাবল ও ক্ষত্রি-য়োচিত বিচক্ষণতা হইতে কাপালিক মূর্ত্তি মল্ল (এক প্রকার-শৈব ধর্ম্মাবলম্বীর শ্রেণীবিশেষ) গণও তাঁহার একান্ত অনুগত ছিল। রাজা বল্লাল সেন নিতান্ত সুশীল ও ব্রহ্মণ্যষট্‌কর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার লক্ষ বিদ্বান্ মত্ত কুঞ্জর সম, যম তুল্যযুদ্ধ ধর্ম্মে প্রাজ্ঞ ক্ষত্রিয় সৈন্যাধ্যক্ষ ছিল। গৌড়েশ্বর বল্লাল, স্বীয় রাজত্বের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, সুবিধান স্থাপন ও সুন্দর ভবনাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে পৃথিবীর অন্যান্য রাজাদিগের হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার অসীম চক্রে কলঙ্কবিহীন নৃপতিগণও ক্ষণকালের মধ্যে প্রীতির সহিত করপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহার বশ্যতা-স্বীকার করিতেন। তাঁহার লক্ষ্য দূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত গমন করিত। তিনি ভীম সংগ্রাম ও তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান দ্বারা কাশীরাজের সমর সাধ এবং রাজ্য সাশনাদি ক্ষমতার ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনি পৃথিবীর মধ্যে বীর জ্ঞানবান্, ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন। বিক্রমপুরে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের সঙ্গে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে অবস্থিতি করিয়া তিনি স্বীয় মন্ত্র, ধর্ম্ম দ্বারা প্রাণতুল্য জ্ঞানে প্রাণিগণকে ধর্ম্মে রক্ষা করিতেন। তিনি এক মাত্র অসিকেই তাঁহার ঐশ্বর্য্য, দুর্ব্বৃত্তদিগকে বধ করাকেই সম্পত্তি, ধর্ম্মকে উন্নতি, সত্যকে সুধা মনে করিতেন। তাঁহার শঙ্খদেশ (কপাল) ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের মূর্ত্তিবিশিষ্ট ছিল। তিনি ধর্ম্মে সূর্য্য ও বিধিতে প্রজাপতি তুল্য ছিলেন। গুণসাগর ক্রিয়াশীল বল্লাল সেন বিজ্ঞ, ধীর, সুব্রাহ্মণ সুশিষ্যগণের সহিত মিলিত ও ক্ষত্রিয়বলাভিষিক্ত হইয়া ত্রিসন্ধ্যা ব্রহ্ম কবচ আরাধনা করিতেন। তিনি বন্ধু ও ব্রাহ্মণগণের শত্রুদিগকে সর্ব্বদা বধ করিতেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেণীর ও মহোপম আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ দর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি, তপঃ এবং দান প্রভৃতি নবগুণ সম্পন্ন কুলাচারের আদি নিয়ন্তা।

বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনও লক্ষ্য কার্য্যে নিতান্ত সুখী হন। বিদ্ধ করিবার উপযুক্ত জন্তু বহু দূরে থাকি-তেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা তাহাকে বধ করেন। তিনি বীর এবং ঔষধিজ্ঞ (চিকিৎসক)। তিনি সহজেই লক্ষ্য কার্য্য ও ক্ষত্রিয়দিগের সমুদয় কার্য্য বুঝিতে সক্ষম। রাজা লক্ষ্মণ সেন সুশাসক, সূক্ষ্মধী, সুশীল, বিজ্ঞ, সুযশস্বী ও ধর্ম্মের

নিতান্ত অধীন ; ব্রহ্ম ধর্ম্মোন্নিত ক্ষমা ও লক্ষ্মীযুক্ত এবং অশেষ প্রজ্ঞাবান্। তিনি পরম সুধীর, ত্রিসন্ধ্যা ব্রহ্ম কবচ, ব্রহ্মগায়ত্রী আরাধনা করেন। ব্রহ্ম ধৃতি সম্পন্ন অতিশয় ধার্ম্মিক অসংখ্য সুধী ব্রাহ্মণ সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে অবস্থিতি করেন। স্বধর্ম্মপুষ্টক বৈদ্যগণের তিনি চক্ষুস্বরূপ। তিনি সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের মূল যে কুল, বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহারই উৎকর্ষ সাধন করিতেন। তাঁহার সুখ্যাতি ঘনদ্যুতিবিশিষ্ট একমাত্র ক্ষমাই তাঁহার বৃত্তি। তিনি ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণধর্ম্ম প্রযুক্ত এবং সকল প্রকার মঙ্গলের হেতুস্বরূপ। রাজা লক্ষ্মণ সেন শুদ্ধপ্রতিজ্ঞ, একমাত্র বীরত্বই তাঁহার ব্রত। রক্ষক সৈন্যদিগের রক্ষা কার্য্যের সুব্যবস্থা করিতে তিনি বিলক্ষণ পটু এবং কি প্রকারে রাজ্য রক্ষা করিতে হয়, তাহাতেও তাঁহার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা আছে। তাঁহার নিজের কার্য্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ মনোযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। সুনাম ও যশের সহিত তাঁহার নিতান্ত ঘনিষ্ঠতা। তিনি বিশুদ্ধ নীতিজ্ঞ বসু (১) ও ব্রহ্মজ্ঞ। ধর্ম্ম কার্য্যাদিতে তিনি বিলক্ষণ সুখী হন। লক্ষ্মণ সেন সকল কার্য্যেই সুবিজ্ঞ। তিনি ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের হইতে শ্রেষ্ঠ সাধু, কেলিবিহ্বল ও কৃতকর্ম্মা। তিনি নির্লিপ্ত বুদ্ধি, একমাত্র ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের সহিতই তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি ধর্ম্ম ব্রহ্ম প্রভৃতি সমুদয় বিদিত। গৌড়েশ্বর যশঃসিন্ধু লক্ষ্মণ সেন ব্রাহ্মণমণ্ডলীর একমাত্র চক্রবর্ত্তিস্বরূপ। মহাবীর লক্ষ্মণ রঘুবংশীয় লক্ষ্মণের ন্যায় সম্প্রতি ভূতলে বিরাজমান। তিনি রসজ্ঞদিগের ক্ষুধাস্বরূপ, পৃথিবীতে রামচন্দ্র তুল্য। তাঁহার চক্ষু বিশাল এবং শ্মশ্রু (দাড়ি গোঁপ) সকল বাণ সংযুক্ত অর্থাৎ তীরের ন্যায়। লক্ষ্মণ সেন পণ্ডিত ও সুধী শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের অধ্যক্ষ, সত্যপ্রতিজ্ঞ। সম্প্রতি তিনি বিক্রমপুরে গমন করত, মত্ত পরাক্রমশালী সৈন্যগণের দ্বারা স্বীয় পিতৃরাজধানীকে অধিকার করিয়া মহাসমারোহের সহিত যজুর্ব্বেদোক্ত যজ্ঞাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ধর্ম্মজ্ঞ নৃপতি লক্ষ্মণ সেনের পুরোহিতের নিবাস মৎস্যবনে। দ্বারপালগণের দোষে সেই বনের এক জন তস্কর পৃথিবীর মধ্যে অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠে। তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য নৃশংস রাবণগুণসম্পন্ন, বিষয় প্রয়াসী, দক্ষ, সুযোদ্ধা ক্ষত্রিয় ও অম্বষ্ঠ সৈন্যগণ নিযুক্ত হয়। ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে ক্ষত্রিয়ই বীরশ্রেষ্ঠ, পৃথিবী শাসনের উপযুক্ত শরীরবিশিষ্ট। জপ, যজ্ঞ, ন্যাস লক্ষণাদিতে ব্রাহ্মণ শীঘ্রহস্ত ও সুবিজ্ঞ। ইষ্টবান ব্রাহ্মণেরা জপশ্রম দ্বারা দুর্ব্বৃত্তদিগকে হত, ধৃত ও আবদ্ধ করিয়া থাকেন এবং ব্রহ্মতন স্বভাব দ্বারা দয়া বশতঃ কোন কোন সময়ে দুর্ব্বৃত্তগণকে ক্ষমা করেন। বপুজ্ঞ ব্রাহ্মণ জপ ও আশীর্ব্বাদ দ্বারা সকলেরই গুরু। সেই চৌর রাজপুরোহিতের জপশ্রম দ্বারা প্রথমে আক্রান্ত হইয়া তৎপরে যুদ্ধে আবদ্ধ ও হত হয়, ইহা যুদ্ধস্থানের পশ্চিমসীমান্তবাসী সমুদয় যোদ্ধা ও জাপকগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

অতএব চন্দ্রকোণ বিরাটনগর যাহার উত্তর সীমা, যে ভূভাগের পশ্চিমে সপ্তক্ষীরা, যাম্বুক, চন্দ্রকোণ ও বিরাটনগরই যাহার পূর্ব্ব সীমা, তারাস, অগ্রসর যে ভূমির দক্ষিণ সীমা, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন কানন, অশেষবিধ সজল স্থল ভূমি শ্রীমাধব (২) ব্রাহ্মণের পাল্যভূমি হইল। মহারাজের ঋক্‌কর্ম্ম অর্থাৎ পৌরোহিত্য কার্য্য সম্পাদনার্থ সকল প্রকার পৌরোহিত্য কার্য্যের দক্ষিণাস্বরূপ ঋত্বিক্ ঋষির সম্বন্ধে ঋত্বিগার্থিক ভূমি বলিয়া স্বীকৃত হইল। ঘুড়াকা পাষাণিকা, যাম্বুক, ভূষা, উধিযুষ, চাঙ্গধূপিল, ভূশ্বর, ক্ষযব, সাধুবাকলা, বেতিল ও ভূশয় প্রভৃতি গ্রাম, ধৈর্য্যশীল কর্ম্মশীল, বিজ্ঞ, ধর্ম্ম ও ক্ষমাদিতে তুষ্ট, কুশলী, প্রাজ্ঞ, বিশুদ্ধ, ক্ষিতিজ্ঞ, সুশ্রাদ্ধতর্পণ ও শ্রুতিজ্ঞ, বিষয়-মোহান্ধকারের ক্ষয়কারক, বিষয় কার্য্যে বিজ্ঞ, প্রধান, জপ যজ্ঞাদি যুক্ত, অধ্যাত্মসিদ্ধ শ্রীসর্ব্বেশ্বর দেব শর্ম্মার পুত্র, কৌশিকগোত্র, কৌথুম শাখানুধ্যায়ী, বিশ্বামিত্র আপ্নুবৎ ও যমদগ্নি প্রবর শ্রীমন্ মাধব দেব শর্ম্মাকে ধর্ম্ম নির্ব্বন্ধ দ্বারা বর্ষ শক ও স্বস্তি (অর্থাৎ স্বীকৃত বাক্য) উচ্চারণপূর্ব্বক প্রদত্ত হইল।

ধৈর্য্যশীল, পুণ্যবান্ সৎলোকের দ্বারা বিবর্দ্ধিত অর্ণব সদৃশ, অম্বষ্ঠসংজ্ঞক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অভিষেক ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় শরীর, বলাদিযুক্ত, কর্ম্মলব্ধ, মহাপ্রাজ্ঞ বৈদ্যগণের ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণের এবং ধীর কবি জয়দেব ধোয়িকাদি বীর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণের সহিত বিখ্যাত ব্রহ্মের তুল্য ত্রৈলোক্য-বিমুগ্ধকারক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতির হিংসকের প্রতিহিংসক, যজ্ঞাদি দ্বারা প্রজাগণের মঙ্গলকারক, যশের রেখাস্বরূপ লক্ষণাবতী নাম্নী নগরীর নির্ম্মাতা ও তাহাতে নানাবিধ ধনরত্নের আবিষ্কারকর্ত্তা; ধর্ম্ম, দ্বিজ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির গৌরব-বর্দ্ধনকারী, পৃথিবীতে অর্জ্জুনতুল্য, অর্জ্জুনের ন্যায় যোদ্ধা, মেঘের ন্যায় শীঘ্রকর্ম্মা, অমৃতভাষী, বিক্রমদক্ষ, ক্ষীরসমুদ্রতীর বিজয়ী, সুহ্মদেশের মণি, সুবঙ্গের অধিপতি, বীরতেজবিশিষ্ট, বীরশ্রেষ্ঠ, সুন্দর সুবুদ্ধিযুক্ত, শ্রীলক্ষ্মণ সেন দেব শর্ম্মা সুব্রাহ্মণ, শ্রীকৃষ্ণ ও স্বস্তি স্মরণ করত, সূর্য্যদেবের পূজাপূর্ব্বক বিষ্ণুকে পূজা করিলেন ওঁ হ্রীঁ ব্রহ্মকে নমস্কার। উপরিতন অর্থাৎ এই তাম্র শাসনের শীর্ষস্থ বিশ্বমূর্ত্তি ত্রিমূর্ত্তি বিষ্ণু, যিনি সহস্র মস্তক, সহস্রচক্ষু, সহস্র বাহু, সহস্রপদবিশিষ্ট, যিনি আকাশ, পৃথিবী প্রভৃতি সর্ব্বত্র শান্তি, সাক্ষী ও শাস্তারূপে বিরাজমান রহিয়াছেন, তিনিই এই দান সম্বন্ধে শান্তি সাক্ষী ও শাস্তাস্বরূপ।

(১) ধব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাত, ইহাদিগকে বসু বলে।

(২) এই মাধব ব্রাহ্মণ হইতে বোধ হয় দত্ত ভূমির নাম মাধবনগর হইয়াছিল এবং তাহা হইতে কালে মাধাইনগর হইয়াছে।

সুকর্ম্মা, ব্রহ্মশক্তিযুক্ত, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, বৈদ্যবৃত্তি দ্বারা বৈদ্যবর্ণ, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের বৃত্তি ও ধর্ম্মের সাক্ষী, ব্রহ্মদেশের ঈশ্বর, স্বমিত্র ও ব্রহ্মবিদ্গণের আশ্রয়, স্বধর্ম্ম ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্মজ্ঞ, ব্রহ্মসন্ন্যাস ধর্ম্ম ও ঔষধ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণের সহিত বর্ত্তমান, ত্রৈলোক্যের লক্ষ্মীযুক্ত, যুধিষ্ঠির ও রামচন্দ্রের তুল্য অশেষবিজয়লক্ষ্মী, ব্রাহ্মণ কুলীন বন্ধুগণের ও স্বধর্ম্ম, দেবতা, বেদজ্ঞগণের আশ্রয় এই লক্ষ্মণ ব্রাহ্মণ।

শ্রীদুর্গানাথ শর্ম্মা।

মাধাইনগরের তাম্রশাসন।

পাবনা জেলায় সিরাজগঞ্জ মহকুমায় রায়গঞ্জ থানায় মাধাইনগর। রঘুনাথ সিংহ নামে এক বুনো ঐ গ্রামে মাটীর ভিতর এক খানি তাম্রশাসন বা তাম্রলিপিস্থ দানপত্র প্রাপ্ত হয়। ঐ তাম্রফলকে দাতা লক্ষ্মণ সেনের বংশকীর্ত্তন আছে, বংশের শৌর্য্যবীর্য্যাদির কথা আছে, লক্ষ্মণ সেনেরও গুণগান আছে। মাধাইনগর নিমগাছীর জঙ্গলের অন্তর্গত। নিমগাছীতে বিরাট রাজার রাজধানী ছিল। এখনও ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখা যায়। ঐ তাম্র ফলকে বিষ্ণু, শিব ও দশভূজার প্রতিকৃতি আছে। সিরাজগঞ্জের উকিল শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ তালুকদার দেবশর্ম্মা রঘুনাথ সিংহের কাছে তাম্রশাসন লইয়া কবিরাজ গোপীচন্দ্র সেনকে দেন। তিনি তাম্রলিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। উকিল মহাশয় উহার বঙ্গানুবাদ ও ইংরেজি অনুবাদ করিয়াছেন। মুদ্রণ ও প্রচার হইয়াছে, আমরা মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ পাইয়াছি। ইংরেজি অনুবাদ বোধ হয় স্বতন্ত্র মুদ্রিত হইয়াছে, বাঙ্গালা পত্রের সম্পাদক বলিয়াই বোধ হয় আমরা ইংরেজি পাই নাই। পাঠোদ্ধারে কবিরাজ মহাশয় যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন তাম্রশাসনাদির আলোচনায় ও উদ্ধারে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল না। আজ কাল এই চর্চ্চাকে একটা স্বতন্ত্র বিদ্যা বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই বিদ্যার স্বতন্ত্র অধ্যয়ন অধ্যাপনা হইতেছে। গবর্ণমেণ্টকে এ জন্যে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত এবং ব্যয়ভূষণ করিতে হইতেছে। কবিরাজ মহাশয় যে, রীতিমত শিক্ষালাভ না করিয়াও, পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে প্রশংসার বিষয়। কিন্তু অনভ্যস্ত অশিক্ষিত কার্য্য বলিয়াই পাঠোদ্ধারে অনেক দোষ ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। লক্ষ্মণ সেনের বংশাদিকীর্ত্তনের সুতরাং অনেক অংশ বেশ সুসঙ্গত হয় নাই, অনেক স্থলে অর্থগ্রহ হয় নাই। বাঙ্গালা অনুবাদে আর সংস্কৃত মূলে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্র সমাঞ্জস্য হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। কবিরাজ মহাশয় নিজেই বলিতেছেন, তাম্রলিপির অক্ষরগুলা না দেবনাগর না বাঙ্গালা—মাঝামাঝি। দেবনাগরই বাঙ্গালাবর্ণমালায় পরিণত হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে হইয়াছে। লক্ষ্মণ সেনের আমলে বাঙ্গালা অক্ষরে নাগরী ভাবের কিছু অধিক ভাঁজ দেওয়া হইত। এখনও দেখিতে পাই, কোন কোন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের হস্তলিপি ঠিক আমাদের মত নহে; দেখিতে পাই, ইহাঁদের বাঙ্গালা অক্ষরেও যেন দেবনাগরের আঁচ আসে। প্রাচীন তাম্রশাসনাদির পাঠোদ্ধারে এ সকল লিপিক্রম শেখান হয়। শেখা থাকিলে কবিরাজ মহাশয়ের কষ্ট কম হইত, আর বোধ হয় উদ্ধার আরও ভাল হইত। যাহাই হউক, তিনি যাহা করিয়াছেন. তাহার জন্যেও ধন্যবাদভাজন। তাম্রলিপির দানপত্রে দেখিলাম, লক্ষ্মণ সেন অম্বষ্ঠবৈদ্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, চিকিৎসাবিৎ বলিয়াও কথিত হইয়াছেন। আবার একস্থানে লক্ষ্মণ সেন দেবশর্ম্মা সুব্রাহ্মণ, এরূপও দৃষ্ট হইল। ক্ষত্রিয়বৎ শৌর্য্যবীর্য্যের কথাও কথিত হইয়াছে। অনেকে হয় ত গোলযোগে পড়িবেন, কিন্তু বংশকীর্ত্তনে ও দানপত্রে "বৈদ্য" আখ্যানেরই প্রাধান্য দেখা গেল। সুতরাং ধরিতে হইবে, লক্ষ্মণ সেন জ্ঞানে ও আকারে ব্রাহ্মণ ছিলেন,শৌর্য্যে ক্ষত্রিয় ছিলেন ; কিন্তু জাত্যংশে অম্বষ্ঠ বৈদ্যই ছিলেন। তাম্রশাসন দেওয়া হইয়াছিল শ্রীমাধবচন্দ্র দেবশর্ম্মাকে, আর যে ভূমিখণ্ড ঐ দান পত্রে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাই বোধ হয় মাধবনগর হইয়াছিল। সেই মাধবনগরই তাহা হইলে এখনকার মাধাইনগর। দানপত্রে দেখা গেল, বল্লাল সেনের কথা আছে ; তিনি যে, লক্ষ্মণ সেনের পিতা ছিলেন, তাহাও উক্ত হইয়াছে। আর বিক্রমপুরেই যে, বল্লাল সেনের রাজধানী ছিল ; আর সমস্ত গৌড়ই যে, তাঁহার ও লক্ষ্মণ সেনেরও রাজ্য ছিল ; তাহাও কথিত হইয়াছে। কিন্তু বল্লালসেনের কাশীবিজয়ের কথাও আছে, আছে আরও অনেক কথা। তাম্রশাসনের আরও বিশুদ্ধ এবং সটীক পাঠ দেখিতে চাই। আর দানপত্রে যাঁহাদের কথা কথিত হইয়াছে, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও দেখিতে চাই। আশা করি, কোন প্রত্নকম্র পণ্ডিত ভার লইয়া আমাদিগকে তুষ্ট করিবেন। সেনরাজবংশের ইতিহাস বাঙ্গালির অবশ্য জ্ঞাতব্য। বঙ্গের বাঙ্গালি রাজার কথায় যে, বাঙ্গালির স্বাভাবিক অনুরাগ। সেননরপতিরা বৈদ্য বলিয়াই বিখ্যাত। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র যে, কি বুঝিয়া তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায় না। যদি শুদ্ধ "বর্ম্মা" দেখিয়া সেনরাজদিগকে ক্ষত্রিয় করিতে হয়, তাহা হইলে ত "শর্ম্মা" দেখিয়া তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ করা উচিত। এই তাম্রশাসনেই বর্ম্মা শর্ম্মা দ্বিবিধ উপাধিই দৃষ্ট হয়। আবার অম্বষ্ঠ বৈদ্য উপাধিরই প্রাধান্য শর্ম্মা শব্দে ব্রাহ্মণবৎ আচারনিষ্ঠ ও শাস্ত্রজ্ঞ এবং বর্ম্মা বলিতে ক্ষত্রিয়বৎ বীর ও রাজধর্ম্মা, ইহাই বুঝিতে হয়

বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রের ইতিহাস।

(দ্বাদশ প্রস্তাব)।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে চারিখানা "বার্ত্তাবহ" প্রচারিত হইয়াছিল। তাহাদের পরিচয়, পাঠকগণ পূর্ব্ববারে পাইয়াছেন। এইবার পর বর্ষের (১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের) কথা বলিতে হইবে। নিম্ন-তালিকায় তদ্বৃত্তান্ত বিবৃত করা গেল।

৪৩। ইবেঞ্জিলিষ্ট।

(১২৫৪ সাল—১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ।)

নাম দেখিয়াই ইহাকে পাদরি-পুঙ্গবদের পদার্থ বলিয়া চিনিয়া লইতে কিঞ্চিন্মাত্রও ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না। পাদরিরা, চিরকালই "নাছোড়বান্দা"। অধিক কাল "ইবেঞ্জিলিষ্টকে" মিশনরি সাহেবেরা বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন নাই। মিশনরিরা "ইবেঞ্জিলিষ্টের" অঙ্গ-রাগের ত্রুটি করেন নাই। বাঙ্গালা ও ইংরেজি—দুই ভাষাতেই ইহার শরীর সজ্জিত ও শোভিত হইত। কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল। নিয়তির নিদেশ অতিক্রম করিয়া নির্দ্দিষ্ট আয়ুর আধিক্য, দশ দিনের তরে বৃদ্ধি করিতেও, উদ্যোগকারকদের ক্ষমতায় কুলায় নাই।

৪৪। নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

(১২৫৩ সাল হইতে ১২৫৯ সাল অর্থাৎ
১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ)

পাদরিরা, নানা ছাঁদে কাঁদ পাতিয়া, তাহাতে নিরীহ বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানকে ধরিবার ফন্দীতে কতই না প্রয়াস পাইতেন! সুখের বিষয় এই যে, কখন কখন শাস্ত্র-পারঙ্গত হিন্দু পণ্ডিতগণ ও মুসলমান মোল্লা-মৌলবীগণ, তাঁহাদের ব্যগ্রতা ব্যর্থ করিতে প্রাণপণে প্রয়াস পাইতেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তাদৃশ শুভ চেষ্টার অভিনয় দেখিতে পাইতেছি।

পণ্ডিতপ্রবর নন্দকুমার কবিরত্নেরই প্রোৎসাহে এই "নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার" সৃষ্টি। তিনি স্বসমকালিক এক বিখ্যাত বিদ্বান্ লোক। অনেকানেক শাস্ত্র-গ্রন্থ এবং বিচার-পুস্তক তৎকর্ত্তৃক সঙ্কলিত, প্রণীত ও প্রচারিত হইত। তাঁহার নিবসতিভূমি "পাথুরিয়াঘাটায়" ছিল। তদ্বংশে এখন বোধ হয়, কেহই বাঁচিয়া নাই। উত্তরজীবী কোনও বংশীয় ব্যক্তিকে জীবিত পাইলে, তাঁহার সাহায্যে এই পণ্ডিতকুলতিলকের জীবনের ঘটনা, লোকের সমক্ষে উত্থাপিত করিতে পারিতাম। কিন্তু হায়! আমাদিগকে সে আশায় হতাশ্বাস হইতে হইয়াছে!

"নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা" পাক্ষিক পত্রিকা। উহার বার্ষিক দর্শনী ৩৲ তিনটী রজত-মুদ্রা বৈ আর কিছুই অতিরিক্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল না।

নামেই পত্রিকার প্রতিপাদ্য পদার্থ স্পষ্টীকৃত। হিন্দু-ধর্ম্মের মহত্ত্ব-প্রচারই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। সাকার উপাসনা—প্রতিমা-পূজা—এই পত্রিকায় সমর্থিত হইত।

১২৫৯ সালে নিরঞ্জন-নিকেতনে "নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার" মহাপ্রাণ মহাপ্রয়াণ করেন। সুতরাং বলিতে পারি, "নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার" সহায় "নিত্য" বিশেষণ বিলক্ষণ ব্যর্থ—নিতান্তই বিফল হইয়াছিল। অনিত্য সংসার, মানবও অনিত্য। অতএব অনিত্য মর্ত্তধামে অনিত্য মর্ত্ত্য মানবের কৃত পদার্থের নিত্যতা কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে, বল?

৪৫। দুর্জ্জন-দমন-মহানবমী।

(১২৫৩ সাল ১৫ই জ্যৈষ্ঠ। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ)

"দুর্জ্জন-দমন-মহানবমী" মথুরানাথ গুহ ও ঠাকুরদাস বসু এই যুগল জনকের সন্ততি। সূতিকাগার—"চন্দ্রিকা-প্রেস"। শরীর-সৌষ্ঠব-কর্ত্তা (প্রিণ্টার)—"এ লরেন্স"। কর্ম্ম-ক্ষেত্র—গরাণহাটার রাজা গুরুদাসের ইষ্টীটে ৮নং ভবন।

ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বাদ-প্রতিবাদ—উত্তর-প্রত্যুত্তর—ইহার লক্ষ্য থাকে। চতুর্দ্দশ সংখ্যা হইতে 'সংবাদ' মুদ্রিত হয়।

দুই জন্মদাতার যত্নে ও বলে উৎপাদিত ও পরিপোষিত হইয়াও—"দুর্জ্জন-দমন-মহানবমী" দীর্ঘ জীবনে বঞ্চিত এবং অশক্ত হইয়াছিল, এটী নিশ্চয়ই অতিশয় পরিতাপের বিষয়।

এই "মহানবমীর" গলে এক ছড়া মালা দেখিয়াছি। সমাচার-দর্পণ * "সংবাদ-কৌমুদী" "সমাচার-চন্দ্রিকা" "সংবাদ-প্রভাকর" প্রভৃতির ন্যায় "দুর্জ্জন-দমন-মহানবমী", যে কবিতা-বল্লীতে কণ্ঠদেশ সুসজ্জিত করিয়াছিলেন, তাহা এই—

"ধর্ম্মবিহিংসকদ্বিপদপশূনাং,
কণ্ঠ-গলিত-রুধিরং স্পৃহয়ন্তী।
সম্প্রত্যুদয়বতীহ নগর্য্যাং,
শ্রীদুর্জ্জন-দমন-মহানবমী॥"

বাঙ্গালায় উহার তাৎপর্য্যার্থ বলিয়া দেওয়া আবশ্যক। ধর্ম্মদ্বেষ্টারা দ্বিপদ জন্তু। শ্রীমতী 'দুর্জ্জন-দমন-মহানবমী' ঐ ধর্ম্মদ্বেষীদিগের কণ্ঠনিঃসৃত রক্ত-পানে অভিলাষিণী হইয়া সম্প্রতি এই নগরীতে আবির্ভূতা হইলেন।

২রা আশ্বিনের (অর্থাৎ ১১শ সংখ্যার) পর হইতে পত্রিকার স্বত্বাধিকার-ভার, এক জনেরই উপর বর্ত্তিল। একমাত্র কলহের সূচনায় আশঙ্কিত হইয়া "গুহ" গুপ্ত

* "সমাচার-দর্পণের" ৭ম সংখ্যা হইতে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী মুদ্রিত হইত,—

"দর্পণে মুখসৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ।
বৃত্তান্তানীহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥"

হইলেন। তিনি বসুজকে পত্রিকার সর্ব্বাংশে অধিকারী করিয়া দিয়া নিঃসংস্রব হইলেন। ঠাকুরদাস—ঠাকুরের দাস। কিন্তু একাধীশ্বরত্ব-লাভের পর বসু ঠাকুরদাস বসু-দাস হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন, বিত্তের বিত্তের অর্জ্জন করিবেন। ধনোপার্জ্জনাশয়ে পরাক্রান্ত পশুরাজের সমধর্ম্মা হইলেন।

"মহানবমী", অনেকগুলি ঐতিহাসিক কথা মধ্যে মধ্যে কহিয়াছেন। ১৪ (চতুর্দ্দশ) ১৬ (ষোড়শ) ২১ (একবিংশ) ও ২২ (দ্বাবিংশ) সংখ্যা হইতে কতিপয় ঘটনা উদ্ধৃত করিলাম।

১। "জ্ঞানদর্পণ" ও "কাব্যরত্নাকর" এই পত্রিকা দুই খানির স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক—শ্রীযুক্ত উমাচরণ ভট্টাচার্য্য। তিনি বিশেষ করিয়াই জানাইয়াছেন—"ভারত ভট্টাচার্য্য" "কাব্যরত্নাকর" সম্পাদক বলিয়া প্রচার। তাহা কিন্তু অমূলক। উমাচরণ ভট্টাচার্য্যই প্রকৃত সম্পাদক। উমাচরণের "রাশিস্থ নাম" ভারত। দ্বিদ্বার গৃহের ন্যায় উমাচরণ ভট্টাচার্য্য ও ভারত ভট্টাচার্য্য, এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

২। "হিন্দুধর্ম্মচন্দ্রোদয়" নামক আর এক সমাচার পত্রের সমাচার, "মহানবমী" প্রদান করিলেন। উহার সম্পাদক হরিনারায়ণ গোস্বামী, তিনি পাদরিদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সমরে—বিচার ব্যাপারে—কিছু দিন লিপ্ত ছিলেন। ডফ সাহেব জিতিয়াছিলেন, কি এই গোসাঞি জয়ী হয়েন, তাহার স্থিরতা করা গেল না।

রাজা রামমোহন রায়, কবিপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "সংবাদ জ্ঞানদর্পণ" এবং "কাব্যরত্নাকর" পত্র-দ্বারায় সম্পাদক উমাচরণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির কেহই, "মহানবমীর" প্রবল আক্রমণ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। অনেককেই অশিষ্ট গালাগালি বর্ষণে ইহা পরিপ্লুত করিয়া দিয়াছিল।

"প্রভাকরের" ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়, দুই এক বার আক্রান্ত হইয়া "সংবাদ পত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" নামক প্রবন্ধে (১২৫৮ সালের ১লা বৈশাখ) ঐ গালাগালির প্রতিশোধ করেন। তাঁহার লেখার মর্ম্ম এই রূপ ছিল,

সম্পাদক ঠাকুরদাস বসুজ বাবু মহাশয়, এই "মহানবমীতে" সেকেলে 'নবমীর খেউড়' ধরিলেন। সুতরাং লোকে কেবল 'নবমীতে' "বমী" দেখিতেই লাগিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বাবু, ঐ লেখার ৬ বৎসরের পর যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা সময়োচিত হয় নাই। তিনি সজীব সিংহের সঙ্গে সমর করিয়া নিজ-বীরত্ব প্রমাণকৃত করেন নাই, মৃত মৃগেন্দ্রের উপর বার বার তীক্ষ্ণধার করবালের আঘাত করিয়াছিলেন মাত্র। তাই বলিয়া আমরা ঠাকুরদাসের মত সমর্থিত বা অব্যাহত রাখিতেও শক্ত নহি। তিনি নামে ঠাকুর-দাস! ঠাকুরদাস যিনি, তিনি কেমনে অশিষ্টাচারের দাসত্বে স্বীকৃত, তাহা বুঝিবার উপায় কি? তাঁহার বিচার, বিবেচনা ও বুদ্ধির দোষে পত্রিকারত্নিপাত বড় বিষম হইয়া উঠে। অশিষ্টতা-অবলম্বনের পূর্ব্বে তাঁহার ভাবিয়া দেখিবার অবসর বা অনুরক্তি হয় নাই যে, তাঁহার তদ্বিধ বিক্রম-বীর্য্যে তদীয় পাঠক সম্প্রদায়ের প্রবল প্রবৃত্তি হইবে, কি বিষম বিতৃষ্ণা জন্মিবে।

এতাদৃশ দশায় কার্য্য কেমন করিয়া অগ্রসর হইবে? সুতরাং কতিপয় সংখ্যার পর ইহার প্রচার রহিত করিতে হইয়াছিল। অকালেই "নবমীর" 'দশমী' হইয়াছিল। সকলে অবশ্যই বুঝিতেছেন, এই দশমী সাধারণ নয়—কিন্তু বিজয়া দশমী।

পত্রিকাতে ইংরাজি ভাষার নীতি-সূত্রও প্রায়ই স্থান লাভ করিত। সুতরাং ইহাও দ্বিভাষী পত্র। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফির যত্ন ও আগ্রহে পত্রিকার যে যে সংখ্যা পাইয়া অশেষ প্রকারে আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছি, তাহার তালিকা এবং বিবরণে পাঠকেরও উপকার হইবে, এই আশ্বাসে সেই বিষয়ের বৃত্তান্ত বিবৃত হইল। এই জন্য ব্যোমকেশ বাবুকে ধন্যবাদ করিতেছি।

৯, ১০, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২১, এবং ২২—এই ১০ (দশ) সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। প্রতি সংখ্যার ।০ (চারি) আনা, এই হিসাবে বার্ষিক মূল্য ৬৲ ছয় টাকা ছিল। খৃষ্টান ধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, "নবমীর" আক্রমণের বিষয়। বাম পার্শ্বে "ক্রশ"। ঐ "ক্রশ" যন্ত্রে এক শৃঙ্খল (শিকলি) লম্বমান। দক্ষিণ দিকে অঙ্গুরীয়ের উপর "প্রণব"। অঙ্গুরীয়টী বৃত্তাকার পরিধি পরিবেষ্টিত। মধ্যস্থলে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চিত্রের অভ্যন্তরে শুভ্র অক্ষরে "দুর্জ্জন-দমনমহানবমী" খোদিত। অর্দ্ধ বৃত্তের শীর্ষে চতুর্ভুজা সিংহবাহিনীর মূর্ত্তি।

ইহার ভাষা তাদৃশ বিশুদ্ধ বা সুললিত নয়। ব্যাকরণ-দোষেরও অভাব নাই। "ঐক্যতা" প্রভৃতি অশুদ্ধ পদ সম্পাদকের শাব্দিকজ্ঞানবত্তার সাক্ষ্য দিতেছে!

রচনা-নমুনা ও তদানুষঙ্গিক বিষয়-বর্ণনা, অবগত হওয়া যাইবে, এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য-সাধন-কারণ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল;

লাহোরীয় সংবাদ।

১। "গত ২৬ জানুয়ারি বাসরীয় দিল্লী গেজেট পত্র পাঠান্তর এতদ্দেশীয় এই সমাচার অবগত হওয়া গেল যে, সিন্ধুদেশীয় যুদ্ধে লব্ধ সম্পত্তি অদ্যাপি বিক্রয় হয় নাই বোধ হয় তাহা কলিকাতায় আনীত হইলে অত্রনগরস্থ অনেক ব্যক্তি যাঁহারা উক্তটাকার অংশ প্রাপ্ত হইবেন তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন। পরন্তু উক্ত সংবাদ-পত্র-সম্পাদক আরো ব্যক্ত করিয়াছেন যে আভরণ দ্রব্যাদি যাহা বিক্রয় হয় নাই তাহা এতন্নগরে আনীত হইবেক যে হেতুক কলিকাতাস্থ আমীরেরা ঐ আভরণের মধ্যে তিন লক্ষ টাকার দ্রব্য ক্রয় করিবেন।

২। "শ্রীযুত সারজান লিটনর লাহোর হইতে জলন্দরে যাত্রা করিয়াছেন তথা হইতে কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইয়া কৌন্সেলী পদে উপবেশন করিবেন।

৩। "রাজা লালসিংহের তোসাখানাতে ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকার সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে ১২ (বার) লক্ষ টাকা বৃটিস গবর্ণমেণ্টে প্রদত্ত হইয়াছে।"*

৪৭। জ্ঞান-সঞ্চারিণী।

(১২৫৪ সাল ভাদ্র হইতে ১২৫৭ সাল।
১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ আগষ্ট হইতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ)।

"জ্ঞান-সঞ্চারিণীর" জীবন-সঞ্চার বর্ষ-ত্রয়-ব্যাপক। সাত দিবস অন্তর ইহার প্রচার হইত। গঙ্গানারায়ণ বসুজ মহাশয়ের প্রযত্নে উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। কলিকাতা কাঁসারিপাড়া উহার উৎপত্তিস্থল। কিন্তু পাদরি লঙের এতদ্বিষয়িনী বর্ণনা অন্যরূপ। ইহা কাঁচড়াপাড়া-স্থিত সমিতি বিশেষের মুখ-পত্র ছিল,—সাহেব মহাশয় এই কথাই বলিয়াছেন। কোথায় "কাঁসারিপাড়া" আর কোথায় "কাঁচড়াপাড়া"। এ ক্ষেত্রে সাহেব-পাদরি ভারি ভুল করিয়াছেন।

সংবাদ-"জ্ঞান-সঞ্চারিণী" ভূরি ভূরি ব্যাপারের জননী। তদ্-গর্ভে না থাকিত, এমন বিষয়ের সংখ্যা স্বল্প। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ ১২৫৭ সাল, ইহার স্বর্গারোহণের কাল। "জ্ঞান-সঞ্চারিণীর" জীবন তিন বৎসর-ব্যাপক। স্বল্পায়ুঃ কর্ত্তৃক সমাজের অতি অল্প উপকৃতিরই সম্ভাবনা। বলা অত্যুক্তি বৈ আর কিছুই নয় যে, এই পত্রিকা, বঙ্গদেশের বহুল ব্যাপার সমাধান করিয়া—বিস্তর জ্ঞান সঞ্চারিত করিয়া—গতাসু হইতে পায় নাই, এটী একটী মহান্ মনস্তাপের বিষয়!

৪৮। হিন্দু-বন্ধু।

(১২৫৪ সাল ভাদ্র—১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ, সেপ্টম্বর।

উমাচরণ ভদ্র, "হিন্দু বন্ধুর" অতি নিকট আত্ম-বান্ধব—জন্মদাতা। খৃষ্টান্-প্রচারক-বৃন্দের বিপক্ষেই ইহার অভ্যুত্থান। কিন্তু যেমন উত্থান, তেমনই পতন—প্রায় জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মরণ!

তখন পাদরিগণ নূতন নূতন কার্য্যে নিত: যত্নবান্ হইতেন। তাঁহাদের অকুণ্ঠিত উদ্যম, নূতন যত্ন; আর, হিন্দুকুলের স্বধর্ম্মে, স্বকীয় পরিজনগণের সামাজিক ও সাংসারিক কর্ম্মে অনাস্থা। কাজেই তাহাতেই "হিন্দু-বন্ধুর" বিরহ ও বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিল। খৃষ্টান প্রচারক দলের সাজ সজ্জার ঘটার কাছে হিন্দুরা চির-পরাস্ত। "আটকৌড়ে" সাঙ্গ হইবার পর "ষষ্ঠীপুজাও" সম্পন্ন হইতে পাইল না—এমন অবস্থাতেই হিন্দুর এই "বন্ধু" জন ত্রিদিব-ধামে প্রয়াণ করিলেন। অদীর্ঘ জীবনে এই বান্ধব নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর কার্য্যই করিতে শক্ত হইয়াছিল।

* দুর্জ্জনদমনমহানবমী, ২১ সংখ্যা। ১২৫৪ সাল, ২৪ মাঘ।

৪৯। রঙ্গপুর-বার্ত্তাবহ।

(১২৫৪ সাল ২৩শে ভাদ্র হইতে ১২৬২ সাল।
১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ ৭ই সেপ্টম্বর হইতে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ)

এই সাপ্তাহিক পত্রিকা মফস্বলের দ্বিতীয় সংবাদ পত্র। "মুরশিদাবাদ-পত্রিকা" মফস্বলে প্রকাশিত প্রথম বার্ত্তাবহ। উহার ৭ বৎসর পরে "রঙ্গপুর-বার্ত্তাবহের" জন্ম। আমরা ইহাকে অষ্টম বর্ষীয় শিশু বলিয়া জানিয়াছি। নবম বর্ষেই ইহার আয়ুঃশেষ হয়।

পল্লীগ্রামস্থ দুঃস্থ জনগণের দুঃখ-ক্লেশ-বিমোচনের এই পত্রিকাই প্রথম প্রয়াসী। তাহার পর ইহার এই সাধু উদাহরণের অনুসরণে মফস্বলে উত্তর কালে কত শত পত্রিকারই যে, উত্থান ও পতন হয়, তাহার গণনা করিয়া নিঃশেষ করা দুরূহ। অন্ততঃ, উক্ত সংস্রবাধীনেও এতৎ পত্রিকার নাম চিরস্মরণীয় হওয়া আবশ্যক। নারীজাতির শিক্ষার প্রতিও ইহার দৃষ্টি না ছিল, এমন নয়!

১২৫৪ সাল হইতে ১২৬২ সালের মধ্যে "বার্ত্তাবহের" জীবনধারণের বার্ত্তা জ্ঞাত আছি। এই আট বৎসরের ভিতর জন্মদাতা ও পালক পিতাই ইহাঁকে জীবিতবান্ রাখিয়াছিলেন। প্রথমোক্তের নাম—গুরুচরণ রায়, দ্বিতীয় ব্যক্তি নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়। লঙ সাহেব ভ্রমক্রমে নীলাম্বরকে "নীলরতন" নামে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। প্রথম সম্পাদক, প্রথমাবধি ১২৬১ সাল পর্য্যন্ত এবং দ্বিতীয় সম্পাদক ১২৬২ সালের পর কিছু কাল, উহাকে চালিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে উহার বাৎসরিক মূল্য ৪৲ চারি টাকা ধার্য্য ছিল।

কাহার অর্থ-ব্যয়ে "বার্ত্তাবহ" জন্মপরিগ্রহ করে, সে কথাও বিবৃত হইবার উপস্থিত ক্ষেত্রেই কেবল উপযুক্ত ও সময়োপযোগী। "কুণ্ডী" পরগণার ভূম্যধিকারী কালীচন্দ্র রায় মহোদয়ের অধ্যবসায় ও মহান্ আশয়েই—"বার্ত্তাবহ" দেহ-ধারী হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। প্রাগুক্ত পরগণা জেলা "রঙ্গপুরের" অন্তর্গত। জমিদার কালীচন্দ্র * বিদ্যার্থিতায় বিলক্ষণ বিখ্যাত। তদীয় অধ্যবসায় সাতিশয় প্রশংসনীয়। তাঁহার মত সুযোগ্য আদর্শ ভূম্যধিকারীর দল যদি বাঙ্গালায় অধিক থাকিত, তবে না জানি, কোন্ দিনে এতদ্দেশীয়দিগের মলিন ম্লান মুখ-চ্ছবি কবির কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হইত। ধন্য কালীচন্দ্র! তোমাকে অগণ্য ধন্যবাদ করিতে হয়। তুমি বঙ্গীয় জমিদার-দলের অগ্রগণ্য।

* বাবু রাজনারায়ণ বসুজ মহাশয় তাঁহার প্রকৃত নাম ভুলিয়া গিয়াছেন, কালীনাথ চৌধুরী বলিয়াই তাঁহাকে বসুজ মহাশয় পরিচিত করিয়াছেন।

৫০। সাধু-রঞ্জন।

(১২৫৪ সাল ভাদ্র——১২৬২ সাল।
১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ সেপ্টম্বর—১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ)।

নিখিল বিশ্ব-মণ্ডলে পামরের পরিমাণ ও প্রভাব প্রকৃত প্রস্তাবেই সুপ্রচুর। সেই হেতুই কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদিত "পাষণ্ডপীড়ন," পৃথিবীতে প্রচুর সময় পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পায় নাই। "পাষণ্ড পীড়ন" চলিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার স্রষ্টার অস্তিত্ব রহিল। তিনি নিশ্চিন্ত বা নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবার পাত্র ছিলেন না। গুপ্ত কবির 'চন্দ্রকে পিঠ'।

ঈশ্বরচন্দ্রকে অন্য অন্য বিষয়ে কেহ যদি গুপ্ত বলিতে চান, বলুন; সংবাদ-পত্র-প্রচারে তাঁহাকে আমরা চির-ব্যক্তই দেখি। অথবা তিনি "গুপ্ত" পদের মূলার্থেরই অভিধেয়। তিনি গুপ্ত অর্থাৎ রক্ষিত। দেখা যাইবে—তৎকর্ত্তৃক সমাচার-বিষয়িণী সমগ্র কথাই রক্ষিত হইয়াছে, কদাচ বিনাশিত হয় নাই।

প্রকৃত ভক্ত যিনি, দুর্গাপ্রতিমার বিসর্জ্জন দিনেই—শ্রীশ্রীবিজয়া দশমীর পবিত্র তিথিতেই তিনি "লক্ষ্মী" প্রতিমার প্রতিষ্ঠা ও পুজার সঙ্কল্প মনে মনেই করিয়া বসেন; তৎপরে তাঁহার শ্যামাপুজার মানস হয়। তৎপরেই আবার কার্ত্তিকেয়, জগদ্ধাত্রী এবং সরস্বতীর পুজার ব্যবস্থা ও আয়োজন। সংবাদ-পত্রের সম্পাদকপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্রেরও মানসিক অবস্থা ঠিক তাদৃশী। তিনি একবার "প্রভাকর" প্রতিমার বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পরই "সংবাদ-রত্নাবলীর" জীবন সঞ্চারিত করিলেন। উহার আয়ুর নাকি আধিক্য হয় নাই। কাজেই প্রভাকরকে যেন মৃতসঞ্জীবন মন্ত্রে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। প্রভাকরের অর্চ্চনা-বন্দনা চলিতে থাকুক, এদিকে আবার এক মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা। কেন না, আমরা দেখিতেছি, তিনি ভক্তিগদ্গদচিত্তে "পাষণ্ড-পীড়নকে" আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাহারই পর উহার সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দী—"সাধুরঞ্জনের" আবির্ভাব হইল! গুপ্ত কবির উদ্ভাবনী ক্ষমতা শত শত সাধুবাদেও পুরস্কৃত হইতে পারে না। তাঁহার উৎসাহ, সৎ-সাহস কি সুন্দর!

এই সাপ্তাহিক পত্রিকার কলেবরে ঈশ্বরচন্দ্রের সাহিত্য-শিষ্য-সম্প্রদায়ের রচনা-সমূহ স্থানলাভে কৃতার্থ হইত। কৃষ্ণনগর কালেজের দ্বারকানাথ অধিকারী, হুগলী কলেজের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হিন্দু কলেজের দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি উহাতে কবিতা লিখিয়া লিপিনৈপুণ্যের অভ্যাস করিতেন। সম্প্রতি (১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে) শোষোক্ত ভদ্র বক্তির "পদ্য-সংগ্রহ" সঙ্কলিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে সাধু-রঞ্জনে মুদ্রিত অংশও আছে। ইহা ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক বর্ষ পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিল। "প্রভাকর যন্ত্র" ইহার জন্ম-ভূমি। কবিতা ব্যতীত সাহিত্যসংক্রান্ত সংবাদ প্রভৃতিও ইহার অন্তর্নিবিষ্ট থাকিত। অনেকানেক উত্তমোত্তম অনুবাদেও উহার দেহ-গেহ সুসজ্জিত হইত। পত্রিকার নামোপযোগী ও সময়োচিত প্রবন্ধাবলীও যে, ইহাতে মুদ্রিত না হইত, এমন কথা কেহ বলিতে সাহসী হইবেন না।

"সাধুরঞ্জনের" নাম বিকৃত করিতে কেহ ইচ্ছা করিয়া চেষ্টা পান নাই। তবে যে 'দূত' পত্র-সম্পাদক মহাশয় ইহাকে 'সুধারঞ্জন' এবং পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় "সুধীরঞ্জন" বলিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা নিশ্চিতই ভ্রমের কর্ম্ম। "সুধীরঞ্জন" একখানি গদ্য-পদ্যময় পুস্তক—সংবাদ পত্রিকা নয়। উহার প্রণেতা ইতিপূর্ব্বোক্ত বাবু দ্বারকানাথ অধিকারী। আর, 'সুধারঞ্জন" নামে বঙ্গপ্রদেশে পুস্তক বা পত্রিকার সত্তা ছিল না এবং এমন কি এখনও পর্য্যন্ত নাই।

কাল দায়রা।

ইংলণ্ডের রাণী এলিজেবেথের সময়ে বিচারে প্রায়ই নিষ্ঠুরতার একশেষ হইত। তাঁহার জ্যেষ্ঠা মেরীর সময়ে কাথলিকদিগেরই একাধিপত্য ছিল, প্রোটেষ্টাণ্টদিগের কিন্তু দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার অবধি ছিল না। রাণী মেরী নিজে কাথলিক ধর্ম্মের অনুরক্তা ছিলেন, কাথলিক ধর্ম্মেরই স্বরাজ্যে প্রচার করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, প্রোটেষ্টাণ্ট পীড়নে অকুণ্ঠিতা ছিলেন। বৈমাত্রেয়ীর আমলে এলিজেবেথকেও ধর্ম্মের জন্যে নিগ্রহভোগ করিতে হইয়াছিল। প্রোটেষ্টাণ্ট এলিজেবেথ পাশা উল্টাইয়া দিয়াছিলেন, কাথলিকদিগেরই হইয়াছিল নিগ্রহের একশেষ! প্রোটেষ্টাণ্টদিগেরই হইয়াছিল পোহাবারো! কিন্তু ঐতিহাসিক রহস্য পাঠকের বিদিত, অদ্য আমাদের সম্পর্ক কাল দায়রায়। এলিজেবেথের সময়ে একদা অক্সফোর্ডের দায়রায় যে ভয়ঙ্কর বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহার সহিতই অদ্য আমাদিগের সম্বন্ধ! পাঠক স্তম্ভিত হইও না। অক্সফোর্ডে দায়রা বসিল, অনেক কাথলিকের বিচার, ষড়যন্ত্রের অভিযোগ, রাজদ্বেষের অভিযোগ! অভিযোগের প্রধান আসামী হইয়াছেন এক রোলাণ্ড জেঙ্কিন্স, ধর্ম্মে কাথলিক, পোপের অনুচর। অভিযোগ, ধর্ম্মদ্বেষের জন্যে রাজদ্বেষ, এলিজেবেথের প্রতি ঘোর বিদ্বেষ! দায়রা আদালত লোকে লোকারণ্য। এজলাসে বসিয়াছেন, অনেক জজ। প্রধান জজ হইয়াছেন সার রবার্ট বেল, সহযোগী আছেন কয়েক জন। ভিন্ন ভিন্ন এজলাস, আসামী যে, অনেক। ভিন্ন ভিন্ন এজলাসে ভিন্ন ভিন্ন জুরি, আর চারি দিকে উকিল মোক্তার কৌঁসুলি। সরকার পক্ষে সাক্ষীর অভাব নাই। আদালত ভবন পরিপূর্ণ! যত কাথলিক আসামী শৃঙ্খলে আবদ্ধ, কাত্তার দিয়া দাঁড়াইয়া রহি-

য়াছে! যত জজ জুরি লইয়া এজলাসে বসিয়াছেন, উকিল কৌসুলিরাও বার দিয়া বসিয়া আছেন। ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ! কিসের গন্ধ? বড় জজ সার রবার্ট বেল বারবার হেতু জিজ্ঞাসা করিতেছেন, অনুসন্ধান হইতেছে; দুর্গন্ধের ত মূল পাওয়া যায় না! কিন্তু টেকা দায়, অসহ্য, গন্ধ অসহ্য! বিচার সাঙ্গ করা ভার! সাক্ষীদিগের সাক্ষ্য যে, সাঙ্গ হয় না! উকিল কৌসুলিদিগের যে, তিষ্ঠান ভার! না, আর চলিল না! পলাও পলাও! কিন্তু পলায়নকালেই যে, কত লোকের মূর্চ্ছা হইল, পতন হইল! জজদিগের পতন হইল, জুরিদিগের পতন হইল, উকিল কৌসুলিদিগের পতন হইল, সরকার পক্ষের যত সাক্ষীর পতন হইল; পাতে যে, নিপাতও হইল! কত লোকের বিচারালয়েই নিপাত হইল, কত লোকের বাহিরে। যাহাদের সহিষ্ণুতা বড় অধিক, তাহাদের স্বগৃহে আসিবার পর মৃত্যু হইল। ঐতিহাসিক বলিতেছেন, ৩০০ লোকের নিপাত হইল। কিন্তু কোন আসামীর নিপাত হইল না! রমণী ও শিশুদিগের নিপাত হইল না। বিচারে যাহাদিগের কোনরূপ সংস্রব সম্বন্ধ ছিল না, তাহাদিগের ত নিপাত হইল না! রহস্য-ভেদের চেষ্টা হইয়াছিল, স্বয়ং লর্ড বেকন রহস্যভেদ করিতে বসিয়াছিলেন। বলিয়াছেন, "হঠাৎ কারাগার হইতে বন্দীরা কি এক ঘোর মহামারী আনিয়াছিল, তাহাতেই যত জজ জুরি উকিল কৌসুলি ও সাক্ষীদিগের হটাৎ মৃত্যু হইয়াছিল।" কিন্তু শিশু ও রমণীদিগের কিছুই হয় নাই কেন? যাহারা জেল হইতে মহামারী আনিয়াছিল, সেই সকল বন্দীর হটাৎ মৃত্যু হয় নাই কেন? লর্ড বেকনের অনুমান ত গ্রাহ্য হইতে পারে না। আর এক মহাশয় বলিয়াছেন, "প্রধান আসামী সেই রোলাণ্ড জেঙ্কিন্স দ্রব্যগুণে সিদ্ধ ছিল। বিচারের পূর্ব্বে সে একদিন কারাধ্যক্ষের সহিত এক ঔষধালয়ে গিয়াছিল। একখানা ফর্দ্দ দিয়া কতকগুলা ঔষধ চাহিয়াছিল, ঔষধবিক্রেতা ফর্দ্দ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। কিন্তু ঘরের ভিতর গিয়া নকল লইয়া ফর্দ্দ ফিরাইয়া দিয়া বলিয়াছিল, এ সব দ্রব্য দিতে পারিব না। দেখা হইয়াছিল, সবগুলাই ভয়ঙ্কর বিষ! জেঙ্কিন্স কিন্তু পরে কোন উপায়ে অন্য কোন স্থান হইতে ঐ সকল বিষের সংগ্রহ করিয়াছিল, এবং তাহাতেই একটা দীর্ঘ ধূপ প্রস্তুত করিয়াছিল। তার পর বিচারের দিনে—যে দিন তাহার প্রাণদণ্ড হইল সেই দিনে—রাজাজ্ঞার অব্যবহিত-পূর্ব্বেই সেই ধূপ আদালতের ভিতরই জ্বালিয়া দিয়াছিল। আর সেই ধূপের ধূমে সকলের নিপাত হইয়াছিল।" কিন্তু আখ্যায়ক লাউঞ্জারের ন্যায় লেহর্ণও বলিতেছেন, "অত লোকের মাঝখানে আসামী জেঙ্কিন্স ধূপ জ্বালিল কিরূপে? চক্‌মকী ঠুকিল, সে আলো ধরাইল, অথচ কেহ দেখিতে পাইল না; ইহা ত হইতে পারে না। যার গন্ধে মানুষ মরে, সেরূপ ধূপ প্রজ্বলিত হইলে ত লোকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইত!" আবার বড় জজ সার রবার্ট বেল যে, প্রথম হইতেই দুর্গন্ধের অনুভব করিয়াছিলেন; গন্ধ ত তত হটাৎ বাহির হয় নাই। আর যদি কোনরূপ দুর্গন্ধ বা ধূমাদিই হেতু হইত, তাহা হইলে ত তাহার ক্রিয়া হইত সকলেরই উপর। আদালতের যত লোককেই ত তাহা হইলে মরিতে হইত। রমণীরা মরিল না কেন? শিশুরা মরিল না কেন? আসামীরা মরিল না কেন? রহস্যভেদ হয় নাই, কিন্তু ঘটনা সত্য, ব্যাপার ঐতিহাসিক! কাথলিক আসামী রোলাণ্ড জেঙ্কিন্সের যাই প্রাণদণ্ড হইল, অমনই জজ জুরি উকিল কৌসুলি ও সাক্ষীদিগের নিপাত হইল। যাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষে ছিলেন, তাঁহাদিগেরই নিপাত হইল। কাথলিক বলিবেন, "ঐশ অভিসম্পাত! নচ দৈবাৎ পরং বলম্!" কাল দায়রার ত অন্যরূপ রহস্যভেদ হয় নাই। কিন্তু ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহ করা চলে না। ঐতিহাসিক সত্যে সন্দেহ করা অনুচিত! আর, যখনকার ঘটনা, তখন যে, ইংলণ্ডে ঐতিহাসিক অনুরাগের বেশ একটু আধিপত্য হইয়াছিল। রাণী এলিজাবেথের আমলের কথা; তখন যে, বিদ্যার জোয়ার সুরু হইয়াছিল, ইতিহাসের যুগ আসিয়াছিল, বিজ্ঞানের আলোচনাও চলিতেছিল। যে লর্ড বেকন ইংলণ্ডের আদি বৈজ্ঞানিক বলিয়া খ্যাত এবং এখনও আদৃত, তিনি যে ঘটনার মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সে ঘটনার সত্যতার সন্দেহ করিতে যাওয়া ত সুবোধের কার্য্য নহে। কাল দায়রার কথা সত্য, কাথলিকদিগের বিচারের কথা সত্য, কাথলিক পাদরি রোলাণ্ড জেঙ্কিন্সের বিচারের কথা সত্য, তাঁহার প্রাণদণ্ডের কথা সত্য; বিচারালয়ে যে, অনেক জজ জুরি উকিল কৌসুলি সাক্ষী দর্শক প্রভৃতির অবস্থান হইয়াছিল, তাহাও সত্য; আর হঠাৎ যে, অনেকেরই নিপাত হইয়াছিল, অনেককে মৃতপ্রায় হইয়া নীত হইতে হইয়াছিল এবং পরে মরিতে হইয়াছিল, তাহাও সত্য; বিচারালয়ে যে, একটা ঘোরতর অসহ্য নারক দুর্গন্ধ উঠিয়াছিল, জজ প্রভৃতিকে সেই দুর্গন্ধে অস্থির হইতে হইয়াছিল, তাহাও সত্য। কোন বিষয়েই সন্দেহ নাই, গন্ধের তাৎকালিক অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ নাই। সন্দেহ কেবল গন্ধের মূলে, কিসের গন্ধ, কোথা হইতে আসিয়াছিল, কি জন্যে আসিয়াছিল, তাহাই কেহ স্থির করিতে পারেন নাই। কিন্তু যাহার কারণ স্থির করিতে পারা যায় নাই, তাহাতেই সন্দেহ বা অবিশ্বাস করিতে হইবে, ইহাও ত যুক্তিযুক্ত নহে! সংসারে এমন ঘটনা অনেক হয়, যাহার আমরা হেতু স্থির করিতে পারি না; কিন্তু যাহাতে আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই। কাল দায়রার এই ঘটনাও সেইরূপ। কাথলিকেরা ঐশশক্তির আরোপ করিয়াছেন। তুমি আমি না মানিতে পারি, কিন্তু কাথলিকের ধারণায় ত প্রতিবাদ করিতে পারি না।

জন্মভূমি।

অষ্টম ভাগ। } ভাদ্র। ১৩০৫। { ৯ম সংখ্যা।

সাম্যবাদেই সর্ব্বনাশ।

হিন্দুর সমস্তই সম্পূর্ণ—সাঙ্গ—সর্ব্বাবয়বে অক্ষুণ্ণ; হিন্দুর ধর্ম্ম সম্পূর্ণ, হিন্দুর শাস্ত্র সম্পূর্ণ, হিন্দুর সমাজ তথা সম্পূর্ণ। হিন্দুর সমস্তই যে, দৈব আর আর্ষ।

"সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে।"

হিন্দু দৈবাদেশে দৈবদেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন, দৈবদেশের অধিবাসী হইয়াছেন। হিন্দু সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতিই প্রজাপতির দেহোত্থ। হিন্দু নিজে দৈব, হিন্দুসমাজও সুতরাং দৈবসমাজ। আর হিন্দুর সেই দৈবসমাজ অনাদ্যনন্তবেদমূলক দৈব আর্ষ শাস্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, সেই শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিতেছে। হিন্দুসমাজের ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তো বৃহৎ পর্য্যন্ত যত আচার অনুষ্ঠান ক্রিয়া কলাপ সংস্কার বিশ্বাস প্রভৃতি সমস্তই দৈব আর্ষ আদেশে উপদেশে পরিচালিত হইতেছে। অক্ষুণ্ণ সম্পূর্ণ শাস্ত্র যাহার পথপ্রদর্শক পরামর্শদাতা এবং নিয়ন্তা, সেই হিন্দুর জীবনপথ, ধরিতে গেলে, অতি সহজ। যে হিন্দু শাস্ত্র মানিয়া চলে, তাহার বাঁধা পথ; তাহাকে চলিতে ফিরিতে কষ্ট পাইতে হয় না; পথে হোঁচট টক্কর খাইতে হয় না; তাহাকে খানা খোন্দলে পড়িতে হয় না। যে হিন্দু শাস্ত্র না মানিয়া চলে—পথ ছাড়িয়া অপথে চলে, তাহারই বিড়ম্বনা পদে পদে। তাহাকে জীবনপথে নানারূপ কষ্ট পাইতে হয়, পদে পদে হোঁচট টক্কর খাইতে হয়, খানা খোন্দলে পড়িতে হয়, সর্ব্বদাই আহত ক্ষত হইতে হয়। সময়ে সময়ে তাহাকে অপঘাতেও মরিতে হয়।

হিন্দুমাত্রই পূর্ব্বজন্ম ও কর্ম্মফলে বিশ্বাসী। কেন না, শাস্ত্র তাহাকে সেইরূপ বিশ্বাসে প্রণোদিত করিয়াছে। সুতরাং সংসারে তারতম্য দেখিয়া, ধনী নির্ধনের ইতর-বিশেষ দেখিয়া, প্রভু ভৃত্যের প্রভেদভাব দেখিয়া, হিন্দুকে মনঃকষ্ট পাইতে হয় না। রাজা প্রজার—আশ্রয়াশ্রয়ের—আদেষ্টা আদিষ্টের—সম্বন্ধবিচার করিয়া হিন্দুকে বিস্মিত বিচলিত হইতে হয় না। হিন্দু পুরুষানুক্রমে দেখিয়া আসিতেছে, বর্ণচতুষ্টয়ের ভিতর তারতম্য; সামাজিক ভেদপ্রথায় হিন্দুর মন কদাপি কুণ্ঠিত হয় না। হিন্দু জানে, যাহার প্রালব্ধ যেরূপ, পূর্ব্ব জন্মে যাহার কর্ম্ম যেরূপ হইয়াছে, ইহকালে তাহার সেইরূপ ফলভোগ হইতেছে। ব্যতিক্রম কাহারও সাধ্য নহে, যাহা হইবার তাহা হইবেই। আবার হিন্দু জানে, ইহজন্মে যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে, পরজন্মে সে সেইরূপ ফলভোগ করিবে। সুতরাং হিন্দু নিজের অবস্থায় তুষ্ট থাকিয়া ভবিষ্যতের পথ প্রশস্ত করে, অদৃষ্টের সহিত কোন হিন্দুই কলহ করিতে যায় না। অতএব হিন্দুসমাজে সাম্যবাদের অধিকার নাই। যে সাম্যবাদের জন্যে পাশ্চাত্য সমাজে—ইউরোপ আমেরিকায়—ভয়ঙ্কর উৎপাত ঘটিতেছে, সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে, সে সাম্যবাদ

হিন্দুসমাজে

প্রবেশ করিতে পারিবে না; যত দিন হিন্দুসমাজে হিন্দুত্ব থাকিবে, তত দিন কিছুতেই পারিবে না। ভারতের হিন্দুসমাজে সুতরাং পাশ্চাত্য ভয় ভীতি—উদ্বেগ দুশ্চিন্তার—অবসর নাই। হিন্দুসমাজে সোশালিষ্ট, কমিউনিষ্টের প্রতিপত্তি হইবে না। নিহিলিষ্ট এনার্কিষ্টের স্থান হইবে না। পাশ্চাত্য সমাজে যেরূপ বিপ্লবের ভয়, আমাদের হিন্দুসমাজে সেরূপ ভয় নাই; সেরূপ ভয়ের হেতুও নাই। তথাপি প্রজাপালনে ও রাজ্যশাসনে দূরদর্শিতা আবশ্যক। যাহাতে পাশ্চাত্য সাম্যবাদের ভারতে কোনরূপে প্রবেশ না হয়, তাহার দিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি রাখা উচিত। যাহাতে চিরন্তন সংস্কারে ব্যতিক্রম না হয়, যাহাতে হিন্দুধর্ম্মে হিন্দুর অবিশ্বাস না হয়, হিন্দুশাস্ত্রে

হিন্দুর অনাস্থা না হয়, হিন্দু আচার অনুষ্ঠানে হিন্দুর বিরাগ ঔদাসীন্য না হয়, তাহার দিকে মনোযোগ রাখিয়া, তবে রাজপুরুষদিগের উচিত, শিক্ষা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা—আইন কানুনের প্রণয়ন করা। যে শিক্ষায় হিন্দুর হিন্দুধর্ম্মে বিরাগ জন্মিতে পারে, সে শিক্ষায় সাম্যবাদও আসিতে পারে। যে সভ্যতায় হিন্দুর স্বধর্ম্মে বিরাগ জন্মিতে পারে, সে শিক্ষায় সাম্যবাদ আসিতে পারে। খৃষ্টান ব্রাহ্ম প্রভৃতি ধর্ম্মের জন্যে—ধর্ম্মপ্রচারের জন্যে—হিন্দুর স্বধর্ম্মে অনাস্থা হয়, সুতরাং হিন্দুসমাজে সাম্যবাদের আবির্ভাব হয়। রাজপুরুষদিগের সাবধান হওয়া উচিত, সাবধান করা উচিত। কেন না, হিন্দুসমাজে সাম্যবাদের আধিপত্য হইলেই, এনার্কিষ্টমন্ত্রের আবির্ভাব হইবে; অদৃষ্টে প্রারব্ধে পূর্ব্বজন্মে কর্ম্মফলে অবিশ্বাস হইলেই, বিভ্রাটের সূত্রপাত হইবে; যাহা ইউরোপ আমেরিকায় হইয়াছে, তাহা ভারতেও হইবে; ইউরোপ আমেরিকার যত রাজপুরুষকেই যেরূপ বিব্রত হইতে হইয়াছে, ভারতের রাজপুরুষদিগকেও সেইরূপ বিব্রত হইতে হইবে। সাম্যবাদেই ত ইউরোপে বিষম সোশালিষ্টপ্রথার উৎপত্তি হইয়াছে। সাম্যবাদেই ত সোশালিষ্ট হইয়াছে, আবার সোশালিষ্টই নিহিলিষ্ট হইয়াছে, এনার্কিষ্ট হইয়াছে। এনার্কিষ্টের জ্বালায় সমগ্র ইউরোপকে বিব্রত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। জ্বালা যে, ক্রমেই অসহ্য হইতেছে!

এনার্কিষ্টের

উৎপাত ইউরোপের নাই কোন রাজ্যে? এনার্কিষ্টই ত নিহিলিষ্টরূপে রুষিয়া দখল করিয়াছে। এনার্কিষ্ট এনার্কিষ্টরূপেই স্পেন, ফ্রান্স, ইতালি, জর্ম্মণী, অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়ম, সুইজরলণ্ড প্রভৃতিকে বিব্রত করিয়াছে। এনার্কিষ্ট ত নিজ বিলাতকেও বিব্রত করিতে ছাড়ে নাই। নিহিলিষ্টধর্ম্মা এনার্কিষ্টের জন্যেই রুষের জারকে প্রাণ দিতে হইয়াছে, এনার্কিষ্টের জন্যেই স্পেনের রাজমন্ত্রীকে অপঘাতে মরিতে হইয়াছে, এনার্কিষ্টের জন্যেই ফরাসীর প্রেসিডেণ্ট কার্ণোকে হত হইতে হইয়াছে, এনার্কিষ্টের জন্যেই অষ্ট্রিয়ার রাজমহিষীকে সুইজরলণ্ডের জেনীবা সহরে প্রাণ দিতে হইল, এনার্কিষ্টের জন্যেই ইতালির রাজাকে আর একটু হইলে অপঘাতে মরিতে হইত, এনার্কিষ্টের জন্যেই ত ইংলণ্ডে আজ অমুক বাড়ীর কাছে ডিনামাইট ছুটিল, তমুক বাড়ীর কাছে বোম ফুটিল; এনার্কিষ্টের জন্যেই ত আজ ফরাসীর অমুক কারখানা উড়িল, কাল নিজ পার্লেমেণ্টের ভিতর রোমের বিভ্রাট ঘটিল! ভয় নাই কোথায়? ইউরোপের যত রাজাকে সদাই প্রাণ লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে, যত রাজমন্ত্রীকে সদাই শশব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে, যত ধনীকে ভয়ে ব্যাকুল থাকিতে হইয়াছে, যত কারবারীকে থরথর কাঁপিতে হইতেছে! এনার্কিষ্টমন্ত্রের শিক্ষা দীক্ষা যে, অতি ভয়ঙ্কর! পুরাতন সমাজের উচ্ছেদ করিতে হইবে, পুরাতন রাজত্বের উচ্ছেদ করিতে হইবে, পুরাতন প্রথা পদ্ধতির বিপ্লব করিতে হইবে; রাজার লোপ করিতে হইবে, রাজত্বপ্রণালীর লোপ করিতে হইবে, সাধারণতন্ত্রের লোপ করিতে হইবে, পার্লেমেণ্টের লোপ করিতে হইবে, ধনের লোপ করিতে হইবে, ধর্ম্মালয়ের ধ্বংস করিতে হইবে, ধর্ম্মপ্রচারকদিগের নিপাত করিতে হইবে! এনার্কিষ্টের সংস্কার যে, বড় বিষম সংস্কার! জগতে রাজা প্রজা থাকিবে না, ধর্ম্ম কর্ম্ম থাকিবে না, ধনাগার ভাণ্ডার থাকিবে না; সকল দিকই

একাকার

হইবে; অরাজকতারই আধিপত্য হইবে; সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইবে; সংসারে সকল ব্যক্তিরই সকল বিষয়ে সমান অধিকার হইবে; সাম্যবাদের চূড়ান্ত হইবে! এনার্কিষ্টধর্ম্মে ঈশ্বর নাই, ধর্ম্ম নাই, পাপ পুণ্যের ভেদ নাই, কোনরূপ সমাজ জনের আদর নাই, বিচার নাই, আচার নাই। এনার্কিষ্টদিগের আদিগুরু বলিয়া গিয়াছেন, "সমাজে কোনরূপ বন্ধনের প্রয়োজন নাই, কোনরূপ আইন কানুনের আবশ্যকতা নাই; রাজার অস্তিত্ব আবশ্যক নহে; শাসনপ্রণালীরও উপযোগিতা নাই; সকল মানুষই সমান। সকলের মনেই সাম্যভাব উপস্থিত হইলে, কোনরূপ বন্ধনের—কোনরূপ বিধিব্যবস্থার—প্রয়োজন থাকিবে না। সাম্যভাবের আধিপত্য হইলেই, সংসার শান্তিময় হইয়া উঠিবে।" কিন্তু যত পুরাতনের উচ্ছেদ না হইলে, নূতনের আদর হইবে না তাই এনার্কিষ্টদলের এখন কেবল চেষ্টা উচ্ছেদে—কেবল নিপাতে—কেবল ধ্বংসে। এনার্কিষ্টের ধারণা, যত ধনীর ধ্বংস করিতে হইবে, যত মানীর উচ্ছেদ করিতে হইবে, যত প্রভুর নিপাত করিতে হইবে, যত রাজার মুণ্ডপাত করিতে হইবে, যত রাজপুরুষকে যমের বাড়ী চালান দিতে হইবে, যত পার্লেমেণ্ট—যত ব্যবস্থাপকসভা—যত বিচারালয়—যত বিচারক—সকলের তিরোভাব করিতে হইবে; ধর্ম্মকে সংসারত্যাগী করিয়া দিতে হইবে; ধর্ম্মপ্রচারকদিগের আস্তত্ব উড়াইয়া দিতে হইবে। আদিগুরু

বাকুনীন

যে মন্ত্রের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ভয়ঙ্কর; কিন্তু এখন আবার তাঁহার যত চেলা সেই ভয়ঙ্করকে আরও ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছে। এইরূপই হইয়া থাকে, মন্দের ক্রমেই মন্দতা বাড়িয়া যায়; পাপের ক্রমেই প্রগাঢ়তা জন্মে। বাকুনীন ছিলেন জাত্যংশে রুষ, জন্মিয়াছিলেন ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে, রুষেরই মস্কো সহরে। প্রথমে রুষ পলটনেই কাজ লইয়াছিলেন, পোলণ্ডে অবস্থিতি করিতেন; রুষের পোলণ্ডপীড়ন দেখিয়াই ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন। হৃদয় ছিল ভাল, দুর্ব্বলের দুঃখে কাতর হইয়াছিলেন;

কিন্তু ভাল শেষে মন্দে পরিণত হইয়াছিল, অমৃত গরল হইয়া উঠিয়াছিল। দুই দশ জন রাজপুরুষের দুর্ব্ব্যবহার দেখিয়া বাকুনীন একেবারে রাজত্বপ্রথার উপর—শুদ্ধ রাজত্বপ্রথা নহে—সমস্ত সমাজপ্রথার উপর—খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন; আর তাই রাজত্বধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সমাজধ্বংসেরও প্রচার করিয়াছিলেন।

গুরুর গুরু

জুটিয়াছিল। বাকুনীন জর্ম্মণী ও ফ্রান্সে আসিয়া গুরু পাইয়াছিলেন, প্রুধোনকেই গুরু করিয়াছিলেন। এই যে প্রুধোন, ইনি ছিলেন বটে পণ্ডিত লোক, কিন্তু সংসারবিরাগনিবন্ধন জ্ঞানে বাতুলবৎ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইনিই ত প্রথমে ঘোরতর চরম সাম্যবাদের প্রচার করিয়াছিলেন; এখনকার রাজত্বপ্রণালী ও সমাজপ্রথার উচ্ছেদে ইনিই ত প্রথমে পরামর্শ দিয়াছিলেন জর্জ্জ সাণ্ড ছিলেন ইহাঁরই দোসর। কিন্তু ইহাঁরা ছিলেন কথার বীর, বাকুনীনই প্রথমে কাজের বীর হইয়াছিলেন। ১৮৪৮ সালে জর্ম্মণরাজ্যে বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, বিপ্লবের সূত্রপাতও করিয়া দিয়াছিলেন। কথার প্রচারে লোক ক্ষেপে না, কাজের প্রচারেই ক্ষেপিয়া উঠে। ১৮৪৮ সালেই জর্ম্মণরাজ্যে দুরন্ত সোশালিষ্টদিগের কার্য্যক্ষেত্রলাভ হইয়াছিল, এনার্কিষ্টমন্ত্রেরও ঐ সময়েই প্রথম ও প্রকৃত প্রচার হইয়াছিল। দলপতি বাকুনীন কিন্তু বন্দী হইয়া রুষের হস্তে অর্পিত হইয়াছিলেন। সেখানে কিছু দিন বন্দিভাবে থাকিয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সাইবিরীয়ায় নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। সাইবিরীয়া হইতে পলাইয়া একখানা মার্কিণ জাহাজে আশ্রয় লইয়াছিলেন, এবং জাপানে অবতীর্ণ হইয়া কিছুদিন সেইখানেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন; শেষে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গিয়া হাজির হইয়াছিলেন। ইংলণ্ড তখনও ছিল আশ্রয়স্থান, এখনও ত ইংলণ্ড অনেক এনার্কিষ্টের আশ্রয়স্থান। ১৮৬৫ সালে বাকুনীন ইতালি আসিয়া এনার্কিষ্টধর্ম্মের প্রচার করিতে লাগিয়াছিলেন, ১৮৬৯ সালে সোশাল-ডেমক্রেসি বা সামাজিক লোকতন্ত্রের এলায়ান্স বা সমবায় করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ষেই ইতালির ঐ সভাকে আরও বিস্তৃত করিয়া, সার্ব্বজাতিক সাম্যবাদের সভায় পরিণত করিয়াছিলেন। এখন সেই সাম্যবাদের সভাই এনার্কিষ্টদিগের মহাসভা। তখনও কার্য্যতঃ সভা এনার্কিষ্ট-সভাই ছিল; কেবল রাজপুরুষদিগের ভয়েই নামকরণে সাবধানতার অবলম্বন হইয়াছিল। ১৮৭০ সালে বাকুনীন ফরাসীর লিয়ঁ অঞ্চলে কার্য্যতঃ এনার্কিষ্টমন্ত্রের প্রচার করিতে গিয়াছিলেন, যত লোককেই রাজ্যের ও সমাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। জর্ম্মণযুদ্ধের পর ফরাসী রাজনীতিকদিগকে ইহাঁর জন্যে এবং ইহাঁর ঐ মন্ত্রপ্রচারও দলবন্ধনের জন্যে বড়ই বিব্রত হইতে হইয়াছিল; অনেক ফরাসীই যে, ইহাঁর দলে যোগ দিয়াছিল। ১৮৭১ সালে প্যারিসে যে কমিউনিষ্টদিগের ঘোর উৎপাত হইয়াছিল, তাহারও হেতু হইয়াছিলেন, ঐ বাকুনীন। প্যারিসের পুরাতন কমিউনিষ্টেরা বাকুনীনের জন্যেই নূতন উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াছিল। প্রথম ফরাসিবিপ্লবের সেই গুপ্ত এতদিন লুপ্তভাবে থাকিয়া আবার ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল! ঐ সময়েই কিন্তু বাকুনীনের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবল হইয়াছিলেন;

কারল মারক্স

বাকুনীনের সহিত কলহারম্ভ করিয়াছিলেন। হেগ সহরে ১৮৭২ সালে এনার্কিষ্টদিগের যে "ইণ্টারনেশনাল কংগ্রেস" বা সার্ব্বজাতিক মহাসভা বসিয়াছিল, তাহাতেই কারল মারক্সের জন্যে বাকুনীনের দলপতিত্ব ঘুচিয়া গিয়াছিল। মন্ত্রে ও মতে দুই জনে প্রায় সাম্য ছিল, কিন্তু বাঘে বাঘেও যুদ্ধ হয়। মারক্সের সহিত বাকুনীনের বিবাদ হইয়াছিল, বিবাদে বাকুনীন পরাজিত হইয়া, এনার্কিষ্টদলের দলপতিত্ব ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন; দলপতিত্ব ছাড়িয়া তিনি গিয়া সুইজরলণ্ডে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ১৮৭৬ সালে সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু এখনও সুইজরলণ্ডেই এনার্কিষ্টদিগের প্রধান আশ্রয়স্থল। গুপ্ত ব্যক্ত সভা সমিতিরও ঐখানে মূলসূত্র! বাকুনীন পণ্ডিত ছিলেন, বক্তৃতায় সুপটু ছিলেন, অনেক স্থলেই বক্তৃতা করিয়াছিলেন, অনেকগুলি গ্রন্থও লিখিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থের মুদ্রণ প্রচার হইয়াছে, নানা ভাষায় অনুবাদও হইয়াছে। তখন কারল মারক্সের জন্যে বাকুনীনকে পরাস্ত হইতে হইয়াছিল, এখন কিন্তু বাকুনীনই এনার্কিষ্টদিগের আদিগুরু বলিয়া পূজিত; প্রুধোন, সাণ্ড এবং মারক্স প্রভৃতির অপেক্ষা এখন বাকুনীনেরই পসার অধিক।

দলের ভয়ঙ্করত্ব

বৃদ্ধি ও বিস্তার হইয়াছে। উৎপত্তি হইতে এখনকার পরিণতি পর্য্যন্ত এখনও পঞ্চাশ বৎসর হয় নাই। আর বল ত বাকুনীনের প্রথম প্রচার হইয়াছিল ১৮৭০ সালে! ২৫।২৬ বৎসরে যে বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা যে, ভাবিলেও হৃদ্‌বুদ্ধি হইতে হয়! ইউরোপের এমন দেশ নাই, যেখানে এনার্কিষ্ট নাই, যেখানে এনার্কিষ্টদিগের সভা সমিতি নাই, ষড়যন্ত্র চক্রান্ত নাই। পাশ্চাত্য জগতের যত রাজ্যেই সভা আছে, সকল সভাই মূলসভার অধীন। মন্ত্রগুপ্তির এনার্কিষ্টদলে বিচিত্র আধিপত্য! মূলসভার মূল পাণ্ডারা যে, কোথায় আছেন, কোথায় থাকেন, তাহা কাহারই জানিবার যো নাই। এখন কোন্ কোন্ মহাপুরুষ মূলসভার মূল পাণ্ডা, তাহা কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না! অথচ যেখানকার যত এনার্কিষ্টসভায়—মূলসভার অনুমোদিত কার্য্য হইতেছে, কুত্রাপি ব্যতিক্রম নাই। বর্ষে বর্ষে এখন এনার্কিষ্টদিগের কংগ্রেস বা মহা-

সভা বসিয়া থাকে, ইউরোপের কোন না কোন বড় সহরে অধিবেশন হয়। বর্ষে বর্ষে ভিন্ন ভিন্ন সহরে অধিবেশন হইয়া থাকে; সভা বে, সার্ব্বজাতিকী! এনার্কিষ্ট দলের যেরূপ ষড়যন্ত্র চক্রান্ত, সেরূপ আর কোন দলে দেখা যায় না। মধ্য যুগে ইউরোপে যে ভেমিক কৌন্সিল ছিল, এনার্কিষ্ট কাউন্সিলের ষড়যন্ত্রে চক্রান্তে তাহাকেও পরাজিত হইতে হইয়াছে। ভেমিক কৌন্সিলেরও ইউরোপের অনেক নগরেই শাখা ছিল, লোক ছিল। জর্ম্মণীর জমিদারদিগের উপরই ভেমিকদিগের অধিক আক্রোশ ছিল। যত হোটেল যত সরাই, সমস্তই ছিল ভেমিকদিগের হস্তগত। ভারতের গামছামোড়া ঠকেরা যেরূপ এক সময়ে মধ্য ভারতে ও মধ্যপ্রদেশে একাধিপত্য করিয়াছিল, বুন্দেলখণ্ডের সর্ব্বত্রই একচ্ছত্র হইয়াছিল, মধ্যযুগের ভেমিকেরাও জর্ম্মণরাজ্যের সর্ব্বত্র সেইরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। যত হোটেল পান্থনিবাসেই ভেমিকদিগের কর্ত্তৃত্ব ছিল, পথিকদিগকে ভেমিকের হস্তে পড়িতে হইত; সর্ব্বস্বে বঞ্চিত হইতে হইত সর্ব্বদা। ঠকদিগের ভিতর স্বদলের বিশ্বাসঘাতককে যেরূপ প্রাণ দিতেই হইত, মধ্য যুগের ইউরোপে ভেমিক দলেও সেইরূপ বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে প্রাণ দিতেই হইত; কুত্রাপি নিষ্কৃতি ছিল না। ইতালি গ্রীসের দস্যুদিগের ভিতরও এই নিয়ম, দস্যুদলে সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। কিন্তু এনার্কিষ্ট দলে আরও ভয়ঙ্কর! ইউরোপে সেই ভেমিক অপেক্ষা, ইতালি গ্রীসের দস্যু অপেক্ষা, ভারতের ঠক অপেক্ষা, এনার্কিষ্ট অধিকতর ভয়ঙ্কর। এনার্কিষ্টের আক্রোশ ভয়ঙ্কর—নির্ব্বন্ধ ভয়ঙ্কর—ধৈর্য্য ভয়ঙ্কর—অধ্যবসায়ও ভয়ঙ্কর! এনার্কিষ্টদিগের একটা

সাম্রাজ্যই

চলিতেছে! একদিকে যেমন ক্রিয়া, অন্যদিকে সেইরূপ প্রতিক্রিয়া; একদিকে যেরূপ দমনচেষ্টা, অন্যদিকে সেইরূপই উত্তেজনা উদ্যোগ! ইউরোপের সকল দেশেই এনার্কিষ্টের গুপ্তচর ঘুরিতেছে। রুষের নিহিলিষ্ট, ফ্রান্সের কমিউনিষ্ট, সকলেই কার্য্যতঃ এনার্কিষ্ট-সমাজের সামাজিক, এনার্কিষ্টদলের দলভুক্ত। যত দেশের যত গবর্ণমেণ্টের যেরূপ ডাকঘর আছে, এনার্কিষ্টদিগেরও সেইরূপ ডাকঘর আছে। এক শাখার সংবাদ সমাচার অন্য শাখায় যাওয়া আসা করিতেছে। যে সময়ে এক স্থানে কোন অনুষ্ঠান হইতেছে, সেই সময়েই অন্য স্থানে—অতি দূরস্থানেও—তাহার আভাস যাইতেছে। কোন শাখায় কোনরূপ নূতন প্রতিজ্ঞা হইলেই, চারিদিকে তাহার প্রতিধ্বনি হইতেছে। ফ্রান্সে কোন এনার্কিষ্ট উৎপাত করিল, তৎক্ষণাৎ ইউরোপের যত এনার্কিষ্টদলে তাহার খবর হইল। স্পেনের কোন সহরে কোন এনার্কিষ্ট ধরা পড়িল, তৎক্ষণাৎ ইউরোপের সর্ব্বত্র শোকসংবাদ পৌঁছিল। বন্দোবস্তে বিস্মিত হইতে হয়! এনার্কিষ্টদমনের ইউরোপীয় চেষ্টায় তাই আমাদিগকে হতাশ হইতে হয়। দলে পঙ্গপালের পুষ্টি! পলকে পলকে পিল পিল করিয়া এনার্কিষ্ট-পঙ্গপাল বাড়িয়া যাইতেছে! এক জনের ধ্বংসে এক লক্ষের উৎপত্তি! একটার প্রাণদণ্ড হইলে, নূতন এক লক্ষের সৃষ্টি হয়! দল দিন দিন প্রবল হইতেছে। আইন কানুনের কঠোরতায়, শাসন দমনের নিষ্ঠুরতায়, দলের বৃদ্ধিই হইতেছে! প্রেসিডেণ্ট কার্ণোর হত্যার পর ফরাসি গবর্ণমেণ্ট এনার্কিষ্ট-দমনের কঠোরতা বাড়াইয়াছেন, অন্যান্য আইনের তুলনায় এনার্কিষ্টদমনের আইন ঘোরতর রূপ নিষ্ঠুরও হইয়াছে; জর্ম্মণীর আইনেও কঠোরতাবৃদ্ধির ত্রুটি হয় নাই। রুষের ত কথাই নাই, এমন কঠোরতা নিষ্ঠুরতা নাই, যাহা রুষের এনার্কিষ্টদমনে প্রযুক্ত না হয়। কঠোরতায় ইতালি অষ্ট্রিয়াও কুণ্ঠিত নহেন। কিন্তু ফল ত কুত্রাপি হইতেছে না, হিতে বরংবিপরীতই হইতেছে!

প্রতিকার

হইবে না; ইউরোপের সমাজ ও ধর্ম্মে যতদিন দোষ থাকিবে, ততদিন কিছুতেই প্রতিকার হইবে না। ইউরোপের যত গবর্ণমেণ্টই ত এনার্কিষ্টদিগের পথ মুক্ত করিয়া দিতেছেন! পূর্ব্বে ছিল শুদ্ধ ছোরা ছুরি আর বন্দুক পিস্তল; এখন হইয়াছে ডিনামাইট, এখন হইয়াছে ইনক্লার্ণাল মেশীন বা যমের যন্ত্র! ইউরোপের রাজা ও রাজপ্রতিনিধিরা যুদ্ধের জন্যে—সমরক্ষেত্রের শত্রুনিপাতের জন্যে—যে যে উপাদানের সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎসমস্তই এনার্কিষ্টদিগের সাহায্য করিতেছে; পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিল্প ইউরোপীয় সমরের হত্যাপথ মুক্ত করিতেছে, এনার্কিষ্টদিগেরও গুপ্তহত্যাপথ মুক্ত করিয়া দিতেছে! আবার ইউরোপীয় শ্রমজীবীদিগের জন্যেই এনার্কিষ্টদলের পুষ্টি হইতেছে; সাম্যবাদ শ্রমজীবীদিগকে স্বস্ব অবস্থায় অসন্তুষ্ট করিতেছে। অসন্তুষ্ট শ্রমিক সোশালিষ্ট হইতেছে; সোশালিষ্ট শ্রামিক এনার্কিষ্ট হইতেছে। মজুর মিস্ত্রীদিগকে তুষ্ট করিবার জন্যে ইউরোপের যত গবর্ণমেণ্টই প্রাণপণ করিতেছেন, কিন্তু ফল হইতেছে না; তুষ্টিচেষ্টা যত বাড়িতেছে, অসন্তোষ তত ই বাড়িতেছে। যত রাজনীতিকেরই ভয় হইয়াছে, হয় ত কিছুদিনের মধ্যে ইউরোপের যত শ্রমজীবীই এনার্কিষ্ট হইয়া পড়িবে! ভয় অমূলক নহে!

শাসন দমনে

ফল হইবে না, আইন কানুনে—শাস্তি দণ্ডে—ফল হইবে না। যাহাতে প্রতিকার প্রকৃতপ্রস্তাবে হইবে, তাহাতে ইউরোপের মন যাইবে না; প্রকৃত প্রতিকারের ধারণা ইউরোপীয় হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না। হিন্দুর কাছে খৃষ্টান শিক্ষা লইবেন না, লইতে পারিবেন না। ইউরোপের ধর্ম্মে ও সমাজে যদি হিন্দুর উপদেশ শিরোধার্য্য হয়, তাহা হইলেই প্রতিকার হইতে পারে। হিন্দু যেরূপ পূর্ব্বজন্মে—কর্ম্মফলে—প্রারব্ধে—বিশ্বাস করে, ইউরোপের

সকল খৃষ্টান যদি সেইরূপ বিশ্বাস করিতে পারে, তাহা হইলেই প্রতিকার হইতে পারে! "আমার অদৃষ্টে আছে, তাই আমি কষ্ট পাইতেছি; অদৃষ্টে ধন নাই, তাই আমি গরীব হইয়াছি। আমার প্রতিবেশীর অদৃষ্টে সুখ আছে, তাই তাহার সুখ হইয়াছে; তাহার অদৃষ্ট ধন আছে, তাই সে ধনী হইয়াছে; আমার হাত নাই, মানুষের হাত নাই।" প্রত্যেক হিন্দুর মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল আছে, হিন্দুসমাজের যত চোয়াড় গোঁয়ার মূর্খ নির্ব্বোধও এই বিশ্বাসে চালিত হইতেছে; তাই হিন্দুসমাজে সাম্যবাদের আদর নাই, অবসর নাই; সুতরাং হিন্দুসমাজে সোশালিষ্ট এনার্কিষ্টের উৎপত্তি হয় নাই। হিন্দুর সমাজ তাই আদর্শসমাজ। কিন্তু ইউরোপের শিক্ষা হইবে না, আর ইউরোপের বিভ্রাটও ঘুচিবে না। ইংরেজ ভারতের রাজা, যাহাতে ভারতে বিভ্রাট না ঘটে, তাহার দিকে তাঁহার দৃষ্টি রাখা উচিত। তাঁহার স্বদেশে যে বিভ্রাটের ভয় হইয়াছে, তাঁহার ভারতে সে বিভ্রাটের ভয় হয় নাই। কিন্তু যতদিন ভারতে হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুশাস্ত্রের আদর প্রতিপত্তি থাকিবে, ততদিনই ভারত অভয়ে থাকিবে। যে দিন ব্যতিক্রম হইবে, সেই দিনই বিভ্রাট ঘটিবে। সাম্যবাদে ইউরোপের সর্ব্বনাশ হইবে। যাহাতে ভারতেও সাম্যবাদের প্রবেশ না হয়, রাজা প্রজা সকলেরই উচিত, প্রাণপণে তাহা করা। হিন্দুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিলেই হিন্দুস্থানও অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

ঘু—ঘু—ঘু!

"ঘু—ঘু—ঘু"—অলক্ষুণে ডাক! কুৎসিত কিম্ভূত কিমাকার—চাকামুখো পেচাটা হইল সুলক্ষুণে আর অমন সুন্দর সুশ্রী ঘুঘু হইল অলক্ষুণে! হিন্দু গৃহিণীর এ কোন্‌দেশী বিচার? বাস্তুভিটায় ঘুঘুর প্রবেশনিষেধ! বনবিহারী বনকপোত হিন্দুর বাসভবনে আসিলেই বিদূরিত হয়! অথচ পায়রা আর ঘুঘু একজাতীয় জীব। ঘুঘু বনকপোত, পায়রা গৃহকপোত। হিন্দুগৃহিণীর কাছে দুই জনের এত তারতম্য কেন? পায়রার যত আদর, ঘুঘুর তত অনাদর! পায়রা লক্ষ্মীর সাথী, ঘুঘু অলক্ষ্মীর চেড়ী! সুলক্ষণ আর কুলক্ষণের জন্যেই তারতম্য; কুলক্ষণ বনকপোতের প্রতি বিদ্বেষ, সুলক্ষণ গৃহকপোতের প্রতি অনুরাগ। রূপে কি করে, গুণেই যে গৌরব গরিমা! কুৎসিত কুরূপ পেচক যে, লক্ষ্মীর বাহন! তাই ত তাহার অত সম্মান। লক্ষ্মীপেচার আদর হইবে না ত কি কালপেচার আদর হইবে? কালপেচাও পেচা বটে, কিন্তু সে যে, অলক্ষ্মীর বাহন। ঘুঘু আর পায়রা, দুই জনেই এক বংশে জন্মিয়াছে সত্য, কিন্তু লক্ষণের তারতম্যেই যে, তারতম্য হইয়াছে। অলক্ষ্মীও ত লক্ষ্মীর সহোদরা! কেন তবে অলক্ষ্মীর মূর্ত্তি গোবরে গড়িতে হয়? দেব দানবও ত এক পিতার ঔরসজাত। কেন তবে দুই জনে স্বর্গমর্ত্তপ্রভেদ?

যেমন সুর অসুর, যেমন লক্ষ্মী অলক্ষ্মী; সেইরূপই লক্ষ্মীপেচা কালপেচা, সেইরূপই পায়রা আর ঘুঘু। কাক কোকিল এক বাসায় প্রতিপালিত হয়, এক আহারে পুষ্ট হয়, তথাপি কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ। যেমন কাক আর কোকিল, সেইরূপই ত ছাতারে আর পাপিয়া। ব্রাহ্মণ চণ্ডালে প্রভেদ! কুকুর মানুষের অত প্রিয়, আর শৃগাল সম্মুখ পড়িলেই দূর দূর! অথচ মূলে দুই এক! মৎস্যসমাজে ত অসংখ্য দৃষ্টান্ত। কই খলসে, মাগুর শিঙ্গী, লেটা চ্যাঙ, শোল শাল, চিতল ফলুই, আড় পাঙ্গাশ, তপসে কইভোলা, বাচা গড়চা; রূপে ত প্রায়ই সাম্য, গুণেই না যের বৈষম্য। এক দল খাদ্য, অন্যদল অখাদ্য। সকল জীবেই এইরূপ। মাছী যে, মাছী, তাহারও হাড়ী মুচি আছে; শুয়ে মাছীই ত হাড়ী-মাছী। মেথর ভোমরা—গুবরে পোকা। গুবরে বরং রূপে শ্রেষ্ঠ, গুণে কিন্তু অপকৃষ্ট।

ঐ আবার ডাকিল, ঘু—ঘু—ঘু! সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাস্তুভিটায় ঘুঘুর ডাক; অলক্ষ্মীর দূত স্বয়ং আগত। ঐ গো অলক্ষ্মীর নকীব কুকরাইতেছে! দূর—দূর—দূর; কোঁটা মারো! ঘুঘু যে, ভিটায় চরে! যে ভিটায় আজ ঘুঘু চরিবে, দিন কতক পরে যে, সেই ভিটায় লোকে সরিষা বুনিবে! অমন অশুভ পাখীকেও কি স্থান দিতে আছে?

হইলই বা কপোতের ভাই, তার মুখে ছাই! অসুরও ত সুরের ভাই! নিজের গুণে কপোত প্রিয়, নিজের দোষে ঘুঘু অপ্রিয়। যেখানে লক্ষ্মীর অনুগ্রহ, ষষ্ঠীর কৃপা; কপোত সেইখানেই থাকিতে ভাল বাসে। যেখানে লক্ষ্মী ষষ্ঠীর নিগ্রহ, ঘুঘুর আনন্দ সেইখানে। যত জনশূন্য ভগ্নভবনই ঘুঘুর লীলাক্ষেত্র, আর ধনধান্যপূর্ণ পুত্রপৌত্রাদিশোভিত বাসভবনই কপোতের প্রিয় নিকেতন। মেলেরিয়ার জন্যে যত অশুভ জন্তুর মাহেন্দ্রযোগ উপস্থিত হইয়াছে। গ্রাম পল্লী যখন জনপূর্ণ ছিল, গ্রামের যত বাড়ীতেই যখন লোক জনের আধিক্য ছিল, সকল বাড়ীতেই যখন ধন ধান্য ছিল, আনন্দ উৎসব ছিল, তখন গ্রামে ছিল পায়রার আধিপত্য, সকল বাড়ীতেই ছিল পায়রার বাসা। এমন দালান ছিল না, যাহা কপোতে পূর্ণ ছিল না। আনিতে হইত না, পুষিতে হইত না, কপোত কোথা হইতে আসিয়া জুটিত, বাসা করিত; পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বসবাস করিত। মেলেরিয়ার জন্যে গ্রাম পল্লী উৎসন্ন গিয়াছে, যত বাসভবন শূন্য পড়িয়া আছে। এখন আর কুত্রাপি কপোতের বসবাস নাই, গতিবিধি নাই, সর্ব্বত্রই দেখিবে ঘুঘু চরিতেছে; গৃহকপোত গৃহত্যাগী হইয়াছে, বনকপোত আসিয়া গৃহবাসী হইয়াছে। দেখিবে দিবসে পাড়ার ভিতর শৃগাল বেড়াইতেছে, বাড়ীর ভিতর আসিয়া বিচরণ করিতেছে। এরূপ অশুভ

দৃষ্টি যে, হিন্দুর অসহ্য! কিন্তু চারা নাই। যেখানে মেলেরিয়া ঢুকিয়াছে, সেইখানেই এই দশা! চিরপ্রিয় গৃহস্থ কুকুর এখন গঙ্গাবাসী হইয়াছে। তাহার সে আকৃতি নাই, সে প্রকৃতি নাই। গৃহস্থ সারমেয় এখন হইয়াছে শ্মশানের যমদূত। কুকুরের কুকুরত্ব গিয়াছে, এখন সে শৃগালের অধম হইয়াছে। এখন সে আর পাতের ভাতের জন্যে লালায়িত নহে, শবের লোভে বসিয়া থাকে! যমের নিগ্রহ বাড়িয়াছে, যমদূতেরও বৃদ্ধি হইয়াছে। গৃহবাসী কুক্কুর শ্মশানবাসী হইয়াছে, আর বনবাসী শৃগাল গৃহবাসী হইয়াছে! সুলক্ষণ কুলক্ষণ কি আর গাছের ফল—না নদীর জল? আকার প্রকার আচার ব্যবহারেই সুলক্ষণ কুলক্ষণ দেখা যায়—বুঝা যায়।

পায়রার জাতি ঘুঘুর কি আর সেরূপ আছে? কপোতের শ্রী কি ঘুঘুতে দেখিতে পাও? কপোত, কোকিল, কুক্কুর, কই দেখিতে যেমন সুন্দর; ঘুঘু, কাক, শৃগাল, খলসে কি তেমন? এইখানেই দেখিবে "যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি।" গুবরে পোকার রূপটাও ত গুণের জন্যে মাটী হইয়া গিয়াছে। দেখিলেই ঘৃণাবোধ হয় না কি? ডাকেও যে, প্রভেদ হইয়া গিয়াছে! পায়রার বক বকম কেমন মধুর! আর ঘুঘুর?—ঘু—ঘু—ঘু—শুনিলেই কাণ জ্বলিয়া উঠে! কোকিলে কাকে ত কথাই নাই। কুক্কুরের ডাকে আনন্দ হয়, আর শিয়ালের ডাকে আতঙ্ক!

পাশ্চাত্য বিচারে বিড়ম্বনার বাড়াবাড়ি! তাই ঘুঘু কন্দর্পের চর! পাশ্চাত্য প্রেমিকের যেমন কন্দর্প, তেমনই কন্দর্পের চরও। একটা কাণা ছেলে যাহার কন্দর্প, তাহার কন্দর্পচর যে, ঘুঘুই হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? যেমন রাজা, তেমনি চর! কাণা কন্দর্পের কাছে রূপের বিচার ত পাইবেই না, গুণের বিচারই বা পাও কোথায়? কাফরি ওথেলোর জন্যে উর্ব্বশীশ্রেষ্ঠা দেস্‌দেমোনা পাগলী। আমাদের কন্দর্প ঠাকুর নিজে যেমন রূপবান্ গুণবান, তাঁহার রতিও সেইরূপ। তাঁহার চর ঋতুরাজ বসন্ত, তাঁহার ধনুক কোমল কুসুমে প্রস্তুত। তাঁহার বাণ কুসুমমুকুল। তিনি রূপ গুণ দুই দেখিয়া তবে যুবক যুবতীর মিলন করিয়া দেন। যেমন শ্রীকৃষ্ণ, তেমনই শ্রীরাধিকা, যেমন রামচন্দ্র তেমনই সীতা, যেমন নল তেমনই দময়ন্তী, যেমন অর্জ্জুন তেমনই দ্রৌপদী, যেমন দুষ্মন্ত তেমনই শকুন্তলা। কৃষ্ণও কালো বটেন, কিন্তু তিনি যে, জগতের আলো। অমন কালো ত পেলে হয়! কাণা কন্দর্পের কেলে কাফরি আর রতিপতির কৃষ্ণচন্দ্র; প্রভেদের যে, ভেদ করা যায় না! কালো হইলেই হয় না, পাকা জামও কালো; আর ধলআঁকড়া গাছের পাকা আঁবফলও কালো। কিন্তু কালো জাম অমৃত—অমৃতের মালাই দই, আর ধলআঁকড়োর কালো ফল—দুর্গন্ধ—দুর্গন্ধ! টেকা দায়!

পাশ্চাত্য কন্দর্পের চর বলিয়া পাশ্চাত্য কবির কাছে ঘুঘুর কত আদর! সে আবার পাশ্চাত্য যুবক যুবতীকে প্রেম শিখায়! পাশ্চাত্য যুগল ঘুঘু দেখিলে পাগল! হাস্যসংবরণ করা যায় কি? কুঁজী যদি দূতী হয়, তাহা হইলে আমরা উর্ব্বশী মেনকার সঙ্গেও প্রেম করিতে রাজী হই না। অষ্টাবক্র মুনি পুরোহিত হইলে, এত বয়সেও আমরা আইবড়ো থাকিতে প্রতিজ্ঞা করি। ঘুঘু হইবে কামদেবের চর, আর তাহার পরামর্শে পিরীত করিতে হইবে! কাকের ডাক শুনিয়া বসন্তের অভ্যর্থনা করিতে হইবে! অমন দূতের মুখে ছাই, অমন কন্দর্পের বদনে ভস্ম, অমন পিরীতেরও আস্যে পাংশু। যেমন উনুনমুখো দেবতা, তাকে দিতে হয় তেমনি ঘুঁটেপোড়া নৈবেদ্য। কাণা ছোঁড়া আবার কামদেব! "স্বয়মসিদ্ধঃ কথমন্যান্ সাধয়েৎ?" যে নিজে বাপের জন্মে পিরীত করে নাই, সে আবার পরের পিরীত ঘটাইয়া দিবে? চিরবন্ধ্যা ধাত্রী হইবে?

এসব ভুক্তভোগীর কাজ, অনেক দেখিলে শুনিলে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে অভিজ্ঞতা বলে। এক কালের রোগী আর কালের রোজা। যে নিজে সাঁতার জানে না। সে কি পরকে সাঁতার শিখাইতে পারে? পাঁচ বছরের অন্ধশিশু কন্দর্পের আসনে বসিয়া জগৎশুদ্ধ যুবক যুবতীর মিলন করাইয়া দিবে, ইহা যে, পাগলের কথা!

আমাদের কন্দর্প ঠাকুরকে কত কাণ্ড করিয়া তবে অভিজ্ঞতালাভ করিতে হইয়াছে। অনেক সাধ্য সাধনা ভজনা আরাধনা করিয়া তবে তিনি রতিদেবীর মন ভুলাইতে পারিয়াছিলেন। শিক্ষানবিশী করিতে হইয়াছিল অনন্তকাল। রতিমিলনেই ত রতিপতির প্রেমশিক্ষা হইয়াছিল। উপদেশে দৃষ্টান্তে আর হাতে-কলমে শিক্ষা হইয়াছিল, তবে ত কন্দর্প প্রেমের কাজে—মিলনের কাজে—দক্ষ হইয়াছিলেন।

অত শিক্ষান্তেও কন্দর্পকে শিবের বেলায় বিপদে পড়িতে হইয়াছিল, পুড়িয়া মরিতে হইয়াছিল। বোধ হয় শিবকে গিরিবালার রূপে মোহিত করিতে না পারিয়াই রতিপতি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন! হয়ত প্রেমকার্য্যে অভিজ্ঞতালাভ করিবার তরে শিবেরই তুষ্টি করিতে বসিয়াছিলেন—তাই পঞ্চতপা করিয়াছিলেন; আর পঞ্চতপার অনলেই নিজের দেহ নিজে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

শিবের মত ত আর শিক্ষক নাই। যিনি উলঙ্গদেহে ভিক্ষুকবেশে—ভস্মমাখা গায়ে—ষাঁড়ে চড়িয়াও, দক্ষসুতাকে ভুলাইয়াছিলেন, তাঁহার মত প্রেম-শিক্ষক আর কোথায় পাইবে? আবার ভুলানো বলিয়া ভুলানো, জন্মদাতা পিতা জামাতা শিবের তেমন আদর করেন নাই বলিয়া দাক্ষায়ণী আত্মহত্যা করিয়াছিলেন! বাপ! কি ভয়ঙ্করী ভালবাসা! দ্বিতীয় পক্ষে—বুড়া বয়সে—যিনি গিরিবালাকে মজাইয়াছিলেন, প্রেম-শাস্ত্রে তাঁহার মত

গুরু আর ত জগতে নাই। সপত্নীসত্ত্বেও গঙ্গা যাঁহার গুণে মজিয়া জটার ভিতর ঢুকিয়াছিলেন, তিনি যে, পিরীতবিদ্যায় বৃহস্পতির বাবা, এক নম্বরের মহামহোপাধ্যায়, তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? প্রেমদর্শনে পশুপতির মত পণ্ডিত আর নাই, তাঁহাকে স্পেশাল পেন্‌শন দিতে হইয়াছে!

কন্দর্প শেষদশায় ঐ শিব ঠাকুরের কাছেই প্রেমের তালিম লইয়াছিলেন, পিরীতের পুরাতন পাঠ চাহিয়া লইয়াছিলেন। প্রথম শিক্ষায় যে ত্রুটি ছিল, তাহা দ্বিতীয় বারে মিটাইয়া লইয়াছিলেন। কন্দর্প এখন সর্ব্বাঙ্গে অক্ষুণ্ন। আমাদের কন্দর্পই কন্দর্প, কাণা ছেলেটা পিরীতের কি ধার ধারে? কোকিল কপোত পাপিয়া দয়েল শুক শালিক থাকিতে যে বাছিয়া বাছিয়া একটা ঘুঘুকে নিজের দূত করিয়াছে, পবিত্র পিরীতের কাজে দালাল করিয়াছে; তাহার বুদ্ধির আর মাপ লইতে হইবে কেন? আর একটু বয়স হইলে, সে হয়ত ছাতারে বা হাড়িচাঁচা কিংবা কালপেঁচাকেই চর করিয়া বসিবে! বয়স বাড়িলে ত ছাগল বোকাই হয়!

যে ঘুঘু জনশূন্য পরিত্যক্ত ভবনে থাকিতে ভাল বাসে, সে হইবে প্রেমের দূত—মিলনের ঘটক! মিলনে পরিবারবৃদ্ধি, পরিবারবৃদ্ধি হইলে ভবন জনপূর্ণ! জনপূর্ণ ভবনে ঘুঘুর বিদ্বেষ! অথচ পাশ্চাত্য কন্দর্পের সেই নকীব! নিশ্চিত পাশ্চাত্য কন্দর্পটা মেলথসের শিষ্য, প্রজাবৃদ্ধির ঘোর বিদ্বেষী। তাই অন্ধ, যুগলের যোগ্যতা না দেখিয়া, মিলন ঘটাইয়া দেয়; আবার বংশধ্বংসকারী—ভিটামাটিচাটীকারী—ঘোর স্বার্থপর ঘুঘুকে করিয়াছে নিজের দূত। অমন কন্দর্পকে নমস্কার, অমন মিলনে কাজ নাই, আর অমন দূতকে কেবল কাবাব করিতে হয়। কাবাবেও ত ঘুঘু মন্দ নহে! আমাদের তাঁহাকেই নমস্কার! তিনি যে,

"পুষ্পধন্বা রতিপতির্মকরধ্বজ আত্মভূঃ।"

তিনি যে স্বয়ংভু। তাঁহার ভ্রম প্রমাদ নাই, অবিচার অবিবেচনা নাই। যেখানে যে যেমনটি চায়, তাঁহার কৃপায় সেখানে সে তেমনটীই পায়। তাঁহার সুবিবেচনার গুণেই ত পেচার পেচী, বোঁচার বুঁচী; তাঁহার বিচারগুণেই ত যোগ্যা যোগ্যেন যুজ্যতে; তাঁহার নির্ব্বাচনের কল্যাণেই ত দেবের দেবী, দানবের দানবী, কিন্নরের কিন্নরী, বানরের বানরী। কাণা ছোঁড়ার হাতে পড়িলে, আমাদের যে, কি দশাই হইত, তাহা কামদেবই জানেন! কাণা কন্দর্পের অপঘাত হইলেও ত ক্ষতি নাই, বরং ঘুঘুর হাতে নিস্তার পাওয়া যায়। সেই ছোঁড়ার কাছে আদর পাইয়াই ত যত ঘুঘু ভিটায় চরিতেছে; আর দিবারাত্র ডাকিতেছে—"ঘু—ঘু—ঘু!" আ মরণ! তোর মুখে আগুন!

অসভ্য জাতির ধর্ম্ম-সংস্কার।

(১)—এস্কিমো জাতি।

উত্তর মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে,—আমেরিকা মহাদেশের উত্তর ভাগে—সমুদ্রকূলবর্ত্তী প্রদেশসমূহে এবং গ্রীণলণ্ড নামক দ্বীপে এস্কিমো জাতির বাস।

ঐ সকল দেশ অত্যন্ত শীতপ্রধান; বৎসরের অধিকাংশ সময়েই ওখানে নিদারুণ শীত।

এস্কিমোজাতি ঐ সকল শীতপ্রধান এবং তুষারশৈল-সমাবৃত দেশে বাস করিয়া থাকে। বরফ-নির্ম্মিত কুটীরই ইহাদের গৃহ। তিমি ও শীল মৎস্য এবং সিন্ধুঘোটকই ইহাদের জীবনোপায়,—জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান অবলম্বন। শীল মৎস্যের চর্ম্মই ইহাদের প্রধানতঃ গাত্রাবরণ। একপ্রকার কুক্কুরই শিকারে ইহাদের প্রধান সহায়!

এরূপ বর্ব্বরদশাপন্ন হইলেও, আত্মরক্ষায় ইহারা সর্ব্বদাই অতিমাত্র যত্নশীল। কোন বৈদেশিককে ইহারা সহজে স্বদেশে প্রবেশ করিতে দেয় না। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ডেন্মার্কদেশীয় একখানি জাহাজ এস্কিমোজাতি-পূর্ণ ডিস্কো নামক এক স্থানে গিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু এই জাহাজের কোন ব্যক্তিকেই তীরভূমে অবতীর্ণ হইতে হয় নাই; এস্কিমোরা ইহাদের সকলকেই মারিয়া ফেলিয়াছিল। ইহার দুই বৎসর পরে, আরও একখানি জাহাজের যাবতীয় ব্যক্তিকে এইরূপ শোচনীয় দশায় পড়িয়া, প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল।

এই এস্কিমোজাতির ধর্ম্ম-সংস্কার বড়ই কৌতূহলপ্রদ। ইহারা প্রেতযোনির অস্তিত্ব এবং জীবাত্মার অনশ্বরত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। ইহাদের মতে স্বর্গ ও নরক উভয়ই বিদ্যমান আছে। ইহাদের নরক—সূচীভেদ্য চির-অন্ধকারে আবৃত; ভীষণ বরফ-মালায় সমাচ্ছন্ন। এই নরকে অনন্ত কাল ধরিয়া সর্ব্বদাই বরফ-বৃষ্টি হইতেছে; দিবারাত্র অবিশ্রাম নীহার-পাত হইতেছে,—বিশ্বগ্রাসী বরফের ঝড় বহিতেছে; অধিকন্তু এ নরকে একটী মাত্রও শীল মৎস্য দেখিতে পাইবে না!

এঙ্গিকো বা "বৈদ্যরাজের" প্রতি ইহাদের অবিচলিত ভক্তি এবং অটল বিশ্বাস। স্থলে বা সমুদ্রে,—ইহলোকে বা পরলোকে,—যাবতীয় শুভ ঘটনার একমাত্র নিয়ন্তা,—এই এঙ্গিকো। মৃগয়ায় বাহির হইবার কালে, বা পীড়িতের পীড়া-প্রশমন-কল্পে, ইহারা এঙ্গিকোর দ্বারা প্রেত-শক্তির উদ্বোধন করিয়া, শুভ-সম্পাদন করিয়া লয়। এঙ্গিকো বিবিধ অদ্ভুত ইন্দ্রজাল-ক্রিয়া দেখাইয়া, ইহাদের মনোভীষ্ট-সম্পাদন করে। মধ্যে মধ্যে এই এঙ্গিকো প্রেতলোকের বহুবিধ অপূর্ব্ব রহস্য শুনাইয়া, শ্রোতৃগণকে মুগ্ধ করিয়া থাকে।

অইলিয়াউ,—ইহাদের মতে মহাশক্তি-রূপিণী প্রেতিনী।

ইনিই দক্ষিণ হস্তে ভল্লুক, তিমি, শীল মৎস্য এবং সিন্ধু-ঘোটক প্রভৃতির সঞ্চালনক্ষমতা সন্তাড়নদক্ষতা এবং সঙ্করণ শক্তির বিধান করিয়া থাকেন। যখন ভল্লুক, মৎস্য এবং সিন্ধু-ঘোটক প্রভৃতি নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে, তখন এঙ্গিকো, এই অইলিয়াউ প্রেতিনীর নিকট গমন করিয়া, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে আঘাত করে। যদি এই আঘাতে তাঁহার হস্তের নখগুলি মাত্র কাটিয়া যায়, তাহা হইলে, বুঝিতে হইবে, তিনি এইবার ভল্লুকগণকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া দিলেন অর্থাৎ এইবার ভল্লুককুল সুপ্রাপ্য হইবে; তাঁহার অঙ্গুলির প্রথম পর্ব্বের সন্ধিমাত্র কর্ত্তিত হইলে, বুঝিতে হইবে, এইবার ক্ষুদ্র শীল-মৎস্য-মাত্র সুপ্রাপ্য হইবে; দ্বিতীয় পর্ব্বের সন্ধি কর্ত্তিত হইলে বুঝিতে হইবে, এইবার বৃহৎ শীলমৎস্য সুপ্রাপ্য হইবে; অঙ্গুলির মূল-সন্ধি কর্ত্তিত হইলে, সিন্ধুঘোটককুল সহজ-প্রাপ্য হইবে এবং সমগ্র হস্ত বিচ্ছিন্ন হইলে বুঝিতে হইবে, তিমিকুল সুপ্রাপ্য হইবে। এঙ্গিকো নানারূপ বিচিত্র উপায়ে এই সকল প্রক্রিয়ার সাধন করিয়া থাকেন।

অইলিয়াউ—দীর্ঘকায়;—ইহাঁর কেবল একটী মাত্র চক্ষু। ইহাঁর একটী লাঙ্গুল আছে। এই লাঙ্গুল মনুষ্য-চরণের ন্যায় দীর্ঘ এবং ইহাঁর জানুদেশ পর্য্যন্ত ইহা লম্বিত। একখানি মনোরম গৃহে ইনি বাস করিয়া থাকেন; একটি ভয়ঙ্কর কুক্কুর এই গৃহের প্রহরী। এই কুক্কুর লাঙ্গুলহীন এবং ইহার পশ্চাদ্‌ভাগ নিবিড় কৃষ্ণ-বর্ণ। ইহাঁর পিতা কিন্তু অতি অল্পবয়স্ক, দেখিতে যেন দশ বৎসরের বালকটী; তাঁহার একটীমাত্র হাত; তাহাও সর্ব্বক্ষণ ভল্লুক-চর্ম্মাবরণে আবৃত।

এঙ্গিকো যেমন শুভফল ও শুভাদৃষ্টের বিধাতা, আইসিণ্টোক তেমনি অশুভকর্ম্মের ও অশুভাদৃষ্টের নিয়ন্তা। এঙ্গিকোর উপর এস্কিমোদের যেরূপ অগাধ ভক্তি, আইসিণ্টোকোর উপর ইহাদের তেমনি বিষম অভক্তি,—ভয়ঙ্কর বিদ্বেষ! স্থলে বা জলে,—ইহ এবং পরলোকে যাহা কিছু অনিষ্ট অমঙ্গল সাধিত হইতেছে, ঘটনা-পরম্পরার যাহা কিছু পরিবর্ত্তন হইতেছে,—ইহাদের মতে এই আইসিণ্টোকোই তাহার একমাত্র নিয়ামক।

এই অসভ্য এস্কিমোদের দেশে, এখন পাদরিগণ গিয়া, ধর্ম্ম-প্রচার করিতেছেন! বহু এস্কিমো খৃষ্টান হইয়াছে।

---

(২) ফিজিদ্বীপবাসী।

আমেরিকার পশ্চিমদিকে—প্রশান্ত মহাসাগরে ফিজি দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর তারিখে ফিজি দ্বীপ-বৃটিশ রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়। একজন ইংরেজ গবর্ণরের উপর এ দ্বীপের শাসনভার সমর্পিত আছে। বহু ইংরেজ এক্ষণে এই দ্বীপে আশ্রয় লইয়াছেন। দ্বিশতাধিক ক্ষুদ্র দ্বীপের দ্বীপমালায় ফিজিপুঞ্জ সংগঠিত; ইহার মধ্যে ৮০ মাত্র দ্বীপে মনুষ্যের বাস আছে। ১৮৯২ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের গণনানুসারে এই দ্বীপের সর্ব্বসমেত লোকসংখ্যা এক লক্ষ পঁচিশ সহস্রের কিছু অধিক।

অসভ্য ফিজিবাসিগণ বহু সংখ্যক দেব দেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকে। এই সকল দেবদেবীর শক্তি-সামর্থ্য, সম্মান-সম্ভ্রমের সবিশেষ তারতম্য আছে। অর্থাৎ কেহ ছোট কেহ বড়; কেহ সম্ভ্রান্ত কেহ ইতর। প্রত্যেক ফিজীয় এক একটী স্বতন্ত্র দেবতার শাসনাধীন; তাহাদের প্রত্যেকেরই প্রায় এক একটী করিয়া ঘরকরা দেবতা আছে। সজীবই হউক আর নির্জ্জীবই হউক, পৃথিবীর বহু পদার্থকেই তাহারা এইরূপ দেবতা বলিয়া সম্মান এবং পূজা করে।

পৌরোহিত্যের আদর ইহাদের মধ্যে বড় বেশী। পুরোহিত না পাইলে, কোন ফিজীয়ই, কোন দেবতার নিকট যাইতে পারে না; কোন দেবতার অনুগ্রহলাভে সমর্থ হয় না। পুরোহিতগণেরও একাধিপত্য! যজমানের কাজে যথেষ্ট উপার্জ্জনও হইয়া থাকে। কোন গুরুতর আবশ্যক কার্য্য করিতে হইলে, পুরোহিতগণ প্রকাণ্ড ফর্দ্দ দিয়া থাকেন; ছোট কাজে ছোট ফর্দ্দ দেন। কোন অত্যন্ত গুরুতর প্রয়োজনীয় ঘটনার ফল জানিবার প্রয়োজন হইলে, তিমি মাছের দাঁত এবং বহুপরিমাণে খাদ্য দ্রব্য পুরোহিতের নিকট ভেট দিতে হয়। পুরোহিত এই উপঢৌকন না পাইলে, দেবতার নিকট যজমানের অভীষ্ট জানাইতে বা যজমানের ইচ্ছামত কাজ করিতে চাহেন না। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কর্ম্মে পুরোহিতকে কেবল এক খানি মাদুর, এক গাছা লাঠি, এক গাছ বল্লম, একটা দাঁত বা হরিদ্রা-রঞ্জিত একটা সুপারি দিলেই চলে। পুরোহিত ইহাতেই সন্তুষ্ট; কিন্তু ভেট না পাইলে, দেবতাও তুষ্ট হন না,—পুরোহিতও দেবতার নিকট অগ্রসর হইতে পারেন না। এই ভেটকে ইহারা সোরো বলিয়া থাকে। একবার একজন ফিজীয় সর্দ্দার রণ-দেবতার উদ্দেশে কয়েকটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল; আর প্রচুর পরিমাণে সিদ্ধ খাদ্য, বহু সংখ্যক কচ্ছপ এবং তিমি মৎস্যের দাঁত দিয়া এই রণ-দেবতার পূজা করিয়াছিল।

এই ভেট বা নৈবেদ্যের কতক অংশ দেবতার জন্য পৃথক করিয়া রাখা হয়; অবশিষ্ট অংশ বহু বন্ধুবান্ধব মিলিয়া একত্র ভোজন করে। বলা বাহুল্য, দেবতার উদ্দেশে যাহা পৃথক করিয়া রাখা হয়, পুরোহিতগণই তাহা ভোজন করিয়া থাকেন; বৃদ্ধ ব্যক্তিরাও ইহা ভোজন করিতে পারে।

ইহাদের মতে স্বর্গের পথ বড়ই বিঘ্নসঙ্কুল। প্রধান প্রধান সর্দ্দারেরাই কেবল সহজে স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারে। কাজেই, ইহারা সকলে আপন আপন দেবতার নিকট বলে, আমিই প্রধান সর্দ্দার,—স্বর্গে যাইবার আমার

বিশেষশক্তি এবং অধিকার আছে।" অভীষ্ট দেবও, সেবকের এইরূপ কথায় সহজেই বিশ্বাস করেন এবং বর দেন।

অবিবাহিত ব্যক্তি স্বর্গে যাইতে অধিকারী নহে। যদি কোন অবিবাহিত পুরুষ জোর করিয়া স্বর্গে যাইতে চাহে, তাহা হইলে, নারীরূপিণী আর এক দেবতা আসিয়া পথে তাহাকে আক্রমণ করে এবং খণ্ড বিখণ্ড করিয়া মারিয়া ফেলে। অনবধানতাবশতঃ অনেক সময়ে নারী দেবতা এরূপ অবিবাহিত স্বর্গগমনেচ্ছু ব্যক্তিকেও ছাড়িয়া দেন বটে, কিন্তু এরূপ স্থানে, উক্ত ব্যক্তিকে আর এক দেবের হাতে পড়িতে হয়। ইনি পথের ধারে লুক্কায়িত থাকেন; এবং যেমন ঐ অবিবাহিত পুরুষের জীবাত্মা স্বর্গের পথে অগ্রসর হইতে থাকে, অমনি ঐ লুক্কায়িত দেবতা লাফাইয়া আসিয়া তাহার উপর পতিত হন এবং পাথরের উপর আছাড় মারিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলেন।

ফিজিদ্বীপবাসিগণের ধারণা এই যে, একাকীই মরিতে হইবে বটে, মৃত্যুর হাতে একাকীই প্রাণ সমর্পিত হইবে বটে; কিন্তু প্রেতলোকে একাকী যাইতে নাই; একাকী যাওয়া অনুচিত, এবং অতিমাত্র শঙ্কাপ্রদ। কাজেই, কোন ফিজিয়ান সর্দ্দারের মৃত্যু ঘটিলে, তাহাকে একাকী সমাহিত করা নিয়ম নহে। এই ব্যক্তির যতগুলি পত্নী থাকে, তাহাদিগের সকলকেই মৃত পতির সহিত সজীবনে এক সমাধিতে নিহিত করা হয়; কোন কোন স্থলে পত্নীদিগের প্রথমে হত্যা করিয়া পরে সমাধি করা হইয়া থাকে। কিন্তু স্ত্রীলোকে যদি প্রেতের সহিত যুদ্ধ করিয়া, আপন পতিকে রক্ষা করিতে না পারে,—এই আশঙ্কায় অন্য একজন অতিসাহসী সশস্ত্র যোদ্ধা বীর পুরুষকেও হত্যা করিয়া, ঐ মৃত সর্দ্দারের সমাধিতে নিক্ষিপ্ত করা হইয়া থাকে। বিশ্বাস এই যে, এই বীরপুরুষ অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া প্রেতলোকে অগ্রে অগ্রে গমন করিবে; এবং তত্রত্য যাবতীয় শয়তান বা প্রেতগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া, মৃত সর্দ্দার ব্যক্তির পথ নির্ব্বিঘ্ন করিয়া দিবে। সমাধির সর্ব্ব নিম্নে এই যোদ্ধপুরুষকেই সমাহিত করা হয়। সজীবনে সমাহিত হইতে, এরূপ কোন বীরপুরুষই বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না; পরন্তু নিজ বাহুবলে মৃত ব্যক্তির পথ নিরাপদ করিয়া দিতে পারিবে, এই মহীয়সী শ্লাঘার আকাঙ্ক্ষায় স্বেচ্ছায়—সানন্দে,—প্রাণের মায়া ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়।

জরাজীর্ণ প্রাচীন এবং অকর্ম্মণ্য ব্যক্তির ইহ-লোকে জীবনের আর প্রয়োজন কি? কাজেই, স্ত্রীই হউক, আর পুরুষই হউক, এরূপ বার্দ্ধক্য-দশাগ্রস্ত হইলেই, তাহাদের ইহলোক হইতে অপসারিত হওয়াই কর্ত্তব্য,—ইহাই ফিজিদ্বীপবাসী আদিম বর্ব্বরগণের বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাসেই তাহারা কার্য্য করিয়া থাকে। পিতা মাতা বা ভগিনী ভ্রাতা,—এরূপ স্থবির হইলে, তাহা-দিগকে সজীবনে সমাহিত করা হইয়া থাকে। ইহাতে ইহাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র মনোবেদনা বা সঙ্কোচভাব দেখা যায় না। বরং কোন আত্মীয় ব্যক্তি এরূপ ভাবে কার্য্য করিতে,—বৃদ্ধ পরমাত্মীয় বা পরমাত্মীয়াকে এরূপ ভাবে সমাধিস্থ করিতে ইতস্ততঃ করিলে বা সঙ্কুচিত হইলে, বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা তাহাকে উৎসাহিতই করিয়া থাকে। ইহাদের বিশ্বাস, দেহে কিঞ্চিৎ পরিমাণে, কার্য্যশক্তি বর্ত্তমান থাকিতেই কবরস্থ হওয়া উচিত। তাহা হইলে, প্রেত-লোকে সহজে প্রবেশ করিতে বা প্রেত-যুদ্ধে জয়ী হইতে পারা যায়।

ফিজিদ্বীপেও এক্ষণে মিশনরিগণের প্রবেশলাভ হইয়াছে এবং এই সকল বর্ব্বরোচিত প্রথা ক্রমেই তিরো-হিত হইতেছে।

ভূত নয় বর্ত্তমান।

ভূত প্রেত দেখি নাই, পেত্নী শাঁখচুন্নীর হাতেও পড়ি নাই, কখনও ব্রহ্মদৈত্যের সহিতও সাক্ষাৎ করি নাই। আসলের কথাই কহিতেছি, নকল ভূত ত ভূতই নহে! অনেকে ভূত প্রেত দেখিয়া থাকেন, পাইলে আমরাও রাজী আছি। কিন্তু বাল্যাবধিই আমাদের সাহসটা কিছু অধিক। হয় ত বা এই জন্যেই ভূত দেখাটা আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। অতি বাল্যকালেও আমরা একাকী রাত্রিকালে এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাওয়া আসা করিতাম, পথে শ্মশান না পাই, ভাগাড় পাইতাম; কৈ কখনও ত একটা গোভূতও আমাদের পথে পড়ে নাই; বাল্যকালে ত একটা বাছুর ভূতও দেখিতে পাই নাই! বয়স যখন ১৫।১৬ বৎসর, সে সময়ে এক দিন অনেক রাত্রে নিমন্ত্রণ হইতে আসিয়া দেখিলাম, বাড়ীতে কাহারও সাড়া শব্দ নাই, পাড়ায়ও সাড়া শব্দ নাই। পল্লীগ্রামের রাত্রি, ১০টার সময়েই ১টা! আকাশ হইতে ক্লাকডিমে গোছের আলোক আসিতেছে। খিড়কি দরজা দিয়া বাড়ী ঢুকিলাম, দেখিলাম, এক দিকে যেন কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; লাল কস্তাপেড়ে—ধপ্‌ধপে কাপড় পরা। স্ত্রীলোক বলিয়াই মনে হইল! মনে করিলাম, হয় ত বাড়ীরই কেহ প্রয়োজন উপলক্ষে বাহির হইয়াছেন। কিন্তু দেখিলাম কেহ না, সকলেই যেন মৃতবৎ হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। কেহ যে, অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া যান নাই, কোনই গৌরবের বিষয়। দুর্গাপ্রসন্ন দাদা ও তাঁহার দুই পুত্র যে, এক ভূত বন্ধুর সহিত গ্রাবু খেলিতে খেলিতে, নটাহার নাকি সুরের "ইস্তঁক পঞ্চাশ" শুনিয়া—আর একটা হাতের কয়টা অঙ্গুলি দেখিয়া—মূর্চ্ছিতই হইয়াছিলেন! ভূতের অঙ্গুলি ত আর সহজ অঙ্গুলি নহে। এক একটী

ভূত প্রেতের উপদ্রব ছিল না, তখন ত মেলেরিয়া হয় নাই। তথাপি সন্দেহ হইল, পেত্নীই বটে। যাহা হউক, হাতের লাঠীগাছটা আগে আগে চালাইয়া পেত্নীর কাছে গেলাম; চক্ষু বুজিয়া খুব জোরে এক ঘা বসাইয়া দিলাম। হুড়মুড় করিয়া শব্দ হইল। দেখিলাম, কতকগুলা কঞ্চীর উপর একখানা কস্তাপেড়ে কাপড় শুখাইতেছিল, কঞ্চীর বোঝা দেওয়ালে খাড়া করা ছিল, তাহার উপরই কাপড় শুখাইতে ছিল। যষ্টি-প্রহারে কাপড়শুদ্ধ কঞ্চীর বোঝা পড়িয়া গেল, পেত্নীরও অপঘাত হইল! তাই প্রথমেই বলিয়াছি, আসল ভূত প্রেত বা পেত্নী শাখচুন্নী দেখি নাই; নকল দেখিয়াছি।

দেখিনাই কিন্তু শুনিয়াছি, অনেক অনেকেই বলেন, আমি দেখি নাই, অমুক বলিয়াছে; অমুককে ধরিলে আবার তমুকের উপর বরাত দেন। ভূতের কথায় প্রায়ই এইরূপ বরাত চলে, অনেক স্থলেই দেখিতে পাই, অনন্ত বরাত! দুই এক জন বটে, নিজের দেখা ভূতের কথা কহিয়া থাকেন; এইরূপ স্থলেই সমস্যাটা কিছু শক্ত হয়। তবে, যে স্থলে মুখোপাধ্যায় ভায়ার নবযৌবনের পেত্নী কেবল তাঁহাকে ঘরে একাকী দেখিলেই বাড়ীর সম্মুখের কাঁটাল গাছে বসিয়া থাকে, আর বাড়ীর দাসী আসিয়া তামাক সাজিয়া দিতেছে দেখিলেই পলাইয়া যায়, সে স্থলে সমস্যা বড় শক্ত হয় না; দর্শনের অদর্শনের—আবির্ভাব তিরোভাবের—আগমন পলায়নের—হেতু স্থির করিতে পারা যায়। অন্ততঃ হেতুসম্বন্ধে একটা অনুমানও করিতে পারা যায়। অনেক পেত্নীই আইবড়ো যুবককে একাকী পাইলে দেখা দেয়, যুবকের কাছে আর কেহ থাকিলে দেখা দেয় না। এইরূপ পেত্নীকেই শাঁখচুন্নী বলে, আইবড়ো যুবতী মরিয়াই শাঁখচুন্নী হয়। শাঁখাটা সাবেক আমলে সধবারই একচেটিয়া ছিল, আইবড়ো পেত্নীর তাই শাঁখায় লোভ। শাঁখা চুরি করিতে ভাল বাসে বলিয়াই নাম শাঁখাচোরিণী—তাই শাঁখচুন্নী। যেমন আইবড়ো যুবতী মরিলে শাঁখচুন্নী হয়, সেইরূপ আইবড়ো যুবক—কিন্তু কেবল ব্রাহ্মণ যুবক মরিলে, ব্রহ্মদৈত্য হয়। ব্রহ্মদৈত্যত্বে আর কাহারই অধিকার নাই; বৈদ্যেরও নাই। অন্যদিকে বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণের সমান হইতে চাহিয়াছেন, অনেকটা পারিয়াছেনও; কিন্তু এস্থলে—ব্রহ্মদৈত্যত্বলাভে—কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। স্বতন্ত্রবৈদ্যদৈত্যের অস্তিত্ব আছে কি না, তাহ[illegible] বিনোদ[illegible] মন বলিতে পারেন;

(২) ফিজিদ্বীপবাসী। প্রচার করিয়া- [illegible] চন্দ্রি-

আমেরিকার পশ্চিমদিকে—প্রশান্ত ম[illegible] স্ব কূলের [illegible] যাহা দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। [illegible] নাই, ত[illegible]র

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর তারি[illegible]য় আমাদে[illegible] বৃটিশ রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়। এ[illegible] ছাড়া আরও গবর্ণরের উপর এ দ্বীপের শাসনভার সমর্পি[illegible] বাসও ত ইংরেজ এক্ষণে এই দ্বীপে আশ্রয় লইয়াছে[illegible]ম্পকবৃক্ষে—

না হয় অশ্বত্থ বা এইরূপ কোন পবিত্র বৃক্ষে। ভগ্ন দেবালয়েও কখনও কখনও বসবাস হইয়া থাকে। মেজাজ বড় কড়া, একটুতেই সর্ব্বনাশ করেন! ভূতের মধ্যে মাম্‌দো বড় ভয়ঙ্কর; মুসলমান ভূতকেই মাম্‌দো বলে। তবে সাতগেঁয়ের কাছে মাম্‌দোবাজী চলে না। কিন্তু ভূত-সমাজে সাতগেঁয়ের সংখ্যা বড় অল্প।

বয়সকালেও আমরা ভূত দেখিতে পাই নাই, যেখানে দেখা একান্ত সম্ভবপর, সেখানেও দেখিতে পাই নাই; শ্মশানেও দেখিতে পাই নাই। বারাশতের একটা পুকুরে শবদাহ হইত, দূর বলিয়া মৃতদেহ গঙ্গায় লইয়া যাইতে পারিত অল্প লোকেই; বনষ্টেত ঐ কল-পুকুরেই অনেক শবের দাহ হইত। কৈ নিশীথে একাকী গিয়া সেখানেও ত ভূত প্রেত দেখিতে পাই নাই!

অনেকে বলেন, আমাদের প্রকৃতিটা প্রেতের বড়ই প্রতিকূল। ভূত দেখা যে সে লোকের ভাগ্যে ঘটে না! রাশি নক্ষত্রের উপর অনেকটা নির্ভর করে কিনা, বলিতে পারি না। ঠিকুচী কোষ্ঠি নাই, যে, কোন জ্যোতিষীকে দিয়া পরীক্ষা করাইব! কলেজে পড়িবার সময়ে একবার কয় জনে মিলিয়া স্পিরিট ইনভোক করিতে বসিয়াছিলাম, তখন স্পিরিচুয়ালিজমের বড় ধূম। অনেকে যে, নূতন ব্রতী, নূতন কাকের বাড়াবাড়ি! অধ্যাপকদিগের বিশ্রাম-ঘরেই আমাদিগের স্পিরিট ইনভোক করা চলিতেছিল, সকলকেই চক্ষু বুজিয়া তন্মনস্ক হইতে হইয়াছিল; আমরাও হইয়াছিলাম। মধ্যে কি হইয়াছিল না হইয়াছিল, কিছুই জানিতে পারি নাই। যখন অধ্যাপক সাহেব আসিয়া তাড়া দিয়াছিলেন, তখনই চমক ভাঙ্গিয়াছিল। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, বুঝি স্পিরিট স্বয়ং হাজির! আমরাই যে, মিডীয়ম হইয়া বসিয়াছিলাম! চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম, ভূত নয়—স্বয়ং সাহেব! ইহার পরেও আর দুই একবার ঐরূপ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম, কিন্তু সকল বারেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। স্থির হইয়া গিয়াছিল, স্পিরিটের সহিত আমাদিগের বিরুদ্ধ সম্বন্ধ, অপঙ্করস্তা আর আদ্রকের সম্বন্ধ! প্ল্যাঞ্চেট সকলের হাতেই ঘুরিয়া ফিরিয়া লিখিয়া দেয়, আমাদের হাতে লেখা দূরে থাকুক, প্ল্যাঞ্চেট ঘুরেও না!

এরূপ অবস্থায় প্রেতদর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটিবে কেন? কিন্তু শোনা কথায়ও ত বিশ্বাস করা চলে না। বিলাতী মার্কিণ কেতাবে কাগজে আজ কাল কতরূপ ভূতের কথাই পড়িতে পাই! ভূতের শুভাগমন হইতেছে, দেখাশুনা হইতেছে, কথা বার্ত্তা চলিতেছে, সংবাদপত্রে রিপোর্টে বাহির হইতেছে। বিশ্বাস না কর কি বলিয়া? ছাপার কাগজে সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে, ভাল ভাল লোকে হলপ লইয়া সত্যপাঠ পড়িয়া সার্টিফিকেট দিতেছেন; বিশ্বাস না কর কি বলিয়া? শুদ্ধ কথা বার্ত্তা নহে, দেখা শুনা হইতেছে; আবার ভূতের ফটোগ্রাফ পর্য্যন্ত লওয়া

হইতেছে; অবিশ্বাস কর কোন্ বিচারে? এরূপ প্রশ্নে উত্তর দেওয়া শক্ত—আমাদের পক্ষেও শক্ত। কিন্তু এক উচ্চপদস্থ মার্কিণ জজকে ভূত মানিয়া পদচ্যুত হইতে হইয়াছিল। তিনি বিচারের সময়ে ছাপার নজীর মানিতেন না; কোক কোবরণ প্রভৃতি জজদিগের যে সকল নজীর কেতাবে রহিয়াছে, তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। বড় বড় মৃত জজদিগের স্পিরিট ইনভোক করিয়া, স্পিরিটের কাছে ব্যবস্থা লইয়া, সেই ব্যবস্থাকেই নজীর বলিয়া গ্রাহ্য করিতেন। আর সেই সাক্ষাৎ নজীর অনুসারেই বিচার নিষ্পত্তি করিতেন। এই অপরাধেই তাঁহাকে পদচ্যুত হইতে হইয়াছিল। মার্কিণ প্রধান রাজপুরুষেরা স্পিরিটের অস্তিত্বে—আগমনে সাক্ষাৎকারে—বিশ্বাস করেন না বলিয়াই জজকে পদচ্যুত করিয়াছেন। তবে আর আমাদিগকে দোষী করিবে কি বলিয়া?

মৃত্যুর সময়েই ভূত হইয়া দেখা দিয়া দিয়াছে, এরূপ অনেক লোকের কথা শোনা যায়, পড়াও যায়। আমাদের এক বন্ধুকে তাঁহার এক আশ্রিত প্রতিপালিত বালক নবদ্বীপ হইতে কলিকাতায় আসিয়া দেখা দিয়া গিয়াছিল। বন্ধু পরে জানিতে পারিয়াছিলেন, যে দিন যে সময়ে সে বউবাজারে দেখা দিয়াছিল, ঠিক সেই দিন সেই সময়ে সে নবদ্বীপের বাড়ীতে মরিয়াছিল। সিপাহিবিভ্রাটের সময়ে দুই একজন সেনানী সৈনিকও এইরূপে দূরস্থ আত্মীয় বা আত্মীয়াকে দেখা দিয়াছিলেন। কেহ কেহ কাণপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কেহ কেহ বা অন্যস্থান হইতে বিলাত পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। বেশ মনে আছে, তৎকালের ইংরেজিপত্রে এই সকল কথার আলোচনা হইয়াছিল। মৃত আত্মীয় বন্ধুকে ভূতরূপে দেখা আমাদের ভাগ্যে ঘটে না। কিন্তু মৃত্যুর সময়ে তাহাদিগকে স্বপ্নে দেখা অনেকবার ঘটিয়াছে। অনেকে বলেন, আমাদিগের স্বপ্নেই কার্য্য সাঙ্গ হইয়া যায়, আর আর জনের ঐ স্বপ্নদৃষ্টই চাক্ষুষ হয়। হইতে পারে!

কিন্তু আবার সাক্ষাৎ বর্ত্তমানকেও ভূত বলিয়া মনে হয়, জীবিতকেও ত মৃতের সামিল হইতে হয়। ইংলণ্ডে কি হইয়াছিল, শুনিবে? লেখকপ্রবর লেহণ্ট বলিতেছেন; পশ্চিম ইংলণ্ডে একটী কলব বা আমোদসভা ছিল। সভায় ২৪টী সভ্য ছিলেন। নিয়মই ছিল, ২৪ জনের অধিক সভ্য লওয়া হইবে না। ঐ ২৪ জনের এক জন ছিলেন সভাপতি। সকলেরই নির্দ্দিষ্ট আসন ছিল। একের আসনে অন্যের বসিবার অধিকার ছিল না। এখনও কোন কোন স্থলে এরূপ নিয়ম আছে। আর অনেকের স্বভাবই হইতেছে, যে চেয়ারে বসেন, সেই চেয়ারেই বসিবেন; যে থালায় বা যে পাথরে ভাত খান, তাহাতেই ভাত খাইবেন; যে ঘটী বা গেলাসে জল খান, তাহা ছাড়া অন্য ঘটী গেলাসে মুখ দেওয়া ত দূরের কথা হাতও দিবেন না। ঘরে ত কথাই নাই, পরিবর্ত্ত হইলে বোধ হয় গৃহযুদ্ধ হয়। আসনের জন্যে অনেকে আপিশেও লঙ্কাকাণ্ড করিয়া বসেন! পশ্চিম ইংলণ্ডের উক্ত কলবে ২৪ সভ্যের নির্দ্দিষ্ট আসন ছিল। আবার ২৪ জনেরই ২৪ রকম, ভয় পাছে অদল বদল হয়। নিশ্চিত নাম লেখা ছিল। হয় ত ছবি আঁটাও ছিল; যাঁহার যে চেয়ার, হয় ত তাহাতে তাঁহার চিত্রপটও ছিল। সভাপতির চেয়ার খানি আর ২৩ খানির চেয়ে কিছু উচ্চ ছিল।

প্রতি শনিবার রাত্রে বৈঠক হইত, ব্যতিক্রম হইত না। এক শনিবার এক সভ্য হাজির হন নাই। কলবের কাছেই বাসা, নিতান্ত অসামর্থ্য না হইলে আর অনুপস্থিতি হয় নাই। কেন না, কলবে ত আর লেখা পড়ার কাজ হইত না, প্রবন্ধ পড়িতে হইত না, বক্তৃতাও করিতে হইত না। ইয়ারকির বৈঠক। একটু একটু মদ্যপান চলিত, চুরুট খাওয়া পাইপ টানা চলিত, আর গল্প গুজব হইত।

চাঁদা বরাদ্দ ছিল, হাজির না হইলেও চাঁদা দিতে হইত। এরূপ অবস্থায় কে বল, নিতান্ত অসামর্থ্য না হইলে, এরূপ সভায় গরহাজির হইয়া থাকেন? অতএব, খোঁজ খবর লইতে হইল; অনুপস্থিত সভ্যের কি হইয়াছে, তাহার খবর লইতে হইল। এক জন গিয়া দেখিয়া আসিলেন, জন পীড়িত—শুদ্ধ পীড়িত নহেন, মরমর! বিষাদের একশেষ হইল। অন্য কথা গেল, কেবল ঐ বন্ধুর কথা চলিতে লাগিল। সকল মনেই বিষাদ, সকল মুখেই আক্ষেপ! কিন্তু চেয়ার খানি খালি রহিয়াছে! যাঁহার চেয়ার, তিনি ভিন্ন অন্যের অধিকার নাই। মৃত্যু হইলে চেয়ার বদলাইতে হইবে, নূতন সভ্য নিজের চেয়ার নিজে আনিবেন।

শীতের দেশে সভা, তাহাতে আমোদের সভা; তেইশ ইয়ারের ইয়ার্কীর সভা; দরজা ভেজানই রহিয়াছিল। হঠাৎ কে দরজা ঠেলিয়া ভিতরে আসিলেন, আসিয়া সেই খালি চেয়ারে বসিলেন। সকলেই দেখিলেন, সেই বন্ধুই বটেন। কি সর্ব্বনাশ! যিনি মরমর, এখন তখন; যাঁহার শ্বাস হইয়াছে, মুহূর্ত্তমাত্রও যিনি আর ইহলোকে তিষ্ঠিতে পারেন না; ইনি যে, তিনিই; সেই বন্ধু! ২৩ জনেই স্তম্ভিত—নিস্তব্ধ—নির্ব্বাক্। আমরা হইলে, ওরূপ সভায় ওরূপ সাজ সরঞ্জাম সম্মুখে থাকিলে, নিশ্চিতই কথা কহিতাম; সাক্ষাৎ ভূত হইলেও বন্ধুর সহিত কথা কহিতাম। বিলাতী বন্ধুদিগকে ত প্রশংসা করিতে পারিলাম না। যাহাই হউক, কথা বার্ত্তা তাঁহারা কহিতে পারিলেন না, সকলেই যেন মৃতবৎ হইয়া বসিয়া রহিলেন। কেহ যে, অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া যান নাই, ইহাই গৌরবের বিষয়। দুর্গাপ্রসন্ন দাদা ও তাঁহার দুই বন্ধু যে, এক ভূত বন্ধুর সহিত গ্রাবু খেলিতে খেলিতে, তাহার নাকি সুরের "ইস্তঁক পঞ্চাশ" শুনিয়া—আর একটা হাতের কয়টা অঙ্গুলি দেখিয়া—মূর্চ্ছিতই হইয়াছিলেন! ভূতের অঙ্গুলি ত আর সহজ অঙ্গুলি নহে। এক একটী

অঙ্গুলি যেন এক একটী প্রকাণ্ড পাকা শাল মাছ! গন্ধও আঁষটে! বিলাতের তেইশ বন্ধুকে ইহাঁদের তুলনায় সাহসী বলিতে হইবে!

কিয়ৎকাল পরেই কিন্তু বন্ধু আবার আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন। বসিয়া তিনিও একটী কথা কহেন নাই। যাইবার সময়েও কথা কহিলেন না! অনতিবিলম্বে তেইশ বন্ধুও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। পর দিন প্রাতেই খবর পাইলেন, রাত্রে যে সময়ে—প্রায় দ্বিপ্রহরের পর —(কেন না, ঐ সময়েই ভূত প্রেতেরা বিচরণ করিয়া থাকেন!) বন্ধু কলবে আসিয়াছিলেন, প্রায় সেই সময়েই মারা গিয়াছেন! সকলেই বুঝিলেন, পূর্ব্ব রাত্রে ভূত লইয়া মজলিস করিয়াছিলেন। কথা চারি দিকে রটিল! দিন কতক খুবই হৈচৈ হইল। অবিশ্বাস করিবার যো নাই, তেইশ জন গণ্য মান্য বিদ্বান লোকের সাক্ষ্য। চাক্ষুষ প্রমাণ! বোতল গেলাসকেও দোষী হইতে হইল না! ভৌতিক মজলিসের কথা যত সংবাদপত্রেও উঠিল। বোধ হয় এখানকার বাজারেও আসিয়াছিল!

ক্রমে কথা লোকের বিস্মৃতির তলে পড়িল, সংসারের নিয়মই এইরূপ! বন্ধুরাও বন্ধুভূতের কথা ভুলিয়া গেলেন! মজলিস নিয়মিতরূপে চলিতে লাগিল। খালি পদে আর এক জন গৃহীত হইলেন। তিনি নিজের আসন লইয়া গেলেন। পুরাতন খানার দশা কিরূপ হইল না হইল, বলিতে পারি না। কেন না, লেখক লেহণ্টও বলেন না—যাহা হউক, মাসের পর মাস আসিল গেল; বৎসরের পর বৎসর আসিতে লাগিল, যাইতে লাগিল। কয়েক বৎসরই চলিয়া গেল! সেদিনকার সেই তেইশ সভ্যের ভিতর একটী ডাক্তার-সভ্য ছিলেন। অনেক দিন পরে তাঁহাকে একটী বৃদ্ধার চিকিৎসায় যাইতে হইল। বৃদ্ধা পূর্ব্বে রুগ্ন-সেবিকার কার্য্য করিতেন, অনেক মৃত্যুশয্যায়ও শুশ্রূষা করিয়াছেন। এখন নিজে মৃত্যু-শয্যায়! কিন্তু মনে শান্তি নাই! ডাক্তারকে চিনিতেন; তিনি যে, ঐ চতুর্ব্বিংশ-কলবের সভ্য, তাহাও জানিতেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "দেখুন ডাক্তার মহাশয়, আমার মনে একটা বড় গুরুতর গুপ্তকথা আছে, আপনাকে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। না বলিলে পাপভার আমাকে পরলোকেও লইয়া যাইতে হইবে! দেখুন, সেই যে, অমুক আপনাদের কলবের সভ্য ছিলেন, তিনি নিজেই আপনাদের মজলিসে উপস্থিত হইয়াছিলেন, মরিবার পূর্ব্বেই কলবে গিয়াছিলেন।"

ডাক্তার অবাক! মনে করিলেন, নিশ্চিত বুড়ীর প্রলাপ! বলিলেন, "আমিই যে, নিজে দেখিয়া আসিয়াছিলাম, তিনি মরমর, মরিতেছেন।"

বৃদ্ধা—"তা বটে। কিন্তু আপনাদের মনে আছে ত মিআই রুগ্নসেবিকা হইয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছিলাম।"

ডাক্তার—"তা মনে আছে।"

বৃদ্ধা—"আমি হঠাৎ একবার বাহিরে গিয়াছিলাম, ঘরে আর কেহই ছিল না। জানেন ত আপনাদের বন্ধুর তখনও বিবাহ হয় নাই। বোধ হয় আমি আধঘণ্টা আন্দাজ স্থানান্তরে ছিলাম। আসিয়া দেখিলাম, রোগী শয্যায় নাই, ঘরেও নাই! ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম! কি হইল, কোথায় গেল? এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়ে রোগী বাহির হইতে ঘরে ঢুকিয়া শুইয়া পড়িলেন, আর তাহার দুই চারি মিনিট পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল! আমি জানি, তিনি প্রলাপের ধমকেই উঠিয়া কলবে গিয়াছিলেন। যাইবার পূর্ব্বে ক্রমাগত কলবের কথা কহিয়াছিলেন, বৈঠকের কথা কহিয়াছিলেন; শেষে বিকারের জোরেই নিজে কলবে গিয়া পড়িয়াছিলেন। আমি শুদ্ধ আইনের ভয়ে এত দিন একথা কাহাকেও কহি নাই, আজ আপনাকে কহিলাম; আমারও মৃত্যু উপস্থিত বলিয়া।"

ভূত উড়িয়া গেল, বর্ত্তমানই বাহাল হইল। বিকারের ধমকে লোকে যে, মৃত্যুর পূর্ব্বেও চলা বিলা করিতে পারে, করিয়া থাকে, তাহা সকলেরই জানা আছে। আর যেখানে যাহার বড় টান, সে যে, এরূপ অবস্থায় সেইখানেই যায়, তাহাও বোধ হয় অনেক পাঠকের দেখা আছে। নৃসিংহ-ভায়া বোধ হয় এই জন্যেই বলেন, সকলের উচিত নিমতলা ঘাটে মজলিস করা। তাঁহার বিশ্বাস, তাহা হইলে আর কাহারই গঙ্গাপ্রাপ্তি পক্ষে ব্যতিক্রম হইবে না। নিমতলা ঘাটে কি তত টান হইবে? আর সকলেই কি প্রলাপে মরিবে? হয় বটে, অত্যাসক্তির ফল এইরূপ! ভরত ঋষি যে, "হরি হরি" করিতে পারে নাই, "হরিণ হরিণ" করিয়া মরিয়াছিলেন; হরিণশাবকটী যে, তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ভাগ্যে "মৃগ মৃগ" না করিয়া "হরিণ হরিণ" করিয়াছিলেন, তাই ত ঋষিজীর পরকালটা একেবারেই মাটী হয় নাই। হরি হরিণে একটা ণকারের তারতম্য বই ত নয়। হিন্দু পুত্র কন্যাদির নাম রাখেন, দেবতার নামে; এই জন্যে। এখনকার বাবু বিবীরা এরহস্য বুঝেন না, এ মাহাত্ম্যও জানেন না। কিন্তু ভূতের প্রবন্ধও ত আর বাড়ানো চলে না!

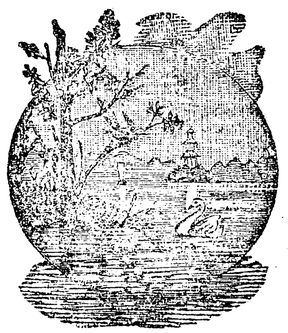

মাছ-ধরা।

জালে মাছ ধরা জালিকের কাজ। পল্লীগ্রামের ভদ্রলোকেরাও আপনাদের পুকুরে ক্ষেপলা ফেলিয়া মৎস্য সংগ্রহ করেন বটে, কিন্তু সেটা আমোদ নহে, কাজ। জাল আছে নানাবিধ। সাধারণতঃ স্বল্প জলে ফেঁটি জাল আর গভীর জলে ক্ষেপলা। বংশনির্ম্মিত ত্রিকোণে যে জাল লাগানো থাকে, তাহাকেই ফেঁটি জাল বলে। স্বল্প জলে ছাঁকনী জাল, চাবী জাল প্রভৃতিরও ব্যবহার হয়। বৃত্তাকার বাখারীর ঘরায় ছাঁকনী জাল লাগানো থাকে; ছাঁকনী জালে মাছ ছাঁকিয়া ধরিতে হয়! চাবী জাল চাপা দিতে হয়। তিন খণ্ড সরু বাঁশের গোড়া গুলা একত্র বদ্ধ, শেষ দিকে একটা গোলাকার ঘরা, সে ঘরায় জাল। গোড়া ধরিয়া জাল জলে চাপিয়া দিতে হয়। জালে মাছ চাপা পড়ে। দস্যুরা এই জাল চাপা দিয়া মানুষ মারিত। পথিক পানার্থে হউক বা স্নানার্থেই হউক জলে নামিলেই, দস্যুর জালে চাপা পড়িয়া মরিত। পোলো এক-প্রকার বংশনির্ম্মিত পাত্র। এক মুখ খুব ফাঁদাল, অন্য মুখ সংকীর্ণ। ফাঁদাল মুখটা তলায় রাখিয়া সরু মুখটা হাতে রাখিতে হয়; আর পোলো দিয়াও মাছ চাপিয়া ধরিতে হয়। নদী-নদে বড় বড় জাল ব্যবহৃত হয়। বেঁউতী জালে কিছুই এড়ায় না। এক মুখ খুব বিস্তৃত, অন্য মুখ খুব সরু, সাপ-লেজুড়ে। বড় মুখ দিয়া মাছ ঢুকে, সরু দিকে গিয়া আটকাইয়া থাকে। চুনা-পুটি হইতে বড় বড় আড় বোয়াল পর্য্যন্ত কিছুই বাদ পড়ে না। কখনও কখনও হাঙ্গর কুমীর শুশুক পর্য্যন্ত ধরা পড়ে! নৌকায় ফেঁটি জালের মত একপ্রকার জাল লাগাইয়াও নদী-নদে মাছ ধরা হয়। আবার স্বল্পজল নদী-নদে ক্ষেপলাও চলিয়া থাকে। দামোদরে দেখিবে, কত লোক জলের মাঝে মাচায় দাঁড়াইয়া ক্ষেপলা ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে। গঙ্গায় দেখিবে, এ পার ও পার গাঁতি জাল পাতা রহিয়াছে; জালের যত ঘরায় মাছের কল্‌সা আটকাইয়া গিয়াছে। জালিকেরা নৌকায় জাল তুলিতেছে; জালের যত ঘরায় মাছ ঝুলিতেছে। পুকুরেও খয়রা মাছ ধরিবার জন্যে গাঁতি জাল পাতা হয়। পদ্মার জালিকেরা জগদ্বেড় জালে মাছ ধরিয়া থাকে। আমাদের গঙ্গায়ও জগদ্বেড়ের চলন আছে। নামের মতই জাল বটে, জগদ্বেড়ই জালের রাজা।

মাঠের জল এক দিক হইতে অন্য দিকে যাইতেছে, বা কোন জলাশয়ে পড়িতেছে, এরূপ স্থলে আড়া দেওয়া হয়, ঘুনী পাতা হয়। স্রোতের মাছ—আড়ার ভিতর ঘুনীর ভিতর প্রবেশ করিয়া ধরা পড়ে। একখানা নেকড়ার চারি মুখে দুই খানা বাখারী বা দুই গাছা কঞ্চী লাগাইয়া, কুঁড়োজালী করিতে হয়, জালীতে কুঁড়ো দিয়া জলাশয়ে তারসকাশে স্বল্প জলে ভাসাইয়া রাখিতে হয়। একটা ইট দিয়া রাখিলেই কুঁড়োজালী এক জায়গায় স্থির থাকে। জালের ভিতর কুঁড়ো থাকে, চিংড়ী মাছের মরণ, কুঁড়ো খাইতে আসিয়া ধরা পড়ে! সঙ্গে সঙ্গে পুঁটি বাটাও আসিয়া পড়ে। জাল আড়া ঘুনীর মাছ ধরায় পেশাদারী; কুঁড়োজালীর মাছ ধরায় একটু আমোদ আছে। ছেলেরাই প্রায় কুঁড়োজালী পাতিয়া মাছ ধরে। জল শুখাইয়া আসিলে পুকুর ডোবা ছেঁচিয়া মাছ ধরা হয়। ছাঁকনী, চাবী জালই তখন প্রধান অবলম্বন। পোলো চাপাও ঐ সময়ে চলিয়া থাকে। আবার কেহ কেহ টেঁটা চালাইয়া মাছ বেঁধে। অনেকে আবার গাবানো পুকুর ডোবায় হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া মাছ ধরে। পুকুরে গাঁধি লাগিলেও এইরূপে মাছ ধরিতে হয়! প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, গলদাচিংড়ীর জন্যেই গাঁধি লাগা ধরা পড়ে। গাঁধি লাগিলে যত মাছ তীরের দিকে আসিয়া যেন নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। মাছ যখন নির্জ্জীব হইয়া পড়ে, তখনই গাঁধি লাগে। জলে দোষ না হইলে, মাছের গাঁধি লাগে না।

ছিপ সূতার মাছ-ধরাইতেই কিন্তু আনন্দ অধিক। আমোদই মুখ্য উদ্দেশ্য, মৎস্যসংগ্রহ গৌণ। ছিপ আর হাতসূতাই প্রধান যন্ত্র। ইংরেজের আমলেই হুইল বা মাছধরা চাকার চলন হইয়াছে। হুইল ছিপের গোড়ায় লাগান থাকে, তাহাতেই সূতা জড়ান থাকে; ছিপের আগাগোড়া ছোট ছোট কড়া লাগান থাকে। সূতা হুইল হইতে সেই সব কড়া দিয়া গিয়া ছিপের ডগায় ঝোলে; মাছ গাঁথা পড়িলেই ছুটিতে থাকে, তখন হুইলও ঘুরিতে থাকে। হুইলের হাতল আছে, অনায়াসেই সূতা গুটান যায়। মাছ ছুটিতেছে, সূতা নিজেই হুইল হইতে চলিয়া যাইতেছে; আবার মাছকে নিকটে আনিতে হইলে, হুইলের হাতল ঘুরাও, সূতা জড়াইয়া আসিবে। অনেকক্ষণ এইরূপ খোলা জড়ান হইলে পর মাছ যখন নির্জ্জীব হইয়া পড়িবে, তখন তাহাকে ধরিবে। ধরিবার সময়ে একখানি ছাঁকনী জালেরই ব্যবহার করা উচিত। হাত দিয়া সূতা ধরিলে, অনেক সময়ে মাছ খুলিয়া যায়। যে ছিপে হুইল নাই, তাহাতে মাছ ধরাই কিন্তু অধিক বাহাদুরী। যিনি ধরেন, তাঁহার কৌশল, আর সূতারও যোগ্যতা। বড় মাছ ধরিতেই হুইলের প্রয়োজন, পুঁটি বাটা কেবল ছিপ সূতায় ধরিতে হয়।

হাতসূতাও একটা ষড়ষড়ের গায়ে জড়ান থাকে। ষড়ষড়ে থাকে একটা সরু দণ্ডের উপর, সেই দণ্ড মাটীতে পোতা থাকে। মাছ খাইলেই, হাতসূতা ষড়ষড়ে হইতে ছুটিতে থাকে। হুইলের সূতা সরু, হাতসূতা মোটা। খুব বড় মাছ না হইলে, হাতসূতায় ধরা চলে না। ছিপ সূতা হুইলে মাছ ধরার নিয়ম আছে পৃথিবীর সকল দেশে। বিলাতী লোকের বড়ই আমোদ। ছিপ সূতা বড়শীর উন্নতিও ত হইতেছে সেখানে কম নহে! আবার মাছ ধরার কেতাবই হইয়াছে অসংখ্য। আইজাক ওয়াটই

প্রথমে বই লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন, এখন তাঁহার অসংখ্য শিষ্য।

বড়শী ইসপাতে প্রস্তুত হয়। আজকাল যোড়া বড়শীরই রেওয়াজ হইয়াছে। এখনকার বাবুরা বিলাতী বড়শীর পক্ষপাতী হইয়াছেন; আমাদের দেশের বড়শীও বড় নিকৃষ্ট নহে। ধনেখালীর বড়শী এখনও বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। বড়শী দুই প্রকার। কাঁচা বড়শীতে পান থাকে না, সহজে সোজা হইয়া যায়। পুঁটি বেলে প্রভৃতি গরীবের কাছেই কাঁচা চলে। পাকা বড়শী পান দিয়া প্রস্তুত, খুব শক্ত, কিছুতেই সোজা হয় না; ভাল বড়শী ভাঙ্গেও না। আগে সকল গ্রামেই ভাল বড়শী পাওয়া যাইত। এখন আর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিলাতীর চলনেই দেশীর রেওয়াজ কমিয়াছে।

গুটির রেশমেই মাছধরা সুতা ভাল হয়। গুটির ভিতর আবার কূলে গুটি বা কূলগাছের গুটিই মাছ ধরার পক্ষে উৎকৃষ্ট। সালগাছের সেলো গুটিও মন্দ নহে। হাতসূতাকে তাগীও বলে, তাগীর সূতাও গুটি রেশমে প্রস্তুত হয়; কিন্তু মুগোর সূতারই চলন অধিক। মুগো একপ্রকার গাছ, আনারসের মত পাতা। ঐ পাতা জলে পচাইয়া সূতা লইতে হয়, মুগোর সূতা কাঁকড়ায় কাটিতে পারে না। তাগীর হাত সূতা জলের ভিতর থাকে, ফাতা নাই; কোন কিছুতে ধরিলে হঠাৎ টের পাওয়া যায় না। তাই কাঁকড়ার বড় উৎপাত! জলে ডুবিয়া থাকিবে বলিয়া হাতসূতায় বড়শীর অদূরে দোলন দিতে হয়, সীসায় প্রস্তুত দোলনের জন্যেই সূতা জলে ডুবিয়া থাকে। ছিপের সূতায়ও রাঙ দিতে হয়। রাঙ থাকে বড়শীর একটু উপরে। যেখানে যেমন জল, সেখানে সেইরূপ করিয়া ফাতা লাগাইতে হয়। ফাতা ভাসিয়া থাকে, বড়শীতে মাছ ধরিলেই ফাতা নড়ে, আর অমনই খ্যাঁচ মারিতে হয়। সরফুল্কা আর ময়ূরপুচ্ছেই ফাতা হয় ভাল। অন্ধকার রাত্রে মাছ ধরিতে হইলে, পেনের কুইলে ফাতা করিয়া তাহার ভিতর জোনাকিপোকা পুরিয়া দিতে হয়। খদ্যোতের সেই আলোকেই ফাতা দেখিতে পাওয়া যায়, আর মাছ খাইলেই বুঝিতে পারা যায়। অনেক সময়ে আবার ফাতা না দিয়াও মাছ ধরিতে হয়; বেলে লেটা শোল প্রভৃতি মাছ ধরিতে ফাতার প্রয়োজন হয় না। চিংড়ী সূতায় জড়াইয়া থাকেন।

আমাদের দেশে কঞ্চী বাখারীতেই ছিপ হয়। তল্‌দার কঞ্চীতেই ভাল ছিপ হয়। বাঁশিনীর কঞ্চীতেই পুঁটী বাটার ছিপ করিতে হয়। বিলাতে কাঠের ছিপ, ওক কাঠেই ছিপ ভাল হয়। আমরা কিন্তু কঞ্চীর ছিপই পছন্দ করি। কঞ্চীতে যেমন ডগাসরু ছিপ হয়, কাঠে তেমন হয় না। বাখারীতেও বেশ ছিপ হয়! তাগীর হাতসূতায় গাব দিয়া রঙ কালো করিতে হয়। সাদা সূতায় মাছ পলায়।

মাছধরা টোপ অসংখ্য প্রকার। পুঁটি বাটায় পিটুলীর টোপই প্রচলিত। আতপ চাউল ভিজাইয়া অতি পরিচ্ছন্ন শিলে বা চন্দননাটায় বাটিতে হয়। পিটুলি যত সাফ হইবে তত ভাল। এই জন্যে অনেকে শাঁখ দিয়া চাউল বাটিয়া থাকেন। বাটা পিটুলি কলাপাতে করিয়া নিরন্ত আগুনে সেকিয়া লইতে হয়, তাহা হইলেই আটা হয়। নেবুর পাতায় সেকিলে সদ্‌গন্ধ হয়; মৎস্যেরা বড়ই গন্ধবিলাসী। রুই কাতলায় ময়দার টোপ চলে, কিন্তু দুধে কেঁচো উহাদের অতিপ্রিয়। বোলতার টোপও অনেক মাছ ভাল বাসে, পিপড়ের টোপ পুঁটি চুনার অতি প্রিয়। যেখানে রেশমের কাজ আছে, সেখানে গুটির ডিমও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পরলে অর্থাৎ গুটির মরা ডিমে মাছের চারই খুব ভাল হয়। চিংড়ী মাছের টোপেও মাছধরা হয় মন্দ নহে। কখন কখনও ঘুরঘুরে দিয়া টোপ করিতে হয়। ঘুরঘুরেও পুকুরধারেই মাটীর ভিতর থাকে, একপ্রকার পোকা। বোয়ালমাছ ধরিতে বেঙের টোপ আবশ্যক। খুব এদোঁ পুকুরের পাকা মাছ ধরিতে কাঁটালের টোপ লাগাইতে হয়। কলিকাতা অঞ্চলে পাঁউরুটীর টোপেরও চলন আছে, কিন্তু ময়দা পিটুলীরই প্রতিনিধি।

চারের স্বতন্ত্র মস্‌লা আছে, বেনের দোকানে পাওয়া যায়। প্রায় সমস্তই তামাকের মস্‌লা। খোল কুঁড়াও চারের অঙ্গ। উইপোকার ডিম বড় উৎকৃষ্ট চার। কিন্তু মদের গোড়ার কাছে কিছুই নহে। মাছ নেশা করিতে বড় ভাল বাসে। যে বড় মদ খায়, তাহাকে এই জন্যে ইংরেজি-ভাষায় কখনও কখনও মৎস্য বলা হয়; যেমন "ওলন্দাজেরা মদে:মাছ।" ভাঁটীতে যে মদের তলানী শিটা পড়িয়া থাকে,তাহাকেই মদের গোড়া বলে। কিন্তু এ চারেও একটা দোষ আছে, যত চুনা মাছ আসিয়া বিরক্ত করে। ভাল জিনিসেই ত ছেলের উৎপাত! কেবল গোবরেও চার হয়। কেবল কুঁড়া ফেলিলেও হয়। ভাতে কুঁড়া মাখিয়া ফেলিয়া দিলে উৎকৃষ্ট চার। মস্‌লার চার মাটী মাখিয়া ফেলিতে হয়। কেহ কেহ আতর দিয়াই চার করেন। আর কেঁচো কুচাইয়া পচাইয়া চার করিলে, যত মাছই আসিয়া জুটে। কেঁচোর টোপ হয়, কেঁচোর চারও হয়। বাটা পুঁটি ধরিতে হইলে আড়কাটী পুতিয়া দিতে হয়; অর্থাৎ একটা কাটিতে গুগলি বা শামুকের শাঁস বিধিয়া জলে পুতিয়া দিতে হয়। যত মাছ সেইখানে হাজির হয়, চার খাইতে খাইতে টোপ ধরে। কখনও কখনও কেঁচোরও আড়কাটী করিতে হয়। ফলতঃ মাছধরায় কেঁচোর মত উপযোগিতা আর কাহারই নাই।

ছিপ চালাইবার কৌশল আছে; একটা বিদ্যা! এ বিদ্যা সকলের নাই, সকলের সমান নহে। ছিপ চালাইবার কৌশল আছে, চার ফেলিবারও কৌশল আছে। কোন্ জলাশয়ের কোন্ স্থানে চার করিতে হইবে, ইহা বুঝা সকলের পক্ষে সহজ নহে। আর মাছের ফুট দেখিয়াই কৃতবিদ্যেরা বুঝিতে পারেন, গতি কিরূপ। ঘাই দেখিলেই ত মাছ চেনা যায়। কিন্তু সকলের অভিজ্ঞতা সমান নহে।

ছিপ হাতসূতায় মাছ ধরা শীতকালে চলে না; বসন্তেই বড় সুবিধা। বর্ষার ঘোলা জল নির্ম্মল হইলে, শরতের সময়েও মাছ-ধরার সুবিধা আছে। রহস্য আছে অনেক। মাছধরাও শিখিতে হয়, গুরূপদেশ লইতে হয়। আমাদের বন্ধু ফকিরচাঁদ বলিতেছেন, "মাছ'ধরার তিন দোষ, যার ছিপে খায় তার ছিপেই খায়, খায় ত উঠে না, আর ছিপে ছিপে জোড় লাগে।" একত্র পাঁচ জনে বসিয়া মাছ ধরিতে গেলেই শেষের কষ্ট উপস্থিত হয়। "যার ছিপে খায় তার ছিপে খায়" কথাটা বড় ঠিক, সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; এক্ষেত্রেও ভাগ্যের পরিচয়। কোন কোন লোকের মৎস্যভাগ্য বড় প্রসন্ন, বসিলেই ধরিয়া থাকেন। আর আমাদের মত লোককে সারা দিন বৃথা শ্রম করিয়া পরে পয়সা দিয়া বাজার হইতে মাছ ধরিয়া আনিতে হয়! ফকিরচাঁদই বলিতেন,

"লিখিব পড়িব মরিব দুখে
মৎস্য ধরিব খাইব সুখে।"

কাজে কথায় এক করিয়াছিলেন। পড়া শুনার কাছ দিয়াও যান নাই, মাছ ধরিয়াই জীবন কাটাইয়াছিলেন। নেশাও ত কম নহে! ঈশ্বর ঠাকুরদাদা মৃত্যুকালেও মাছের খেয়াল দেখিয়াছিলেন! আমরা কিন্তু দেখিয়াছি, ভোজনে যেমন সুখ, ধারণে তেমন নহে; মৎস্যমৃগয়াটাকে আমরা অতি অপকৃষ্ট ব্যসন বলিয়াই মনে করিয়া থাকি। তবে যেখানে ছিপে সুরু করিয়া জালে উপসংহার করা হয়, সেখানে আমাদের আপত্তি নাই। আমরা প্রক্রিয়া দেখিনা, কার্য্যই দেখি।

বাঙ্গলা ভাষার লেখক।

—০:০—

প

(২)

—প্রফুল্লচন্দ্র রায়। কায়স্থ সাং কলিকাতা, অপার সার্কুলার রোড। ইনি একজন উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি। কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক। রসায়ন-বিজ্ঞানে প্রচুর অভিজ্ঞতা ও অধিকার আছে। বিলাতের এডিনবরা ইউনিভারসিটীতে ইনি ডি, এস, সি উপাধি পাইয়াছেন। এরূপ পণ্ডিত ব্যক্তিকে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় ব্রতী হইতে দেখিলে, আমাদের মনে স্বতই আহ্লাদের সঞ্চার হয়। প্রদীপ, ধন্বন্তরি প্রভৃতি মাসিক পত্রে বিজ্ঞান-বিষয়ে ইহাঁর কয়েকটী সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

* * *

—প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী। পিতা ৺ ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সাং কলিকাতার দক্ষিণ,—গোকর্ণী নামক গ্রাম। জেলা ২৪ পরগণা। প্রিয়নাথ পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। যৌবনেই সংসারে অনাসক্তি জন্মে। অনেক কষ্টে, বড় দুঃখে ইনি মানুষ হন। অতি বিনীত, মিষ্টভাষী, সদালাপী ও সুরসিক। সর্ব্বাপেক্ষা ইহাঁর ভক্তি বিশ্বাস এবং ধর্ম্মবুদ্ধি অধিক প্রশংসনীয়। কলিকাতা শ্যামবাজারে, সুপ্রসিদ্ধ মোহনলাল মিত্র মহাশয়ের বাটীতে ইনি অবস্থিতি করেন। কয়েক খানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া, ইনি সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়াছেন। ইহাঁর "জীবন পরীক্ষা বা ভীষণ স্বপ্ন চতুষ্টয়,"—বাঙ্গলা ভাষায় একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ। গ্রন্থখানি আকারে এবং প্রকারে যেরূপ বিশাল, সারবত্তায় এবং সদ্ভাব ও সুচিন্তায়ও সেইরূপ বিশাল। গ্রন্থখানি দেখিয়া,—প্রিয়নাথকে চেনা যায়, বুঝা যায়, তাঁহার ধাত জানিতে পারা যায়। এই প্রিয় গ্রন্থেই তিনি বাঙ্গলা পাঠক পাঠিকার,—সাধক সাধিকার,—প্রেমিক প্রেমিকার বড়ই প্রিয় হইয়াছন। নারায়ণ তাঁহার মনোবাঞ্ছাও পূর্ণ করিয়াছেন,—তিনি বেশ সুখে ও শান্তিতে এবং সদালাপে ও সাধুসঙ্গে দিন কাটাইতেছেন। জীবন পরীক্ষা ব্যতীত তাঁহার জীবন্ত পিতৃদায়, আনন্দ তুফান, মদ খাও—নেশা ছুটিবে না, আহ্নিক-ক্রিয়া, জীবন-কুমার, কুমার-রঞ্জন, প্রভৃতি কয়খানি ভক্তিভাবপূর্ণ সুন্দর গ্রন্থ আছে। গ্রন্থগুলি সর্ব্বত্র পঠিত হয়। বিশেষতঃ, ভক্ত ও ভাবুক-সমাজে গ্রন্থগুলির বড় আদর।

প্রিয়নাথের আর তিনটী ভাই আছেন; তাঁহারাই বিষয়-কর্ম্ম করিয়া সংসার-ধর্ম্ম পালন করেন। সঙ্গীতে ভক্তিপ্রাণ ভাবুক প্রিয়নাথের বিশেষ অধিকার আছে। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সুমধুর কণ্ঠে যখন তিনি কোন সাধন-সঙ্গীত গান করেন, তখন তাঁহার অপাঙ্গ বহিয়া দর দর অশ্রুপাত হয়, শ্রোতৃমণ্ডলীরও মন উদাস হইয়া যায়। প্রিয়নাথের উপর যে, ভগবানের বিশেষ করুণা আছে, আমরা অনেক স্থলে তাহার অনেক নিদর্শন দেখিয়াছি।

* * *

—প্রতুলচন্দ্র বসু। পিতা ডাক্তার শিবচন্দ্র বসু। শিব বাবু ঢাকায় চিকিৎসা করেন। চিকিৎসায় ঢাকা অঞ্চলে তাঁহার বেশ হাত-যশঃ আছে। পুত্র প্রতুলচন্দ্র উৎসাহ-শীল নব্য-যুবক। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুস্তক-বিভাগের ইনি লাইব্রেরীয়ান ও উক্ত সভার কার্য্যনির্ব্বাহ সমিতির একজন মেম্বর। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়-সম্পাদিত "অনুশীলন ও পুরোহিত" পত্রের প্রতুলচন্দ্র একজন লেখক ও অধ্যক্ষ

* * *

—প্রিয়নাথ সেন। সাং কলিকাতা, আহেরীটোলা। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন এটর্ণি। ভারতী ও সাহিত্যে কয়েকটি পদ্য ও প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

* * *

—পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, বি, এল। সাং কলিকাতার উত্তর পাইকপাড়া। ইনি, পাইকপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ সিংহ বংশোদ্ভব। উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ। সচ্চরিত্র, বিদ্বান বুদ্ধিমান। বাঁকিপুরে ওকালতি করেন। ওকালতিতে ক্রমশই বেশ পসার-প্রতিপত্তি হইতেছে। বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতিও ইহাঁর অনুরাগ আছে। সাহিত্যে,—ইহাঁর দুই একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

* * *

—প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। সুবিখ্যাত ডিক্টেটিভ এবং "দারোগার দপ্তর"-লেখক ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সর্ব্বত্র সুপরিচিত। এক দিকে তিনি রাজকীয় কার্য্যে যেমন যোগ্যতা ও নিপুণতার পরিচয় দিয়া আসিতেছেন, অন্যদিকে বাঙ্গলা সাহিত্যেও তাঁহার সেইরূপ যোগ্যতা ও নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বাঙ্গলা ভাষায় ডিটেক্‌টিভের গল্প,—তিনিই প্রথমে লিখিতে আরম্ভ করেন! এদেশে এরূপ ধরণের গল্প লিখিবার, তিনিই পথ প্রদর্শক। আজ ৮।১০ বৎসর পূর্ব্বে, প্রিয় বাবুই প্রথমে অনুসন্ধানে ডিটেক্‌টিভের গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন। তাহাই কালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং তাহার কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয়ের তত্ত্বাবধাকতায় তিনি "দারোগার দপ্তর" নামে মাসিকপত্রের প্রচার করেন। তাঁহার দেখাদেখি, আজ এ কাগজে, কাল সে কাগজে,—ডিটেক্‌টিভের গল্প প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু প্রিয় বাবুই যে, এ গল্প-রচয়িতার মূল, তাহা সাহিত্যসেবিগণ সকলেই জানেন। এই গল্প ব্যতীত "পাহাড়ে মেয়ে", "তান্তিয়া ভীল", "আদরিণী" প্রভৃতি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রিয় বাবু লিখিয়াছেন। গ্রন্থ গুলিতে গ্রন্থকারের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও প্রচুর অভিজ্ঞতা পরিদৃষ্ট হয়। গ্রন্থগুলির ভাষা বেশ সরল ও সরস। আখ্যায়িকাগুলি কৌতূহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপূর্ণ। আমরা জানি, এক শ্রেণীর পাঠক পাঠিকা কেবল এই ডিটেক্‌টিবের গল্প পড়িতেই ভাল বাসেন,—অন্য গল্পে বা উপন্যাসে, ইতিহাসে কিংবা জীবন-বৃত্তান্তে তাঁহাদের মন উঠে না। সুতরাং এই শ্রেণীর পাঠক পাঠিকা প্রিয় বাবুর বিশেষ ভক্ত।

* * *

—প্রাণকৃষ্ণ দত্ত। হাং সাং কলিকাতা বাদুড়বাগান, বৃন্দাবন মল্লিকের লেন। প্রাণকৃষ্ণ বাবু,—৺কেশবচন্দ্র সেনের "নববিধান" সমাজের একজন ব্রাহ্ম। ভূতপূর্ব্ব "পরিচারিকা" পত্রিকার সহিত ইহাঁর বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। এক হিসাবে, ইনিই উক্ত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বহুকাল পূর্ব্বে,—এমন কি "সুলভ সমাচারের"ও জন্মের পূর্ব্বে, প্রাণকৃষ্ণ বাবু "নবপত্রিকা" নামে একখানি কাগজ বাহির করিয়াছিলেন। কিছুদিন মাত্র সেই কাগজ চলিয়াছিল।

উপস্থিত, প্রাণকৃষ্ণ বাবু বড় একটি ভালো কাজে হাত দিয়াছেন। প্রধানতঃ, তাঁহারই যত্নে, এই কলিকাতা সহরে, একটি অনাথ-শিশু-আশ্রম সংস্থাপিত হইয়াছে। আশ্রমটি সুপরিচালিত ও হইতেছে। অবশ্য,—আশ্রমের উৎসাহদাতা, ও পৃষ্ঠপোষক সুহৃৎ অনেক আছেন; কিন্তু প্রাণকৃষ্ণ বাবুর ন্যায় সদাশয়, উন্নতহৃদয় ব্যক্তি যদি আশ্রমের সম্পাদকের গুরুভার গ্রহণ না করিতেন, এবং সবটা মন প্রাণ নিয়োজিত করিয়া যদি উক্ত আশ্রমের স্থায়িত্বের প্রতি লক্ষ্য না রাখিতেন, তবে ঐ আশ্রমের কার্য্যাবলী কখনই সাধারণের সন্তোষকর ও আশাপ্রদ হইত না। শুনিয়া সুখী হইলাম, প্রাণকৃষ্ণ বাবুরই অক্লান্ত যত্নে ও পরিশ্রমে, আশ্রমটি নিঃশব্দে, বিনা আড়ম্বরে বেশ চলিতেছে। পিতৃ-মাতৃহীন, দরিদ্র অনাথ শিশু সন্তানগুলি যাহাতে নিরাপদে প্রতিপালিত হইয়া শিক্ষা পাইতে পারে, এই আশ্রমের প্রাণ ও প্রতিষ্ঠাতা,—প্রাণকৃষ্ণ বাবুর তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য আছে। লক্ষ্য উচ্চে থাকিলে, ভগবান সহায় হন; সুতরাং আমাদের বিশেষ আশা আছে, প্রাণকৃষ্ণ বাবু এই মহাব্রত উদ্‌যাপিত করিয়া, ইহলোকে অতুল যশঃ ও পরলোকে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিবেন।

* * *

—প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ। পিতার নাম ৺গোপালচন্দ্র ঘোষ। সাং হুগলী জেলার অন্তর্গত বৈদ্যবাটীর নিকট। "দণ্ডী-চরিত্র" ও "লম্পটের কারাবাস" নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, প্রাণকৃষ্ণ বাবুর কতকগুলি ইংরেজী অর্থ-পুস্তকও আছে।

* * *

—পশুপতিনাথ মিত্র। সাং কলিকাতা, বাগবাজার। ইনি কলিকাতার জেনারল পোষ্ট আপিসে চাকরি করেন। "মনোরমা" উপন্যাস ও "বিবাহ-সঙ্কট" নামে ইহাঁর একখানি প্রহসন আছে। কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে, কলিকাতা কায়স্থ সমাজের পুত্র কন্যার বিবাহের ব্যয় সংক্ষেপ বিষয়ে, যে সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সভার জন্য পশুপতি বাবু বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এক হিসাবে, তাঁহারই যত্ন ও চেষ্টার ফলে ঐ সভা প্রতিষ্ঠিত হয়।

* * *

—প্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়। সাং কলিকাতা, যোড়াবাগান ষ্ট্রীট। "গৃহস্থ জীবন" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রসাদবাবু প্রকাশ করিয়াছেন।

জন্মভূমি।

অষ্টম ভাগ। } আশ্বিন। ১৩০৫। { ১০ম সংখ্যা।

উৎসবে হিন্দু।

যখন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী যোগীরাও উৎসব করিয়া থাকেন, তখন সংসারী মানবের পক্ষে উৎসব করাত একান্ত আবশ্যক। যখন অসভ্য বর্ব্বর মানবের সমাজেও উৎসব দেখিতে পাওয়া যায়, তখন সভ্য মানবের সমাজে উৎসব না থাকিবে কেন? পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের সমাজেও উৎসবের অভাব নাই, দেখিবে ঋতুভেদে তির্য্যক্ সমাজেও উৎসবের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বসন্তকালে যত পশু পক্ষীর যেরূপ আনন্দ, শীতকালে সেরূপ নহে। বসন্তে কোকিলের কুহুরবে আনন্দিত হও, কিন্তু আনন্দ কেবল তোমার নহে; কোকিল নিজে আনন্দিত হইয়া তবে তোমাকে আনন্দিত করে; ইতরজীবেরও শোক তাপ আছে, কষ্ট যন্ত্রণা আছে। শোকতাপে—কষ্ট যন্ত্রণায় ব্যসন, অন্যথা হইলেই উৎসব। সময়ে সময়ে যত জীব জন্তুই দল বাঁধিয়া আনন্দ করে। তাহাই—জীব সমাজের সামাজিক উৎসব! যাহার বিপত্তি ব্যসন আছে, তাহারই সুখ উৎসব আছে; যাহার সমাজ আছে, তাহারই সামাজিক উৎসব আছে; দশে মিলে উৎসব করিলেই সামাজিক উৎসব হইল।

সন্ন্যাসী যোগীদিগের উৎসব দেখিতে পাও, যোগে যাগে। প্রয়াগে কুম্ভমেলা হইল, দেশ বিদেশের অসংখ্য সন্ন্যাসী যোগীর সেখানে শুভাগমন হইল। সকলেই ত্রিবেণী স্নানে পুণ্যলাভ করিতে থাকিলেন। আবার আগ্রহই বা কত! কোন কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনে হয় না, কোন দুঃখকেই তখন দুঃখ বলিয়া মনে হয় না। কেবল আনন্দ, যত সন্ন্যাসী সাধুরই কেবল আনন্দ। ইহাই তাঁহাদের উৎসব। যেখানে তীর্থ, সেই খানেই সাধুসমাগম। যেখানে যোগের মেলা, সেইখানেই সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম; আর সেইখানেই তাঁহাদিগের উৎসব।

হ আনন্দের কার্য্যকেই উৎসব বলা যায়। হিন্দুর উৎসব স পদে। কেন না, ধর্ম্মপথে থাকিলে, নিজের আচার বজায় রাখিয়া সৎপথে চলিলে, হিন্দুর যত আনন্দ, এত আনন্দ আর কাহারই দেখিতে পাইবে না। হিন্দুর সাত্ত্বিক উৎসব। কেন না, তাঁহার সকল উৎসবেই ধর্ম্মের সম্বন্ধ—গাঢ় সম্বন্ধ! হিন্দুর এমন কার্য্য নাই, যাহাতে ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই। আর সুতরাং হিন্দুর এমন উৎসবও নাই, যাহাতে ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সংস্রব নাই।

দশ সংস্কারই হিন্দুর দশমহোৎসব। মাতার গর্ভাধানে যে উৎসবের সূচনা হয়, মাতার পঞ্চামৃতে যে উৎসবের সূত্রপাত হয়, তাঁহার সাধভক্ষণে যে উৎসবের অনুবৃত্তি চলে, ভূমিষ্ঠ হইবার পর হিন্দু শিশুর জাতকর্ম্মে সেই উৎসব আসিয়া, তাহার অজ্ঞাতসারে হইলেও, তাহাতেই সংসৃষ্ট হয়। ছয় দিনে হিন্দু শিশুর ষেটেরা উৎসব, আট দিনে আটকৌড়ের উৎসব। পুত্র হইলে একুশ দিনে, শিশু কন্যা হইলে এক মাসে, যে ষষ্ঠীপূজা হয়, তাহা শিশুর পক্ষে মহোৎসব। শিশু জন্মের পর তিন মাস বাড়ীর বাহির হইতে পায় না, তাহার পর নিষ্ক্রামণ; তখন তাহার বাহিরে আসিবার অধিকার; শিশুর তখন উৎসব। ছয় চাঁদে—বা আট চাঁদে—পুত্রের এবং সাত চাঁদে বা নয় চাঁদে কন্যার—অন্নপ্রাশন হয়। অন্নপ্রাশন শিশুর মহোৎসব। এত দিন মাতৃস্তন্য—অভাবে গব্যস্তন্যই ভরসা ছিল; অন্নপ্রাশনে শিশুর মুখে অন্ন পড়িল। এত দিন যে সে দ্রব্যের আস্বাদন লইতে তাহার অধিকার ছিল না, এখন সে অধিকার হইল; ইহার বাড়া মহোৎসব আর কি হইতে পারে বল দেখি! ভগবান্ খাদ্য দিয়াছেন অসংখ্যবিধ, কত অমৃতই আমাদের জন্যে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন; আমরা তাঁহার দত্ত বুদ্ধির বলে, তদ্দত্ত নানা খাদ্যে কতপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিতেছি! যে অন্নপ্রাশনে শিশুর এই সমস্ত খাদ্যে অধিকার হইল, তাহার মত মহোৎসব আর শিশুর পক্ষে কি হইতে পারে বল দেখি? অন্নপ্রাশনের সঙ্গে সঙ্গেই নামকরণ। শিশু ছিল এত দিন খোকা না হয় খুকী, অথবা পুঁটে না হয় পুঁটী; কিংবা

খুদে না হয় খুদা—না হয় খোদন বা খুদ্‌নী। নামকরণে সে হইল কালীকুমার বা হরিবালা! এতদিন যাহার নামই ছিল না, নামকরণে তাহার নাম হইল, শিশু দশ জনের একজন হইল। ভাবিয়া দেখ দেখি, নামকরণে কিরূপ উৎসব!

কর্ণবেধের উৎসবও বড় সামান্য নহে। দ্বিজাতির আবার উপনয়ন! তখন শিশু বালক হইয়াছে, কন্যা হইলে বালিকা হইয়াছে; কিন্তু এ উৎসবে পুত্রেরই এক চেটিয়া অধিকার। কর্ণবেধেই দ্বিজেতর বালকের শুদ্ধি হয়, উপনয়নে দ্বিজ বালকের—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বৈদ্য বালকের দ্বিজত্ব হয়। এত দিন সে শূদ্রবৎ ছিল। যে উৎসবে তাহার দ্বিজত্ব হইল, তাহার গায়ত্রীলাভ হইল, তাহার সন্ধ্যাহ্নিকে অধিকার হইল, তাহার দেহ মনের শুদ্ধি হইল; বুঝিয়া দেখ দেখি, সে কিরূপ উৎসব! এ উৎসবের মর্ম্ম হিন্দুই বুঝিতে সক্ষম।

তারপর পরিণয়োৎসব, সংসারী মানবের মহোৎসব। পুত্রলাভ পরিণয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য! কেন না, পুত্রই পিণ্ডদানে প্রধান অধিকারী। হিন্দু পরিণয় পরকালের জন্যে; পরকালই মুখ্য, ইহকাল গৌণ। পরিণয়ে হিন্দু যুবক পূর্ণ হন। অস্ত্রীক পুরুষ অপূর্ণ, সস্ত্রীক হইলে তিনি পূর্ণ। কেন না, সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ। সংসারীর স্ত্রী ছাড়া ধর্ম্ম কর্ম্ম চলে না। যিনি পিণ্ডাধিকারী পুত্রের জননী, তিনি বড় যে সে নহেন। হিন্দুর পক্ষে তিনি দেবী—তিনিই হিন্দুর গৃহলক্ষ্মী। স্ত্রীর মান পুত্র-জননী বলিয়া। পুত্রের মান, তিনি পিতার স্বর্গের পথ মুক্ত করিয়া দেন বলিয়া, পিতৃপুরুষদিগকে পিণ্ড দেন বলিয়া। স্ত্রী—সহধর্ম্মিণী—এই পুত্রের জননী। তিনি যে, হিন্দুর পক্ষে সত্যই দেবী, তাহা ত আর হিন্দুকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। যে উৎসবে এই দেবীর সহিত মিলন হয়, তাহারই নাম বিবাহ। ভাবিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়; বিবাহ-সংস্কারের উদ্দেশ্য ভাবিলে, সত্যই স্ত্রীকে নমস্কার করিতে হয়!

হিন্দুধর্ম্মের—হিন্দুশাস্ত্রের—এমনই মাহাত্ম্য যে, মরণেও উৎসব! ধর্ম্মপথে থাকিয়া সংসারধর্ম্ম করিয়া, সংসারের কর্ত্তব্য পুর্ণ করিয়া, যথাকালে মরিতে পারিলেই ত হিন্দুর সদ্গতি হইল, ইহজন্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জন্মের প্রাপ্তি হইল, অথবা ইহলোক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকে গমন হইল; হিন্দুর মৃত্যুও সুতরাং উৎসব।

গর্ভাধান হইতে মরণ পর্য্যন্ত যত সংস্কারই—সঙ্গে সঙ্গে যত অবান্তর-সংস্কারও—যত লৌকিক সামাজিক সংস্কারও—উৎসবসহচর। দীয়তাং ভুজ্যতাং সকল কাজে, হিন্দুর সকল কার্য্যেই মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ।

উৎসব হিন্দুর যাবজ্জীবন, বারমাস ত্রিশ দিন। পিতা মাতা পিতামহ পিতামহী মাতামহ মাতামহী প্রভৃতি যত গুরুজনের বৎসর বৎসর মৃত্যুতিথিতে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, শ্রাদ্ধে তাঁহাদিগের পূজা করিতে হয়, তাঁহাদিগেরই উদ্দেশে খাদ্য পানীয় বস্ত্রাদি দিতে হয়, দেবতার মত ধূপ দীপাদি দিতে হয়। শ্রাদ্ধকার্য্যে মন কিরূপ ভক্তিপূর্ণ হয়, তাহা হিন্দুই জানে। এই শ্রাদ্ধও হিন্দুর উৎসব। দেবতা ব্রাহ্মণের পূজা সঙ্গে সঙ্গে, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের ভোজন সংবর্দ্ধন নিত্যসহচর। শ্রাদ্ধেও হিন্দুর উৎসব। হিন্দুর যত উৎসব, এত আর কাহারই নাই!

এই দেখ, হিন্দু শরতে মহাশক্তির দুর্গারূপে পূজা করিয়াছেন, শুক্লা দশমীতে মাকে বিদায় দিয়া আবার পূর্ণিমায় মহালক্ষ্মীর আরাধনা করিয়াছেন, উৎসব করিয়াছেন; তার পরই অমাবস্যায় শ্যামারূপে মহাশক্তির পূজা করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীরও পূজা হইয়াছে। এই পূজার মহোৎসব সাঙ্গ হইবার পর দিনই আবার সংসারী হিন্দুর আর এক উৎসব, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মহোৎসব।

"দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তন্তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ।"

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় হিন্দুরমণী—বালিকা যুবতী প্রবীণা বৃদ্ধা যত হিন্দুমহিলা—ভ্রাতার সংবর্দ্ধনা করেন। কনিষ্ঠা হইলে জ্যেষ্ঠের পূজা করেন, জ্যেষ্ঠা হইলে কনিষ্ঠকে মন খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। যাঁহার ভগিনী আছেন, তিনিই জানেন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কিরূপ উৎসব। যখন "ভ্রাতস্তবানুজাতাহং বা ভ্রাতস্তবাগ্রজাতাহং" বলিয়া হিন্দুভগিনী বলেন, "ভুঙ্ক্ষ্ব ভক্তমিদং শুভং" তখন মনে কি আনন্দ হয়, তাহা হিন্দুভ্রাতাই জানেন; হিন্দু ভগিনীই জানেন। তার পর যখন হিন্দুভগিনী বলেন,

"প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ।"

তখন সত্য সত্যই হিন্দু ভগিনীর ভ্রাতৃস্নেহ বা ভ্রাতৃভক্তি ভাবিয়া মোহিত হইতে হয়। এত ভক্তি শ্রদ্ধা—স্নেহ মমতা—আর কোথাও আছে কি? অশন বসন এই উৎসবের অঙ্গ; আনন্দ এই উৎসবে ষোল আনা।

শ্যামাপূজার পরই শুক্লপক্ষের নবমী তিথি পুণ্যতিথি, সে দিন আদ্যাশক্তি জগদম্বা জগদ্ধাত্রী হইয়া আসিয়াছেন। কার্ত্তিকের সংক্রান্তি-দিবসে জগদম্বার পুত্র দেবসেনানী কার্ত্তিক আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। দিন কতক পরেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা! বসন্ত আসিতে না আসিতেই বাগ্‌দেবী সরস্বতীর পূজা-মহোৎসব। ঐ দিনেই বসন্তপঞ্চমী; হিন্দু গৃহলক্ষ্মীদের পর দিন শীতলষষ্ঠী! উৎসব—কেবল উৎসব! বসন্ত পড়িলেই দোলযাত্রা। চৈত্রে ষটোৎসব, চড়ক। তার পর দশহরা আছেন, স্নানযাত্রা আছেন, সঙ্গে সঙ্গে জামাতৃপূজা আছে। যাঁহাকে কন্যাদান করিয়াছেন, হিন্দুর পক্ষে সেই জামাতাও পরম আদরের ধন; তিনি যে, দশম গ্রহ। ভ্রাতৃপূজা, ভগিনী পূজা, জামাতৃপূজা—বৎসর বৎসর—হিন্দু ছাড়া আর কাহারই নাই। হিন্দুই জানে উৎসব করিতে। সকল উৎসবের হিসাব দিতে পারিব না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ মাসেই যে, দ্বাদশ যাত্রা আছে, দ্বাদশ উৎসব

আছে। তাহার এক একটীও ত অল্প আনন্দের নহে! দোলে আনন্দ, ফুলদোলে আনন্দ, ঝুলনে আনন্দ, রাসে ত কথাই নাই। আনন্দ হিন্দুর সকল উৎসবে। কিন্তু এত আনন্দ, উৎসবে ধর্ম্মের সম্বন্ধ অতিঘনিষ্ঠ বলিয়া। যেদিন এই ধর্ম্মের বন্ধন ঘুচিবে, সেদিন হিন্দুর উৎসবও আনন্দহীন হইবে।

এখনই দেখিতে পাই, অনেক সংসারে উৎসবের ব্যতিক্রম হইয়াছে, আনন্দেও ব্যতিক্রম হইয়াছে। অনেকে পূজা করেন, কিন্তু ভক্তি নাই। পূর্ব্বপুরুষেরা যেরূপ ভক্তিভরে মাকে আনিতেন, তাঁহার পূজা করিতেন, এখনকার অনেকেই সেরূপ ভক্তিভরে মাকে আনেন না, তাঁহার পূজাও করেন না। আনিতে হয়, তাই আনেন, পূজার ভার হয় ত পুরোহিতের উপর। বৃদ্ধা জননী বর্ত্তমান আছেন বলিয়াই, হয় ত এখনও মণ্ডপ চণ্ডীশূন্য হয় না; কিছুদিন পরে হইবে। বাড়ীর যিনি আধুনিক কর্ত্তা, তাঁহার বিশ্বাস, পূজায় কেবল বাজে খরচ হইতেছে, কেবল অর্থের অপব্যয় হইতেছে। সুতরাং উৎসবে উৎসব নাই, উৎসবে আনন্দ নাই। আমরাই বাল্যকালে যে বাড়ীতে যেরূপ পূজা, যেরূপ ভক্তি, যেরূপ যত্ন, যেরূপ অনুরাগ দেখিয়াছিলাম; এখন সেরূপ দেখিতে পাই না। আর তখনকার উৎসবে যেরূপ আনন্দ ছিল, এখনকার উৎসবে কাজেই আর সেরূপ আনন্দ দেখিতে পাই না।

এখন বরং দেখিতে পাই, অনেক বাবুর তামসিক আনন্দে মন পড়িয়াছে। শনিবারে শনিবারে উদ্যানভোজ হইতেছে, উদ্যানভোজে যাহা যাহা হইয়া থাকে, তাহা তাহা হইতেছে; আনন্দ আছে বটে, কিন্তু সে ভূতানন্দ। যেমন হর্ষ—তেমনই বিষাদ; যেমন নেশা, তেমন খোঁয়ারী; আনন্দের আনন্দ উড়িয়া যায়, শেষে উৎসব প্রায়ই ব্যসনে পরিণত হয়! ধর্ম্মের সংস্রব না থাকিলেই উৎসব—হিন্দুর উৎসব—ব্যসনে পরিণত হইয়া থাকে। সাহেবেরা পিকনিক করেন, বাবুরাও বনভোজন করিয়া থাকেন। কিন্তু সে কালের বনভোজনেও ধর্ম্মের সংস্রব ছিল। গ্রাম্যদেবতার কাছে গিয়া হিন্দুরমণীরা পূজা করিতেন, পূজার পর রন্ধন করিয়াই হউক, না হয় ফলার করিয়াই হউক, উৎসব সম্পন্ন করিতেন। বালক বালিকারাও যোগ দিত। সে বনভোজনের সেরূপ বিশুদ্ধ পবিত্র আনন্দ এখন ত আর দেখিতেই পাওয়া যায় না!

হিন্দুর উৎসব যে, সকল কার্য্যে। নূতন আম হইলে, হিন্দু মা গঙ্গাকে দিবেন, দেবতা ব্রাহ্মণকে দিবেন, তবে কাঁচা আমের ঝোল নিজে খাইবেন। প্রথমেই উৎসব। তার পর আমের আঁটী হইল, হিন্দুমহিলারা কাসুন্দী করিবেন। কাসুন্দীর নাম "আচার," শুদ্ধাচারে করিতে হয় বলিয়া। কাসুন্দীর জন্যে সরিষা কুটিতে হইবে, সরিষা ধুইয়া তবে কুটিবে; সরিষা-কোটাই একটা উৎসব! তাহাতেও পূজা অর্চ্চনা আছে। বাল্যকালে আমরাও কি সরিষা ধোয়ার দিন কম আনন্দের উপভোগ করিয়াছি? গঙ্গার বা নদীর জলে, স্নানান্তে সরিষা ধুইতে হয়; যেখানে নদী নাই, সেখানে বিশুদ্ধভাবে সরোবরের জলে। কিন্তু উৎসব আনন্দ ছিল সর্ব্বত্র! যত পল্লীবাসিনীকে একত্র মিলিয়া সব কার্য্য করিতে হইত। সরিষা ধুইতে হইত, একত্র; ব্রাহ্মণমহিলাকে সঙ্গে লইতে হইত, অগ্রে অগ্রে লইতে হইত। শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে জলাশয়যাত্রা করিতে হইত। শঙ্খধ্বনি যে, হিন্দুর সকল উৎসবেই বাদ্যভাণ্ড। যে দিন সরিষা কোটা হইত, সেদিনও উৎসবের অবধি থাকিত না। যেদিন কাসুন্দী মাখা হইত, সে দিনও উৎসব হইত।

নূতন ইলিশ মাছ উঠিল, হিন্দুর ঘরে আসিল। এখন যেমন আসিল, অমনই কড়ায় চড়িল, আর পেটে পড়িল। কিন্তু এখনও বৃদ্ধা জননী ইলিশ মাছ আসিলে সিন্দুর দিয়া মৎস্যের মান বাড়াইতে বলেন। বঙ্গে মৎস্যভোজন সবধা রমণীর শুভলক্ষণ; সেই মৎস্য প্রথম দিবস আসিল, বিনা মাঙ্গল্যে তাহার ভোজন হইবে, ইহা হিন্দু গৃহিণী কিছুতেই সহ্য করিবেন না। যে সংসারে বৃদ্ধা জননী আছেন, সে সংসারে এখনও ইলিশের মান আছে। অগ্রহায়ণে বড়ী দেওয়া হইবে। অমৃতং পক্কুষ্মাণ্ডং। সেই অমৃত সাহায্যে কলায়ের বড়ী প্রস্তুত হইবে। দাল বাটিতে হইবে শুদ্ধাচারে, প্রাতঃকালে বড়ী দিতে হইবে শুদ্ধাচারে। কুমড়া বড়ীর বুড়া বুড়ী করিতে হইবে, ধাম দুর্ব্বা সিন্দুর দিয়া বুড়া বুড়ীর পূজা করিতে হইবে। তবে বড়ী দেওয়ায় অধিকার হইবে। নূতন কলায়, নূতন কুষ্মাণ্ড, নূতন বড়ী। ইহাতেও ধর্ম্মের সংস্রব, ইহাতেও উৎসব।

মা লক্ষ্মী গৃহে আসিয়াছেন। নূতন চাউল ঘরে আসিবে, আসিবে আর অমনই পেটে যাইবে, ইহা হিন্দুর পক্ষে শোভা পায় না। দেবতার পূজা করিয়া, দেবদ্বিজকে দিয়া, পাখী পক্ষীকে দিয়া, অগ্রে গোপূজাপূর্ব্ব গরুকে দিয়া, সংসারের নিত্য অতিথি বায়সকে পর্য্যন্ত দান করিয়া, তবে হিন্দু নবান্নভোজনের অধিকার পাইবেন। নবান্নও বড় সামান্য উৎসব নহে। ভাদ্র মাসে আশুধান্যের এবং পৌষ মাসে আমনের উৎসব, মা লক্ষ্মীর পূজা করিতেই হইবে, দেব দ্বিজের তুষ্টি করিতেই হইবে, দীন দুঃখীকেও ভোজন করাইতে হইবে; তবে হিন্দু নিস্তার পাইবেন। ভাদ্রেই আবার অরন্ধন, কচুর শাকে পান্তাভক্ষণ। পৌষের শেষে পিঠা পার্ব্বণ, নলেন গুড়ের ওডন পাড়ন; কেকফেষ্টি বালের বড় মজা, ভাবায় শোভা আবার ভাজা; মুগসামলি আওটা পুলি, বাউনী বাঁধা নাহি ভুলি। বারব্রতের কথা কহিতে গেলে গ্রন্থ লিখিতে হয়। হিন্দুললনা বাল্যে ব্রতারম্ভ করিয়া প্রাবীণ্যে সমাপ্তি করিবেন। বাল্যে তুষতুষুলী, পুণ্যপুকুর, যমপুকুর, সেঁজুতি প্রভৃতি। নবযৌবনে ফলগছান প্রভৃতি। একটু পরে বৈশাখী চাঁপার আরম্ভ। প্রাবীণ্যে সাবিত্রীব্রত, অনন্তব্রত প্রভৃতি। আছে অনেক ব্রত, সকল

ব্রতের নাম করিতে পারিলাম না। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ব্রতের তারতম্য। হিন্দুললনার চিরজীবন চলে। সকল ব্রতেই উৎসব, বড় বড় ব্রতে সত্যই মহোৎসব। এখনও সাবিত্রীচতুর্দ্দশীর ব্রতে, অনন্তব্রতে, জলসংক্রান্তির ব্রতে অনেক সংসারে মহোৎসব দেখিতে পাই; এখনও দীয়তাং ভুজ্যতাং হইয়া থাকে। হিন্দুগৃহে এখনও নারীই রাণী, তাই এখনও উৎসব রহিয়াছে, তাই এখনও উৎসবে ধর্ম্মের সংস্রব রহিয়াছে, তাই এখনও উৎসবে আনন্দ রহিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মের উৎসব যত দিন থাকিবে, তত দিনই হিন্দু সংসারের হিন্দুত্ব থাকিবে, আর সংসারী হিন্দুর মনে তত দিনই সুখ শান্তি থাকিবে। উৎসবে অনাস্থা হইতেছে, দেখিয়া এই জন্যেই দূরদর্শী হিন্দুকে ব্যথিত হইতে হয়; ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভীতও হইতে হয়।

গুহাবাস।

কেবল গিরিগুহায় বাস করিলেই যোগী ঋষি হওয়া যায় না, ব্যাঘ্র ভল্লুকাদিও গিরিগুহায় বাস করে। যদি বল, গুহাবাসে মনুষ্যের কেবল ধর্ম্মপ্রবৃত্তিই বাড়িয়া থাকে, কেবল যোগসাধনেই মন যায়, তাহা হইলে ত দস্যুদিগকেও যোগীর দলে ফেলিতে হয়; পৃথিবীর সকল দেশেই দস্যুদিগকে অনেক সময়ে নিবিড় বনে বা গিরি-গুহায় বাস করিতে হয়। কেহ কেহ আবার বন জঙ্গল গুহাগহ্বর না পাইয়া বড় বড় বৃক্ষ-কোটরেও বাস করিয়া থাকে। হুগলি জেলায় বলাগড় অঞ্চলের বিখ্যাত ডাকাত কেনা গোয়ালা দিনের বেলায় বৃক্ষকোটরে থাকিত, রাত্রি-কালে যে গৃহস্থের বাড়ীতে আসিত, তাহাকেই কেনারামের ভোজনতৃপ্তি করিতে হইত; সকল ঘরেই এক পাথর অন্ন ব্যঞ্জন কেনারামের জন্যে সঞ্চিত থাকিত। না দিলে ত আর রক্ষা ছিল না; কেনা গোয়ালা যাহার উপর বিরক্ত হইত, তাহার যে, তিষ্ঠান ভার হইত! মধ্যপ্রদেশে, মধ্যভারতে, বোম্বাই প্রদেশের কোন কোন জেলায়, উত্তর পশ্চিম পঞ্জাবেরও স্থানে স্থানে এখনও অনেক দস্যু, হয় বিজন বনে না হয় গিরিগুহায়, কালাতিপাত করিয়া থাকে! যত ভীল দস্যুই প্রায় গুহাবাসী! তাঁতিয়া ভীলের কথা সকলেই শুনিয়াছেন, সে বৎসর তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে। সে গুহাবাসী ছিল, কখনও কখনও লোকালয়েও থাকিত; তাহার যে, অবিদ্যা ছিল। আর অবিদ্যার জন্যেই তাহার শেষে বিদ্যাপ্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক দস্যুকেই অবিদ্যার জন্যে ধরা পড়িতে হইয়াছে; বঙ্গের বিখ্যাত দস্যু রাধানাথকে অবিদ্যার ভবনেই ধরা হইয়াছিল। অবিদ্যা যে, ইংরেজরাজের রাজকীয় অর্থে বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। স্মিথ এলিয়ট প্রভৃতি দস্যুনাশক দস্যুশাসক দিগের গুপ্ত চর ঘুরিত চারিদিকে, অর্থব্যয়েও ত তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন না। বিখ্যাত দস্যুশাসক ব্লাকীয়ার সাহে-বের শতাধিক পেষা দস্যু ছিল। তিনি দস্যু দিয়া দস্যু ধরিতেন; দস্যু-দমন-কার্য্যে যাঁহারা বাহাদুরী লইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই দস্যুপালন করিতে হইত। কুনকী হাতী না হইলে, বন্য হাতী ধরা যায় না; ঘাই হরিণ না হইলে বনের হরিণ ধরিবে কিরূপে? বাল্যকালে আমরাও ত খাঁচার ভিতর পোষা বুলবুলী—ঠিক বলিতে গেলে বুলবুলিনী—রাখিয়া, সেই খাঁচা ছাদে রাখিয়া দিতাম, বনের বুলবুলী আসিয়া খাঁচায় ঢুকিত আর ধরা পড়িত। সর্ব্বত্রই দেখিবে, প্রেম করা নয় প্রাণে মারা! ঠক ও দস্যুদিগের ইতিবৃত্ত দেখিলেই, জানিতে পারিবে, অনেক স্থলেই অবিদ্যার জন্যে হাতী হাঁদলে পড়িয়াছে, বাঘ বাগুরায় আসিয়াছে! দুই এক স্থলে বাহিরের অবিদ্যা নহে—ঘরের বিদ্যাও—বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে; অর্থলোভ যে, বড় লোভ! কিন্তু সেখানে দেখিবে ঘরের গৃহিণী শত্রুতা করিয়াছে, সেইখানেই বুঝিবে, তাহার চরিত্র দুষ্ট!

কিন্তু আর ত কথা বাড়াইলে চলে না। কথাপ্রসঙ্গে কথা আনিলে, এক প্রবন্ধই অষ্টাদশ পর্ব্বে পরিণত করা যায়। লেখনীর ত বিশ্রাম নাই, কল্পনারও কামাই নাই। আমাদের স্নেহভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত অমৃতলাল রায়কে এক মার্কিণ সাময়িক পত্রের সম্পাদক বলিয়াছিলেন, শুদ্ধ এক হাতের পাঁচটা অঙ্গুলির কথায় পাঁচখানা প্রকাণ্ড পুস্তক লেখা চলে। কথা মিথ্যা নহে। আমরাও এক গাছা তৃণের কথায় তিন শত তেত্রিশটা তালগাছের মত প্রবন্ধ লিখিতে পারি। দস্যুর কথায় দশখানা মহাভারত রচিব, তাহাতে আর বিচিত্র কি? গণেশ সহায় নহেন বলিয়াই, লেখনী-চালনে হস্ত ব্যথিত হয়। অন্যথা আমরাও ত দিবারাত্র প্রবন্ধ চালাইতে পারি। শক্তি সামর্থ্যের অভাব নাই, প্রবৃত্তি অনুরাগেও ত্রুটি নাই। পাঠকের অভাব হয়, আপনারাই পড়িতে পারি। "আপনি মাঝী আপনি দাঁড়ী আপনি চড়নদার। নিজে লিখি নিজে পড়ি নিজেই দেখি লেখার বাহার।" এতই স্বাধীনতা; আত্মনির্ভর যে, আঠার আনা! তবে কিনা, আপরুচি লেখা, আর পর রুচি পড়া। অতএব ইন্দ্রিয়সংযমের ন্যায় লেখনীসংযমও অবশ্যকর্ত্তব্য!

সুতরাং গুহাবাসের কথায় লেখনী-সংযম করিতে হইতেছে। দস্যু তস্করের গুহাবাস দেখিতে চাও পাঠক, একবার ইউরোপের গ্রীস ইতালির দিকে যাত্রা কর। সেকালের কথা কহিতেছি না, একালের কথাই কহিতেছি। তখনকার জলদস্যু কর্সেয়ারদিগের কথা কহিতেছি না, এখনকার স্থলদস্যু রবার ব্রিগাণ্ডদিগের কথাই কহিতেছি। ভয়ঙ্কর দস্যু—গ্রীস ইতালির তারা সব ভয়ঙ্কর দস্যু! এখনও ইতালি সিসিলির দস্যুরা ধনী মানীদিগকে একক পাইলে ধরিয়া লইয়া যায়, আপনাদের গুহাদুর্গে গুপ্ত রাখে। বন্দীকে দিয়া পত্র লেখাইয়া লয়, পত্র লিখিতে হয় কোন আত্মীয় স্বজনের নামে। "অমুক সময়ের মধ্যে অমুক স্থানে এত হাজার টাকা রাখিয়া দিলেই, আমাকে পাইবে; অন্যথা দস্যুরা আমাকে প্রাণে মারিবে।" পত্রে শুদ্ধ এই কথা লেখা হয়। কোথায় কিরূপে ধৃত হইয়া কোথায় কিরূপে রক্ষিত হইয়াছে, কোথাকার দস্যুরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, ইত্যাদি কোন কথাই লিখিবার যো নাই। যাহাতে দস্যুদিগের কোনরূপ সন্ধান হইতে পারে, সেরূপ কোন সংবাদই পত্রে স্থান পায় না। যেস্থলে টাকা রাখিবার কথা বলা হয়, দস্যুদের পক্ষে তাহা সদা-গন্তব্য নহে। সুতরাং পত্র লেখাইতে দস্যুরা ভয় করে না। তবে যে, কখনও এরূপ পত্রে দস্যুরা বিপদে পড়ে না, এরূপ নহে। গ্রীস ইতালি সিসিলির দস্যুরা ত মধ্যে মধ্যে বিপদেও পড়ে। পত্র দিয়া ডাকাতী করিবার প্রথা আমাদের দেশেও ছিল। বিশ্বনাথ রঘুনাথ রাধানাথ বৈদ্যনাথ প্রভৃতিও নিমন্ত্রণ-পত্র দিতেন। "অমুক দিন অমুকস্থানে এত টাকা রাখিও, নতুবা সদলে গিয়া তোমার সহিত দেখা করিব।" এরূপ দস্যুদত্ত পত্রের ত সেকালে রেওয়াজই ছিল। এখনও মধ্যে মধ্যে এরূপ পত্রের হুজুক উঠে, কিন্তু প্রায়ই জাল! সকল দিকেই যেরূপ অবনতি হইয়াছে, দস্যুবৃত্তি বিষয়েও সেইরূপ অবনতি হইয়াছে। দেশে—বঙ্গদেশের কথাই বিশেষ করিয়া বলিতেছি—দস্যু আছে, কিন্তু দস্যুবীর নাই। তখনকার দস্যুদিগের যে মহত্ত্ব ছিল, এখনকার দস্যুদিগের সে মহত্ত্ব নাই। তখনকার দস্যুরা ধনীর লুণ্ঠন করিয়া নির্ধনকে দান করিত যেখানে সহজেই অর্থলাভ হইত, সেখানে গৃহস্থকে বিপন্ন করিত না। বিশ্বনাথ ত একপ্রকার রাজাই ছিলেন, পাঁচ ছয় শত দস্যুর অধিপতি ছিলেন। শুদ্ধ নদীয়া জেলায় নহে, হুগলি চব্বিশ পরগণায়ও রাজত্ব করিতেন। নদীয়ার স্বরূপগঞ্জেই তাঁহার রাজধানী ছিল। বিশ্বনাথ অনেক দীন দরিদ্র অনাথ অনাথার প্রতিপালনও করিতেন। রাধানাথ রঘুনাথ প্রভৃতিরও মহত্ত্বের অভাব ছিল না। গ্রীস ইতালির দস্যুদিগের ভিতরও সেকালে মহত্ত্ব দৃষ্ট হইত। এখন সর্ব্বত্রই অবনতি হইয়াছে, সর্ব্বত্রই সকল দিকে নীচতার আধিপত্য হইয়াছে, দস্যুদলেও এখন নীচতার বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু এখনও গ্রীস ইতালির কোন কোন ধনিসন্তান মদ বেশ্যা এবং দ্যূতে সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া শেষে দস্যুবৃত্তি ধরিয়া থাকেন। এই সেদিনও ত সিসিলির এই-রূপ এক দস্যুর কথা শোনা গিয়াছিল। ইতালিরও এরূপ সংবাদ একেবারে দুষ্প্রাপ্য নহে। পাঠক, খ্রীষ্টেরও নহে।

অনেকে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবার ভয়ে দস্যুদলে প্রবেশ করে। কোন কোন নরহত্যাকারী যে, দস্যুদলে যোগ গিয়াছে, তাহা ত সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইতালি গ্রীসের দস্যুসম্প্রদায় পূর্ব্বে এইরূপে বড়ই পুষ্ট হইত, এখনও যে, না হয় এরূপ নহে। আমাদের দেশেও এরূপ দৃষ্টান্তের অত্যন্তাভাব নাই। দস্যুপুরাণের আলোচনা করিলেই পাঠক, রহস্যবোধ করিতে পারিবে।

তথাপি যে, প্রবন্ধ বাড়িয়া যায়! স্বভাবের দোষ! "অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।" আর "ইল্লৎ যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না মলে।" অথবা বিষ্ণুশর্ম্মাও বলিয়াছেন,

"স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে
যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ।"

বলি ত লেখনীর সংযম করিব, কিন্তু লেখনী আমাদের যে, সংযম মানে না! গণেশের লেখনীও ত সংযম মানিত না। সেই ভয়েই ত বেদব্যাস ঠাকুর গণপতির সহিত সর্ত্ত করিয়াছিলেন, "অর্থগ্রহ না করিয়া লিখিতে পারিবে না।" এই সর্ত্তে ভর করিয়াইত ব্যাসদেব মধ্যে মধ্যে অতি-দুরূহ দুর্ব্বোধ রচনা রচিতেন; সেইগুলাই ত পাঠক ব্যাস-কূট। আমাদের কিন্তু সর্ত্তও চলে না, আমরা যে, নিজেই ব্যাসদেব, নিজেই গণেশ। আমাদের ব্যাসকূট চলে না। তবে মধ্যে মধ্যে হাতবেদনা হওয়ায় একটু একটু ব্যথাকূট হয় বটে, তাই পাঠকের রক্ষা! আর এক কূটও আছে, মধ্যে মধ্যে চুরুট ধরাইতে হয়। এই চুরুটকূটের কল্যা-ণেও পাঠক নিষ্কৃতি পান।

ইতালি গ্রীস অঞ্চলে ভদ্র লোকের দুর্দ্দান্ত সন্তানেরাও মধ্যে মধ্যে নরহত্যাদি করিয়া দস্যুদলে যোগ দেন। আবার কেহ কেহ দস্যু দলে যোগ না দিয়াও গুহাবাসী বনবাসী হইয়া থাকেন। দস্যুদলে যোগ দেন নাই, অথচ বনগুহাবাসী হইয়াছেন, এরূপ বিদ্বান যুবকও কখনও কখনও দৃষ্ট হইতেন। একজনের কথা কহিবার জন্যেই পাঠক এতটা গৌরচন্দ্রিকা করিলাম। গৌরচন্দ্রি-কাতেই প্রবন্ধ ভরিয়া গেল। হইল যেন পাঁচ হাত কাঁকু-ড়ের পঁচিশ হাত বীচি। অথবা যেন ঢাউস ঘুঁড়ীর লেজুড়, পাঁচ হাত ঘুঁড়ীর পঞ্চান্ন হাত লেজুড়। চিংড়ী মাছও বলিতে পার; খোলায় ভরা, শাঁস পাওয়া ভার। একটা একটা নারিকেল দেখিয়াছ, এক ঝুড়ী ছোবড়ার ভিতর এক বর্ত্তুল মালা! যদি কেহ ভক্ত থাকেন, তবে তিনি গৌরচন্দ্রিকায় কেবল দোষ দেখিবেন না। তিনিই ত বলিবেন "কালোয়াতের গান।" তিন কথায় কালোয়াতী গানেও ত তিন ঘণ্টা আলাপচারী করতব চলে; রাগিণী ভাঁজিতেই ত রাত ভোর হইয়া যায়। আর গীতার ব্যাখ্যাতেও ত দেখিতে পাও, এক একটা শ্লোকের এক এক অধ্যায় টীকা। কেবল মন্দটী ধরিলেই চলিবে কেন? কচুরীর পূর অপেক্ষা কি ছাউনীর আদর কম?

এখন শোন পাঠক প্রকৃত কথা। ইতালির নেপলস প্রদেশের দক্ষিণাংশে—পর্ব্বত আছে, পর্ব্বতে গুহা গহ্বর আছে; যেখানে পর্ব্বত সেইখানেই গুহা। গুহাবন্ যে, পর্ব্বতের একটা নাম; কোষে না পাইলে রোষ করিও না, প্রকৃতের ত আর অপলাপ করিতে পারিব না। বিশ্বকোষে

না পাওয়া যায় কি? এ বিশ্বই যে, ব্রহ্মাণ্ডকোষ! দক্ষিণ নেপল্‌সের গিরিগুহায় পূর্ব্বে অনেক দস্যুই আশ্রয় লইত, দিবসে গুহাশয় হইয়া রাত্রে আপনাদের কর্ম্মকাজ করিত। গুহাগুলা যেন আবার দুর্গ! দুর্গে প্রহরী শান্ত্রী নিযুক্ত থাকিত, চারিদিকে গুপ্তচরেরও অভাব হইত না। এক একটা দস্যুদলে দেড় শত দুই শত দস্যু-সৈনিক বিরাজ করিত; প্রধান দলপতিই থাকিতেন বড় সেনাপতি হইয়া। জেনেরলের তাঁবে থাকিত, কর্ণেল মেজর কাপ্তেন লেপ্টেনাণ্ট এন্‌সাইন। পলটনের ব্যবস্থাই বাহাল থাকিত, সর্ব্বত্রই দস্যুদলে পলটনের ব্যবস্থা; বাধ্যতা অধীনতার চূড়ান্ত বন্দোবস্ত। আমাদিগের মনে হয়, প্রথমে দস্যুরাই দল বাঁধিয়াছিল, আর সকল দেশেই দস্যুর কাছেই রাজারা সৈন্যসজ্জার শিক্ষা করিয়াছিলেন। বোধ হয় আদিকালের দস্যুরাই রাজায় পরিণত হইতেন। একালেও ত দেখা গিয়াছে, মহারাষ্ট্রের শিবজী দস্যু হইবার পরে রাজা হইয়াছিলেন; রণজিতের পিতাকেও ত কতকটা ঐ আসনে বসাইতে হয়।

নরহত্যার পর গৃহত্যাগী হইয়া বনবাসী গুহাবাসী হইয়াছেন, এরূপ ভদ্রসন্তানও গ্রীস ইতালি রাজ্যে দেখা গিয়াছে, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। দক্ষিণ নেপলেসেও এইরূপ একটী সম্ভ্রান্ত যুবক দৃষ্ট হইয়াছিল! তাঁহার নাম সেল্‌বেদর। সেলবেদর সম্ভ্রান্তবংশে—সম্ভ্রান্তধনিবংশে জন্মিয়াছিলেন, পিতা মাতার আদরের ধন ছিলেন, বাল্যে সেই জন্যে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। সাধু সচ্চরিত্র ছিলেন। কিন্তু একটী প্রিয়বন্ধু অতি দুশ্চরিত্র হইয়া পড়িলেও তাহাকে ছাড়িতে পারেন নাই, ভালবাসা ভুলিতে পারেন নাই। বাল্যবন্ধু যৌবনারম্ভেই চোর হইয়াছিল, চোরের দলে মিশিয়াছিল, ক্রমেই উন্নতি করিয়াছিল, চোর-বন্ধু ক্রমে ডাকাত হইয়াছিল, শেষে পাকিয়াছিল, নরহত্যায়ও সুপটু হইয়া উঠিয়াছিল। নাম ছিল ইহার এনীনো। এনীনো যে, এত পাকিয়াছিল, তাহা সেল্‌বেদর জানিতেন না, তবে তাহার চরিত্র যে, খুব মন্দ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। অনেক লোকেই অর্থাভাবে অনর্থ ঘটায়, দৈন্যের জন্যে পাপ করে, ইহা মনে করিয়া মধ্যে মধ্যে এনীনোকে অর্থসাহায্যও করিতেন, আর সদুপদেশে তাহাকে সৎপথে আনিবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন।

ফল হয় নাই, এনীনো ক্রমে ঘোর দস্যু হইয়া উঠিয়াছিল, স্বগ্রামেও দস্যুবৃত্তি সুরু করিয়া দিয়াছিল। একদা সেল্‌বেদরেরই এক প্রতিবেশীর ভবনে ডাকাতী করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। মনে করিয়াছিল, প্রথমে সেলবেদরেরই ভাঁটী-বাড়ীতে দলশুদ্ধ গুপ্তবাসে থাকিবে, তাহার পর নিশীথে নিশুতি হইলে, কার্য্যসিদ্ধি করিবে। বলা বাহুল্য, সেল্‌বেদরদিগের মদের কারবার ছিল, দ্রাক্ষার বাগান ছিল। তখন চোলাই-কাজ বন্ধ ছিল, তাই এনীনো সেই নির্জ্জন ভাঁটী-ভবনে গুপ্তবাস করিতে চাহিয়াছিল। সেল্‌বেদরকে সকল কথা খুলিয়া বলিয়াছিল, তিনি এ ঘোর দুষ্কর্ম্মে সাহায্য করেন নাই, পরন্তু এনীনোর নাম না করিয়া, প্রতিবেশীকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। এনীনোর হইল বিষম আক্রোশ, যিনি তাহার জন্যে এত করিতেন, দস্যুবন্ধুকেও অর্থসাহায্য করিতেন, তাঁহারই নিপাত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। তাহার দস্যুহৃদয়ে ত আর তখন স্নেহ মমতা ছিল না, কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বেই উড়িয়া গিয়াছিল! এনীনো যে, ঘোর বৈরনির্য্যাতনে সঙ্কল্প করিল, তাহা সেল্‌বেদর জানিতে পারিলেন না, ততদূর সন্দেহও করিলেন না। প্রবৃত্তি হইল না, মায়া যে, একান্তই নীচগামিনী! এনীনো তর্কে তর্কে থাকিল, এক দিন সেলবেদর একাকী প্রত্যূষে পাখী মারিতে বাহির হইয়াছেন দেখিয়া এনীনো অবসর পাইল, ঝোপের ভিতর থাকিয়া তাঁহার উদ্দেশে দুইবার পিস্তলের ঘোড়া টিপিয়াদিল। তখন সেল্‌বেদরের চট্‌কা ভঙ্গিল, তিনি দৌড়িয়া গিয়া এনীনোকে ধরিয়া ফেলিলেন। দুইজনে পাকড়াপাকড়ি চলিতে লাগিল। সেল্‌বেদর এনীনোর পিস্তল—যে পিস্তল নিজেই তাহাকে পূর্ব্বে উপহার দিয়াছিলেন সেই পিস্তল—কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভয়, পাছে আবার গুলি করে। পাকড়াপাকড়ি ধ্বস্তাধ্বস্তিতে হঠাৎ পিস্তলের ঘোড়া ছুটিয়া গেল ঘোরা পিস্তলে আরও গুলি পোরা ছিল, একটা গিয়া এনীনোর বক্ষে প্রবেশ করিল। নরহত্যা হইল, দেখিয়া সেল্‌বেদর স্বগৃহে পলাইয়া গেলেন, পিতা মাতাকে সকল কথা জানাইলেন, তাঁহারা পুত্রকে পলাইতে লুকাইতে পরামর্শ দিলেন; পুত্রও প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেলেন। ওদিকে শব্দ শুনিয়া যে কয়টা রাখাল ঘটনাস্থলে আসিয়া পড়িয়াছিল, মৃত্যুকালেও মিথ্যা কথা কহিয়া, এনীনো তাহাদিগকে বুঝাইয়াদিল, সেল্‌বেদরই আমাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুলি করিয়া পলাইয়াছেন। দৃষ্ট হইল, এনীনোর পিস্তলে সেল্‌বেদরের নাম লেখা, উপহারে ত উপহারদাতার নাম থাকা বিচিত্র নহে। আবার নিকটেই সেল্‌বেদরের পরিচিত পাখি মারা বন্দুক। সুতরাং পুলীশ আসিয়াও স্থির করিল, সেল্‌বেদরই এনীনোর হত্যা করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিবার জন্যে চেষ্টা হইল, পুলীশ তাঁহার বাড়ীতে গিয়া দেখিলেন, তিনি পলাইয়াছেন। তখন অপরাধ প্রতিপন্ন হইয়া গেল। এইরূপই হইয়া থাকে, অনেক সময়েই অকৃত অপরাধও ঘাড়ে পড়ে।

কিছুদিন খুঁজিতল্লাসী চলিল, কিন্তু কোন সন্ধান হইল না। রাজপুরুষদিগের জিদ কমিয়া গেল, পুলীশের জিদও সুতরাং কমিয়া গেল, সেল্‌বেদর যে, নিজগুণে যত লোকের প্রীতিভাজন ছিলেন, আর তাঁহার পিতা যে, রাজপুরুষদিগেরও ভক্তিভাজন ছিলেন। কিছুদিনের পর ধরা খোঁজার নামগন্ধ রহিল না। কিন্তু তথাপি সেল্‌বেদর গৃহবাসী হইতে সাহস করিলেন না। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতেই বাস করিতে লাগিলেন। দুর্গম নির্জ্জন গিরিগুহা হইল তাঁহার নিভৃতনিকেতন, যত পশু পক্ষী হইল প্রিয় প্রতিবেশী। পাখীগুলি আসিয়া তাঁহার কাছে থাকিতে বসিতে লাগিল, মৃগ মহিষাদি তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিল। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল! ক্রমে বৎসরের পর বৎসরও যাইতে লাগিল! ক্রমে পুলীশের একেবারেই ঔদাসীন্য হইল, দেখিয়া সেল্‌বেদর অপরাহ্নে ভোজনকালে—সহোদরাদিগের বংশীধ্বনি শুনিয়া—প্রত্যহ একবার করিয়া বাড়ী আসিতে লাগিলেন, পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনীদের সহিত একত্র ভোজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভোজনান্তে আর বাড়ীতে থাকিতেন না; নৈশ ভোজনের জন্যেও কিঞ্চিৎ খাদ্য লইয়া নিজের গুহাভবনে—সেই নিভৃত নিকেতনে—গিয়াই আশ্রয় লইতেন। অভ্যাসে সব হয়, গুহাবাসেই তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন। ভগিনীদিগের বংশীরবের কল্যাণে ত পান-ভোজনেরও অভাব হইত না। সুখেই কালযাপন করিতে লাগিলেন। কাছে দুই একখানা পুস্তকও রাখিতেন। বিদ্বান ছিলেন, অধ্যয়ন বিনা কালযাপন করিতে পারিতেন না। বিনা অধ্যয়নে কালযাপন করাও ত এরূপ লোকের পক্ষে অতি কষ্টকর। মনোমত পাঠ্য থাকিলে পাঠক, আমরাও নিভৃত নিকেতনে কাল কাটাইতে পারি। তোমরাও পার নিশ্চিত। পুস্তকের মত সহচর নাই। এ সহচরের সহিত মনান্তর হয় না, বিবাদ বচসা হয় না, হাতাহাতি মারামারি হয় না।

সেল্‌বেদরের যখন এইরূপে কাল কাটিতেছিল, দুই বৎসর পরে—সেই সময়েই ঐতিহাসিকের এক বন্ধু তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। বন্ধু ঐ বাড়ীতে সর্ব্বদা যাওয়া আসা করিতেন, প্রায়ই আহারাদি করিতেন; অতি বন্ধুতার জন্যে দ্বার অবারিত ছিল। কিন্তু বরাবরই তিনি পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ দিয়া যাইতেন, বোধ হয় সেইরূপই ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন। বোধ হয় ঐ গুহাবাসী পুত্রের জন্যেই মাতা ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। কিন্তু হেতু সম্বন্ধে বন্ধু কখনও কোনরূপ সিদ্ধান্ত করেন নাই। তাই হঠাৎ এক দিন বিনা সংবাদে গিয়া পড়িয়াছিলেন। বাটীর সকলেরই ঈষৎ বিব্রতভাব দেখিয়া প্রকৃত হেতু বুঝিতে পারেন নাই। মনে করিয়াছিলেন, হয় ত অতিথিসেবার ভালরূপ আয়োজন নাই। তাই "যাহা আছে, তাহাই খাইব" বলিয়া রহিয়া গেলেন। তখন সেল্‌বেদরের পিতা মাতা প্রভৃতির সহিত উহাঁর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতাই হইয়া গিয়াছে, আর বিশ্বাসও অসীম। সুতরাং প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বাড়ীর মেয়েরা গুহাবাসী—ভোজনার্থে আগত—ভ্রাতাকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। আর তাঁহার মুখেই বন্ধু গুহাবাসের হেতুসম্বন্ধে সকল কথা শুনিতে পাইলেন। বন্ধুর মুখে শুনিয়া ঐতিহাসিক যাহা বিবৃত করিয়াছেন। লেখকের কল্যাণে আমরাও তাহা পাঠকদিগকে উপহার দিতে পাইলাম, গুহাবাসী চতুর্ব্বিংশবর্ষীয় সম্ভ্রান্ত যুবক সেলবেদরের কথা সকলকে শোনাইয়া দিতে পারিলাম। সকলের তৃপ্তি না হউক, আমাদের তৃপ্তি হইল। যাহা মিষ্ট লাগিয়াছে, তাহা ত সকল বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনকে বাঁটিয়া দিতে পাইলাম।

চুম্বনের নীলাম।

আমরিকার নিউইয়র্ক সহরে একটী রমণী আছেন, তিনি রবার্ট কটিঙের স্ত্রী, কিন্তু কার্য্যে অভিনেত্রী। অভিনয়ক্ষেত্রে মিনী মেলিগান বলিয়া পরিচিত। নিশ্চিত সুন্দরী এবং যুবতী, নতুবা অত সাহস করিয়া নিজের চুম্বন নীলামে চড়াইতে পারিতেন না। ধর্ম্মার্থে নীলাম। নিউইয়র্ক হইতে সংবাদ পাইয়াছি, "অভিনেত্রী মিনী মেলগান ওরফে বিবী রবার্ট কটিং যিহুদিসম্প্রদায়ের দান কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্যে একটী চুম্বন নীলামে বেচিবেন। নীলামে যিনি সর্ব্বোচ্চ দর দিবেন, তিনিই কিনিবেন, কিন্তু দর হাজার ডলার অর্থাৎ ৩ হাজার টাকার কম হইবে না।" এই যে, চুম্বন, ইহা কোন্ পক্ষের? সুন্দরী দিবেন কি লইবেন? প্রবীণ লেখকের সন্দেহ দেখিয়া নবীন পাঠক হাসিও না, নবীনে পাঠকে তুমিও অবজ্ঞা করিও না। সন্দেহের হেতু আছে, সন্দেহ মূল্য উপলক্ষে। আচ্ছা বল দেখি, কোন্ চুম্বনের মূল্য অধিক? তুমি সুন্দরী যুবতীর সুকোমল গালে চুম্বন করিলে, আর ঐ সুন্দরী যুবতী স্বীয় কোমল অধরোষ্ঠসংযোগে পাঠক তোমার গালে চুম্বন করিলেন; বল দেখি, কোন চুম্বনের মূল্য অধিক? পাঠিকার কাছেই কি প্রকৃত উত্তর পাইব? আমাদের ত মনে হয় না। কিন্তু আমাদের মনে হয়, পুরুষের পক্ষে চুম্বন দেওয়া অপেক্ষা চুম্বন লওয়াই অধিক তৃপ্তিকর এবং সুতরাং অধিক দামী। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, নিউইয়র্কের ঐ নীলামের চুম্বনটী কোন্ চুম্বন?

বেচিতে গেলেই দিতে হয়। তুমি আম বেচিলে; পয়সা লইয়া আমটী আমাকে দিলে। যুবতী টাকা লইয়া চুম্বন বেচিলেন, চুম্বনটী তোমাকে দিলেন। এই ত বিক্রয়ের অর্থ। এই যে, দেওয়া, ইহা কিরূপে? আমরা ত দেখিতেছি, শাঁখের করাত দুই দিকে কাটে। তোমাকে যুবতী নিজের গালে অধরোষ্ঠ-স্পর্শ করিয়া তাঁহার গণ্ডস্থ কোমল মাংস একটু টানিতে দিলেন—হাত দিয়া নহে ঐ অধর ওষ্ঠ দিয়াই একটু টানিতে দিলেন, অর্থাৎ না হয় একবার চুষিয়া লইতেই দিলেন; ইহা ত চুম্বন। এইরূপ চুম্বনই যুবতী তোমাকে এইরূপে বেচিলেন? তিনি নিজের কোমল অধর ওষ্ঠ দিয়া তোমার অকোমল গালে

চুষিয়া লইলেন, ইহাও ত চুম্বন। তোমাকে চুম্বন করিতে দিয়া বেচিলেন—না তোমার গালে চুম্বন করিয়া বেচিলেন? আমাদের পক্ষে ত বিষম সমস্যা! বিক্রয়ে যে সমস্যা, দানেও সেই সমস্যা। পদার্থগত সমস্যা একইরূপ. তবে অর্থগত সমস্যায় প্রভেদ আছে। দানে ত আর অর্থ যায় না। যদি আমাদের ব্যবস্থা গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে, সুন্দরীকেই সুন্দরের গালে চুম্বন করিতে হইবে, মূল্য বাবদ এইরূপ চুম্বন দিতে হইবে। কেন না, এইরূপ চুম্বনেরই মূল্য অধিক। অন্যরূপ চুম্বনের, অর্থাৎ যুবতীর গণ্ডে পুরুষ কর্ত্তৃক গৃহীত যে চুম্বন তাহার মূল্য কম।

আর এতদ্বিষয়ক শাস্ত্র অনুসারে ধরিতে গেলে, ঐ শেষোক্ত প্রকার চুম্বনের জন্যে সুন্দরী ত সুন্দরের কাছে এক কপর্দ্দকও পাইতে পারেন না। হলপ লইলেই তাঁহাকে বলিতে হইবে, তদ্গণ্ডে পুরুষ কর্ত্তৃক গৃহীত যে চুম্বন, তাহা পুরুষ অপেক্ষা তাঁহার পক্ষেই অধিক তৃপ্তি, কর। যে পা টিপিয়া দেয়, পা টেপায় তাহার তৃপ্তি না যাহার পা তাহার তৃপ্তি? পাটী যুবতীর অঙ্গ, গালটীও ত যুবতীরই অঙ্গ। পা টেপার জন্যে, যে টেপে, তার কাছে মূল্য লইতে হয়, না তাহাকে দিতে হয়? যেরূপেই হউক কিছু দিতে হয় ত? পদমর্দ্দনের বেলায় দিতে হয়, গণ্ডচুম্বনের বেলায় লইতে হইবে কেন? সাধে কি মার্কিণ চুম্বনের প্রকারসম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াছি!

আবার যেমন তেমন চুম্বন নহে, নীলামের চুম্বন! বল ত সুন্দরী একপ্রকার চুম্বনে স্বয়ংবরই হইবেন। নীলামের ডাক অনেকেই ডাকিবেন, হাইয়েষ্ট বিডারে ছাড়া হইবে। ৬ হাজার টাকার হাইয়েষ্ট বিড—চূড়ান্ত ডাক! পুরুষসমাগমে হাট ভরিয়া যাইবে। আর ঐ চুম্বনের নীলাম হইবেও একটা মেলায়। দর ত ৬ হাজারের উপরেও উঠিতে পারে? "অধিকন্তু ন দোষায়," যুবতী একটা দর ধরিয়া দিয়াছেন মাত্র। ইহার কমে বেচিবেন না; অধিক হয়, ভালই। সকল নীলামেই এই নিয়ম। চুম্বনের নীলামে হইবারই কথা। মার্কিণ রাজ্যে ত আর ধনপতির অভাব নাই, নিউইয়র্কে বিশেষতঃ। তবে কিনা, অভিনেত্রীর চুম্বন! অভিনয়ের সময়ে ত প্রায়ই চুম্বন দিতে হয়। কিন্তু সেখানে ত তাদৃশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই, যদিই থাকে তবে দুই একজনের। নাটকে না হয় এক নায়কের প্রতিদ্বন্দ্বী এক প্রতিনায়ক, দুই এক স্থলে একাধিকও হইতে পারে, কিন্তু প্রায় নহে। যে হেতু

"একে রুণু ঝুনু দুইয়ে পাঠ,
তিনে গণ্ডগোল চেরে হাট।"

দুইটীর অধিক হইলেই গণ্ডগোল, নাটকের রসভঙ্গ! সুতরাং সুন্দরী যুবতী অভিনেত্রী হইলেও, মেলার মাঝে তাঁহার চুম্বন স্পৃহনীয়। হাইয়েষ্ট বিডার ত একজন বই হইবে না। হয় ত দশ বিশ হাজারকে হতাশ হইয়া হাঁ করিয়া থাকিতে হইবে—হাহাকার করিতে হইবে! উচ্চতম দর হয় ত লক্ষে উঠিবে, চুম্বনেই হয় ত যুবতী লক্ষহীরা হইবেন।

দৃশ্য বটে, আমাদের মত প্রবীণের পক্ষে কেবল শ্রাব্য হইলেও ক্ষতি নাই; চুম্বন নহে—চুম্বনের কথা। দন্তহীনের কৃত চুম্বনও শ্রাব্য হয় বটে, কিন্তু প্রাবীণ্যে আর বার্দ্ধক্যে প্রভেদ আছে। চুম্বনচর্চ্চাটা রাখা ভাল। আজ কাল সংবাদপত্রে সাময়িক পত্রে চর্চ্চাও হইতেছে নানারূপ, নানারূপ চুম্বনের; চুম্বনঘটিত নানারূপ ক্রিয়াকলাপের।

বাজীর চুম্বনের কথা পাঠকের শ্রুত হইয়াছে, দৃষ্ট হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না। ঘণ্টায় হাজার, ঘণ্টায় দুই হাজার, দশ ঘণ্টায় দশ হাজার, ইত্যাদি হারে চুম্বনের বাজী হইয়া থাকে। ইউরোপ আমরিকায় ঘন ঘন হইতেছে। এ বাজীর চুম্বনে প্রকারভেদজন্য সন্দেহ নাই। স্পষ্ট করিয়া বলা হয়, পুরুষ রমণীর গালে চুম্বন করিবেন। আর যখন ঘণ্টায় হাজার দু হাজার, তখন ত চুম্বনে রমণীর কর্ত্তৃত্ব ঘটিতেই পারে না। কিন্তু এরূপ বাজীর স্থলে পুরুষকে এক গণ্ডে বা এক রমণীর গণ্ডে আবদ্ধ রাখা যুক্তিসিদ্ধ নহে। বাজী জিতিলে পুরুষের লাভ, চুম্বনের যাতনা রমণীকে সহিতে হয় কেন? ঘণ্টায় হাজার ত সহজ নহে। কোমল গাল যে, শতাধিকেই টাটাইয়া উঠে!

যদি বল, গাল বদলাইতে গেলে সময় নষ্ট হইবে, তাহা হইলে ডাক-পাল্কী দেখাইব। ডাকের পাল্কী বেহারাদের কাঁধে কাঁধেই থাকে, বেহারা বদল হয়, পাল্কী কাঁধেই থাকে। বাবুর ঘুমও ভাঙ্গে না, সময়ও যায় না। শত চুম্বনের পরই গণ্ড বদল হইবে, দুই দশ চুম্বন বাকি থাকিতে আর এক রমণী আসিয়া সেইখানেই গাল পাতিয়া দিবেন। চুম্বনের তাহাতে অসুবিধা হইবে না, সময়ও যাইবে না। আর নূতন গালও চুম্বনের চঞ্চু চুম্বকের মত টানিয়া লইবে। চঞ্চু বলিলাম ইচ্ছা করিয়া, পাখীর চুম্বনে ধার অধিক।

চুম্বনের নীলামে বিস্মিত হও কেন? যাহার ব্যবসায় চলে, তাহারই ত নীলাম চলে। যাহার মূল্য আছে, তাহারই আদান প্রদানে ব্যবসায় হয়। বিনামূল্যে কি চুম্বন মিলে? নগদ মূল্যকেই মূল্য বলে না, বিনিময়ে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই ত মূল্য! তুমি রামকে ধান দিলে, সে তোমায় জমি কোদলাইয়া দিল, তোমার ধানের মূল্য হইল, তাহার খাটুনী; তাহার খাটুনীর মূল্য হইল তোমার ধান।

মুদ্রায় বিনিময়ের সুবিধা হয় মাত্র, কিন্তু মুদ্রাই মূল্য নহে, মূল্যের প্রতিনিধি মাত্র। চুম্বনের যে মূল্য আছে, তাহা সকলেই বুঝেন; নিঃস্বার্থ দান কয় জনের ভাগ্যে ঘটে? ঘরেই লও আর বাহিরেই লও, কোন না কোন প্রকারে মূল্য তোমাকে দিতেই হইবে। যেখানে দেখিবে, পুরুষের গরজ নাই, অন্য পক্ষের গরজ অধিক, সেখানেও মূল্য আছে। তবে, সেখানে ক্রেতা নাই, ক্রেত্রী আছেন; যাঁহার গরজ, তাঁহাকেই কিনিতে হয়। মেয়ে-খরিদার কি হাটে যায় না? কিন্তু চুম্বনের হাটে পুরুষ খরিদারেরই সংখ্যা অধিক। অন্য পক্ষের গরজ থাকিলেও গরব অধিক, বুক ফাটে ত মুখ ফুটে না। নিউইয়র্কের নীলামে দোষ দিতে পার না, ধর্ম্মার্থে উৎসর্জ্জেৎ সর্ব্বং; চুম্বনের মূল্য যে, চ্যারিটিতে যাইবে। পরার্থপরতায়ও চুম্বন দেওয়া চলে। বিলাতের ডিউক-পত্নী যে, পতির পার্লেমেণ্ট-প্রবেশের পথ মুক্ত করিবার জন্যে, একটা কঠোরাধরোষ্ঠ কৃষ্ণককেও স্বীয় কোমলগণ্ডে চুম্বন লইতে দিয়াছিলেন। নজীর যে, এখন গ্রাহ্য। সুব্রাহ্মণকে দিলে ধর্ম্ম হয় না কি? অধ্যাপক পণ্ডিতেরাই মীমাংসা করিবেন। চুম্বনচর্চ্চায় আর বাড়াবাড়ি করিব না। অতিভোজনং রোগমূলং, বিশেষতঃ দ্রব্যটা বড় গুরুপাক। খাওয়া সহজ, হজম করা কঠিন!

বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ইতিহাস।

(ত্রয়োদশ প্রস্তাব।)

৫০। আক্কেল গুড়ুম।

[১২৫৪ সাল—১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ]
(পরমায়ুঃ ৪ চারিমাস মাত্র)

অন্যান্য সংবাদপত্রিকার পরিচয়প্রদানের পরেই এই "আক্কেল গুড়ুমের" কথা যখনই যিনি কিছু বলিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, তখন প্রায় তিনিই ইহার উপর তর্জ্জন গর্জ্জনের অবসর ও সুযোগ করিয়া লইয়াছেন। "আক্কেল গুড়ুমের" আকৃতি প্রকৃতি দেখা শোনা নাই, তথাপি ইহার গুণাগুণব্যাখ্যানে আক্কেল গুড়ুম হইয়া গিয়াছে! কেহ না মনে স্থান দেন, আমরা পরলোকগত "আক্কেলের" পক্ষ-সমর্থনার্থে যমপুরী হইতে প্রেরিত ফিঃ সহিত ওকালতনামা প্রাপ্ত হইয়া বক্তৃতা করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। অথবা অযাচিত আমরা, ভাবাবেশে বিভোর হইয়াছি; সেই জন্য বিনা পয়সায় বাজে কাজে হাত দিয়াছি। কিন্তু বলিতে কি সত্যানুরাগে প্রাণোদিত হইয়াছি বলিয়াই আমাদের এই প্রকার প্রযত্ন চলিতেছে। স্বচক্ষে কিছু দেখি নাই, দেখিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা, শক্তি ও প্রবৃত্তি নাই, তথাপি জোর জবরদস্তীর পক্ষপাতী হওয়া, অন্যায় কর্ম্ম দেখা বা অনুমোদন করা, কি অসহনীয় নয়? ভূমিকাতেই আমাদের কলহমূলক সূচনার অভ্যাসে পাঠকের সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। এক্ষণকার কার্য্য হইতেছে, যাহাতে ঐতিহাসিক অপসিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠাপিত না হয়, তাহা করা। তদভিপ্রায়ে বিপক্ষেও যাহা বক্তব্য রহিয়াছে তাহার প্রসঙ্গ করিবার ইহাই প্রকৃত সময়। ব্রজনাথ বাবুই তাৎকালিক সামাজিকদিগের "আক্কেল গুড়ুম" করিবার প্রধান সর্দ্দার ছিলেন। ব্রজনাথ বাবুর বসতি ছিল এই মহানগরীর মধ্যস্থিত কলুটোলা পল্লীতে। তাঁহার সহচর বা অনুচরের অভাব ছিল না। তাঁহার মতামতের অনুবর্ত্তন করিবার জন্যে, রীতিমত একদল লোক নিরবধি কার্য্যালয়ে হাজির থাকিতেন। পত্রিকার নামটা যেরূপ জাঁকাল, তাহার লেখার ভঙ্গীটা যেমন হুজুকে, সাধারণ লোকের বিশেষতঃ উহার অনুবর্ত্তনকারী পাঠকদলের যে প্রকার গোঁড়ামি, তাহাতেও যে জাঁকাল রকমের জাঁক জমকে লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিয়া পত্রিকাখানি চিরস্থায়িনী হয় নাই, ইহাই সবিশেষ বিস্ময়ের বিষয়! "প্রভাকর" ও "ভাস্কর" যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সূত্রে সাহিত্য-সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, তদুপলক্ষেই ইনি "প্রভাকরের" অপ্রার্থিত সুহৃদ্ ছিলেন। শুদ্ধ বাঙ্গালা বুলিতে বাগ্‌যুদ্ধ, সম্পাদকপ্রবরের মতে, সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। সুতরাং বিজাতীয় বিদেশীয় ভাষার আনুকূল্যেরও প্রার্থনা আবশ্যক হইয়াছিল। ইংরেজি বিদেশীয় ও বিজাতীয় হউক, কিন্তু উহা রাজপুরুষেরই ভাষা। প্রবর্ত্তনকারী ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন, অর্থকরী রাজভাষার সহায়তায় কি না সম্ভবে? কিন্তু অনুমান যদি সব সময় ঠিকঠাক মিলিয়া যায়, তবে কি আর রক্ষা থাকে! দ্বিভাষী "আক্কেল গুড়ুম" "ভাস্কর"-দলীয় লোকদিগকে স্তম্ভিত করিতে গিয়া চারি মাস পরে নিজেই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, পক্ষান্তে আবির্ভূত হইতে গিয়াও বিত্তাভাবে তিনি দিন দিন নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরিশেষে তাঁহার হাস্যকর দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। অধিক দিবস "গুড়ুম" মহাশয়, বাগ্বাণে অরাতিপক্ষকে বিদ্ধ করিতে পারেন নাই। তাঁহার "গুড়ুম গুড়ুম" আওয়াজও সমাজকে অধিক জ্বালাতন করিতে পায় নাই। পত্রিকার নামেও যা, কাজেও তাই। কেননা, চারি মাসের মধ্যেই সব শেষ।

লঙ সাহেব ও তাঁহার অনুবর্ত্তক কেহ কেহ, এই ব্রজনাথকে নিরুপাধি করিতে গিয়াছিলেন। তাহা হইলে, ব্রজনাথ না "বন্ধু" না 'শত্রু' কিছুই হইতেন না। সেটা কিন্তু ভাল নয়। আমরা তাঁহার 'বন্ধু' উপাধির আবিষ্কার করিলাম। *

---

* কোন ব্রজনাথ বন্ধু? যিনি কলিকাতায় গণ্য মান্য ডাক্তার ছিলেন; প্রেসিডেন্সি মেডিকাল হলের যিনি অধিকারী ছিলেন?
[জং সং]

মূল্য আছে। তবে, সেখানে ক্রেতা নাই, ক্রেত্রী আছেন; যাঁহার গরজ, তাঁহাকেই কিনিতে হয়। মেয়ে-খরিদার কি হাটে যায় না? কিন্তু চুম্বনের হাটে পুরুষ খরিদারেরই সংখ্যা অধিক। অন্য পক্ষের গরজ থাকিলেও গরব অধিক, বুক ফাটে ত মুখ ফুটে না। নিউইয়র্কের নীলামে দোষ দিতে পার না, ধর্ম্মার্থে উৎসর্জ্জেৎ সর্ব্বং; চুম্বনের মূল্য যে, চ্যারিটিতে যাইবে। পরার্থপরতায়ও চুম্বন দেওয়া চলে। বিলাতের ডিউক-পত্নী যে, পতির পার্লেমেণ্ট-প্রবেশের পথ মুক্ত করিবার জন্যে, একটা কঠোরাধরোষ্ঠ কৃষ্ণককেও স্বীয় কোমলগণ্ডে চুম্বন লইতে দিয়াছিলেন। নজীর যে, এখন গ্রাহ্য। সুব্রাহ্মণকে দিলে ধর্ম্ম হয় না কি? অধ্যাপক পণ্ডিতেরাই মীমাংসা করিবেন। চুম্বনচর্চ্চায় আর বাড়াবাড়ি করিব না। অতিভোজনং রোগমূলং, বিশেষতঃ দ্রব্যটা বড় গুরুপাক। খাওয়া সহজ, হজম করা কঠিন!

৫১। কাব্য রত্নাকর।

(১২৫৪ সাল হইতে ১২৫৫ সাল অগ্রহায়ণ)
অর্থাৎ ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ নবেম্বর পর্য্যন্ত।)

কাব্যরত্নের আকর কি জন্য কি করিতে সংবাদপত্র দলে আসিয়া মিলিয়াছিল, উহার সৃষ্টিকর্ত্তাই তাহার উত্তর দিতে বাধ্য ও উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু করালকাল-সম সুদূরকালের কবল হইতে তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিয়া আনিতে না পারিলে কোন সদুত্তরের সম্ভাবনা নাই। ইনি যখন জন্মিয়াছিলেন, তখন হইতে সপ্তাহের ভিতর দুইবার মাত্র ইহাঁর আবির্ভাব হইয়াছিল। "দূত" পত্রের সম্পাদক কিন্তু সপ্তাহে একবার আবির্ভাবের বিষয় স্বীকার করেন। তাঁহার অনেক মতই ইতিপূর্ব্বে যেমন খণ্ডিত হইয়াছে, এটীও সেইরূপ খণ্ডনীয়। কোন প্রমাণের সামর্থ্যের উপর ভর দিয়া "দূত" ঐ মত ঘোষিত করেন নাই। 'দূত' মহাশয় প্রমাণের নিদর্শন ব্যক্ত করিতে অনিচ্ছু কি অশক্ত, তাহা বলা দুর্ঘট। এক টাকায় কাব্যরত্নাকর লোকের করতলগত হইতেন। মূল্যটা মাসিক কি বার্ষিক, তৎপক্ষে সুস্পষ্ট অভিজ্ঞান পাইতেছি না। বোধ করি, ঐ টাকাটা বাৎসরিক মূল্য নয়। কেননা, দুই ভাষায় যাহার প্রচার, তাহার ঐরূপ মূল্য অবিশ্বাস্য। প্রথমকার পুরাতত্ত্ববিদেরা বলিয়া গিয়াছেন "বাক্যরত্নাকর" বেনামিসম্পাদকের সম্পত্তি। দৃষ্টান্তটা, দুর্লভ না হইলেও, কিঞ্চিৎ কৌতুককর ও কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা সামান্য শ্রমেই জ্ঞাত হইতে পারিয়াছি, পত্রিকাতেই সম্পাদকের সংজ্ঞা মুদ্রিত থাকিত। সে নামটী "ভারত চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।" গুরুতর সম্পাদকতার কর্ম্মভার, কিন্তু তাঁহার দুর্ব্বল স্কন্ধ বহনে অসমর্থ ছিল। সেই পবিত্রতর গুরুতর কার্য্যে ব্রতী ছিলেন কিন্তু ভট্টাচার্য্য। তৎসময়ের পরবর্ত্তী লোকই এই তত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তা। সুতরাং ঐ ব্যাপারটী জানিতে আমাদের কোন ক্লেশই পাইতে হয় নাই। অনেকে বিবেচনা করিয়া লিখিয়াছেন, উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি হিন্দুকলেজের অন্যতম ছাত্র ছিলেন। বিশ্বস্তপ্রমাণাভাবেই মতটী গৃহীত হইল না। শ্লেষ ও রহস্য, বিদ্রূপ ও গালাগালি, গ্লানি ও কুৎসা, নিন্দা ও পরিবাদ, কৌতুক ও হাসি তামাসা, এই সকলেই পত্র খানির বপুঃ সদা সমাচ্ছন্ন থাকিত। সংবাদ, প্রেরিতপত্র, রাজনীতিক মতামত, সাহিত্যসমাচার, ঐতিহাসিক তত্ত্বপ্রচার, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনা, দার্শনিক তথ্য—ইত্যাকার মনোহর প্রবন্ধসমূহের সত্তা কাব্যরত্নাকরে প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। "রসরাজের" সহিত সমর করিতে ইনি সদাই সংগ্রামক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইতেন। শেষে তাহাতেই তাঁহার জীবনান্ত হয়। এটী দ্বন্দ্বযুদ্ধ। দুই জনের মধ্যে দুর্জ্জয় কলহ-কোলাহল উঠিল। একজন রসের কর্ত্তা, ষড়রস বা নব নব রস কিম্বা নব রস, তাঁহার প্রয়াস-প্রসূত জিনিষ নয়; সুতরাং তিনি রসের রাজা; অপর কাব্য রত্নের আকর; অমূল্য নানাজাতীয় মণির তিনি খনি।

"সংবাদরসরাজের" কাছে পাছে "কাব্যরত্নাকরের" পরাভব হয়, এই এক অতি মহতী ভীতি সকলের মানসে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু শেষে কার্য্যকালে দৃষ্ট হইয়াছিল, শেষোক্তই ঐ সাহিত্য-সমরে পরাজিত হইলেন। ভালই হইয়াছিল। বয়োজ্যেষ্ঠ—কেবল তাহাই কেন—গুণগরিষ্ঠ—সাহিত্যাদি অংশেও শ্রেষ্ঠ—"রসরাজের" এই জয়ে আমরা নিতান্ত আনন্দযুক্ত।

৫২। দিগ্বিজয়।

অথবা

দিগ্বিজয় ও জ্ঞানচন্দ্রোদয়।

(১২৫৪ সাল, পৌষ—১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ জানুয়ার)।

পূর্ব্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ—এই চতুর্দ্দিকের জয়-পরাজয়ের কথা "দিগ্বিজয়" ঘোষণা করিতে জগতে জন্ম লইয়াছিল, কি তাহার অপর অভিপ্রায় ছিল, তাহার তো কিছু পাঠককে পরিচয় দিতে পারিতেছি না। নামমাত্রে "দিগ্বিজয়" যিনি, তিনি বিজয়ী বীর হইবেন কেন? তাঁহার বিক্রমবার্ত্তা কেহই—পরবর্ত্তী বা সামকালিক এক প্রাণীও—বহন করিয়া আনিতে সমর্থ হয়েন নাই। গালাগালিতে কাহারও কলেবর কি কখনও কমনীয় বা সুন্দর দেখাইতে পারে? দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়—এই মহাশয়দ্বয়ের প্রবল ভুজ-বলে "দিগ্বিজয়" কিয়ৎ কাল পরিচালিত হইয়াছিল। যুগল সম্পাদক, উহার ভাগ্য-নেমির নিয়ন্তা—নেতা। তাই বলিয়া সম্পাদক-দ্বয়, যুগ্ম—মিলিত—হরি-হরি-মূর্ত্তিতে—একান্তভাবে গুরু-গম্ভীর, পবিত্র মনোহর কার্য্যে [illegible]রত চেষ্টার প্রয়োগে মনোযোগী ছিলেন না। [illegible] স্বতন্ত্র কালে দুই জনের নেতৃত্ব চলিয়াছিল। যেন ভীষ্মের সাবধান সারথ্যের পর দ্রোণের একাধিপত্য, কর্ত্তৃত্ব। শেষসম্পাদক চট্টোপাধ্যায় শ্রীনাথ বাহ্যাড়ম্বরের মূর্ত্তিমান আদর্শ ছিলেন। তিনিই "দিগ্বিজয়ের" অঙ্গে "জ্ঞানচন্দ্রোদয়ের" সংযোগ ঘটাইয়াছিলেন। বুঝি বা পূর্ব্বে তাবৎ অজ্ঞান তিমিরেই "দিগ্বিজয়" পরিব্যাপ্ত থাকিত। কষায়, কটু, তিক্ত—কটূক্তি—যাহার হৃদয়ের ভিতর স্থান পায়, তাহার আস্বাদন করিয়া কে আনন্দ অনুভব করে? গৃহীত কার্য্যের গুরুত্ব ও দায়িত্ব কত বড়—কত বেশী, এ বোধভাব হইলে, জগতে সেই বস্তুর স্থায়িত্ব—অস্তিত্ব, কিছু কাল অন্ততঃ ব্যাপক হইবেই হইবে। অসতের বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি দুই দিনের তরে, ইহা স্মরণ রাখিলেই সম্পাদক ভাল করিতেন।

৫৩। সুজন-বন্ধু।

(১২৫৪ সাল পৌষ—১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ জানুয়ারি)।

নামনির্ব্বাচনেই আমাদের আপত্তি। যিনি কেবল সুজনগণের সহিত সখ্যবন্ধন করিতে অভিলাষী, তাঁহার কার্য্য-ক্ষমতায় আমাদের সন্দেহ হয়। সুজন ও দুর্জ্জন—উভয়ই যদি বন্ধুত্বের বন্ধনে আকৃষ্ট না হইল, তবে আর কার্য্য করা কৈ হইল? সজ্জন কি কেবল সজ্জনেরই সুহৃদ? তাঁহার হৃদয় প্রশস্ত প্রশান্ত হওয়া চাই। তবেত জগতের সজ্জন অসজ্জন বশীভূত হইবেন।

"সুজন-বন্ধুর" আর একটী গুণ বা দোষ এই যে, ইনি কোলাহলসঙ্কুল এই মহানগরী রাজধানীতে নিবাস করিতেন না। রাজধানীর কোন কোন অংশে কিছু কিছু অসুবিধার যেমন অসদ্ভাব নাই বটে, তেমনই কিন্তু বিস্তর বিষয়ে বহুল সুবিধাও বিদ্যমান। জ্ঞানানুশীলন, তত্ত্বপ্রচার ইত্যাদি বিদ্যা-পক্ষে কত শত সুযোগের পথ সুপ্রশস্তই রহিয়াছে। স্বাস্থ্যোন্নতি হর্ম্ম্যময় মহানগরে সকল সময়ে অশানুরূপ না হইতে পারে; কিন্তু অপর বিষয়সমুদয় কতই মানবের উপকারক হয় বল দেখি?

মফস্বলের ইতিপূর্ব্বে "মুরশিদাবাদ পত্রিকা" ও রঙ্গপুর-বার্ত্তাবহ", এই দুই পত্রিকার প্রসঙ্গ প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু "সুজন-বন্ধুকে" সহরের ওরূপ দূরস্থ মফস্বলনিবাসী "পত্র" বলিয়া গণনা করিতে গেলে, অবিবেচনা-দোষে দুষ্ট হইতে হইবে। কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ ভবানীপুর "সুজন বন্ধুর" উৎপত্তিভূমি। ভবানীপুর—উপনগরমাত্র, সহরতলী বৈ আর কি? নবীনচন্দ্র দের হস্তে ইহার জীবন মরণ নির্ভর করিত।

৫৪। মনোরঞ্জন।

(১২৫৪ সাল পৌষ—১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ জানুয়ারি)।

কলিকাতায় ঐ সময়ে (১২৫৪ সালে), জ্ঞানদর্পণ যন্ত্রালয় "মনোরঞ্জন" প্রসব করিলেন। গোপালচন্দ্র দে ইহার উৎপাদনকর্ত্তা।

সদ্বচন, মিষ্ট অথচ উপদেশপূর্ণ ভর্ৎসন, সু-আচরণ, দোষসংশোধন—সাধুর মহাস্ত্র। লোকনিন্দা, গ্লানি, মানহানি, কুৎসা-কলঙ্ক, কেচ্ছা, গালি গালাজ ইত্যাদি—এক একটী যাহার জীবনের নিয়ামক মূলমন্ত্র—শোণিত ভক্ষক তক্ষক-সমান—এবং শাণিত অসি, তাহার স্থায়িত্ব চিরকালই সন্দেহ-জনক; তাহার "মনোরঞ্জন" নামকরণ অতীব অশোভন। অধিক কাল বিলম্ব না করিয়া নিরঞ্জন, "মনোরঞ্জনের" প্রাণ হরণ করিলেন—এ বিষয় কদাচ বিস্ময়ময় বলিয়া বিবেচিত হইবে না। সরস পরিহাস, মধুময় নির্দ্দোষ হাস্য-কৌতুকের পরিবর্ত্তে বিকট উৎকট উপহাস ও পরীবাদ এবং নিন্দা ও কুৎসার আধিপত্য, একান্তই অসহনীয় নয় কি?

১২৫৪ সালের পর মফস্বলের দুইখানি পত্রিকার প্রকাশান্দ অপ্রাপ্ত আছে। যে যে বিষয় লব্ধ হইল, পশ্চাৎ-প্রদর্শিত তালিকায় তাহা সুন্দর প্রতীত হইবে—

পত্রিকার নাম।	মূল্য-পরিমাণ	প্রচার-নিয়ম।
বর্দ্ধমানজ্ঞান-প্রদায়িনী	৮৲ আট টাকা (বার্ষিক মূল্য)	সপ্তাহে দ্বিবার
সংবাদ-বর্দ্ধমান	৪৲ চারি টাকা (বাৎসরিক মূল্য)	সপ্তাহে একবার

১৮১৮ খৃষ্টাব্দ (১২২৫ সাল) হইতে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ (১২০৪) পর্য্যন্ত ৩০ ত্রিশ বর্ষ ব্যাপিয়া একাধিক ভাষায় (অর্থাৎ দুই, তিন চারি বা তদধিক ভাষায়) যতগুলির প্রচার হইয়াছিল, তাহার এক তালিকা দেখিলে, পাঠকের উপকার ও আনন্দ উভয়েরই উদ্রেক হইবার কথা। সেই নিমিত্তে প্রকাশকালের সঙ্গে পত্রিকাসমূহের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্তও পশ্চাৎ প্রদত্ত হইতেছে।

১।	সমাচার-দর্পণ ...	১৮১৮।২৩শে মে। ১২২৫।১০ই জ্যৈষ্ঠ।
২।	সমাচার সভারাজেন্দ্র ...	১৮৩১ খৃঃ (১২৩৮ সাল)।
৩।	সংবাদসারসংগ্রহ ...	" "
৪।	জ্ঞানান্বেষণ ...	" "
৫।	সত্যবাদী	১৮৩৫ খৃঃ (১২৪২) সাল।
৬।	সংবাদসৌদামিনী	১৮৩৮ খৃঃ (১২৪৫ সাল)।
৭।	বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট গেজেট	১৮৪২০ খৃষ্টাব্দে (১২৪৭ সাল)।
৮।	বেঙ্গল স্পেক্টেটর	১৮৪২ খৃঃ (১২৪৯ সাল)।
৯।	জগদুদ্দীপকভাস্কর	১৮৪৬ খৃঃ (১২৫৩ সাল)।
১০।	মার্ত্তণ্ড	ঐ ঐ
১১।	ইবেঞ্জিলিষ্ট	১৮৪৭ খৃঃ (১২৫৪ সাল)।
১২।	সংবাদজ্ঞানাঞ্জন	ঐ ঐ
১৩।	আক্কেল গুড়ুম	ঐ ঐ
১৪।	কাব্যরত্নাকর	ঐ ঐ

৫৫। জ্ঞান-রত্নাকর।

(১২৫৫ সাল, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ)।

বিশ্বম্ভর ঘোষ, "জ্ঞান-রত্নাকরের" জনয়িতা। সম্পাদকবর ঘোষজ মহাত্মা, গোপজাতীয় কি না, ঠিক নির্ণয় করিবার পথ পাইতেছি না। যে কালে "দাস ঘোষ" "দাস-বন্ধু" "দাস মিত্র" লেখার প্রাদুর্ভাব ছিল, আলোচ্য কাল, তাহার পরবর্ত্তী। বুঝি বা বিশুদ্ধতর বাবুর জন্মগ্রহণে কমনীয় কায়স্থ-কুল সুশোভিত হইয়াছিল। ফলে, তাঁহার "বর্ণ"-নির্ণয় হইল না। পুরাতত্ত্ববিদের যুক্তি, তর্ক—এখানে পরাভূত। এই জ্ঞান-রূপ রত্নের খনিতে অমূল্য মণি-মাণিক্য, কতই না জানি বিরাজ করিত! "জ্ঞান-রত্নের" "আকর" যদি প্রতি দিবস, বা দিবস-দ্বয়, কি

দিন-ত্রয় পরে অবলোকিত হইত, তবে কি তাহার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য, সহসা সকলে স্বীকার করিত? তাই সাত দিন অন্তর "জ্ঞান-রত্নাকর" মানবের নেত্র-গোচর হইতেন। তাঁহার "ভিজিট" কত ছিল, তাহা জানিবার পক্ষে বিস্তর প্রবল বাধা-বিঘ্ন দেখিতেছি! এই "আকর" সুন্দর কি অসুন্দর, জানি না। আর, "আকরের" অস্তিত্ব কত কাল ছিল, তাহাও বলিয়া দিতে পারিতেছি না। আশা আছে—পাঠকগণ, আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের নিমিত্ত প্রচুর তিরস্কার করিয়া অদূরদর্শিতার পরিচয় প্রদানে অগ্রগামী হইবেন না।

৫৬। দিন-মণি।

(১২৫৫ সাল, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ)।

হায় দিন-মণি! তুমি কেন দিন কয়েকের তরে প্রচণ্ড কিরণ বিকীর্ণ করিয়া বাঙ্গালার লোকগুলাকে দগ্ধ করিয়াছিলে! জগতের 'দিনমণি' বহুবিধ গুণের খনি, আমাদের এই "দিনমণি" কুৎসা-কাহিনীরই খনি। তিনি ঘন ঘন দর্শন দিলে তো রক্ষা পাইবার যো ছিল না! সত্য বটে, "দিন-মণি"! তুমি সপ্তাহান্তে আবির্ভূত হইয়া, নিজের চাকচক্যময় মণ্ডল—কিন্তু অকোমল উজ্জ্বল মূর্ত্তি খানি প্রকটিত করিয়া লোকসকলকে ব্যতিব্যস্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতে না। যাঁহারা তোমার দ্রষ্টা, তাঁহারা বিলক্ষণই কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত অধিক কি উৎপীড়িতও হইতেন। "দিন-মণির" দর্শকদের প্রাণান্ত হইবার উপক্রম ঘটিয়াছিল। ভাগ্যে তিনি সুদীর্ঘ জীবন লাভ করেন নাই, তাই অতি সত্বরই সকলের অব্যাহতি হইয়াছিল। আর অধিক গুণ-ব্যাখ্যা না করিয়া "দিন-মণিকে" বিদায় দিলাম। দেখি, এবার আমাদের অদৃষ্টে আবার কোন্ মহাপুরুষের সন্দর্শনলাভ ঘটে।

৫৭। রত্ন-বর্ষণ।

(১২৫৫ সাল, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ)।

১২৫৫ সাল এক রকম কাটিয়াছিল ভাল। এ বৎসর "রত্ন" "মণি" "জ্ঞান" এই সকল ভাল ভাল বস্তু ছাড়া আর কোন কিছুর কথা ছিল না। ১২৫৫ সাল বেশ সুপ্রসবই করিয়াছিলেন। তবে যে, তৎকাল-জাত সুতগণ দীর্ঘজীবন-লাভে বঞ্চিত ছিলেন, সেটা লোকের পোড়া কপালের ফল। কথাই আছে—দগ্ধ-ভাগ্য যে দিক্ দিয়া চলিয়া যায়, অতলস্পর্শ মহাসমুদ্রের বারি-রাশিও সেদিকে তাহার পদার্পণে—শুভাগমনে বিশুষ্ক হয়!

উপনগর ভবানীপুর, "রত্ন-বর্ষণের" জন্মভূমি। পাঠক, বোধ করি, "সুজনবন্ধুকে" অন্তর হইতে অন্তরিত—বিদূরিত করেন নাই। আর তিনি নাকি "সুজনবন্ধু"—সুতরাং তিনিও অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইবার পাত্র ছিলেন না। কেই বা বাঞ্ছা করিয়া "সুজনকে" বিদায় দেয়? "সুজন-বন্ধু" যদি বিস্মৃতি-বারিধির অতল-জলে না নিমজ্জিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, এখানে তাঁহার আর এক ভ্রাতার সন্দর্শন জন্য আমরা কত পুলকিত হইলাম, তাহা কেমন করিয়া অন্যকে বুঝাইব! "সুজন-বন্ধু" ও "রত্ন-বর্ষণ" দুয়েরই সূতিকাগৃহ গৃহ—ভবানীপুর। "ভবানীপুরের মাধবচন্দ্র ঘোষজ "রত্ন-বর্ষণ" উৎপাদিত করিয়া জনকোচিত স্নেহ ও যত্নে উহাকে সংবর্দ্ধিত করিতে থাকেন।

মধ্য-যুগে ভবানীপুর গোপ ও সদ্গোপ জাতিতে সমাকীর্ণ হইয়াছিল, বলিলেও অনৈতিহাসিক বিষয়ের অবতারণা করা হয় না। ঘোষ, দধি, দুগ্ধ, ছানা-ননী—তাহার সঙ্গে মিছরি ও চিনি—দিয়া শিশুকে কত শীঘ্রই বলিষ্ঠ করিয়া তোলে! গোপজাতীয় ঘোষ মাধবও অনেক আদরে আপন সন্তানের পরিপোষণে বরাবর যত্নবান্ ছিলেন। ভগবান্ মাধব, গোপের লালন-পালনেই দৃঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, রস-ভূয়িষ্ঠ হইয়াছিলেন। এখানে কিন্তু তাহার ব্যতিক্রম। মাধব, এস্থলে পোষণকর্ত্তা। সেই "মাধবের"—পরিপালনে পরিপুষ্ট হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ সন্তান, কেনই না লোকের নয়নানন্দ-বর্দ্ধন হইবে? সুজাত সুসন্তান "রত্ন-বর্ষণ" লোকদিগকে তৃপ্ত বা তুষ্ট করিতে কোন বিষয়েই আলস্য বা ঔদাস্য করিতেন না। আশাতীত যত্নে বর্দ্ধিত "রত্নবর্ষণে" কিন্তু বেশী দিন লোকের মানস-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইতে পায় নাই। কত দিন কি কি রত্নের বৃষ্টি হইয়াছিল, জানিবার যো নাই। সূর্য্যকান্ত, চন্দ্রকান্ত, নীলকান্ত, অয়স্কান্ত, পদ্মরাগ, ইন্দ্রনীল, এ সকলের কি বর্ষণ হয় নাই?

একটু বিজ্ঞান।

টেলিফোঁর চলন হইবার পূর্ব্বে তালতলার কার্ত্তিক মামা বলিতেন, "বাবা আমি কলিকাতার ছাদে বসিয়া ভয়েস দিই (অর্থাৎ কথা চালাই), আর কাশীর ছাদ হইতে আমার কেনা কাকা শুনিতে পাইয়া আমাকে ভয়েস দেয়। সুতরাং আমাদের কথা বার্ত্তা চলে।" কার্ত্তিক মামা আমাদের সম্মুখেই মধ্যে মধ্যে ভয়েস দিতেন, আর বলিতেন, "ঐ শোন বাবা কেনা কাকা বলিতেছে, আমি আছি ভাল। কাশী এখন গুলজার।" কার্ত্তিক মামাকে আমরা পাগল বলিয়াই মনে করিতাম, কিন্তু তখনও তিনি ডল সাহেবের স্কুলে পণ্ডিতী করিতেন।

তার পর টেলিফোঁ হইল, কার্ত্তিক মামার মতই ভয়েস দিবার বন্দোবস্ত হইল। তখনও মামা জীবিত ছিলেন। স্পর্দ্ধা করিয়া আমাদিগকে বলিতেন, "কেমন বাবা দেখিলে, আমার কথা ঠিক কিনা? আজ সাহেবেরা যাহার নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া গর্ব্ব করিতেছেন, আমি তাহার কবে আবিষ্কার করিয়াছি!"

টেলিফোঁর রেওয়াজ হইবার পূর্ব্বে কিন্তু ছেলেরা লম্বা সূতার দুই মুখে দুইটা চোঙ লাগাইয়া ভয়েস দিত। আস্তে ভয়েস দিলেও কাণে শব্দ আসিত। আর জলের ভিতর শব্দ করিলেও ত অনেক দূর হইতে শোনা যাইত। টেলিফোঁর চলন হইবার পর জানা গেল, সিংহলের কাফি-বাগানে এইরূপ ভয়েস দিবার নিয়ম রহিয়াছিল অনেক দিন হইতে। এখানে বাগিচা, ওখানে বাগিচা, মধ্যে পর্ব্বতের দরী বা দীর্ঘ গহ্বর; বরাবর সূতা লাগানো আছে; ভয়েস দেওয়া চলিতেছে।

বায়ুর একটা গুণ শব্দসঞ্চালকতা, বায়ু শব্দবাহক। টেলিগ্রাফের খবর যাওয়া আসা করে তারের ভিতর দিয়া। তাড়িতের বেগে তার কাঁপে, পৃথিবীর এক মুড়ায় তারে তাড়িতের সঞ্চালন হইলে, তাহার বেগ ও মুড়ায় যায়। ও মুড়ার তার কাঁপিয়া উঠে; সেই কম্পনে সঙ্কেত হয়; সঙ্কেতেই সমাচারের আদান প্রদান হয়। কিন্তু টেলিফোঁযন্ত্রে সঙ্কেত হয় না, কথাই শোনা যায়। কথার শব্দ তার দিয়া চলিয়া গিয়া শ্রাবকের কর্ণে প্রবেশ করে। টেলিফোঁর এক মুখে শব্দ হইলে, অন্য মুখে গিয়া শ্রুত হয়। কলিকাতার যত বড় বড় আপিশ কাছারী আদালতে টেলিফোঁর সংযোগ আছে। দেশী বিলাতী অনেক বড় লোকের বাড়ীতেই সংযোগ আছে; থিয়েটার হোটেলে সংযোগ আছে। সাধারণ তার লম্বা লম্বা খোঁটার উপর দিয়া চারি দিকে গিয়াছে। টেলিফোঁর কোম্পানির আপিশে ঐ মূলতারের সংযোগ আছে। আর শাখা চলিয়াছে যত আপিশ কাছারী হোটেল থিয়েটরে—যত লোকের বাড়ী ঘরে। এই সকল শাখা তারেরও ঐ আপিশেই সংস্রব আছে। প্রত্যেক আপিশ কাছারী প্রভৃতির তারের স্বতন্ত্র নম্বর আছে। তোমার নিজবাড়ীর তারে কথা কহিলেই, সে কথা আপিশে গেল। সেখানে লোক রহিয়াছে; তোমার কথা শুনিতে পাইল; সাড়া দিল। তুমি বলিয়া দিলে, অমুক নম্বরে যোগ করিয়া দাও। অমুক নম্বর বলিতে অমুক আপিশ বা বাড়ীর তারের নম্বর। আপিশের লোক সেই নম্বরের তারে আর তোমার তারে যোগ করিয়া দিল; তখন তুমি সেই অমুক বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে টেলিফোঁ মুখে করিয়া কথা কহিতে লাগিলে। কখনও কখনও কর্ত্রীর সহিতও কথা কহিতে না পাইলে এমন নহে। কলিকাতায় আজ কাল বড় সুবিধা হইয়াছে, ঘরে বসিয়াই অন্যের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে পারা যায়।

কিন্তু ইহাতেও আয় পোষাইতেছে না। টেলিফোঁ টেলিগ্রাফে হাঙ্গামা অনেক! চারি দিকে তার পাতিতে হয়, তারের জন্যে খোঁটা পুতিতে হয়, কত কাণ্ড করিতে হয়! তাই আবার বেতার টেলিগ্রাফের সৃষ্টি করা হইয়াছে। মার্কোণি সাহেবই এ বিষয়ে সিদ্ধ হইয়াছেন। অনেকেই ঐ পথে যাইতেছেন বটে, কিন্তু ইনিই প্রধান বলিয়া গণ্য। বায়ুর সঙ্গে একপ্রকার তরল পদার্থ মিশ্রিত রহিয়াছে। তাহাকে ঈথর বলে। টেলিগ্রাফের তার যেমন তাড়িতে কম্পিত হয়, এই ঈথরও সেইরূপ হয়। আর তারের কম্প যেমন একস্থান হইতে বরাবর চলিয়া যায়, এই ঈথরের কম্পনও সেইরূপ চলিয়া যায়। মার্কোণি যে নব তাড়িত-যন্ত্রের উদ্ভাবনা করিয়াছেন, তাহাতেই বায়ুস্থ ঈথরে কম্পন লাগিবার সুবিধা হইয়াছে। যেখানে বসিয়া তুমি খবর দিবে, সেইখানে এই যন্ত্র রাখিতে হইবে; আর অন্য ব্যক্তি যেখানে ঐ খবর ধরিবেন, সেখানেও ঐরূপ যন্ত্র থাকিবে। দুই যন্ত্রই একরূপ, দুই যন্ত্রেই খবর লওয়া দেওয়া চলে। অর্থাৎ ঐ বায়ুস্থ ঈথরে কম্প দেওয়া চলে, আর অন্য দিকের কম্প ধরিয়া লওয়াও চলে। কম্পে সঙ্কেত হইবে, সেই সঙ্কেত অন্যদিকের যন্ত্রে ধৃত হইবে। যাহা সাধারণ টেলিগ্রাফে হয়, তাহাই হইবে ও হইতেছে। মধ্যে যখন আমাদিগের মহারাণীর জ্যেষ্ঠপুত্র নিমন্ত্রণে গিয়া পড়িয়া পা ভাঙ্গিয়াছিলেন, সেই সময়ে স্বাস্থ্যলাভের তরে তাঁহাকে বিলাতের কাছেই জাহাজে থাকিয়া হাওয়া খাইতে হইয়াছিল। মহারাণী দিনের মধ্যে দশ বারো বার পুত্রের খবর লইতেন, পুত্রকে খবর দিতেন। সাধারণ টেলিগ্রাফের সুবিধা হয় নাই বলিয়াই হউক বা নূতন যন্ত্রে উৎসাহ দিবার জন্যেই হউক কিম্বা তৎপ্রতি অনুরাগ বলিয়াই হউক, মহারাণী ঐ বেতার টেলিগ্রাফেরই বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন; সারাদিনই পুত্রের সহিত সঙ্কেতে কথা বার্ত্তা কহিয়াছিলেন। এখন এই বেতার টেলিগ্রাফের দুই এক স্থানে চলন হইয়াছে।

কিন্তু দুই তিন ক্রোশ ব্যবধান হইলেই, এখন বেতার টেলিগ্রাফে কাজ চলে। মার্কোণি বহুদূরেও কাজ চালাইবেন, বলিতেছেন। স্থির করিয়াছেন, খুব উচ্চে যন্ত্র বসাইলেই বেতার টেলিগ্রাফে—অর্থাৎ ঐ ঈথরপথে—বহুদূরেও খবরের আদান প্রদান করা চলিবে। নিম্নস্থ বায়ু ভারী, উচ্চস্থ বায়ু হাল্কা; উচ্চস্থ বায়ুতেই ঈথরের শক্তি অধিক। কেন না, ভারী বায়ুর উপর ঈথরের অনেক বাধা বিঘ্ন পাইতে হয়, হালকা বায়ুতে সেরূপ বাধা বিঘ্ন পাইতে হয় না। মার্কোণি স্থির করিয়াছেন, বেলুনে যন্ত্র বসাইলে; যন্ত্র খুব উচ্চে উঠিবে, তাহা হইলেই দূরস্থানে সংবাদের আদান প্রদান করা চলিবে।

দড়ীবাঁধা বেলুন উচ্চে উঠিয়া একস্থানে থাকে, পলাইতে পারে না। সেবার কলিকাতায় গড়ের মাঠে কয়েক দিন ঐরূপ বাঁধা-বেলুন উড়ান হইয়াছিল, অনেকেই দেখিয়াছেন। ইউরোপের অনেক সহরেই সর্ব্বদা ঐরূপ বাঁধা-বেলুন উড়ান হয়। ফরাসীর প্যারিস সহরে প্রত্যহ অপরাহ্ণে বাঁধা-বেলুন উড়ান হয়, কত শত নরনারী ঐ বেলুনে উঠিয়া আনন্দ করেন। যুদ্ধের সময়ে বাঁধা-বেলুনে উঠিয়া সেনানীরা শত্রুপক্ষের গতিবিধি সাজসজ্জা দেখিয়া থাকেন।

মার্কোণি ঐরূপ বাঁধা-বেলুনে যন্ত্র বসাইয়া উচ্চস্থ বায়ুর ঈথরের ভিতর দিয়া খবর চালাইবেন। বলিতেছেন, ১৯০০ সালে ফরাসীর প্যারিসে যখন মহামেলা হইবে, সেই সময়ে প্যারিস হইতে আমরিকায় সমাচারের আদান প্রদান করিবেন,—করিবেন ঐ বেতার টেলিগ্রাফে। অনেক তাড়িতবিৎ ও টেলিগ্রাফরহস্যজ্ঞ কিন্তু বলিতেছেন, মার্কোণির চেষ্টা ফলবতী হইবে না। বলিতেছেন, "খুব উচ্চে বায়ু খুব পাতলা বটে, এবং তন্মধ্যস্থ ঈথরের কম্পন-চালনশক্তিও খুব অধিক বটে। সেরূপ ঈথরে, মার্কোণির ঈপ্সিত দূরসঙ্কেতও সাধ্য বটে। কিন্তু যত উচ্চে বায়ু সেইরূপ হালকা ও পাতলা এবং তাহার ঈথরের কম্পন-চালকতা খুব অধিক, তত উচ্চে ত বেলুন উঠিতে পারিবে না। সুতরাং মার্কোণির যন্ত্রও বেলুনে চড়িয়া তত উচ্চে উঠিতে পারিবে না। কাজেই তাঁহার চেষ্টাও ফলবতী হইবে না।" কিন্তু মার্কোণি বলিতেছেন, "ফলেন পরিচীয়তে!"

আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না। বিজ্ঞানের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে কি যে, না হইতে পারে, তাহা ত বলা যায় না! টেলিগ্রাফের পূর্ব্বে কেহ কি মনে ভাবিয়াছিল, এক নিমেষের মধ্যে খবর পৃথিবী বেষ্টন করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে? টেলিফোঁর চলন হইবার পূর্ব্বে কার্ত্তিক মামা ছাড়া আর কেহ কি মনে করিয়াছিলেন, ঘরে বসিয়া দূরস্থ বন্ধুর সহিত সম্মুখে কথা বার্ত্তা কহা চলিবে? বেতার টেলিগ্রাফের যেটুকু সফলতা হইয়াছে, সেটুকু হইবার পূর্ব্বে কি কেহ ঐ টুকুরও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল? যাহা এখন তিন চারি ক্রোশের ভিতর হইতেছে, তাহা যে, দুই তিন হাজার ক্রোশের ভিতর হইবে না, তাহা কিরূপে বলিব? অতএব, মার্কোণির কথায় অবিশ্বাস করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

মার্কিণ এডিসন তাড়িত লইয়া কি না করিতেছেন? তাড়িতের সাহায্যে দূরস্থ বন্ধুর চিত্র পর্য্যন্ত দেখাইতে পারেন! সেই চিত্রকে যেন সজীব করিয়া দিতে পারেন। ফনোগ্রাফে গান বক্তৃতা ধরিয়া রাখিয়াছেন; অনেক দিন পরে যেখানে সেখানে সেই গান বক্তৃতা যন্ত্র হইতে বাহির হইতেছে। যাঁহার মুখের গান বা কথা, যেন তাঁহার মুখেই শুনিতেছি। আবার তাঁহার ঐ পূর্ব্বোক্ত চিত্র হইতে গান কথা বাহির হইতেছে। অর্থাৎ যেন তিনিই তোমার কাছে আসিয়া গান গাহিতেছেন বা বক্তৃতা করিতেছেন। অথচ তিনি হয় ত আছেন উত্তর কেন্দ্রে, আর তুমি দক্ষিণ কেন্দ্রে। হয় ত তিনি কবে মরিয়া গিয়াছেন! এডিসনের কল্যাণে মরা মানুষই যেন বাঁচিয়া উঠিতেছে! এসব হইবার পূর্ব্বে কে ভাবিয়াছিল যে, এসব হইতে পারে? অতএব, মার্কোণির কথায় অবিশ্বাস করা উচিত নহে।

ঐ এডিসনের এক চেলা আছেন। চেলার নাম তেস্‌লা। তিনি অস্ত্রিয়ার জর্ম্মণ, জন্মিয়াছেন ইউরোপের মন্তনেগরো প্রদেশে। শিখিয়াছেন আমরিকার এডিসনের কাছে। এখন নিজেই গুরু, বয়স ২৪।২৫ বৎসর মাত্র! অসাধারণ মনুষ্য। তাড়িত লইয়া তিনিও কত কি করিয়াছেন ও করিতেছেন! তিনিও বেতার টেলিগ্রাফ লইয়া ব্যস্ত হইয়াছেন। জলযুদ্ধে জাহাজ-চেরা লৌহতরী ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই চলন হইয়াছে। নাম টর্পেডো। কলিকাতার গাঙেও আছে। শত্রু-পোত আসিলেই চিরিয়া দিবে। কিন্তু ঐ টর্পেডো দূর হইতে তাড়িতবলে চালাইয়া দিতে হয়। টর্পেডো তাড়িতবেগে জলের ভিতর ছুটিয়া গিয়া জাহাজের তলায় ঢু মারে, আর জাহাজ চিরিয়া দেয়। আমেরিকায় আবার এইরূপ তাড়িতের ডুবুরি-নৌকা হইয়াছে। অন্য নৌকা জলের উপর ভাসিয়া চলে, এ নৌকা জলের ভিতর ডুবিয়া চলে। তরীর আগা-গোড়া ঢাকা, জল পশিতে পারে না। ভিতরে ঘর আছে, কামরা আছে, সেখানে মাঝী মাল্লা থাকে, তাহাদের খাদ্য পেয়াদি থাকে। তাড়িতের আলোক থাকে। ডুবুরি-নৌকা দুই তিন ঘণ্টা অন্তর ভাসিয়া উঠিয়া স্বীয় উদরবিবরে বায়ু পূরিয়া লয়। সেই বায়ু যতক্ষণ না ফুরায় ততক্ষণ অভ্যন্তরবাসীদের কোন কষ্ট হয় না। বায়ু ফুরাইয়া আসিলেই, তরী ভাসাইয়া ফের বায়ু লওয়া হয়। ডুবুরি-নৌকাও চলে তাড়িতে। হাল আছে, অক্লেশে ঘুরাণ ফেরাণ চলে। পরীক্ষা হইয়াছে, ডুবুরি-নৌকায় কাজ চলিবে। ফরাসি-দেশের বিখ্যাত নবন্যাসলেখক জলেশবারণ নিজের "টোয়েন্টিথাউজাণ্ড লীগ অণ্ডর দি সী" অর্থাৎ "সমুদ্রের ভিতর ৩০ হাজার ক্রোশ" নামক নবন্যাসে এইরূপ ডুবুরি-নৌকা কল্পনায় প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তখন কি কেহ ভাবিয়াছিলেন, এত শীঘ্র সত্য সত্য সেইরূপ তরী চক্ষুর প্রত্যক্ষ হইবে? তাই বলিতেছি, বিজ্ঞানের অসাধ্য কাজ নাই। মার্কোণির কথায় অবিশ্বাস করিবার হেতু নাই। এখনকার টর্পেডো যে তাড়িতে চালানো হয়, তাহাতে তার লাগে। তেস্‌লা সেই কাজ সারিবেন বেতার টেলিগ্রাফে; যেখানে সেখানে যে দিকে সেদিকে যখন তখন টর্পেডো চালাইবেন। যদি টর্পেডো চালাইতে পারেন, তাহা হইলে ত ডুবুরি-তরীও চালাইতে পারিবেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে এই কাজ করিতেছেন, পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ত মহাপ্রলয়ই করিয়া দিবেন! ভাবিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। সুতরাং একটু বিজ্ঞানেরও অন্য এই খানেই উপসংহার করিতে হয়। আমরা বৈজ্ঞানিক নহি, বিজ্ঞানের সূক্ষ্মরহস্য আমাদের ভেদ্য নহে। একটু বিজ্ঞানের আমরা যেরূপ ধারণা করিয়াছি, আমাদের মত অল্পজ্ঞান পাঠকের জন্যে সেইরূপই আভাস দিলাম। আমরা যেমন হীন বক্তা, সেইরূপ হীনশ্রোতার তুষ্টি হইলেই আমাদের যথেষ্ট হইবে। বহুজ্ঞ পাঠকদিগের জন্যে বহুজ্ঞ লেখক। যেমন দোকানী তার তেম্‌নি খরিদদার। রাতভিখারীর গানে ত আর সুর লয় দেখিতে হয় না!

লৌহযুগে লৌহমাহাত্ম্য।

সাহেবেরা সত্যযুগকে "গোল্‌ডন এজ" বা স্বর্ণযুগ বলিয়া থাকেন। আমাদেরও ত সত্যযুগে সুবর্ণময় ভোজনপাত্র ছিল। ধরিতে গেলে, আমাদের সত্যযুগও গোল্‌ডন এজ বা কাঞ্চনযুগ। সেইরূপ ত্রেতা রজত যুগ, দ্বাপর তাম্রযুগ; আর কলিযুগ যেমন ইউরোপীয় পুরাণ ও পঞ্জিকায় আয়রণ এজ বা লৌহযুগ, সেইরূপ আমাদের পক্ষেও হইয়াছে লৌহযুগ। মৃন্ময় ভোজনপাত্রই আমাদের কলিযুগের নিত্য সহচর। কিন্তু ইংরেজের কল্যাণে লৌহপাত্রের যেরূপ চলন হইয়াছে, তাহাতে লৌহময় ভোজনপাত্রই ত এখন আমাদের কলিযুগেরও সহায় হইয়া পড়িতেছে। লৌহকটাহ ত পাকপাত্র হইয়াছে অনেক দিন হইতে। ইংরেজের পূর্ব্বেও লৌহকটাহের চলন ছিল। দুধ জ্বাল হইত লৌহকটাহে, লুচি ভাজা হইত লৌহকটাহে, ভাজা ভুজি হইত লৌহকটাহে। আবার চাটু তাওয়া তৈ প্রভৃতি লৌহপাত্রেরও চলন ছিল। এখন ত কথাই নাই। এখন যত কাজেই লৌহপাত্র। কড়া কেটলি, তাওয়া তৈ ত আছেই, আবার কলাই-করা পাত্র যে, কতরূপ হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কলের জন্যে কলির মাহাত্ম্য। কলাইও কলের অঙ্গ। কল, কলি, কলাই, সবই এক 'কল' ধাতুর উৎপন্ন। কলাই প্রথার চলন হওয়াতে আমরা বিলাত হইতে সকল পাত্রই পাইতেছি। লৌহপাত্রে কলাই হয়। আর লৌহময় ঘটী গেলাস বাটী থালা খোরা হাতা চমস প্রভৃতি সমস্তই ত ব্যবহৃত হইতেছে। কলাই করা কড়া পাইয়াছি, কলাই করা কেট্‌লি পাইয়াছি, কলাই করা লোহার হাঁড়ী আছে। চার জল গরম হয়, কলাই-করা লৌহময় চা-দানীতে। কলাই করা জগে জল রাখা হয়, দুধ রাখা হয়। কলাইয়ের কল্যাণে লৌহের কলঙ্কভঞ্জন হইয়াছে; পাত্রগুলি কেমন চকচকে ঝকঝকে! যেন কাচের মত, দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। আবার কেমন শস্তা! তিন চারি আনা হইলেই বেশ একটী বাটী হয়। ছয় আনায় মস্ত গেলাস। কাচের বা চীনার গেলাস বাটী ভাঙ্গিয়া যায়, কলাই করা গেলাস বাটী ঘটী খোরা ভাঙ্গিতে জানে না। লৌহময় পাত্র ভাঙ্গিবে কেন? যত দিন কলাই, তত দিন পাত্র দর্শনে ভাল, স্পর্শনে ভাল, ব্যবহারেও ভাল। যত্ন করিয়া রাখিলে কলাই থাকেও অনেক দিন। কলাই উঠিলে, এদেশে আর পুনঃ সংস্করণ হয় না, বিলাতে হয়। ক্রমে এদেশেও হইবে, তাহা হইলে,আরও সুবিধা হইবে। হাঁড়ী কলসী সরা মাল্‌সা ক্রমে সবই লৌহের হইবে। মৃত্তিকার ব্যবহার উঠিয়া যাইবে। বিলাতী কলের তাঁতের জন্য আমাদের তাঁতিকুলকে নির্ম্মূল হইতে হইয়াছে, আবার যদি এদেশেও কলাই শিল্পের চলন হয়, তাহা হইলে, হয় ত যত কুমারকে কামারবৃত্তিই ধরিতে হইবে।

কলাই ক্রমে কুমারকে কলা দেখাইবে। কাঁসারীকে ত এখনই কলা দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে। গরীবের দেশে রাংতাই সোনা। শস্তার আদর ব্যবস্থা চিরদিন। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কয় জন চলে? সদ্যোভক্ষ্য চুচুড়া মিষ্ট। কাঁসা পিতল তামার পাত্র ভগ্ন, অকর্ম্মণ্য হইলেও মূল্যহীন হয় না, অর্দ্ধেক মূল্য ত পাওয়াই যায়। নূতন এক সের পাত্রের মূল্য যদি হয় পাঁচ সিকা, তবে পুরাতনের দশ আনা ত বটেই। কখনও কখনও বারো আনাও মিলে। কিন্তু বিলাতী চীনার বাসন বা কলাই বাসন ভাঙ্গিয়া গেলে কেবল কলা, তাও পোড়া! চীনা পোর্সলেন সহজেই ভাঙ্গে। কলাই লোহ পাত্র সহজে ভাঙ্গে না। কাচের পাত্রেরও ভঙ্গে দুর্দ্দশা, বেলোয়ারী কাচ বেচা চলে; অন্য কাচের আদর নাই। তবে কিনা, পাথর-ভাঙাও ত আমাদের সহা আছে। পাথর ভাঙ্গিলে একেবারেই গেল! গয়ার পাথরও ত স্বল্পমূল্য নহে। তাহাও ত সর্ব্বদা ভাঙ্গিয়া যায়। জয়পুরের সাদা পাথর যে, দেবদুর্ল্লভ পাত্র, তাহাও ত সর্ব্বদাই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। মুঙ্গেরের পাথরওত ফেলনা নহে; ভাঙ্গিলে কিন্তু তাহাও ত ফেলিয়া দিতে হয়। ভাঙ্গা পাথরের মূল্য নাই। নিতান্ত ভড়ভুঁইদেশে—কলিকাতার দক্ষিণে তাড়দা অঞ্চলে—ভাঙ্গা পাথর বদল হইত। চতুর পাথরব্যবসায়ী গিয়া হাঁকিত, "ভাঙ্গা পাথর বদল করো।" পল্লীগ্রামের যত সরলা অবলা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইত। বাড়ীর পুরুষেরা যখন উপস্থিত থাকিত না, ক্ষেত খোলা বা হাট বাজারে বা অন্যরূপ কাজ কর্ম্মে যাইত, পাথর-ব্যবসায়ীরা ঠিক সেই সময়ে গিয়া পাথর বদলাইত। মেয়েরাও বাড়ীর পুরুষদিগকে বোকা বানাইবার জন্যে যত ভাঙ্গা পাথর লইয়া হাজির হইত, ব্যবসায়ীরাও সুযোগ পাইত। নিজের যে নূতন পাথরটীর ন্যায্য মূল্য ৷৵০ আনা, সেটীর মূল্য ধরিত ১ টাকা, আর ক্রেত্রীর আনীত ভাঙ্গা পাথরটীর দর ধরিত চারি আনা। চারি আনা বাদ দিয়া বারো আনা লইত। তাহার বেশ দুই পয়সা লাভ হইত, আর বাড়ীর বুদ্ধিমতীরাও বুঝিতেন, চারি আনা লাভ করিলেন; যে ভাঙ্গা পাথর ফেলিয়া দিতে হয়, তাহাতেও চারি আনা মূল্য পাইলেন। বাড়ীর কর্ত্তা বড় নির্ব্বোধ, এমন ফিকিরও তাঁহার জানা নাই! পাথরওয়ালাও ভাঙ্গা পাথরগুলা যত্নপূর্ব্বক লইয়া আসিত, সুবিধা মত জলে বা বনে ফেলিয়া দিয়া ভার-মুক্ত হইত। কিন্তু যে গ্রামে ব্যবসায়ী একবার যাইত, সে গ্রামে আর যাইতে পাইত না। বাড়ীর কর্ত্তারা শীঘ্রই গৃহিণীদিগের ভ্রম ঘুচাইয়া দিতেন, নূতন পাথর দশ আনায় আনিয়া দিতেন। তখন গৃহিণীরা বুঝিতেন, দুই আনা লোকসান! ভাঙ্গা পাথরে যে, কোন কাজ হয় না, তাহা শেষে অগত্যা বুঝিতেন।

কিন্তু হইতেছে, আমাদের বাজে কথায় আসল ভেস্তা! দেখাইতে হইবে, লৌহ শস্তা; লৌহযুগে তাই লৌহেরই

ওড়ন পাড়ন। পিতল কাঁসা মৃত্তিকার বদলে লৌহের ব্যবহার হইতেছে। কাঠের বদলে ত কথাই নাই, এখন যত বাড়ীতে লৌহের কড়ী লৌহের বরগা, অনেক ঘরে লৌহের দরজা; লৌহের জানালা, লৌহের কপাট। আবার যে টিনের পেট্‌রা, টিনের সিন্দুক টিনের পোটমেণ্টো, দেখিতে পাও, তৎসমস্তও লৌহে নির্ম্মিত। লৌহের পাত টিনে ঢাকা। টিন সাদা রাঙের নরম ধাতু, আগুনের অল্প তাপেই জলের মত গলিয়া যায়। লৌহের পাত লৌহের চাদর ঐ তরল টিনে ঢাকিয়া লওয়া হয়, অবশ্য তাহার প্রক্রিয়া আছে। টিনের জিনিস যে, কতরূপই চলিতেছে, তাহার ত সত্য সত্যই সংখ্যা করা যায় না! ফলতঃ সমস্তই লোহার, লোহারই এখন একাধিপত্য। লোকের গাড়ী লোহার, বাড়ী লোহার। লৌহময় প্রাসাদে ধনপতির বাস, ইউরোপ আমরিকার চারিদিকে, আমরিকায় ত ছড়াছড়ি। পূর্ব্বে জাহাজগুলা কাঠে প্রস্তুত হইত। এখন তাহাতেও লৌহের একাধিপত্য! যত ষ্টীমারই লৌহে প্রস্তুত হইতেছে। লৌহের নৌকারও চলন হইয়াছে; লৌহের গাধাবোটে মাল বোঝাই হয়। যেমন তরকারীর মধ্যে গোল আলু, যেমন দেবতার মধ্যে গণপতি, যেমন ঔষধের অণুপানে মধু, যেমন বাদ্যের মধ্যে শঙ্খ ঘণ্টা, তেমনই ধাতুর মধ্যে লৌহ! অণুবীক্ষণে দৃশ্য কেশাৎ সূক্ষ্ম সূচটী হইতে বিশ্বম্ভর রণপোত পর্য্যন্ত সমস্তই লৌহে প্রস্তুত হইতেছে। লৌহ আছেন সকল ঘটে। দেবঋষিরাও ত লৌহের মর্য্যাদা বাড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন! সধবা হিন্দু মহিলার গাত্রে কোটি টাকার অলঙ্কার থাকিলেও বামহস্তে লৌহের খাড়ু গাছটী পরিতেই হইবে। এখনকার সোনা মণিরা না হয় সোনায় ঢাকিয়া লইবেন। কিন্তু সোনার ভিতর ত লোহা থাকে। কুবের যাঁহার পদানত ছিলেন, সেই দেবাদিদেব মহাদেব কি সোনা রূপার ত্রিশূল গড়াইতে পারিতেন না? তিনি যে, লৌহময় ত্রিশূলেরই ব্যবহার করিতেন, তাহা শুদ্ধ লৌহের মাহাত্ম্য বাড়াইবার জন্যে। এখন হইলে না হয় শূলপাণি নিজের ত্রিশূল গাছটা কলাই করিয়াই লইতেন। শিখধর্ম্মেও ত লৌহের আদর। যত শিখকেই লৌহ ধারণ করিতে হয়। আর যত সন্ন্যাসীর হাতেও ত লৌহের চিমটে!

লৌহের মত ধাতু নাই। এত উপযোগিতা এবং উপকারিতা ত আর কোন ধাতুরই নাই। লৌহ না হইলে সংসার চলে না। লৌহ না হইলে এক পাও চলিবার যো নাই। ছুরি, বঁটী, কুড়ুল, কাটারি, হাতা, বেড়ী কড়া, হাতুড়ী প্রভৃতি যে যে দ্রব্য না হইলে, এক মুহূর্ত্ত চলে না, তাহা সমস্তই লৌহে প্রস্তুত হয়। চাষ না হইলে অন্ন জুটে না, লৌহ না হইলে চাষ চলে না। লাঙ্গল, কুদাল, খুরপো শাবল, কোঁড়, কাস্তে সবই যে, লৌহে প্রস্তুত হয়। সূচ কাঁটা গজাল কাঁচী ক্ষুর নরুণ প্রভৃতি যাহা না হইলে দিন যায় না, তাহাতেই লৌহের একাধিপত্য। আত্মরক্ষায় লৌহ, আবার শত্রুনাশেও লৌহ; তীর তরোয়াল টাঙ্গি কাতান বর্ষা, লৌহ মাত্রই ভরসা। আর যে কলের জন্যে কলির এত মাহাত্ম্য, সে কলও ত লৌহ বিনা প্রস্তুত হয় না। যন্ত্রতন্ত্র কল কবজা, সবই লৌহের। তীর ধনুকের কাল গিয়াছে, বন্দুক পিস্তল কামানের কাল আসিয়াছে। কিন্তু লৌহের আধিপত্য বরং আরও বাড়িয়া গিয়াছে!

রোগ ব্যধিরও ত লৌহ প্রধান প্রতিকারক। অস্ত্র চিকিৎসায় ত লৌহই মুখ্য। ইস্‌পাত যে, লৌহেরই রূপান্তরমাত্র; খাঁটি লৌহেই ইস্‌পাত হয়। চিকিৎসা-শাস্ত্রের যত অস্ত্রশস্ত্র—লৌহে প্রস্তুত হয়। আবার ঔষধেও লৌহেরই অধিক আদর। স্বর্ণ রৌপ্য পারদ তাম্র রঙ্গও ঔষধের অঙ্গ, কিন্তু লৌহের কাছে কেহই কলিকা পান না। যত ঔষধে লৌহের যত প্রয়োজন, তত ঔষধে অন্য ধাতুর তত প্রয়োজন হয় না। সোনা রূপার ত কথা নাই, পারাও লৌহের কাছে হটিয়া যায়। যেখানে লৌহ, সেইখানেই পারা; কিন্তু পারা ছাড়িয়াও ত লৌহ ঔষধে লাগেন। যত রসান্ত ঔষধেই পারদ আবশ্যক, পারদই যে, বৈদ্যকে রস বলিয়া অভিহিত। ঔষধে পারদের খুবই আধিপত্য; কিন্তু লৌহের অপেক্ষা অধিক নহে। আর কিছু না থাকিলেও লৌহপাত্রটাও যে, ঔষধের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

উপযোগিতা, উপকারিতা ধরিলে লৌহই ধাতুর রাজা। কিন্তু সুলভ বলিয়াই সুলভ। এত উপযোগিতা বলিয়াই ভগবান জলে স্থলে লৌহ এত অধিক ছড়াইয়া পূরিয়া দিয়াছেন। লৌহ নাই কোথায়? জলে স্থলে চান্তরীক্ষে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে সর্ব্বত্রই লৌহ! জীবশোণিতে লৌহ, উদ্ভিজ্জরসে লৌহ, খনি আকরে ত কথাই নাই। সোনা রূপা সকল দেশে পাওয়া যায় না, লৌহ কিন্তু পৃথিবীর সকল দেশেই পাওয়া যায়। সংসারের কথা ছাড়িয়া দেও! যাহা দুর্লভ তাহাই বহুমূল্য। একটী মাণিকে সাত রাজার ধন; ঘোড়ার ডিম কিন্তু সাত শত রাজার ধন! উপকারিতা হিসাবে আদর হয় না, দুর্লভতার অনুপাতেই আদরের তারতম্য। চিলের মুত যে, অমৃতের বাড়া; বড় আদুরে আলালের ঘরের দুলালকে ত এই জন্যেই চিলের মুত বলিয়া আদর করা হয়। আমরা কিন্তু লৌহেরই আদর করিয়া থাকি। এই যে, আদর করিতেছি, তাহাও লৌহের সাহায্যে, লৌহের কলমে লৌহের মোচ, তাহাতেই যত খেঁচ খোঁচ! আর ঘরেও ত দেখছি, গৃহিণীর আদর হাতের সেই লোহা গাছটীর জন্যে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত লৌহই মানুষের সহায় সম্বল সহচর। জন্মে নাড়িকাটা লৌহ ছুরিকায়, শ্রাদ্ধে খোলা কাটাও সেই লৌহছুরিকায়। যত মঙ্গল কার্য্যেই লৌহ আবশ্যক। লৌহ-মাহাত্ম্য অসীম, অনন্ত। লৌহের কথা কহিতে গেলে যে, অষ্টাদশ পর্ব্বেও কুলাইতে পারিব না।

জন্মভূমি।

অষ্টম ভাগ। { কার্ত্তিক। ১৩০৫। } ১১শ সংখ্যা।

বাঙ্গলা ভাষার লেখক।

প

(৩)

—প্রবোধচন্দ্র দে। পিতার নাম ৺গোপালচন্দ্র দে। বনিয়াদী কায়স্থ। সাং কলিকাতা, ২৮ নং দর্জ্জিপাড়া ষ্ট্রীট।

প্রবোধ বাবু একজন বিশিষ্ট কৃষিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ব্যক্তি। ইংরেজী ও বাঙ্গলায় কৃষি-বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ ও পুস্তক তিনি লিখিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থগুলি সর্ব্বত্র আদৃত ও সুপঠিত হইয়া থাকে। তাঁহার দুই ভাগ কৃষি-ক্ষেত্র মূল্য ১৲, সবজীবাগ ॥০, ফলকর ॥০ আনা,—কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়। এই গ্রন্থগুলির সমালোচনা,—আমরা যথাকালে এই জন্মভূমিতে করিয়াছি! চাষবাসে যাঁহাদের প্রবৃত্তি ও সখ আছে,—এ চাকরি-বিড়ম্বিত দেশে যাঁহারা স্বল্পব্যয়ে, সচ্ছলে স্বাধীনভাবে দুই মুঠা উদরান্নের সংস্থান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রবোধ বাবুর কৃষিবিষয়ক গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে, বিশেষ ফল পাইবেন। ইহাতে একাধারে আহার ঔষধ দুই মিলিবে। গ্রন্থের ভাষা সরল, সহজ ও সকলের বোধগম্য। প্রস্তাবিত বিষয়গুলি বিশদ ও সুস্পষ্ট। যাঁহারা হাতে হেতেড়ে কৃষিকর্ম্ম শিখিতে চান, তাঁহারা কৃষিবিৎ প্রবোধচন্দ্রের গ্রন্থ গুলি সযত্নে পাঠ করুন। প্রবোধ বাবু নিজে হাতে কলমে চাষের কাজ শিখিয়াছেন; শিখিয়া তাহাই যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং এ গ্রন্থে কোনরূপ ভেজাল বা গোঁজামিলন নাই। উপরি-উক্ত তিন খানি গ্রন্থ ব্যতীত,—আম্র ও আলু বিষয়ক দুই খানি গ্রন্থ প্রবোধ বাবু ইংরেজীতে লিখিয়াছেন। সে গ্রন্থদ্বয়ও অতি উপাদেয় হইয়াছে। প্রথম খানির মূল্য পাঁচ সিকা, দ্বিতীয় খানির আট আনা।

সঞ্জীবনী, হিতবাদী, বসুমতী প্রভৃতি সংবাদপত্রে, প্রবোধ বাবু মধ্যে মধ্যে কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। তাঁহার এই প্রবন্ধ গুলি সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রবোধ বাবু কাশীপুর-কৃষি বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেনডেণ্ট ছিলেন। পাঁচ সাত বৎসর কাল তিনি এই কাজ করেন। ইনি,—কৃষিতত্ত্বজ্ঞ জ্যাকসন সাহেবের ছাত্র। প্রশংসায় সহিত পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া, প্রবোধ বাবু এফ, আর, এ, এস উপাধি পান। ইংরেজী ১৮৯১ সালে, মুর্শিদাবাদে নবাব বেগমের কৃষি-উদ্যানের ইনি জেনারল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। ১৮৯২ সাল হইতে তিন চারি বৎসরের জন্য নিজামৎ ষ্টেটের গার্ডেন সুপারিণ্টেনডেণ্টের কাজও করিয়াছিলেন। এখন প্রবোধ বাবু আসাম-তেজপুর অঞ্চলে আছেন। তথায়ও কৃষি-কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। সুতরাং কৃষি কার্য্যে যে, প্রবোধ বাবুর বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রবোধ বাবুর মঙ্গল কামনা করি।

* * *

—পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত। সাং ঢাকা। বিজলী, নবযুগ প্রভৃতি সংবাদপত্র পূর্ণ বাবু পরিচালন করিয়াছিলেন। দুই একখানি গ্রন্থও তাঁহার আছে।

* * *

—প্রসন্নচন্দ্র শাস্ত্রী। হাল সাকিম,—কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট। শাস্ত্রী মহাশয় একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। ইনি,—ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের,—প্রিয় ছাত্র। বহু শাস্ত্র-গ্রন্থ প্রণয়ন ও সম্পাদন করিয়াছেন। চণ্ডীরহস্য, আর্য্যজীবন, মণিরত্নমালা দেবীগীতা, দুর্গোৎসবপঞ্চক, তন্ত্রসার, ভাগবতসার, উপনিষদাবলী, স্তোত্ররত্নমালা প্রভৃতি বহু গ্রন্থ—শাস্ত্রী মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও ভূয়োদর্শন প্রচার করিতেছে।

* * *

—প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতার নাম ৺শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতা ৺সারদাসুন্দরী দেবী। জন্মস্থান, জেলা নদীয়া; সবডিবিসন ও থানা রাণাঘাট; গ্রাম নারায়ণপুর,—চূর্ণীনদীর তটে। গ্রামের এক মাইল দূরে, পূর্ব্ববঙ্গ-রেলওয়ের আড়ংঘাটা রেলওয়ে ষ্টেসন। নারায়ণপুরে একটি পোষ্ট আফিস আছে; অন্য নারায়ণপুর পোষ্ট আফিস হইতে স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার জন্য, প্রফুল্ল বাবুর পিতৃদেবের নামের সহিত সংযুক্ত হইয়া, ইহা শিব-নারায়ণপুর নামে অভিহিত। প্রফুল্ল বাবুর নিজের স্থাপিত, গ্রামে একটি মাইনর স্কুল ছিল; ছাত্রসংখ্যা অল্প হওয়ায় আজ ৫।৬ বৎসর হইল, তাহা উঠিয়া গিয়াছে।

প্রফুল্ল বাবুরা চারি ভাই ও এক ভগিনী। প্রথম ও দ্বিতীয় ভ্রাতা গত। প্রথম-জাত জ্যেষ্ঠ কেশবচন্দ্র ৯।১০ বৎসর বয়সে, দ্বিতীয়-জাত জ্যেষ্ঠ জগৎচন্দ্র ৩৪ বৎসর বয়সে গত হয়েন। ভগিনী অন্নদা দেবী তৃতীয়; তিনি বিধবা এবং বর্ত্তমান। চতুর্থ-জাত ভ্রাতা শরচ্চন্দ্র—সংসার আশ্রমে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন। প্রফুল্ল বাবু সর্ব্বকনিষ্ঠ। তাঁহার জন্ম বাঙ্গলা ১২৫৬ সাল, ১১ই আশ্বিন, বুধবার, বিজয়া দশমী, রাত্রি আট ঘটিকা। তাঁহার রাশিচক্র এইরূপ,—

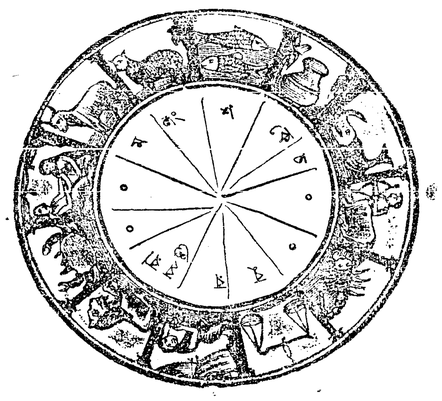

প্রফুল্ল বাবুদের বংশে কেহ কখন ধনী ছিলেন না, পরন্তু নির্ধনও ছিলেন না,—মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান ইহাঁদের চিরদিন ছিল। তবে বর্ত্তমান উন্নতির অবস্থা ও সুখসৌভাগ্য যথাস্থানে বর্ণনীয়।

প্রফুল্ল বাবুর জন্মের পূর্ব্বে, প্রফুল্ল বাবুর পুণ্যবান্ পিতৃদেব, নয় বৎসর ব্যাপিনী তীর্থযাত্রায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। তিনি অতি তেজস্বী ও মনস্বী পুরুষ ছিলেন। অধিকন্তু সঙ্গীত-বিদ্যায় তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। ঐ সঙ্গীত-বিদ্যাই তাঁহার তীর্থযাত্রার ব্যয় সঙ্কুলন পক্ষে একমাত্র সম্বল ছিল। বিন্ধ্য পর্ব্বতের উপরিস্থ কোন তীর্থ ও পুণ্যস্থানে ভ্রমণ,—তিনি বাকী রাখেন নাই। প্রফুল্ল বাবুর মাতৃদেবীও সাতিশয় ধর্ম্মশালিনী এবং সেকেলে সাদাসিদা গুণবতী রমণী ছিলেন।

প্রফুল্ল বাবুর পিতৃদেবের তীর্থগমনের কিছুকাল পরেই, প্রফুল্ল বাবুর পিতামহের মৃত্যু হয়। সুতরাং বাড়ীতে অন্য কেহ কর্ত্তৃপক্ষ না থাকায় এবং প্রফুল্ল বাবুর জ্যেষ্ঠগণ তখন বালক থাকায়, প্রফুল্ল বাবুদের পৈতৃকসম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, তাহার পরিচালন ভার অন্যের হস্তে অর্পিত হয়। তাহার ফলে, প্রফুল্ল বাবুর পিতৃদেব বাটী আসিবার পূর্ব্বেই, সমস্ত সম্পত্তিই নষ্ট হইয়া যায়। তাহাতে সংসারে বড়ই দুঃখের দশা আসে। সেই সময় প্রফুল্ল বাবুর পিতৃদেব দেশে ফিরিলেন এবং তাহার এক বৎসর পরে প্রফুল্ল বাবু জন্মগ্রহণ করিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র,—যেন সাংসারিক দুঃখরাশিকে সঙ্গে লইয়াই জন্মগ্রহণ করিলেন। সে দুঃখ এত যে, অতি সামান্য অবস্থায়ও দিনপাত হওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। অগত্যা,—যাহা কখন হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও ছিল না,—তাহাই হইল,—প্রফুল্লচন্দ্রের পিতৃদেবকে চাকরি করিতে হইল। তৎসঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ জগচ্চন্দ্রও চাকরি গ্রহণে বাধ্য হন। কিন্তু উভয়ের কেহই ইংরেজী না জানায়, অতি সামান্য বেতনে বাঙ্গালীর কাছে বাঙ্গলা চাকরি গ্রহণ করেন। তাহাতে কায়ক্লেশে কোন রকমে জীবিকা-নির্ব্বাহ হইত। প্রফুল্ল বাবুর ইচ্ছা,—তাঁহাদের এই সময়কার বিশেষ দুঃখ-কাহিনী যদি কেহ জানেন, তাহা যেন তিনি প্রফুল্ল বাবুর জীবনকালে প্রকাশ না করেন। কারণ, অতীতের সেই অতি বড় দুঃখ-স্মৃতির স্মরণ হইলেও, প্রফুল্ল বাবুর চক্ষে জল পড়ে, বড় কষ্ট হয়। কেন না, প্রফুল্লচন্দ্রের আজিকার এ সৌভাগ্য-দিনে, তাহারা সব কোথায়! হায়! অতীতের বিশাল উদরে সেই সব দুর্ভাগ্য জীবের অস্তিত্বও আজি বিলুপ্ত।

জীবনের সেই নির্ম্মল উষাকালে প্রফুল্লচন্দ্র,—দারিদ্র্যের কঠোর কশাঘাতে নিপীড়িত হইতে লাগিলেন। অন্য বালকের সহিত আপন অবস্থার তুলনা করিয়া, বালক প্রফুল্লচন্দ্র দুঃখে ম্রিয়মাণ হইতেন। কোন দুষ্ট বালক প্রফুল্লচন্দ্রের দরিদ্রতা দেখাইয়া উপহাস করিলে, কোমলপ্রাণ দরিদ্র শিশু প্রফুল্লচন্দ্র মরমে মরিয়া যাইতেন, নিষ্ফল অভিমানে বিরলে একটু কাঁদিতেন;—যেখানে ওরূপ বিড়ম্বনা ও নির্য্যাতনের সম্ভাবনা বুঝিতেন, ভ্রমেও সে পথ মাড়াইতেন না।

শিবচন্দ্রের সাংসারিক অবস্থা এই, তাহার উপর নিকটে ইংরেজী বা বাঙ্গলা স্কুলও একটি ছিল না; সুতরাং স্থানান্তরে থাকিয়া প্রফুল্লচন্দ্রের লেখা-পড়া শেখা একরূপ অসম্ভব হইল। কাজেই গ্রাম্য গুরু মহাশয়ই প্রফুল্লচন্দ্রের ভবিষ্য-জীবনের পথ-প্রদর্শক হইলেন। গুরু মহাশয়ের পাঠশালে,—বালক প্রফুল্লচন্দ্রের একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত কাটিয়া যায়। এই পাঠশালাতেও, বালক প্রফুল্লচন্দ্রের অনন্য-সাধারণ বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষণীয় বিষয় ও সামান্য সামান্য রচনায়,—প্রফুল্লচন্দ্র

গুরু মহাশয় ও আত্মীয় অভিভাবকগণকে চমৎকৃত করিতেন। গুরুমহাশয়, ছাত্র প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া, অবসরকালে, প্রফুল্লচন্দ্রকে পৃথকরূপে শিক্ষা দিতেন। অন্য বালকবর্গের প্রফুল্লচন্দ্রের উপর রাগ বা ঈর্ষার,—বোধ হয় ইহাও একটা কারণ। শুনা যায়, প্রফুল্লচন্দ্রের স্বর্গীয় পিতৃদেব, প্রফুল্লচন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া প্রায়ই বলিতেন;—"বহু তীর্থের পুণ্যফলে আমার এই পুত্রটীর জন্ম; এজন্য শিক্ষার কোন সুযোগ না হইলেও,—এই শিশু কালে দৈব-বিদ্যায় বিদ্বান ও সৌভাগ্যশালী হইবে।" ভগবদ্ভক্ত শিবচন্দ্রের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফলা হইয়াছে;—আজ সেই দরিদ্র-শিশু প্রফুল্লচন্দ্র প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী, অতুল সৌভাগ্যশালী, উচ্চ রাজকীয় কার্য্যে অধিষ্ঠিত ও দুর্লভ বিদ্যায় যশস্বী হইয়া সর্ব্বত্র সুপরিচিত ও ধন্য হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখ এই, তাঁহার এই অতুল সুখসম্পদ তাঁহার পিতামাতা দেখিয়া যাইতে পারিলেন না!

প্রফুল্লচন্দ্রের বয়স যখন একাদশ বর্ষ, তখন কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব ইণ্টারপ্রিটার ও ব্যবস্থা-দর্পণকার স্বনাম-ধন্য পুরুষ শ্যামাচরণ সরকার মহাশয়,—তাঁহার নিজ গ্রামে আমজোয়ানিতে এক উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী ইস্কুল সংস্থাপিত করেন। আমজোয়ান্,—প্রফুল্ল বাবুদের গ্রাম হইতে দেড় ক্রোশ দূরবর্ত্তী। এই ইস্কুলে ছাত্রদের বেতন ছিল না,—সকলেই ফ্রী পড়িতে পাইত। এই ইংরেজী ইস্কুলই,—বালক প্রফুল্লচন্দ্রের ভাবী সৌভাগ্যের অন্যতম সোপান হয়। এই ইংরেজী ইস্কুল স্থাপিত না হইলে, প্রফুল্লচন্দ্রকে হয়ত চিরদিন কেতাবতী লেখাপড়া শিখিতে হইত এবং আজীবন কোন জমিদারের পাটোয়ারী-গিরিতে নিযুক্ত থাকিতে হইত।

যথাদিনে প্রফুল্লচন্দ্র, এই ইংরেজী ইস্কুলে নিযুক্ত হইলেন। গ্রাম হইতে ইস্কুল দেড় ক্রোশ দূরবর্ত্তী হইলেও, বালক প্রফুল্লচন্দ্র অম্লান বদনে ইস্কুলে পড়িতে যাইতেন; ছাতি-জুতা-জামা-শূন্য ছিন্ন মলিন বসন পরিধান করিয়া, বালক প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিদিন তিন ক্রোশ পথ হাঁটিতেন। এইরূপে চারি বৎসর কাল অতীত হয়। এই চারি বৎসরের মধ্যেই বুদ্ধিমান্ প্রফুল্লচন্দ্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। তখন তাঁহার বয়স পনেরো বৎসর মাত্র। এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্রের পিতৃদেব শিবচন্দ্র,—পরলোক গমন করিলেন। বালক প্রফুল্ল সংসার আঁধার দেখিলেন। দুধের-শিশুর গলায় সংসারের গুরুভার পড়িল। বাধ্য হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রফুল্লচন্দ্রকে জন্মের মত ইস্কুলের লেখা পড়ায় জলাঞ্জলি দিতে হইল। কিন্তু বিধির বিধানে,—অতঃপর প্রফুল্লচন্দ্র যে দারিদ্র্যের পাঠশালে পড়িলেন,—প্রকৃতি তাঁহাকে যে মহাশিক্ষা দিতে লাগিল, তাহা আনুপূর্ব্বিক স্মরণ করিলে অন্তরে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের উদ্রেক হয়।

সহায়হীন, সম্বলহীন, উপায়হীন, দরিদ্র বালক প্রফুল্লচন্দ্রের এই সময়কার জীবন-সংগ্রাম ও তৎসহ অনন্য-সাধারণ অধ্যবসায় স্মরণ করিলে, বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতে হয়। দরিদ্র বাঙ্গালী সন্তান, কিরূপে আত্মবলে মানুষ হইতে পারে; অসাধারণ পরিশ্রম ও একাগ্রতা বলে বাঙ্গালী সন্তান কিরূপে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ, বহুজ্ঞ ও কার্য্যকুশল হইয়া দশের একজন হইতে পারে; ইচ্ছা ও যত্ন থাকিলে শ্রমকাতর বাঙ্গালী কিরূপে দেশে, সমাজে ও সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত হইয়া জনসাধারণের প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি উপহার পাইতে পারে,—বাঙ্গালী-সন্তান কীর্ত্তিমান প্রফুল্লচন্দ্র,—তাহার উজ্জ্বল উদাহরণ। পনেরো বছরের কিশোর প্রফুল্লচন্দ্র আজ সংসার-দায়ে লেখা-পড়ায় জলাঞ্জলি দিয়া, পাঁচ সাত টাকার মাহিনার জন্য কোন প্রাইবেট ইস্কুলের শিক্ষকতার জন্য কত না পথ হাঁটিয়া উমেদারী করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন! এইরূপ নিষ্ফল উমেদারীতে কত দিনই না তাঁহার অনাহারে ও অনিদ্রায় কাটিয়া গেল!—প্রফুল্লচন্দ্রের এ সময়কারও আনুপূর্ব্বিক জীবন-কাহিনী, তাঁহার জীবিতকালে কেহ না প্রকাশ করেন, ইহা প্রফুল্লচন্দ্রের ইচ্ছা।

ইস্কুলের শিক্ষকতা,—প্রফুল্লচন্দ্রের কিছুতেই মিলিল না। ভাগ্যে এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্রের বাড়ীর কাছে, আড়ংঘাটা রেলওয়ে ষ্টেশন খুলিল। রেলের চাকরিতে অধিক বিদ্যাবুদ্ধির আবশ্যক নাই জানিয়া, প্রফুল্লচন্দ্র উক্ত আড়ংঘাটা রেল ষ্টেশনের একজন শিক্ষানবিশী হইলেন। তথায় প্রায় পাঁচ মাস শিক্ষানবিশী করার পর,—রামনগর ষ্টেশনে, প্রফুল্লচন্দ্রের, বুকিংক্লার্কের এক চাকরি হইল। এই চাকরির কাজ হইতেছে,—টিকিট বিক্রয়। প্রফুল্লচন্দ্রের অবস্থা তখন এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, চাকরি স্থানে যাইবার জন্য, প্রফুল্লচন্দ্রকে কর্জ্জ করিয়া কাপড় জুতা কিনিতে হইয়াছিল। জামা গায়ে দিবার অবস্থা তখন হয় নাই,—দুই এক মাসের বেতন পাইলে তবে হইবে।

প্রফুল্লচন্দ্রের এই চাকরি ছয় মাস কাল বেশ চলিল। কিন্তু এই ছয় মাস প্রফুল্লচন্দ্রকে কিছু "রোগে" ধরিল,—অসৎ-সংসর্গটা অতিমাত্রায় আসিয়া জুটিল। সৎসর্গগুণে প্রবৃত্তিটাও ক্রমে বিগড়াইতে লাগিল। ২৬।২৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রফুল্লচন্দ্র,—একরূপ স্রোতে গা ভাসাইলেন। তাহার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। সে স্বাস্থ্য, এখন অনেক সন্তর্পণে, বিশেষ সাবধানে, অনেক ধরা-বাঁধা নিয়মেও তিনি আয়ত্ত করিতে পারিতেছেন না। পারিবেন ও যে, সে আশা বড় বেশী নাই,—কেন না, এখন তাঁহার জীবনে ভাটার সময় আসিয়াছে।

কিন্তু, এতটা বাড়াবাড়ীর মধ্যেও, প্রফুল্লচন্দ্রের পরম পুণ্য বল যে, সৎপ্রবৃত্তির শুভ্র আলোক সর্ব্বদাই তাঁহার আশে পাশে উঁকি-ঝুঁকি মারিত। সেই তীব্র পুণ্যালোকই, এক দিন তাঁহার অসৎপ্রবৃত্তির মূলদেশ শুকাইয়া মারিয়া ফেলে এবং তাহার "গুড়-" শুদ্ধ তাহাকে উৎখাত

করিয়া দেয়। পুণ্যবান্ পিতার সন্তান,—আবার পুণ্যবান্ হইলেন; ধার্ম্মিকের পুত্র আবার সংযমশীল, সচ্চরিত্র হইলেন। চরিত্রের এই সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনে,—প্রফুল্লচন্দ্রের হৃদয়ের উপর আর একজনের আধিপত্য দেখিতে পাই। তিনি,—ভাগ্যবান্ প্রফুল্লচন্দ্রের গুণবতী সতী সাধ্বী সহধর্ম্মিণী। সেই আদর্শ গৃহলক্ষ্মীর কৃপায় প্রফুল্লচন্দ্র পরিত্রাণ পান; তাঁহার নবজীবন লাভ হয়।

রামনগর ষ্টেশনে বুকিংক্লার্কের কাজ,—প্রফুল্লচন্দ্রের ছয় মাস চলিল। তার পর রেলের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে স্থানান্তরে বদলী করিলেন। কুষ্টিয়া হইতে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত তখন যে রেলওয়ে ষ্টীমার চলিত, প্রফুল্লচন্দ্র ত্রিশ টাকা বেতনে সেখানে বদলী হইলেন। কিন্তু এ চাকরি তাঁহার ধাতে সহিল না। ধাতে না সহায়, মন না বসায়, কাজেই, কাজও খারাপ হইতে লাগিল। তাহাতে ষ্টীমারের কাপ্তেন এক দিন প্রফুল্লচন্দ্রকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিল,—এমন কি, গালিও দিল। অভিমানী প্রফুল্লচন্দ্র, তখনই মনে মনে সেই চাকরির মুণ্ডপাত করিয়া, মনে মনে বড়ই চটিয়া, কিছু দূরে গিয়া, একটা ঢিল কুড়াইয়া, আচ্ছা করিয়া তাকিয়া, বাঁ করিয়া সেই ফিরিঙ্গী সাহেবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সাহেব তো আহু, উহু করিয়া যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে থাকুন,—আর সেই অবসরে প্রফুল্লচন্দ্রও এক দৌড়ে, ঊর্দ্ধশ্বাসে বাজারে আসিয়া গা-ঢাকা দিলেন। বাস্, তাঁহার চাকরির দফাও এই খানে রফা হইল।

রেলের চাকরি যাইবার পর, অতি কষ্টে প্রফুল্লচন্দ্রের দিন কাটিতে লাগিল। এক মুষ্টি উদরান্নের জন্য তিনি লালায়িত হইলেন। এমন কি,—লিখিতে কষ্ট হয়,—এ সময় তাঁহাকে কিছু দিনের জন্য প্রকারান্তরে পাচকের কার্য্যও করিতে হইয়াছিল! যেহেতু, চাকরি যাওয়ায়, লজ্জাবশতঃ তিনি বাটী যাইতে পারিলেন না। লেখা পড়াও তখন অধিক শিখেন নাই যে, হঠাৎ কোন স্থানে আর একটা চাকরির জোগাড় করিয়া লইবেন। এ সময় প্রফুল্ল বাবুর বয়স ষোল বৎসর মাত্র।

প্রফুল্লচন্দ্র যখন রামনগরে ছিলেন, তখন তথাকার পোষ্ট আপিসে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। সুতরাং পোষ্ট আপিসের খবর তিনি কিছু কিছু রাখিতেন। রেলের চাকরি গেলে,—বাঙ্গলা দেশের যাবতীয় ইনেস্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টারের নিকট চাকরির জন্য তিনি এক দিন এক এক খানি দরখাস্ত পাঠাইলেন। এখন এই পদ,—ক্ষমতা ও বেতন বৃদ্ধির সহিত "সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট অব পোষ্ট অপিস" পদে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রফুল্লচন্দ্র সকল স্থানেই দরখাস্ত করিলেন, কিন্তু উত্তর আসিল কেবল আসাম ও দার্জ্জিলিং লাইনের পোষ্ট আপিসের ডিবিসন হইতে! কারণ এই দুই স্থান তখন অতি দুর্গম ছিল, সহজে তখন এখানে কেহ চাকরি লইত না। প্রফুল্লচন্দ্রের দরখাস্তের উত্তরে আসাম হইতে সংবাদ আসিল যে, তাঁহাকে ত্রিশ টাকা বেতনে হেডক্লার্কের পদ দেওয়া যাইতে পারে; আর দার্জ্জিলিং লাইন হইতে তাঁহার একেবারে কুড়ি টাকা বেতনে বাহালী পরোয়ানা আসিল:—তত্রস্থ কারাগোলা ডাকঘরে বুলক-ট্রেণ-ক্লার্ক পদে ঐ বেতনে নিযুক্ত হইবার অভিমতি-পত্র আসিল। আসাম তখন বড়ই দুর্গম স্থান থাকায়, প্রফুল্লচন্দ্র ত্রিশ টাকা বেতনের প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া, কুড়ি টাকাতেই,—অপেক্ষাকৃত সুগম দার্জ্জিলিং লাইনের কারাগোলার চাকরিই গ্রহণ করিলেন। কারাগোলা রেলের পথ,—সাহেবগঞ্জের নিকটে। ইংরেজী ১৮৬৬ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে, প্রফুল্লচন্দ্র কারাগোলার ঐ চাকরি গ্রহণ করিলেন।—তাঁহার ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের সূচনা হইল।

প্রফুল্লচন্দ্রের বিদ্যাবুদ্ধি তখন কম,—কাজেই তখন তিনি যে সব-পোষ্ট-মাষ্টারের অধীনে কাজ করিতেন, তাঁহার সহিত কিছু খিট্‌মিট্ চলিতে লাগিল। প্রফুল্লচন্দ্র নিজের দুর্ব্বলতা বুঝিলেন,—ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য অবসরমত দুই এক খানি পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলেন। বিশেষ চাকরি-গ্রহণের তিন সপ্তাহ পরেই তদানীন্তন পোষ্ট সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট রলো সাহেব কারগোলা পোষ্ট আপিসে আসিলেন, প্রফুল্লচন্দ্রের বিদ্যাসাধ্যের দৌড় বুঝিয়া তাঁহাকে তাড়াইবারও ভয় দেখাইলেন। বুদ্ধিমান্ প্রফুল্লচন্দ্র তখন উত্তমরূপ লেখাপড়া শিখিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন,—হাতের লেখাও দুরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন।

তিন মাস পরে ঐ রলো সাহেব পুনরায় ঐ কারাগোলায় আসিলেন। এবার প্রফুল্লচন্দ্রের হাতের লেখা পরিষ্কার দেখিয়া এবং ইংরেজীতে কথঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। তিন মাসের মধ্যেই যে, প্রফুল্লচন্দ্র এত উন্নতি করিতে পারিয়াছেন, তাহাতে সাহেব খুসী হইয়া প্রফুল্লচন্দ্রকে বাহবাও দিলেন। সাহেব এখন সু-নজরে প্রফুল্লচন্দ্রকে দেখিলেন;—তাই খুব শীঘ্র শীঘ্র প্রফুল্লচন্দ্রের প্রমোশনও হইতে লাগিল।

উৎসাহ ও সহানুভূতি বড় উচ্চ জিনিস। সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সাহেবের এইরূপ উৎসাহ-অনুগ্রহে, প্রফুল্লচন্দ্রের পড়া-শুনার প্রতি দ্বিগুণ আঁইট লাগিয়া গেল। ইংরেজী ও বাঙ্গলা গ্রন্থাদি চাহিয়া-চিন্তিয়া সংগ্রহ করিয়া, কখন বা কষ্টার্জ্জিত সামান্য বেতন হইতে ক্রয় করিয়া, প্রকৃতির প্রিয়পুত্র প্রফুল্লচন্দ্র অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অসাধারণ অধ্যবসায়সহকারে, নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই পঠনপ্রণালীর ইতিহাস অতি অপূর্ব্ব। তিনি কখন কাহারও নিকট হইতে এক বর্ণেরও সাহায্য লন নাই, একটি কথাও কাহাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই,—আশ্চর্য্য প্রতিভাগুণে, ধীরে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে উচ্চে—আরও উচ্চে পঠন-মন্দিরের সোপানাবলী অতিক্রম করিতে

লাগিলেন। সরস্বতীর বিশেষ কৃপা-দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল;—যেন বীণাপাণি মূর্ত্তিমতী হইয়া, প্রিয় পুত্রের অন্তরে বাহিরে বিরাজ করিতে লাগিলেন। সেই সামান্য কেরাণীগিরির অবস্থা হইতে আজ পর্য্যন্ত, প্রফুল্লচন্দ্র যে সহস্র সহস্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া আসিয়াছেন,—তজ্জন্য কখন কাহারও নিকট এতটুকুও সাহায্য লন নাই। কেবল সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং লাটিন ও গ্রীকের সময়, তাঁহাকে ক্বচিৎ কখন অন্যের সাহায্যপ্রার্থী হইতে হইয়াছিল।—এক হিসাবে ইহা প্রফুল্লচন্দ্রের "দৈব-বিদ্যা" নহে কি? প্রফুল্লচন্দ্রের ধর্ম্মপ্রাণ পিতৃদেবের সেই আশীর্ব্বাদ-বাণী প্রকারান্তরে সফলা হয় নাই কি?

অবশ্য, কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় দুর্ব্বোধ্য জটিল গ্রন্থ দি পাঠে যে, প্রফুল্লচন্দ্রের কষ্ট না হইত এমন নহে,—কিন্তু চেষ্টার অসাধ্য কাজ কি আছে? বিশেষ প্রফুল্লচন্দ্রের অদ্ভুত অধ্যবসায় ও মৌলিক চিন্তাশক্তিই,—প্রফুল্লচন্দ্রকে বিদ্বান ও মনস্বী করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল।

এদিকে, কারাগোলা পোষ্ট অফিসের কেরাণীগিরি—অধ্যয়নশীল প্রফুল্লচন্দ্রের ধাতে আর সহিল না। তিনি,—তাঁহার উন্নতি-পথের প্রধান সহায় রলো সাহেবকে একথা বলিলেন। বলিলেন যে, একের অধীনে কার্য্য করিতে করিতে গ্রন্থাদির অনুশীলন করা,—আত্মোন্নতির চেষ্টা করা একরূপ অসম্ভব;—এ বিষয়ে তাঁহাকে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার জন্য অন্যত্র বদলী করিয়া দিলে ভালো হয়। রলো সাহেব প্রফুল্লচন্দ্রের এ প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন;—ঐ কুড়িটাকা বেতনেই,—ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত কাহালগাঁয়ে বদলী করিয়া দিলেন। এ চাকরিতে প্রফুল্লচন্দ্রকে অধিক দিন থাকিতে হয় নাই,—সাত মাস পরে, ঐ রলো সাহেবের অনুগ্রহে,—পঞ্চাশ টাকা বেতনে, প্রফুল্লচন্দ্র দার্জ্জিলিং ডাকঘরে হেডক্লার্কের পদে উন্নীত হইলেন। সেখানে দেড়মাস কাল প্রশংসার সহিত চাকরি করার পর, পঁয়ষট্টি টাকা বেতনে,—জলপাইগুড়ী জেলার অন্তর্গত তেঁওলিয়া নামক স্থানে ডেপুটী পোষ্টমাষ্টারের পদে পুনঃ উন্নীত হইলেন। এই তেঁওলিয়া,—পূর্ণিয়া হইতে দার্জ্জিলংএর পথে অবস্থিত। রেলষ্টিমারের চাকরি,—প্রফুল্লচন্দ্রের যে ভাবে যায়, এই তেঁওলিয়ার ডেপুটী পোষ্টমাষ্টারের চাকরিতেও সেই ভাবের একটা বিঘ্ন ঘটে।—একজন সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীর সহিত মনোবিবাদ ঘটায় প্রফুল্লচন্দ্রকে কার্য্য হইতে সস্পণ্ড হইতে হয়। সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে, প্রফুল্লচন্দ্রের তদানীন্তন দৈহিক বল, অপরিণামদর্শিতা ও উদ্ধত স্বভাবই,—প্রফুল্লচন্দ্রের প্রধান শত্রু হইয়াছিল।

পোষ্টমাষ্টার জেনারল—সেই অপমানিত ইংরেজ কর্ম্মচারীর অভিযোগে,—প্রফুল্লচন্দ্রকে বে-কৈফিয়ৎ সসপণ্ড করিলেন। দেড়মাস কাল তিনি সসপণ্ড অবস্থায় রহিলেন। অতঃপর সেই রলো সাহেবের অনুগ্রহেই পুনরায় একটি কাজ পাইলেন; কিন্তু এবার তাঁহার বেতন নামিয়া গেল,—ত্রিশ টাকাতে তিনি নিযুক্ত হইলেন। প্রায় চারি মাস কাল প্রফুল্লবাবুকে এই ত্রিশ টাকা বেতনে থাকিতে হইয়াছিল। অতঃপর সৌভাগ্যক্রমে আবার সত্তর টাকায় উন্নীত হইলেন। কিন্তু তিন মাস পরে তাঁহার সেই পদ উঠিয়া গেল,—তিনি পুনরায় পয়ষট্টি টাকা বেতনে,—সেই পূর্ব্ব কর্ম্মস্থানে—তেঁওলিয়াতে আসিলেন।

এই তেঁওলিয়ায় প্রফুল্লবাবুর বাঙ্গলা রচনার প্রথম হাতে-খড়ি হয়। প্রথম বয়সে সকলেই যেমন পদ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হন, প্রফুল্লবাবুও সেইরূপ কবিযশঃ-প্রার্থী হইয়া পদ্য লিখিতে আরম্ভ করিলেন। পদ্যময় দুইখানি গ্রন্থও লিখিলেন। কিন্তু সে গ্রন্থ স্থায়ী-সাহিত্যে স্থানলাভ করিতে পারিল না;—এখন সে গ্রন্থের অস্তিত্বও নাই। কিন্তু সে সময় অধ্যয়নশীল প্রফুল্লচন্দ্রের অধ্যয়নের আর তিলমাত্র বিরাম ছিল না। সরকারী কার্য্য সমাধা করিয়াই, তিনি যোগমগ্ন যোগীর ন্যায় তদ্গতচিত্তে,—বাহ্যজগৎ ভুলিয়া গ্রন্থ পাঠ করিতেন। ইংরেজী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত,—তিনি যে কত গ্রন্থ পড়িয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই সময়ে বঙ্গের অন্যতম আদি নাটককার দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের সহিত প্রফুল্ল বাবুর আলাপ-পরিচয় হয়। মিত্রজ মহাশয়,—প্রফুল্লচন্দ্রের সরকারী কার্য্যে দক্ষতা,—তদুপরি বিবিধ-গ্রন্থপাঠে অদ্ভুত অনুরাগ দেখিয়া, বড়ই সন্তুষ্ট হন, এবং তাঁহার চাকরি-বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্যও করেন। তিনিও তখন পোষ্টাল বিভাগের একজন উচ্চ-কর্ম্মচারী ছিলেন। ইংরেজী ১৮৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রফুল্লবাবু কুড়ি টাকা বেতনে পোষ্ট আপিসে প্রথম প্রবেশ করেন, আর ১৮৬৯ সালে নবেম্বর মাসের মধ্যেই রলো সাহেব ও দীনবন্ধু বাবুর সাহায্যে, এক শত টাকা বেতনে, পূর্ণিয়ার পোষ্টমাষ্টারের পদে বাহাল হইলেন! ইহার ফলে, কিছুদিন পূর্ব্বে, যাঁহার অধীনে তিনি কুড়ি টাকা বেতনের কেরাণী ছিলেন, সময়গুণে তাঁহার সেই পূর্ব্বতন উপরওয়ালাই, এক্ষণে তাঁহার অধীনে, সেই কারাগোলায় পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। কৃতিত্ব ও যোগ্যতার সহিত, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিরও বিশেষ পরিচয়,—প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে পদে পদে দেখিতে পাই। এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্রের বয়স কুড়ি বৎসর মাত্র।

১৮৭০ সালের জানুয়ারী মাসে, প্রফুল্ল বাবু চট্টগ্রামের পোষ্ট মাষ্টারের পদে বদলী হইলেন। চট্টগ্রামে তিন চারি মাস অবস্থিতির পর তাঁহার বিবাহ হইল। নদীয়া জেলার সুটিয়া গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী গোলাপকামিনী দেবীর সহিত তাঁহার শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই গুণবতী সতীসাধ্বী সহধর্ম্মিনীর পবিত্র হৃদয়-গুণে,—প্রফুল্ল বাবু নবজীবন লাভ করেন। সেই পুণ্যবতী

রমণীর চরিত্র আদর্শ করিয়া, প্রফুল্ল বাবু আপন চরিত্র গঠিত করেন। শ্রীমতী দেবী গোলাপকামিনী, সেকালের ধরণের হিন্দু রমণী,—নব্যা রমণীগণের ন্যায় লেখা পড়া বা আধুনিক চালচলনের কোন ধার ধারেন না। অথচ, এরূপ স্বভাবসুন্দর এবং অসৎ জ্ঞান ও অসৎ ধারণা-পরিশূন্যা দিব্য প্রকৃতি এ সংসারে বিরল। বুঝি, ইঁহাকে দেখিয়াই, প্রফুল্ল বাবু তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "গ্রীক ও হিন্দু" গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন,—"ঈশ্বর যদি আর কতকগুলি এরূপ মানুষ সৃষ্টি করেন,—যাহারা স্বভাবতই দিব্য প্রকৃতি ও যাহাদের মনে অসতের ধারণা একেবারেই স্থান পাইতে পারে না!" প্রফুল্ল বাবু তাঁহার গুণবতী সহধর্ম্মিণীর প্রকৃতি অনুশীলন দ্বারাই প্রথমে অনুভব করেন যে, বিদ্বান হইলেই কিছু মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। পরন্তু যে বিদ্যায় প্রকৃতির পরিমার্জ্জন, তাহা সাংসারিক বিদ্যার মুখ চাহে না,—কেতাবী লেখাপড়ায় তাহা আবদ্ধ থাকে না। দেবী গোলাপকামিনী সেই উচ্চ প্রকৃতি এবং উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। যৌবনের উদ্দাম তরঙ্গাভিঘাতে প্রফুল্ল বাবু যে, ভাসিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, দেবী গোলাপকামিনী নিজ চরিত্রগুণে, জীবনের উচ্চ আদর্শে, স্বামীকে সেই উচ্ছৃঙ্খলতার হাত হইতে রক্ষা করেন। সেই পতিব্রতা রমণীই স্বামীকে সংযত, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং চরিত্রবান্ করিতে সমর্থ হন। অথচ, তিনি একদিনের তরেও স্বামীকে কোনরূপ তিরস্কার করেন নাই, কিংবা কোনরূপ মর্ম্মপীড়াও দেন নাই। উচ্চ আদর্শ চক্ষের সম্মুখে থাকিলে, মানুষ স্বভাবতই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং আপনার মলিনতা ও ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া তাহা আয়ত্ত করিতে যত্ন পায়। ভাগ্যবান্ প্রফুল্লচন্দ্র এইরূপে গুণবতী পত্নীর চরিত্র-গুণে আত্মরক্ষা করেন। ২৩।২৪ বৎসর বয়সের সময়েই, প্রফুল্ল বাবুর এ সৌভাগ্য ঘটে। তৎপরেও তাঁহার হৃদয়ে যে, যৎকিঞ্চিৎ মলামাটী ছিল, ২৬।২৭ বৎসর বয়সের সময় তাহা সমস্তই একেবারে সংশোধিত ও বিশুদ্ধ হয়। সুতরাং বলিতে হইবে, প্রফুল্ল বাবুর জীবনের উপর তাঁহার স্ত্রীর প্রভাব বড় বেশী; এবং সেই সতীসাধ্বী সহধর্ম্মিণীর গুণেই, তিনি ইহ-সংসারে যা কিছু করিতে সমর্থ হন। এরূপ পত্নীভাগ্য সংসারে বড় বিরল। প্রফুল্ল বাবুর পত্নী,—আদর্শ পত্নী।

ইংরেজী বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, তত্ত্বগ্রন্থ,—প্রফুল্ল বাবুর কোন গ্রন্থই পড়িতে বাকী নাই। ইংরেজ লেখকগণের মধ্যে, সর্ব্বাপেক্ষা তিনি কার্লাইলের অধিক পক্ষপাতী। কারণ এই কার্লাইল পাঠেই তাঁহার উচ্চ চিন্তার অধিকার হয়, এবং তত্ত্ববিষয়ে দৃষ্টি পড়ে।

এইবার প্রকৃতির প্রিয়-পুত্র প্রফুল্লচন্দ্র,—সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পণ্ডিত ভৈরবচন্দ্র ন্যায়ভূষণ নামক জনৈক অধ্যাপককে নিযুক্ত করিয়া, তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য-পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক বৎসর মাত্র তিনি এই পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করেন। অতঃপর সংস্কৃত পড়িবার জন্য তাঁহাকে আর কাহারও সাহায্য লইতে হয় নাই। কেবল বেদ পড়িবার সময় উত্তর-পশ্চিম দেশীয় একজন পণ্ডিত তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছিলেন।

চট্টগ্রামে তিন বৎসর চাকরি করার পর, প্রফুল্ল বাবু সেই বেতনেই বালেশ্বরে বদলী হন। বালেশ্বরে আসিয়াও তাঁহার অধ্যয়নের বিরাম ছিল না। তত্ত্ব-বিষয়ক বহু ইংরেজী ও সংস্কৃত গ্রন্থ তিনি নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু এই সময়ে প্রফুল্ল বাবু উড়িয়া, তৈলঙ্গী, লাটিন ও গ্রীক ভাষার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ফাদার সাপার্ট নামে একজন রোমান কাথলিক পাদ্রীর সাহায্যে তিনি লাটিন ও গ্রীক অধ্যয়ন করেন। এই অধ্যয়নের সময় তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না,—যেন শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইত। পড়িতে পড়িতে তাঁহার স্মৃতিশক্তি এতই প্রখরা হইয়া গিয়াছে যে, যে কোন বিষয়ের বা যে কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থের একটু খেই ধরাইয়া দিলে, প্রফুল্ল বাবু তাহা অনর্গল মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারেন। বিবিধ ভাষার বিবিধ শ্লোক ও কিংবদন্তী তাঁহার কণ্ঠস্থ দেখিয়া, কেহ কেহ মনে করেন, প্রফুল্ল বাবু বুঝি ওগুলি যত্ন-পূর্ব্বক মুখস্থ করিয়াছেন; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে,—অসাধারণ অধ্যয়ন-গুণে, তন্ময়ভাবে অনুশীলন-ফলে, তাহা আপনা হইতেই তাঁহার স্মৃতিমূলে বিশিষ্টরূপে জড়িত হইয়া গিয়াছে। পাঠে তাঁহার দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকিত না,—ভালো মন্দ যে কোন বই তিনি পাইতেন, যত্নপূর্ব্বক সমান মনঃসংযোগে, তিনি তাহা পাঠ করিতেন। এখনও, এই প্রবীণ বয়সেও, প্রতিদিন গড়ে ২।৩ ঘণ্টা কাল কোন নূতন বিষয় পাঠ না করিলে, যেন তাঁহার ঘুম হয় না,—আহারে রুচি জন্মে না। পড়া শুনা যেন তাঁহার একটা নেশা হইয়া গিয়াছে। ন্যূনকল্পে ধরিলেও, সর্ব্বরকমে প্রফুল্ল বাবু প্রায় বারো চৌদ্দ হাজার গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন। এরূপ অধ্যয়নশীল বাঙ্গালী,—বঙ্গদেশে যে, অতি বিরল, তাহার সন্দেহ নাই।

বালেশ্বরে অবস্থিতিকালে প্রফুল্ল বাবুর মনে হয় যে, ভারতবর্ষের হিন্দুযুগের একটা চলনসই ইতিহাস লেখা যাইতে পারে কি না। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নানাগ্রন্থ হইতে নানা 'নোট' সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্কিম বাবুর বঙ্গদর্শন বাহির হইয়াছিল। বালেশ্বরের তৎকালীন পুলিস ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পণ্ডিত জগদীশনাথ রায় মহাশয় এক দিন প্রফুল্ল বাবুর বাসায় আসিয়া 'সাহিত্যিক' কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "এখন ইতিহাসের বড় কথা থাকুক, আপাততঃ বঙ্কিম বাবুর বঙ্গদর্শনের জন্য তুমি কিছু লিখ দেখি।" প্রফুল্ল বাবুর পুস্তকাধারে মূল সংস্কৃত রামায়ণের সপ্ত কাণ্ড দেখিয়া

তিনি বলিলেন, "এই রামায়ণ হইতে তাৎকালিক সামাজিক অবস্থা কি, তাহা উদ্ধার করিয়া কিছু লিখ দেখি।" জগদীশ বাবু বঙ্কিম বাবুর পরম বন্ধু ছিলেন। জগদীশ বাবুর সূত্রেই বঙ্কিম বাবুর সহিত প্রফুল্ল বাবুর প্রথম আলাপ হয়। সেই হইতেই প্রফুল্ল বাবু বঙ্গদর্শনে "বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত" লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই প্রবন্ধ যেমন গভীর গবেষণাপূর্ণ, তেমনই সার ও শিক্ষাপ্রদ। কালে এই অপূর্ব্ব প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

এই সময়ে প্রফুল্লবাবু বম্বের এক খানি ইংরেজী কাগজে গোটা দুই প্রবন্ধ লিখেন। সেই প্রবন্ধ দেখিয়া, অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া, বাঙ্গলার তদানীন্তন পোষ্ট মাষ্টার জেনারল গ্রিবল সাহেব,—কথা প্রসঙ্গে এক দিন বঙ্কিম বাবুকে ঐ প্রবন্ধের লেখক কে, জিজ্ঞাসা করেন। বঙ্কিম বাবু বলেন, "লেখক তোমারই অধীনে একজন পোষ্ট মাষ্টার।" এই বলিয়া প্রফুল্ল বাবুর পরিচয় দেন। শুনিয়া গুণজ্ঞ গ্রিবল সাহেব বলেন যে, "এরূপ লেখক এখনও একজন সামান্য পোষ্ট মাষ্টার,—ইহা পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্টের পক্ষে অতি লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয়।" গ্রিবল সাহেব কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াই কিছু দিনের মধ্যে প্রফুল্ল বাবুকে "সুপারিন্টেন্ডেণ্ট অব পোষ্ট আপিস" পদে উন্নীত করেন। তখন প্রফুল্ল বাবু পঁচিশে পদার্পণ করিয়াছেন মাত্র। এত অল্প বয়সে এবং এত শীঘ্র এরূপ পদোন্নতি প্রায়ই দেখা যায় না। অধিকন্তু এত অল্প বয়সে আর কোন বাঙ্গালীই এই পদ পান নাই। অবশ্য, ইহা গুণবান্ প্রফুল্লচন্দ্রের সম্যক গুণেরই পরিচয়।

এখনও প্রফুল্ল বাবু সেই পদেই আছেন। তবে এখন তিনি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছেন; বেতন হইয়াছে,—মাসিক পাঁচ শত টাকা। পাঠক,—সেই দরিদ্র, উদরান্নে লালায়িত,—বালক প্রফুল্লচন্দ্রকে এখন একবার স্মরণ করুন। সেই কুড়ি টাকা বেতনের কেরাণী প্রফুল্লচন্দ্রকে এখন একবার ভাবুন;—অনেক শিখিবেন, অনেক বুঝিবেন, অনেক সারসংগ্রহ করিবেন। আমাদের সম্পূর্ণ আশা আছে, প্রফুল্ল বাবুর পদ ও বেতনের আরও বৃদ্ধি হইবে, তাঁহার আরও উন্নতি হইবে। কারণ তাঁহার ন্যায় যোগ্য লোক পোষ্টাল বিভাগে বিরল।

উন্নতি হইবেই বা বলি কেন? ঐ যে আমাদের আশা সফলা হইবার সূচনা হইয়াছে! ঐ যে, গত বর্ষে পূর্ব্ববঙ্গ বিভাগে, প্রফুল্লচন্দ্র আড়াই মাসের জন্য ডেপুটী পো[...]ার মাষ্টার জেনারেলের পদে একটিনী করিতে গিয়াছিলেন [...] তে কর্ত্তৃপক্ষ ঐ পদে তাঁহাকে স্থায়ী করিবেন, এমন আশা [...] রয়া দিয়াছেন। না দিবেন কেন,—গুণজ্ঞ ইংরেজ রাজ-পু[...] সেই যে, চিরদিন গুণেরই আদর করিয়া থাকেন। প্রফুল্ল চিরদিন প্রশংসার সহিত সরকারী কাজ করিয়া [...] যে কথা তেছেন; [...] কাগজ পত্রেও তাহার নিদর্শন [...] তারতম্য

বঙ্গদর্শনে "বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত" প্রবন্ধ লেখার পর, প্রফুল্ল বাবু ঐ বঙ্গদর্শনেই "গ্রীক ও হিন্দু" নামে দ্বিতীয় প্রবন্ধ লিখেন। ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া পণ্ডিতসমাজ এক বাক্যে প্রফুল্ল বাবুর গুণ-গান করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রবন্ধকার সে প্রশংসায় আত্মহারা হইলেন না;—পরন্তু তিনি সেই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ বহু বিস্তৃত ও বিশাল করিয়া সম্পূর্ণ নূতন অবয়বে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলেন। দেশে ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল,—এই এক গ্রন্থেই প্রফুল্ল বাবু ভারত-বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। ফলতঃ "গ্রীক ও হিন্দুর" ন্যায় অসাধারণ গবেষণাপূর্ণ, চিন্তা ও ভাবুকতাপূর্ণ মৌলিক তত্ত্বগ্রন্থ,—বাঙ্গলা সাহিত্যে সুদুর্লভ। শুধু বাঙ্গলা সাহিত্যেই বা বলি কেন,—যে কোন সাহিত্যে এ ধরণের গ্রন্থ সুদুর্লভ এবং যে কোন সাহিত্যে ইহার প্রতিযোগী গ্রন্থ কম আছে। হায়! আজ যদি এই "গ্রীক ও হিন্দু" গ্রন্থ ইংরেজী কি আর কোন ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত হইত, তাহা হইলে প্রফুল্ল বাবুর যশঃ-ধ্বনি আজ দিক্ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিত। সংস্করণের পর সংস্করণ হইয়া আজ "গ্রীক ও হিন্দু" লোকের ঘরে ঘরে বিরাজ করিত! কিন্তু দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশ,—এখানে গুণের পূজা নাই। তাই প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় একজন প্রতিভাবান্ মৌলিক লেখককে আজিও দাসত্বে ব্রতী থাকিতে হইয়াছে। আর তাহার ফলে, দুর্ভাগ্য দেশও কত অমূল্য চিন্তা ও ভাবরূপ মণিমাণিক্যে বঞ্চিত হইতেছে।

"গ্রীক ও হিন্দু" অতি প্রকাণ্ড বিশাল গ্রন্থ। শুধু আকারে ও প্রকারে বিশাল নহে,—ভাবে, চিন্তায় ও উদ্ভাবনায়,—সর্ব্বাংশেই বিশাল। আবার বলি, এরূপ বিশাল মৌলিক গ্রন্থ যে কোন সাহিত্যে স্থান পাইত, সেই সাহিত্যই গৌরবান্বিত হইত!

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, আর স্থান নাই। বারান্তরে, স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে, এই অপূর্ব্ব "গ্রীক ও হিন্দু" গ্রন্থের বিস্তৃত সমালো[...] বলিয়া [...]হারাণীর প্রজার পক্ষে এরূপ গৌরবের রাখি, এই গ্র[...]ই। কিন্তু ভারতের বড় লাট হইলে যাহা মনস্বী ব[...] হইবে, তাহাও আমার স্থির করা আছে। আমি সুতরাং [...] করিয়াছি ভারতে গিয়া আমাকে মহারাণীর আধিপত্য কি[...] অক্ষুণ্ন রাখিতে হইবে। কিন্তু জানিয়াছি, ভারতের সর্ব্বত্রই —কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত সকলস্থানেই—সকল জাতি সকল সম্প্রদায়েরই মহারাণী—ভারতেশ্বরী—অসীম-ভক্তিভাজন। মহারাণীর নামেই ভারতের আবালবৃদ্ধবণিতা যত লোকে মুগ্ধ। মহারাণীর নামই ভারতীয় একতার হেতু; তাঁহার নামেই এক মোহিনী শক্তি নিহিত রহিয়াছে। ভারতের যত লোকেরই দৃঢ় বিশ্বাস, মহারাণীর রাজ্যে ন্যায়পরতা অকুণ্ঠিত; তাঁহার গবর্ণমেণ্টকে নিজের সুনাম নিষ্কলঙ্ক করিয়া রাখিবার চেষ্টা দেখিতেই হয়। সকলেই জানে, মহারাণীর রাজ্যে রাজশক্তি যেরূপ প্রবলা, দয়া ক্ষমাও সেইরূপ। অতএব, বড় লাটের প্রধান কর্ত্তব্য,

প্রফুল্ল বাবুর এই "গ্রীক ও হিন্দু" গ্রন্থের একটি মাত্র বিশেষত্ব ও নূতনত্বের কথা এখানে উল্লেখ করিব। "কর্ম্ম-ক্ষেত্র' পরিচ্ছেদে প্রফুল্ল বাবু যে, শক্তির আঁকাবাঁকা গতি,—পজিটিব ও নেগেটিব গুণের প্রবাহে সৃষ্টি,—পজিটিব নেগেটিবের আক্রমণেই বিকার এবং বিকারই হৃষ্টি বলিয়াছেন, সম্প্রতি অধ্যাপক ক্রুকসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায়, তাহাই সপ্রমাণ হইতে চলিয়াছে। তাই বলিয়াছি, এ গ্রন্থ আজ যদি ইউরোপীয় কোন ভাষায় লিখিত হইত, তাহা হইলে দেশে একটা হুলস্থুল পড়িয়া যাইত।

প্রফুল্ল বাবুর প্রথম গ্রন্থ,—"বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত"; দ্বিতীয় গ্রন্থ "মণিহারী"। ইহা ব্যতীত নানা মাসিক পত্রিকায় তাঁহার যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, সে গুলি সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে, ৪।৫ শত পৃষ্ঠার একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হয়।

কয়েক বৎসর হইতে "তত্ত্ব-চিন্তামণি" নামকরণ করিয়া, প্রফুল্ল বাবু একখানি মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক মৌলিক গ্রন্থ লিখিতেছেন। শুনিয়াছি, সেই গ্রন্থ খানি "গ্রীক ও হিন্দুর" প্রায় চতুর্গুণ বড় হইবে। আমাদের সম্পূর্ণ আশা আছে, সেই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, "গ্রীক ও হিন্দুর" ন্যায় বাঙ্গলা সাহিত্য-ভাণ্ডারে আর একখানি অমূল্য ও বিশাল গ্রন্থ স্থান পাইবে।

"বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত" প্রথম বঙ্গদর্শনে এবং তৎপরে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা অসম্পূর্ণ। সেই অমূল্য প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করিয়া, প্রফুল্ল বাবু ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি খানি হারাইয়া গিয়াছে। ইহা গল্প বা উপকথা নহে যে, পুনরায় তিনি লেখনী ধারণ করিয়া কৃতকার্য্য হইবেন! হায় সেই অমূল্য পাণ্ডুলিপির অন্তর্ধানের সহিত বাঙ্গলা সাহিত্য [illegible] হৃদয়ে [illegible] হইল। কারণ এ বয়সে ছিল, ২৬।২৭ বৎসর বয়সের সময় তাহা [illegible] পুনরায় লিখিয়া সংশোধিত ও বিশুদ্ধ হয়। সুতরাং বলিতে হ[illegible] বাবুর জীবনের উপর তাঁহার স্ত্রীর প্রভাব বড় বেশী [illegible] প্রবন্ধ সেই সতীসাধ্বী সহধর্ম্মিণীর গুণেই, তিনি ইহ-সংসারে [illegible] শত কিছু করিতে সমর্থ হন। এরূপ পত্নীভাগ্য সংসারে ব[illegible] বিরল। প্রফুল্ল বাবুর পত্নী,—আদর্শ পত্নী।

ইংরেজী বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, তত্ত্বগ্রন্থ,—প্রফুল্ল বাবুর কোন গ্রন্থই পড়িতে বাকী নাই। ইংরেজ লেখকগণের মধ্যে, সর্ব্বাপেক্ষা তিনি কার্লাইলের অধিক পক্ষপাতী। কারণ এই কার্লাইল পাঠেই তাঁহার উচ্চ চিন্তার অধিকার হয়, এবং তত্ত্ববিষয়ে দৃষ্টি পড়ে।

এইবার প্রকৃতির প্রিয়-পুত্র প্রফুল্লচন্দ্র,—সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পণ্ডিত ভৈরবচন্দ্র ন্যায়ভূষণ নামক জনৈক অধ্যাপককে নিযুক্ত করিয়া, তিনি সংস্কৃত

যদি একটি বাঙ্গালী সন্তানও মানুষ হয়, তবেই আমাদের লেখনী সার্থক হইবে। ফলতঃ; এমন ঘটনাময়, শিক্ষাময়, এবং বৈচিত্র্যময় জীবনী আমরা অল্পই লিখিয়াছি।

* * *

—পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। নিবাস সিঙ্গুর গোপালনগর, জেলা হুগলী। মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমে জামালপুরে রেল আফিসে চাকরী করেন; তথা হইতে ভাগলপুরে কমিশনার আফিসে কেরাণীগিরি চাকরী পান। ভাগলপুর হইতে পাটনা-বাঁকীপুরে ঐ কমিশনার আফিসে বদলী হন। বাঁকীপুর হইতে বর্দ্ধমান কমিশনার আফিসে আসেন। এখন চুঁচড়ায় কমিশনার আফিসে আছেন। ইনি খড়দহ মেল যোগেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান,—কুলীন ব্রাহ্মণ। "হাবড়া হিতকরী" পত্রিকার,—মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিয়মিত লেখক ছিলেন। পরে 'ধর্ম্ম প্রচারক" মাসিক পত্রে অনেক ধর্ম্ম-প্রবন্ধ লিখেন। সে গুলি সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে ছাপিলে এক খানি বড় গ্রন্থ হয়। ইনি বিখ্যাত বাগ্মী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের কিশোর কালের বন্ধু। তাঁহার সকল কাজেই ইনি বিশেষ পরিশ্রম করিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। যে যে স্থানে কর্ম্ম-উপলক্ষে গিয়াছেন, সেই সকল স্থানেই হরিসভা, সুনীতি-সভা আদি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথাকার আব-হাওয়া যেন বদলাইয়া দিয়াছেন;—লোকের মতি গতি সম্যক প্রকারে ফিরাইয়া দিয়াছেন। ইঁহার ন্যায় আচারবান্ ধর্ম্মভীরু শান্ত সংযতচিত্ত সুধী ব্যক্তি,—বিরল। বয়স অনুমান পঁয়তাল্লিশ বৎসর।

* * *

—পূর্ণানন্দ সেন গুপ্ত, এম-এ। নিবাস হুগলী গুপ্তি-পাড়া। বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর। ইনি,—বিখ্যাত বাগ্মী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সুলেখক ও সুধী। "সুনীতি" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন; 'ধর্ম্ম প্রচারক" পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। ইহাঁর স্বভাব নির্ম্মল।

বড় লাটের ভালবাসা।

মিষ্ট কথায় রুষ্টও তুষ্ট হয়। যে সদাই তুষ্ট, সে ত মিষ্ট কথায় মোহিত হইবেই। সে ত সেই কথায় কথককে ইষ্ট বলিয়া মনে করিবেই। প্রভুর মিষ্ট কথায় ভৃত্য গলিয়া [illegible]য়, রাজার মিষ্ট কথায় প্রজা ঢলিয়া পড়ে; বড় লাটের [illegible]ষ্ট কথায় ভারতের ভক্ত প্রজা যে, সকল দুঃখ ভুলিয়া [illegible]ইবে, তাহা ত বিচিত্র নহে। মানুষ মিষ্ট কথার গোলাম। [illegible]কে ভাল বাসি, ভক্তি করি, তাঁহার মিষ্ট কথা আমা-[illegible]ক্ষে কত মিষ্ট, তাহা বুঝিয়া দেখা ত কঠিন নহে। [illegible]র পুরাতন বড় লাট লর্ড এলগিন শি[illegible]দার বক্তৃতায়

সে দিন বলিয়াছিলেন, "আমরা তরোয়ালের জোরে ভারত লইয়াছি, তরোয়ালের জোরেই আমাদিগকে ভারত দখলে রাখিতে হইবে।" কথায় অনেকে ব্যথিত হইয়াছিলেন।

"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ
ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।"

অনেকে লর্ড এলগিনের কথার যাথার্থ্য লইয়া বিবাদ করিতেছেন। বলিতেছেন, "ইংরেজ ভারত তরোয়ালের জোরে দখল করেন নাই; ভারতের সকল লোকে যদি প্রতিকূল হইত, তাহা হইলে, ইংরেজ ভারত দখল করিতে পারিতেন না। ইংরেজ প্রথম হইতেই মাছের তৈলে মাছ ভাজিয়াছিলেন, ভারতের সৈন্য লইয়াই ভারত দখল করিয়াছিলেন। ভারতের অধিকাংশ লোকেই ইংরেজের অনুকূল হইয়াছিল, ইংরেজকে ভাল বাসিয়াছিল, তাই ইংরেজ সহজে ভারত দখল করিতে পারিয়াছিলেন। অতএব, লর্ড এলগিন যে, বলিতেছেন, ভারত তরোয়ালে দখল করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে; তাহা ইতিহাসের অনুমোদিত নহে।"

আমরা কিন্তু এরূপ বাদ বিবাদে অনুমোদন করি না। "ইংরেজের তরোয়ালে জোর আছে, দেখিয়াই ভারতের লোকে তাঁহার আশ্রয় লইয়াছিল, মুসলমান মাহরাষ্ট্রাদির বিরুদ্ধে, তাঁহার সাহায্য করিয়াছিল," ইহা আমরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। আর সুতরাং লর্ড এলগিনের "তরোয়ালের জোরে" অনুমোদন করিতেও অসম্মত নহি। কিন্তু তাঁহার শেষবাক্যে—"তরোয়ালের ভারত তরোয়ালেই বজায় রাখিতে হইবে"—এই বাক্যে আমরা প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহি। ভারতের ত্রিশ কোটি লোকে শুদ্ধ ইংরেজের তরোয়ালের ভয়ে বশীভূত আছে, ভক্ত হইয়াছে, ইংরেজকে ভাল বাসিয়াছে, ইহা ত আমরা কিছুতেই মনে করিতে পারি না। ভয়ে ভক্তি আসে না, ভালবাসা চাই; ভালবাসা ভয়ে হয় না। সুতরাং পুরাতন বড় লাট এলগিনের কথায় অনুমোদন না করিয়া আমরা নূতন বড় লাট লর্ড কুর্জ্জনের কথায় অনুমোদন করিতেছি। তিনি বরাবরই বলিতেছেন, "ভারতকে বড় ভাল বাসি বলিয়াই আমি আনন্দসহকারে ভারতের ভার লইয়াছি। ভারত অস্ত্রে অধিকৃত বটে, কিন্তু ভারতবাসীর স্নেহ ভালবাসা ভক্তি শ্রদ্ধার' গুণেই আমরা ভারত দখলে রাখিতে পারিয়াছি; দখলে রাখিতে পারিব।" বলিতেছেন, "ভারতের লোকের সংস্কার বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখিতে হইবে; যাহাতে ভারতবাসীর আচার ধর্ম্মে আঘাত না লাগে, তাহা করিতে হইবে; যাহাতে ভারতবাসীর ভক্তি শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ন থাকে, তাহার মত করিয়া আমাদিগকে ভারতে রাজত্ব করিতে হইবে। তবেই আমরা ভারত বরাবর দখলে রাখিতে পারিব।"

লর্ড কুর্জ্জন অনেকবার অনেক বক্তৃতায় যে কথা কহিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ। ভাষায় তারতম্য থাকিলেও মর্ম্মে তারতম্য নাই। বল দেখি, লাটবাক্যের এইরূপ মর্ম্মে আমাদের মর্ম্ম কেমন শীতল হইয়াছে! লর্ড কুর্জ্জন বাল্যে ঈটনস্কুলে বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন। বিলাতের অনেক বড় লোকেই ঈটনের ছাত্র। হরেস-ওয়ালপোল, বলিংব্রোক, কবিবর গ্রে, হেলাম, শেলি, ওয়েলিংটন, পিট, কেনিং, ফক্স, মিলম্যান, গ্লাডষ্টোন, লবক, সল্‌সবেরি, রোজবেরি, লর্ড কোলরিজ প্রভৃতি অনেক বড় লোকেই ঈটনে বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন। ঈটনে পড়িয়া পরে গণ্য মান্য হইয়াছেন, এরূপ অনেক মহোদয় মধ্যে লর্ড কুর্জ্জনকে ভোজে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। লিবারেল রোজবেরি কন্‌সার্ব্বেটিব কুর্জ্জনের সমাদরসভায় সভাপতি হইয়াছিলেন; তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। উত্তরে নবলাট কুর্জ্জন ভারত-কথা কহিয়াছিলেন, আর নিজের নিয়োগের কথাও কহিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন; "আমার নিয়োগ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা কহিয়াছেন। কেহ আমার উচ্চ আশায় ইঙ্গিত করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন, পার্লেমেণ্টের উচ্চপদ রুদ্ধ বলিয়াই আমি হতাশ হইয়া ভারতের বড় লাট হইলাম; কেহ বলিতেছেন, শরীর ভগ্ন হইয়াছে বলিয়াই বিলাত ছাড়িয়া—স্বদেশ ছাড়িয়া—ভারতে যাইতেছি। কিন্তু আমি নিজে বলিতেছি, ভারতকে বড় ভাল বাসি বলিয়াই আনন্দসহকারে ভারতের ভার লইয়াছি; ভারতের যত লোককে ভাল বাসি বলিয়াই ভারতের ভার লইয়াছি; ভারতের পুরাবৃত্ত ভাল বাসি, ভারতের শাসনপ্রণালী ভাল বাসি, ভারতের গূঢ় সভ্যতা ভাল বাসি, ভারতীয় জীবনকে ভাল বাসি; তাই আমি আহ্লাদপূর্ব্বক ভারতের ভার লইয়াছি। ১৮৮৮ সালে ভারতে গিয়াছিলাম, সেই অবধিই ভারতীয় অনুরাগে মোহিত হইয়াছি। বলিতে কি, ভারতের পবিত্রতায় আমি মোহিত হইয়াছি। ভাবিয়া চিন্তিয়া বুঝিয়াছি, ভারতের কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার মত গৌরব আর কিছুতেই নাই; মহারাণীর প্রজার পক্ষে এরূপ গৌরবের কাজ আর নাই। কিন্তু ভারতের বড় লাট হইলে যাহা করিতে হইবে, তাহাও আমার স্থির করা আছে। আমি স্থির করিয়াছি ভারতে গিয়া আমাকে মহারাণীর আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখিতে হইবে। কিন্তু জানিয়াছি, ভারতের সর্ব্বত্রই—কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত সকলস্থানেই—সকল জাতি সকল সম্প্রদায়েরই মহারাণী—ভারতেশ্বরী—অসীম-ভক্তিভাজন। মহারাণীর নামেই ভারতের আবালবৃদ্ধবণিতা যত লোকে মুগ্ধ। মহারাণীর নামই ভারতীয় একতার হেতু; তাঁহার নামেই এক মোহিনী শক্তি নিহিত রহিয়াছে। ভারতের যত লোকেরই দৃঢ় বিশ্বাস, মহারাণীর রাজ্যে ন্যায়পরতা অকুণ্ঠিত; তাঁহার গবর্ণমেণ্টকে নিজের সুনাম নিষ্কলঙ্ক করিয়া রাখিবার চেষ্টা দেখিতেই হয়। সকলেই জানে, মহারাণীর রাজ্যে রাজশক্তি যেরূপ প্রবলা, দয়া ক্ষমাও সেইরূপ। অতএব, বড় লাটের প্রধান কর্ত্তব্য,

যাহাতে মহারাণীর রাজশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার চেষ্টা করা। তাহার পর, বড় লাটকে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে, ভারতের লোকে বিলাতের লোক নহে; সুতরাং তাহাদিগের মনোগত অভিলাষাদির মর্য্যাদা রাখিয়া, তাহাদিগের সংস্কারের (লর্ড কুর্জ্জন প্রেজুডিস পদের ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার মতে যাহা প্রেজুডিস আমাদের মতে হয়ত তাহা প্রেজুডিস নহে।) গৌরব রাখিয়া, তাহাদের যত সন্দেহ সংশয়ের পর্য্যন্ত আদর করিয়া, তবে বড় লাটকে ভারতের কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা যত ভারতবাসীকে অনুরক্ত করিয়া রাখিতে পারিব।" কাজের কথা,—কথকেরও গুণের কথা এইখানেই সাঙ্গ হইল। ভারতের শিক্ষা সভ্যতাদির কথাও লর্ড কুর্জ্জন কহিয়াছেন, উন্নতি বিস্তৃতির আশা দিয়াছেন। সীমান্তবৃদ্ধি সম্বন্ধেও দুই কথা কহিয়াছেন। কিন্তু এ সকল কথায় আমাদের ততটা সম্বন্ধ নাই, কহিতে বসিয়াছি, নবলাটের ভালবাসার কথা; তাঁহার সেই কথাই পাঠককে শোনাইয়া দিলাম। তিনি যে, ভারত ও ভারতবাসীকে এখন বড় ভাল বাসেন, তাহাই দেখাইয়া দিলাম। পুরাতন লাট এলগিনের বাক্যে আর নূতন লাট কুর্জ্জনের বাক্য তুলনা করিলেই তারতম্য বুঝা সহজ হইবে। এখন কেবল কথারই তুলনা হইতেছে, কাজের তুলনা হইতে পারে না। লর্ড এলগিনের কাজ ফুরাইয়া গিয়াছে, লর্ড কুর্জ্জনের এখনও প্রকৃত প্রস্তাবে সুরু হয় নাই। যখন তাঁহার কাজ দেখিব, তখন কাজের তুলনা করিতে পারিব; এখন সে অবসর হয় নাই, এখন কেবল কথার কথা।

কিন্তু কথারও মূল্য আছে। লর্ড এলগিনের শেষকথা, লর্ড কুর্জ্জনের প্রথম কথা। এই জন্যেই ত অধিক বৈচিত্র্য! প্রজা রাজার সন্তান, বড় লাট ভারতের রাজা। পাঁচ বৎসর লালন পালনের পর বড় লাট এলগিন যাইবার সময়ে বলিয়া ফেলিলেন,"তরোয়ালে লব্ধ ভারতরাজ্য তরোয়ালেই রক্ষণীয়!" কথাটা ভক্ত সন্তানের ভাল লাগিবে কেন? "ভারতকে তরোয়ালের জোরে বজায় রাখিতে হইবে।" এ কথার অর্থই হইতেছে, "ভারতের যত প্রজাকে তরোয়ালের জোরে বশীভূত রাখিতে হইবে।" যাহারা ভারতেশ্বরীকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া মনে করে, ভারতের বড় লাটকে যাহারা সেই দেবতার পূর্ণ অবতার বলিয়া মনে করে, ভারতের যত বৃটিশ রাজপুরুষকে দেবদূত বলিয়া মনে করে, লর্ড এলগিনের কথা তাহাদের মনে—সেই ত্রিশ কোটি ভক্তের মনে—কিভাবে আঘাত করিয়াছে, সহৃদয় বড় লাটেরই ত তাহা বুঝা উচিত ছিল। আর নূতন লাট কুর্জ্জনের ঐ কথাগুলি ভক্ত ভারতবাসীর হৃদয়কে কিরূপ শীতল করিয়াছে, তাহাও ত সহৃদয় লর্ড এলগিনের না বুঝা উচিত নহে।

যিনি ত্রিশ কোটি লোকের পালক চালক, তাঁহার কথার মূল্য অনেক। অথচ জানি, লর্ড এলগিনের মত সহৃদয় লোক অল্পই আছেন। আমরা শুনিয়াছি, তিনি প্রাণান্তেও কাহাকেও মনঃকষ্ট দিতে সম্মত নহেন। এই জন্যেই ত বৈচিত্র্য! আমাদের মনে হয়, শিমলার বৈঠকী বক্তৃতায় বড় লাটের একটু রসনাস্খলন হইয়া গিয়াছিল। মনে হয়, যাহা বলা অভিপ্রেত ছিল না, তিনি হটাৎ তাহাও বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। মনে হয়, কথার জন্যে সহৃদয় লর্ড এলগিন নিজেই মনে মনে অনুশোচনা করিয়াছেন। তাই আমরা হৃদয়ে শুদ্ধ বিস্ময়কেই স্থান দিয়াছি, বেদনাকে স্থান দিই নাই।

আমরা আশা করিতেছি, লর্ড কুর্জ্জনও ভারতে থাকিয়া কথায় কাজে এক করিবেন; আশা করিতেছি, বিলাতে থাকিয়া ভারত ও ভারতবাসীর প্রতি যে ভালবাসা দেখাইয়াছিলেন, ভারতে বসিয়া তাহার মাত্রা বাড়াইয়া দিবেন। আশা করিতেছি, দূরের অনুরাগ নিকটে শতগুণ হইবে; আশা করিতেছি, বিশ্বাস করিতেছি—ভারতে বসিয়া—লর্ড কুর্জ্জন ভারতকে নিজের বিলাতের অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিবেন; যত ভারতবাসীকে নিজের বিলাতবাসী অপেক্ষাও অধিক স্নেহ মমতা করিবেন।

বিলাতের তিনি বড় লাট নহেন, ভারতের বড় লাট; ভারতেশ্বরী নিজে আসিতে পারেন না, তাই তাঁহাকে ভার দিয়াছেন। তিনি ভারতের রাজপ্রতিনিধি, কার্য্যতঃ ভারতের রাজা। ভারত হইল তাঁহার রাজ্য, ভারতের ত্রিশ কোটি প্রজা হইল তাঁহার পুত্র কন্যা। তিনি ছিলেন বিলাতের কুর্জ্জন, ভারতের জন্যেই হইয়াছেন লর্ড কুর্জ্জন। বিলাতে ভারতে সুতরাং তাঁহার পক্ষে প্রভেদ অনেক, বিলাতবাসী ও ভারতবাসীরও তাঁহার পক্ষে প্রভেদ অনেক। ভারতকে তাঁহার বিলাতের অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেই হইবে, ভারতবাসীকেও তাঁহার বিলাতবাসীর অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতে হইবে। আবার ভারতের মত ভক্ত প্রজা জগতের আর কুত্রাপি নাই। একে সন্তান তায় পরম ভক্ত; লর্ড কুর্জ্জনকে ভারতে থাকিয়া ভারতের ও ভারতবাসীর একান্ত অনুরাগী হইতেই হইবে। ব্যতিক্রম হইলেই বিস্ময়ের একশেষ হইবে। তিনি যে, আসিবার পূর্ব্বে বিলাতের অনেক সভায়—অনেক বক্তৃতায় আমাদিগের আশা বাড়াইয়া দিয়াছেন, নিজের ভারতপ্রেমে আমাদিগকেও মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন! ঈটনের ভোজে যে সুর ধরিয়াছিলেন,যত ভোজেই ত লর্ড কুর্জ্জন সেই সুরই বজায় রাখিয়াছিলেন। একটা বক্তৃতার আভাস দিয়াই সুতরাং আমরা কার্য্যতঃ যত বক্তৃতারই আভাস দিলাম। আসরের ভিন্নতা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার ভারত-মঙ্গলের গানে ত ভিন্নতা হয় নাই!

মদের ভোট।

মদের ঘোঁট হয়, কিন্তু ভোট দেখিয়াছ কি? মদের দোষগুণবিচার করিতে বসি নাই। দ্বাদশবিধ মদ্যের পরিচয় দিতেও প্রবৃত্ত হই নাই। মদ যে, হয় নানা দ্রব্যের, তাহা জানা আছে সকলের; মদের সুখ দুঃখ ভুক্ত না থাকিলেও নামগুলা জ্ঞাত থাকিতে পারে। আর নিজের ভোগে শিক্ষা না হইলেও ত পরের ভোগে শিক্ষা হয়। যে ঠেকিয়া শেখে, সে ত বুদ্ধিমান নহে, যে দেখিয়া শেখে, সেই ত বুদ্ধিমান। এদেশে এখন আর দ্বাদশবিধ মদ্যের চলন নাই। মাধ্বীক বা মৌয়ার চলন আছে মেদিনীপুর বীরভূম বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে; যেখানে মৌয়া জন্মে, সেইখানেই মৌয়ার মদ প্রস্তুত হয়। খাস বঙ্গের অধিকাংশ স্থানেই মউয়ার অভাব। সুতরাং অধিকাংশ স্থানেই গৌড়ীর চলন; গুড়ে হয় বলিয়াই সুরা গৌড়ী। পচা কোতরা গুড় জ্বালে চড়াইয়া তাহার বাষ্প নল দিয়া পাত্রস্থ করিতে হয়। পাত্রস্থ বাষ্প শীতল হইলেই মদ্য হয়। রমও গৌড়ী, ধান্যেশ্বরী উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু সাঁওতালসমাজে পৈষ্টী আছে। ইহাকেই বলে পচাই, পচা ভাতে হয় বলিয়া পচাই। মধুচক্রের মধুকেও মদ্যে পরিণত করা যায়, নাম মাধুক। মৌরীর মদ হয়, মৈরেয়; ইংরেজের আনিস। খেজুর ও তালের তাড়ী মদ্যবিশেষ। নারিকেল জলেও মদ্য হয়, এই জন্যেই অশাক্ত এবং বিধবাদিগের পক্ষে কাঁসার পাত্রে ডাবের জলও নিষিদ্ধ। কাংস্যপাত্রে অধিকক্ষণ থাকিলে নারিকেলজল মাদক হইয়া পড়ে। পনস বা কাঁটালেও মদ্য হয়, নাম পানস। কিন্তু দ্রাক্ষমদ্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শেরি শ্যাম্পিন প্রভৃতি ত দ্রাক্ষায় অর্থাৎ আঙ্গুরে প্রস্তুত হয়। এখন বটে খাঁটিদ্রাক্ষারসের মদ্য ইউরোপেও দুর্লভ। নানারূপ ভেল ভেজাল চলিত হইয়াছে। মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ, দ্রাক্ষাভাবে আলুকং; গোল আলুর ব্রাণ্ডী চারিদিকে। পোর্টের এখন অনেকস্থানেই গুড় প্রধান উপাদান, অনেক পোর্টই প্রায় গৌড়ী সুরা! কদম্বে কাদম্বরী হয়, বলরামের প্রিয় মদ্য। বিলাতে ধান্যেশ্বরী নাই, যবেশ্বরীর বড় আদর; হুইসকী যবে হয়। বীয়ার সুরামধ্যেই গণ্য নহে। কিন্তু বীয়ারেও যবের প্রয়োজন।

মদ্য পৃথিবীর আদ্য মাদক, চলিতেছে সত্যযুগ হইতে। নেশায় মানুষের আসক্তি আদিমকাল হইতে। অমরিকা আফরিকা প্রভৃতির আদিম অসভ্যদিগের ভিতরও পূর্ব্বে মাদকের ব্যবহার ছিল। তাহাতে কিন্তু উহাদের কোনরূপ দৈহিক ক্ষতি হইত না। ইউরোপ আমরিকার ব্রাণ্ডী হুইস্কী জীনই সর্ব্বনাশ করিয়াছে, অনেকস্থলেই বংশলোপ করিয়া দিয়াছে। বেদের সোমরসকে মদ্যমধ্যে না ফেলিলেও, মদ্য ভারতে চলিতেছে, সত্যযুগ হইতে। শাস্ত্রে সাহিত্যে প্রমাণ পাইবে।

পারস্যের সুধারস যে সিরাজ বা সুরারাজ, তিনিও আজিকার নহেন। উপকথায় নয় কথায়—মৌখিক ইতিহাসে—দেখিতে পাইবে, অতি পূর্ব্বকালে পারস্যের এক নরপতি ঔষধার্থক বিষের জন্যে দ্রাক্ষারস পচাইয়া জালায় পুরিয়া ভাণ্ডারস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাজভাণ্ডারে জালা জালা আঙ্গুররস সঞ্চিত ছিল। সকলেই জানিত, বিষের জালা। বিশ্বাস ছিল, যে খাইবে, সেই তৎক্ষণাৎ মরিবে।

ঐ নরপতির প্রধানা প্রিয়তমা এক সময়ে পতির ব্যবহারে মর্ম্মবেদনা পাইয়াছিলেন, সে দুঃখ কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন নাই। নরপতি অনেক সাধ্য সাধনা করিয়াও, অনেক মিষ্ট কথা কহিয়াও, মহিষীকে শান্ত করিতে পারেন নাই। তিনি আত্মঘাতিনী হইতেই কৃতসংকল্পা হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজভবনে আত্মহত্যার উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া বসিয়া ভাবিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ সেই বিষের জালাগুলা তাঁহার স্মৃতিপথে আসিয়া পড়িল, আর তিনিও তৎক্ষণাৎ জালার কাছে গিয়া জ্বালা জুড়াইতে সংকল্প করিলেন। রাজভাণ্ডারের চাবিটাও কোন সুযোগে হস্তগত হইয়া গেল! রাজা ত আর ভাবেন নাই যে. মহিষী—এত সুখ সমৃদ্ধি ছাড়িয়া আত্মহত্যা করিবেন; নারীচরিত্রে তাঁহার ততটা অভিজ্ঞতাও ছিল না।

"স্ত্রিয়শ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।"

আমরা পারস্যের রাজা হইলে, অগ্রে ভাণ্ডারের চাবি নিজের হাতে রাখিতাম। আফিনের কৌটাও ত হাত ছাড়া করিতে নাই।

যাহাই হউক, বিষভাণ্ডারের চাবি রাজমহিষীর হস্তগত হইল, আর তিনিও কালবিলম্ব না করিয়া এবং নির্জ্জনে ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার সুযোগ পাইয়া, ভাণ্ডারগৃহে গিয়া পড়িলেন; আর মনের সাধে মরিবার জন্যে দুই তিন পিয়ালা সেই দ্রাক্ষাবিষ উদরস্থ করিয়া ফেলিলেন। বিষ স্বাদেও মন্দ লাগিল না!

আর পায় কে! রাজমহিষী স্থির করিলেন, আর বড় বিলম্ব নাই। হয় ত তখন মনে অনুতাপ আসিয়া চিমটি কাটিতে লাগিল। হয় ত ঐহিক সুখের চিত্রটা তখন তাঁহার হৃদয়পটে উজ্জ্বলতরবর্ণে অঙ্কিত হইতে লাগিল। হইয়া থাকে, এরূপ অনুতাপ হইয়া থাকে। বিষপানান্তে অনেককেই আক্ষেপ করিতে দেখা গিয়াছে।

চারা নাই, অনুতাপে ফল নাই। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন। এখন "গতস্য শোচনা নাস্তি মৃতস্য মরণং যথা।" রাজমহিষীকে মরিতেই হইবে। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে কি মন অত প্রফুল্ল হয়? পারস্যপতির পত্নীর

মনে অত সুখের কেন উদয় হইতেছে? মুখে অত হাসি কেন? হাসির মাত্রা যে, ক্রমে বাড়িতে লাগিল! তিনি নৃত্যবিদ্যায় বিদুষী ছিলেন। পায়ে তাল পড়িতে লাগিল কেন? ভাণ্ডার ছাড়িয়া নিজের বৈঠকখানায় আসিয়াছেন। দুগ্ধফেননিভ পর্য্যঙ্কশয্যায় বসিয়াছেন। বদনবংশী দিয়া হঠাৎ সুমধুর সঙ্গীত বাহির হইতে লাগিল কেন? আত্মহত্যা কি এইরূপে হইয়া থাকে? হয় ত বা শাহ বাদশাহ নবাব সুবাদের মহিষীরা যখন আত্মহত্যা করেন, তখন এইরূপই হইয়া থাকে! হয় ত কিয়ৎকালের তরে গরল অমৃত হয়!

ওকি! গীত যে, চড়িয়া উঠিল; মদিরেক্ষণার মধুর কণ্ঠ যে, আরও মধুর হইল! সঙ্গীত যে, পারস্যপতির কর্ণে গিয়া সুধা ঢালিতে লাগিল! চেনা গলা, পরিচিত স্বর! নরপতি বুঝিতে পারিলেন, প্রিয়তমার কণ্ঠস্বর; বিস্মিত হইলেন! যাঁহার মানভঞ্জনের জন্যে প্রাণপর্য্যন্ত দিতে চাহিয়াছিলেন, যাঁহার বিমর্ষ ঘুচাইবার জন্যে পারস্য রাজ্য পর্য্যন্ত পরকে দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, যাঁহার মুখের এক কোণে,—অধরের একপ্রান্তে একটু হাসি দেখিবার জন্যে সর্ব্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞেরও আয়োজন করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না, যাঁহার অনুকূল কটাক্ষপাতের জন্যে নরপতি পদানত হইয়া পড়িয়া থাকিতেও ত্রুটি করেন নাই, আজ এমন সময়ে তিনি গান গাহিতেছেন! তাই কি বৈরাগ্যের গান! না শান্তিরসের সঙ্গীত! না দেবতার ভজন! সাক্ষাৎ বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার! গানেই বুঝা যাইতেছে, মহিষী মিলনের জন্যে পাগল হইয়াছেন।

তবে কি তিনি অন্যাসক্তা? তাই কি প্রিয়মিলনে বাধা পড়িয়াছিল বলিয়া বিমর্ষবিদ্ধা হইয়াছিলেন? এখন কি একেবারে লজ্জা সরমের মাথা খাইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিতেছেন? মানের ভয় প্রাণের ভয়ও ভুলিয়া গিয়াছেন! নরপতির ইঙ্গিতেই যে, রাজমহিষীর মুণ্ডপাত হইবে! কি সর্ব্বনাশ! এত সাহস! নরপতি সিদ্ধান্ত করিলেন, কুলটার অসাধ্য কাজ নাই। প্রথমে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল চিত্রার্পিতের মত রহিলেন, আবলম্বেই কিন্তু স্ত্রীহত্যার সংকল্প করিলেন। হঠাৎ আবার ভাবান্তর হইল কেন? কি আশ্চর্য্য! গানে যে, নরপতির নাম—বিরহ যে, প্রাণপতি নরপতির জন্যে! নরপতি বুঝিলেন, আমার জন্যেই বিরহ—আমার জন্যেই গান—আমার দর্শনাভিলাষিণী হইয়াই প্রেয়সী গান করিতেছেন। আর বিলম্ব কি সহ্য হয়? নরপতি তৎক্ষণাৎ সেই দিকে গেলেন, গিয়া দেখিলেন কিন্তু বিচিত্র দৃশ্য! দেখিলেন, মহিষীর মোহিনীমূর্ত্তি। মৃগনয়নার নয়ন হইয়াছে ঈষৎ রক্তাক্ত, কিন্তু চক্ষু পলকে পলকে বুজিতেছে, পলকে পলকে খুলিতেছে। বরাঙ্গ যেন ঢলিয়া পড়িতেছে, গান যেন ক্রমশঃ গড়াইয়া যাইতেছে, কথায় যেন জড়তা আসিতেছে। অথচ মুখকমল প্রফুল্ল। বসিয়া বসিয়া পায়ে তাল দিতেছেন। নরপতি প্রথমে বিস্মিত হইয়া পরে ভীত হইলেন। মনে করিলেন, হয় ত অতিবিমর্ষে মহিষী ক্ষিপ্তা হইয়াছেন। তাঁহার যত কাজই ত পাগলিনীর মত!

ক্রমে নরপতি পর্য্যঙ্কের দিকে অগ্রসর হইলেন। পা যে, চলে না; ভয়ে যে, দেহ জড়ীভূত হইতেছে! হঠাৎ মহিষীর নয়নপথে পড়িলেন। তিনিও টলিতে টলিতে ঢলিতে ঢলিতে আসিয়া প্রিয়তমকে জড়াইয়া ধরিলেন।—"আঁ—মি—মর—বো" এই কথা বলিতে বলিতে নরপতিকে লইয়া মহিষী পর্য্যঙ্কশায়িনী হইলেন।

পারস্যরাজ কিন্তু অনেক কষ্টে অনেক কৌশলে আলিঙ্গনভেদ করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রধানতম রাজকীয় চিকিৎসককে নিজে গিয়া সঙ্গে করিয়া আনিলেন; আনিতে আনিতে মহিষীর অবস্থার কথা তাঁহার জ্ঞাত করিলেন। চিকিৎসক আসিয়াও অবাক হইলেন। নাড়ী দেখিলেন, কথা কহিলেন। বাতুলতার লক্ষণ ত ঠিক এরূপ নহে; অনেক সাদৃশ্য আছে, অনেক বৈসাদৃশ্যও আছে। এ যে, নূতন ধরণের বাতুলতা! চিকিৎসক মহাশয় অনেকক্ষণ দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজমহিষীর সহিত চুপি চুপি কি কথা কহিলেন। বৃদ্ধ বিশ্বস্ত পুরাতন চিকিৎসক; রাজার আপত্তি হইবে কেন? কিন্তু তখন চিকিৎসকের পক্ষে চুপি চুপি কথা হইলেও ত রাজমহিষীর পক্ষে হইল না। তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া দিলেন।

"আর বিলম্ব নাই! এইবার বলি, আমি তোমার ভাণ্ডারের সেই জালা হইতে তিন পেয়ালা বিষ খাইয়াছি।" শুনিয়া রাজা যে, মূর্চ্ছিত হইলেন না, ইহা তাঁহার অপূর্ব্ব হৃদয়বলের পরিচায়ক। চিকিৎসকও জানিতেন, জালায় মহাবিষ। কিন্তু মহাবিষের মৃত্যু ত এত বিলম্বে ঘটে না! রাজমহিষী যে, অনেকক্ষণ বিষপান করিয়াছেন! যাহাই হউক, প্রতিকারের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। এদিকেও ক্রমে ক্রমে রাজমহিষীর ভাবান্তর হইতে লাগিল, ক্রমেই তিনি স্থির হইতে লাগিলেন। রাজা ও চিকিৎসক উভয়েই মনে করিলেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে স্থিরতা হইতেছে!

আর বড় বিলম্ব করিতে হইল না। রাজমহিষী স্থির হইলেন, কিন্তু মরিলেন না। ক্রমে স্বাভাবিক ভাবেরই আবির্ভাব হইল। একটু লজ্জিতাও হইলেন, জিব কাটিয়া বস্ত্রবিন্যাস করিয়া লইলেন। আর হঠাৎ রাজার সহিত বিবাদ মিটাইয়া ফেলিয়াছেন, অজ্ঞানের মাথায় নিজের মান নিজেই ভাঙ্গিয়া লইয়াছেন, ভাবিয়া একটু দুঃখিতও হইলেন। কিন্তু আর ত চারা নাই, এখন ত আর মান করা চলে না।

পর দিন হইতে জালার বিষের পরীক্ষা হইতে লাগিল। প্রথমে কৃতদাস কৃতদাসীদিগের উপর পরীক্ষা হইল, কেহই মরিল না, সকলেই আনন্দ করিল। ক্রমে সভাসদ পরিষদগণের উপর পরীক্ষা হইল। শেষে রাজা নিজেও পরীক্ষা করিলেন। সিদ্ধান্ত হইল, জালায় গরল নহে; অমৃতভাণ্ডে সুধা! সেই অবধি পারস্যরাজ্যে ঐ সুধার চলন হইল, এইরূপেই সিরাজ মদের আবিষ্কার হইল। দেবাসুরে মিলিয়া সাগরমন্থন করিয়াছিলেন, তাহাতেই অমৃতের আবির্ভাব হইয়াছিল। পারস্যেও দেব দেবীর বিবাদে রাজভাণ্ডারের জালা হইতে অমৃতের উৎপত্তি হইল, আর রাজকীয় চিকিৎসকই দেবকীর চিকিৎসক ধন্বন্তরির আসনে বসিলেন!

পারসীক সিরাজের ইতিবৃত্ত এইরূপ। কোন কোন কৌল হয় ত বলিবেন, আমাদের সেই সমুদ্রমন্থনেই সুরার উৎপত্তি হইয়াছিল; সুরাই সুধা। আর সুরার নামও ত সুধা বটে। চন্দ্র সুধাকর, বোধ হয় চন্দ্রকেই মদ চোলাই করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল; চন্দ্রলোকে দেবতাদের ভাঁটী বসিয়াছিল; আর রাশিভেদে মদ্যের ভেদ হইয়াছিল। দ্বাদশ রাশি, মদ্যও দ্বাদশবিধ। রাশিভেদেই ত জগতের সকল দিকে সকল বিষয়ে ভাল মন্দ হইয়া থাকে। অথবা চন্দ্র যে, প্রথমে দ্বাদশরাশির দ্বাদশ অধিষ্ঠাতৃদেবতাকে দ্বাদশবিধ মদ্য দেন নাই, তাহাই বা কিরূপে মনে করিব? পাত্রভেদে মদ্যের ভেদ হয়। পানপাত্র পায়িপাত্র, পাত্রও ত দ্বিবিধ। আর সিংহ বৃশ্চিকের যে মদ্য, মেষ বৃষের কি সে মদ্য চলিতে পারে? আবার মিথুনের মদ্যে ত সম্পূর্ণ পার্থক্যই হইতে হইবে।

সে যাহাই হউক, মদ্য এখন চলিতেছে, জগতের সর্ব্বত্র; স্বর্গে, মর্ত্তে, রসাতলে। কিন্তু আর সে সব কথায় কথা বাড়াইব না। এখন কথা হইতেছে, মদের ভোট লইয়া; আর ত ঘোঁট করা ভাল দেখায় না। মার্কিণ দেশের কানাডারাজ্যে সম্প্রতি মদের ভোট লওয়া হইয়াছে। অনেকে মদের লোপ করিতে চাহেন, ভাঁটী চোলাইখানা উঠাইয়া দিবেন; দোকান পাট বন্ধ করিয়া দিবেন; আমদানী রপ্তানী রহিত করিয়া দিবেন; রাজ্যে মদের নাম গন্ধ থাকিবে না; দান বিক্রয়ে দণ্ড হইবে, পানে ত হইবেই; দর্শনে ঘ্রাণে পর্য্যন্ত দণ্ড হইবে। অনেকের এইরূপ মত। আবার অনেকে বলেন, মদ্য না হইলে অদ্যও চলিবে না; বিনা মদে অনেক লোককে দেশত্যাগী হইতে হইবে; যে মদ্য সৃষ্টির আদি হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা রহিত করিতে যাওয়া বাতুলের কাজ!

এইরূপ মতভেদেই রাজ্য মধ্যে ভোট লওয়া হইয়াছিল। পার্লেমেণ্টের নির্ব্বাচনে যাঁহারা ভোট দিয়া থাকেন, মদ্যেও তাঁহারা ভোট দিয়াছিলেন। কানাডারাজ্যে ১২ লক্ষ ৩৩ হাজার ভোটার আছেন, কিন্তু মদ্য সম্বন্ধে ৫ লক্ষ ৪৩ হাজার লোকেই ভোট দিয়াছিলেন। অনেকেই উদাসীন ছিলেন বলিয়া ভোট এত কম হইয়াছিল। কমেও কিন্তু মদ্যবিরোধীদিগের জয় হইয়াছে; তাঁহাদের পক্ষে ১৩ হাজার ভোটের আধিক্য হইয়াছে।

পার্লেমেণ্টে বাগ্‌যুদ্ধ হইলে কিন্তু ভাবান্তর হইবে মদ্যপক্ষপাতী পক্ষেরই জয় হইবে। কানাডা বৈষ্ণবের দেশ নহে, যত ইউরোপীয়বংশজে কানাডা পূর্ণ। মদ্য ইহাদিগের পুরুষপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। এই মদ আইনের জোরে রহিত করা অসাধ্য। ব্যক্ত রহিত হইলে গুপ্ত চলিবে। আর গুপ্ত ব্যক্ত দুই রহিত হইলেই, রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে, রাষ্ট্রবিপ্লব হইবে। মদ্য যে, অনেকেরই মজ্জাগত! যাঁহারা রাজনীতির আড়াআড়ি দলাদলিতে পড়িয়া মদ্যরোধের পক্ষে ভোট দিয়াছেন, তাঁহাদিগের ভিতরও অনেক মদ্যপায়ী আছেন. হয় ত অনেক মাতালও আছেন! রাজনীতির বিরোধে আর ইচ্ছানীতির বিরোধে অনেক বিরোধ। দলাদলির ঝোঁকে পড়িয়া ইউরোপ আমরিকার লোকে খাদ্যরোধের পক্ষেও ভোট দিতে পারেন, মদ্যরোধ ত কোন ছার! তথাপি কানাডারাজ্যে এখনও মদের ভোটে ঘোঁট চলিতেছে। এখনও দলাদলির অভিনয় ভাঙ্গে নাই। প্রহসনে এখনও যবনিকাপতন হয় নাই! আমাদের কিন্তু এই খানেই হইল!

বোম্বেটে।

জলে স্থলে লোককে পূর্ব্বে দস্যুর উৎপাত উপদ্রব সহ্য করিতে হইত। জলে ছিল জলদস্যু, স্থলে ছিল স্থলদস্যু। যত জলদস্যু নৌকায় চড়িয়া দস্যুবৃত্তি করিত, যত নদী নদে খালে খাতে নৌকা মারিত; আবার তীরবর্ত্তী গ্রামে উঠিয়াও ডাকাতী করিত। ছিল তাহারা উভচর। জলদস্যুরাই বোম্বেটে বলিয়া পরিচিত ছিল। বঙ্গের এমন নদ নদী খাল খাত ছিল না, যেখানে বোম্বেটের উৎপাত ছিল না। লোকের নৌকায় যাতায়াত করা ভার ছিল, ব্যবসায়ীদিগকে মালের নৌকা লইয়া প্রাণ হাতে করিয়া থাকিতে হইত। মাঝী মাল্লাদিগকে আত্মরক্ষার জন্যে অস্ত্র শস্ত্রের ব্যবহার করিতে হইত। যত মাঝী মাল্লাই সড়কী বর্ষা চালাইতে জানিত, টেঁটা লইয়া বোম্বেটের সহিত যুদ্ধ করিত। পূর্ব্ববঙ্গের ও রাজসাহী অঞ্চলের নাবিকেরা একপ্রকার চক্রের ব্যবহার করিত, রজ্জুসংলগ্ন সেই সুদর্শন চক্রের ক্ষুরধারে অনেক জলদস্যুকে প্রাণ দিতে হইত। যেমন রোগ ছিল, তেমনই ঔষধও ছিল। কিন্তু দস্যুর দল পুরু হইলেই, নাবিকদিগকে বিপদে পড়িতে হইত। আরোহীদিগের ত কথাই ছিল না, দস্যুতরী দেখিলেই তাঁহাদিগকে হতবুদ্ধি হইতে হইত!

জলদস্যুরা দ্বিবিধ নৌকার ব্যবহার করিত; উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলের যত গাঙে ছিল ছিপ, আর দক্ষিণাঞ্চলে ছিল ছোট। ছিপ সরু সরু লম্বা লম্বা ডিঙ্গি; ষোল জন, চব্বিশ জন, বত্রিশ জন বাসয়া ছোট ছোট দাঁড় ফেলিত; সাধারণ

নৌকার দাঁড় নৌকায় বাঁধা থাকিত, ছিপের দাঁড় বাঁধা থাকিত না, দাঁড়ীদের হাতে থাকিত, নাম বটে। এখনও অনেক জেলেডিঙ্গি ও খিলা নৌকায় এইরূপ বটে দেখিতে পাওয়া যায়। ছিপ চলিত তীরবেগে। সেকালে অনেক সম্ভ্রান্ত লোকেরও ছিপ ছিল; দূরপথে অল্প সময়ে যাইবার জন্যে ছিপ রাখিতে হইত। মুরশিদাবাদের রাজস্ব যাইত ছিপে। নবাব সুবাবের ত কথাই নাই, জমিদার মহাজনদিগেরও ছিপ ছিল। তখন ষ্টীমারের রেওয়াজ ছিল না। মহিষাদলের রাজাদের বিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও ছিপ ছিল; সেই ছিপেই রাজকর্ম্মচারীদিগের কলিকাতায় যাওয়া আসা হইত; কখনও কখনও রাজাকেও ত কলিকাতায় আসিতে হইত। মহিষাদলের ছিপ অনেকেই দেখিয়াছেন।

উলুবেড়ের ওদিকে যত জলদস্যু ছোটের ব্যবহার করিত। ছোট এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য নৌকা যে পথ ২৪ ঘণ্টায় যায়, ছোট সেই পথ ছয় ঘণ্টায় যাইতে পারে। সাধারণ নৌকার তলাটা কাছিমপিঠে; ছোটের তলা ক্রমে সরু হইয়া গিয়াছে, যেন ইলিশ মাছ! দেখা যাইতেছে, খুব ছোটে বলিয়া ছোট। জাহাজের জালিবোটের তলা যেরূপ, ছোটের তলাও প্রায় সেইরূপ। যখন তমোলুকে ষ্টীমার যাওয়া আসা করিত না, জরুরি প্রয়োজন হইলে, তাড়াতাড়ি আসা যাওয়ার দরকার হইলে, তখন তমোলুকের ডেপুটি মুনসফ প্রভৃতিকে ছোটে আনাগোনা করিতে হইত। ছোট প্রায়ই একপেশে হইয়া ছোটে; ছোটে চড়া যাঁহাদের অভ্যাস নাই, তাঁহাদের প্রথম প্রথম একটু ভয় হয়; মনে হয় যেন ছোট ডুবিয়া গেল। কিন্তু ছোট প্রায় ডুবিতে জানে না। যেখানে অন্য নৌকা ডুবিয়া যায়, ছোট সেখানেও ডুবে না।

হুগলী নদীয়া প্রভৃতি জেলার বোম্বেটেরা আবার সাধারণ নৌকারও ব্যবহার করিত. কিন্তু বড় বড় নামজাদা জলদস্যুদিগের ছিপই বাহন ছিল। জলদস্যু রাজসাহী অঞ্চলে বড় অধিক ছিল। অনেক ভদ্রবংশের লোকেও দস্যুবৃত্তি করিতেন, অনেকে আবার দলপতি হইয়া দস্যুপোষণ করিতেন। ভাগীরথীতীরেও অনেক ভদ্রলোক বোম্বেটের কাজ করিতেন। কোন কোন লোকের দুই শত পাঁচ শত জলদস্যু অধীন থাকিত, চাকর থাকিত; কর্ত্তারা ফলভোগ করিতেন। রাজসাহী জেলার কোন কোন ধনবানের—কোন কোন জমিদারের—মূল খুঁজিলে দস্যুবৃত্তির সংস্রব দেখিতে পাওয়া যায়। হুগলি বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলার অনেককে আবার স্থলদস্যুর সংস্রবে পড়িতে হয়। ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর ভিতরই সেকালে দস্যুবৃত্তি বা দস্যুপোষণ ছিল। জলে স্থলে দস্যুবৃত্তি ও দস্যুপোষণ হইত। যশোহর অঞ্চলেও অভাব ছিল না; অনেক ভদ্র কায়স্থের মূলে বোম্বেটেগিরির গন্ধ পাইবে। মধুমতী নদীর ভিতর বোম্বেটের আড্ডা ছিল। আমাদের গঙ্গায়ও দস্যুতরী ঘুরিত চারিদিকে। সোমড়া অঞ্চলে বড় আড্ডা ছিল। উলুবেড়ের দক্ষিণে ভাঁড়ারদহের মোহানার ওদিকে, দামোদর ও রূপনারায়ণের মুখের কাছে, তখন বোম্বেটের গ্রাম দেখিতে পাওয়া যাইত; ঝুমঝুমীর প্রতিপত্তি সেদিনও বাহির হইয়াছিল। বৎসর কয়েক হইল, ঝুমঝুমীর কয়টা জলদস্যু ধরা পড়িয়াছিল।

আমরাই ত বাল্যকালে কলিকাতা হইতে হুগলীর ওদিকে যাওয়া আসা করিবার সময়ে বোম্বেটের ভয়ে ভীত হইতাম। গরুটীর কাছে আমাদিগকেও কর্ত্তাদের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গানাম করিতে হইত। যাইবার সময়ে ঘুসুড়ীর টেঁক ছাড়াইলেই ভয় হইত। তখনও সুখচর পেনেটি দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি অঞ্চলের সকল মাঝীকে বিশ্বাস করা চলিত না। অনেক মাঝী মাল্লাও যে, বোম্বেটেগিরি করিত। নৌকায় উঠিয়া যে, অনেক ভদ্রলোককে বিপন্ন হইতে হইত, তাহা না জানে কে? ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরের কথা বলিতেছি, কলিকাতা-প্রবাসী একটী বৈদ্য-পরিবারকে হালিসহরে যাইবার সময় ঘুসুড়ীর ওদিকে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। সে ঘটনার কথা ত আমাদের মনে এখনও জাগরূক রহিয়াছে! আমরা কদাপি অজ্ঞাতকুলশীল মাঝীর নৌকায় যাওয়া আসা করিতাম না। রেলগাড়ীর পর কর্ত্তারা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন; মাতা মাতামহী পিতামহী প্রভৃতির ভয় ঘুচিয়াছিল। স্বগ্রামের পরিচিত মাঝীর নৌকায় যাওয়া আসা হইত, তথাপি কর্ত্তারা বাটীর পাইক চৌকিদারকে সঙ্গে লইতেন।

হেষ্টিংস, কর্ণওয়ালিস, শোর প্রভৃতি বড় লাটদিগের আমলেও জলে স্থলে দস্যুভয়ের একশেষ ছিল। তৎকালের ইংরেজি সংবাদপত্রে দেখিতে পাই, অনেক ইংরেজকেও বোম্বেটের হাতে পড়িয়া বিপন্ন হইতে হইত; সর্ব্বস্বে বঞ্চিত হইতে হইত, কখনও কখনও আবার প্রাণও দিতে হইত। ঢাকার দিকে যাওয়া আসা করায় তখন ঘোরতর বিপত্তিই ছিল। অনেক ইংরেজকেও যে, বিপদে পড়িতে হইত, তাহাও তৎকালের ইতিবৃত্তে দেখিতে পাই। তখনও দেশ সুশাসিত হয় নাই। চৌকি পাহারা পুলীশ ফাঁড়ীর তখনও ভাল বন্দোবস্ত হয় নাই। জলে স্থলে আবার পুলীশের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে দস্যুদিগের ষড়যন্ত্র ছিল। অনেক স্থলে রক্ষকেই ভক্ষকের সাহায্য করিত। ক্রমেক্রমে সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল; যে সকল নদীনদে সর্ব্বদাই নৌকার চলাচল হইত, মালপত্রের যাতায়াত হইত, সে সকল নদী নদে পুলীশ ছিপের—কোথাও বা পুলীশ নৌকার—ব্যবস্থা হইয়াছিল। যে সকল গাঙে সাহেব সুবার হামেসা আসা যাওয়া ছিল, সেখানে প্রহরিতরীর ভাল বন্দোবস্তই হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি ভয় ঘুচে নাই, ব্লাকীয়ার সাহেবকে অনেক কষ্টে দস্যুদমন করিতে

হইয়াছিল! তাঁহার আমলে কলিকাতায়ও দস্যুর গুপ্ত আড্ডা ছিল। বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে আবার তখন পর্ত্তুগীজ বোম্বেটের ভয়ঙ্কর উপদ্রব ছিল! উহাদের দস্যুবৃত্তি চলিত চারিদিকে; ঢাকা ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে ভয়ানক উৎপাত ছিল। ইউরোপের পর্ত্তুগাল স্পেন প্রভৃতি দেশের লোকে সে সময়ে জাহাজে বোম্বেটেগিরি করিত, জাহাজ লইয়া জাহাজ মারিত; এদেশের পর্ত্তুগীজ বংশধরেরাও সেই বৃত্তি চালাইত। পর্ত্তুগীজ বোম্বেটেরা আবার বন্দুকের ব্যবহার করিত। ভয় তাহাদের জন্যেই বড় অধিক ছিল। বঙ্গের মহারাজ প্রতাপাদিত্য যে, দুই একজন পর্ত্তুগীজ দস্যুপতিকে নিজের বেতনভুক করিয়াছিলেন, আর তাহারাই যে, প্রতাপাদিত্যের জন্যে বন্দুক প্রস্তুত করিয়াছিল, রণতরী প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহাও পাঠকের অবিদিত নহে। পশ্চিমের গঙ্গায়ও বোম্বেটের ভয় ছিল, সময়ে সময়ে বড় বড় বোঝাই নৌকাকেও বিপন্ন হইতে হইত। তখনকার লোকের তীর্থযাত্রায় বিষম বিপত্তি ছিল। স্থলপথে ছিল ঠক ডাকাতের ভয়, অনেক লোকজন প্রহরী পাইক লইয়া তবে যাওয়া আসা করিতে হইত। যেখানে স্থল-পথ সেইখানেই ছিল ডাকাত ঠকের ভয়; যেখানে জলপথ, সেইখানেই ছিল বোম্বেটের ভয়। নবাব বাদসাহদিগের শেষাবস্থায় রাজ্য একপ্রকার অরাজক হইয়া পড়িয়াছিল। ইংরেজরাজকেও প্রথম আমলে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল; অনেক কাণ্ড করিয়া তবে ভয় কমাইতে হইয়াছিল! কিন্তু জের একেবারে মিটে নাই; সে বৎসরও ত গাজিপুর অঞ্চলের কতকগুলা বোম্বেটে পূর্ব্ব বঙ্গে উত্তর বঙ্গে ধরা পড়িয়াছিল! উত্তর পূর্ব্ব বঙ্গে যে, এখনও বোম্বেটের আদৌ অস্তিত্ব নাই, এরূপ নহে। দক্ষিণে কলাগেছে অঞ্চলেও কখনও কখনও জলদস্যুভয়ের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু তখন যেমন চারিদিকেই দস্যুপোষণের ব্যবস্থা ছিল, এখন সেরূপ নাই। এখনকার কোন ভদ্রলোককেই দস্যুপোষণ করিতে দেখা যায় না। দস্যুভয়টা সে আমলে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রবল ছিল। তুলনায় ইউরোপের দস্যুরা ছিল দিক্‌পাল।

তুলনায় ভারতের দস্যুরা ছিল শৃগাল, ইউরোপের তাহারা ছিল কেঁদো বাঘ! কিন্তু জলদস্যুর কথাই প্রবন্ধের আলোচ্য। চীন মালয় প্রভৃতির জলদস্যুরাও অতি ভয়ঙ্কর ছিল! চীন মালয় জলদস্যু এখনও একবারে লোপ পায় নাই। চীন বোম্বেটেরাও জাহাজ মারিত, মালয় জলদস্যুরাও ছাড়িত না। ইউরোপের ত কথাই নাই, স্পেন পর্ত্তুগালই ছিল বোম্বেটের প্রধান জন্মভূমি। আবার আফরিকার উত্তর উপকূলে ছিল মুসলমান জলদস্যুদিগের প্রধান আড্ডা। আরব দস্যুদিগের বিচিত্র কাহিনী অনেক ইতিহাস উপন্যাসেই দেখিতে পাইবে। কর্সেয়ার ও গায়োরদিগের জ্বালায় ভূমধ্য আটলান্টিককে অস্থির হইতে হইয়াছিল। কবিবর বায়রণের কল্যাণে ইহাদের কীর্ত্তিকলাপ—ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি অবয়ব—নিষ্ঠুরতা নৃশংসতা অনেকেরই পরিচিত হইয়াছে।

কিন্তু খৃষ্টান দস্যুরা মুসলমানদিগকেও পরাজিত করিয়াছিল। স্পেনীয় এবং পর্ত্তুগীজ পাইরেটদিগের দৌরাত্ম্যে যে, কোনও বাণিজ্যপোতই নির্ব্বিঘ্নে সমুদ্রবিচরণ করিতে পারিত না! জলদস্যু যে বিলাতেও না ছিল, এরূপ নহে। রবিন্‌সন ক্রুশোর ডিফো ত মেয়ে পুরুষ দস্যুর কাহিনী কহিয়া দিয়াছেন। ফরাসী ওলন্দাজ দিনেমার দস্যুরও দর্শন পাওয়া যাইত। যাহাদের পোতে পটুতা ছিল, তখন তাহাদের দেশেই বোম্বেটের অস্তিত্ব ছিল। পর্ত্তুগীজদিগেরই পোতচালনে অধিক পটুতা ছিল, বোম্বেটের কাজেও উহাদিগেরই প্রাধান্য ছিল।

স্পেনীয় পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদিগের কার্য্যকলাপের কথা শুনিলে পাঠক তোমাকে হতবুদ্ধি হইতে হইবে। এদেশে নৌকার বোম্বেটেই দৃষ্ট হইত। তরোয়াল সড়কী বর্ষা না হয় অস্ত্র ছিল। স্পেনীয় পর্ত্তুগীজ জলদস্যুরা বড় বড় জাহাজে চড়িয়া দস্যুবৃত্তি করিত। তাহাদের পোতে রণপোতের মত কামান সাজান থাকিত। এক এক পোতে শতাধিক দস্যু নাবিকের কার্য্য করিত, সকলেই বন্দুক পিস্তল তরোয়ালে সুদক্ষ ছিল, সকলেই রীতিমত যুদ্ধ করিতে পারিত। আর যুদ্ধও ত তাহাদিগকে করিতে হইত। বাণিজ্যপোত দেখিলেই দস্যুরা আক্রমণ করিত। সুতরাং তখনকার বাণিজ্যপোতেও কামান বন্দুক রাখিতে হইত! স্পেনীয় পর্ত্তুগীজ দস্যুরা বাণিজ্যতরীর শুদ্ধ দ্রব্যসামগ্রী লইয়াই তুষ্ট হইত না, তরী পর্য্যন্ত হরিয়া লইত। আর বাণিজ্যপোতের যত নাবিককে হয় প্রাণে মারিত, না হয় বন্দী করিয়া রাখিত; কাহাকে কাহাকে আপনাদের দলে লইত, অবশিষ্ট গুলিকে কৃতদাসরূপে বেচিয়া ফেলিত।

তখন আমরিকায় কৃতদাসের ভয়ঙ্কর আদর ছিল। স্পেনীয় পর্ত্তুগীজ জলদস্যুরা দস্যুবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে দাসসংগ্রহও করিত। দস্যুপতিরা স্ব স্ব পোতে যেন রাজত্বই করিত, অনেকে আবার সস্ত্রীক থাকিত। দস্যুপোতে আর রণপোতে যে, বড় প্রভেদ ছিল না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দস্যুপতিরও সুখ সমৃদ্ধির অবধি থাকিত না। মর্ত্তের ভোগ স্বর্গের সুখ তাহাদিগের একচেটিয়া ছিল। পৃথিবীর যেখানে যাহা উৎকৃষ্ট, তৎসমস্ত তাহাদিগের ভোগ্য ছিল; লুটিয়া হরিয়া লইলেই ত হইত। কোন কোন পোতের দস্যুপতি ছিল কুবেরের মত। দস্যুপত্নীও পোতেই থাকিত; হীরা মুক্তায় তাহার অরুচি হইত, অমৃতভোজনেও অপ্রবৃত্তি হইত। উৎকৃষ্ট সুরার স্রোত চলিত, সুন্দর সুন্দরী কৃতদাস কৃতদাসী দিবারাত্র সেবা করিত। অরাজকতা ছিল মূর্ত্তিমতী, দস্যুপতিই ছিল সম্রাটের সম্রাট। সে যাহার উপর অসন্তুষ্ট হইত, তাহারই তৎক্ষণাৎ হত্যা করিত। কত

দাস দাসীকেই যে, প্রাণ দিতে হইত, তাহা বলা যায় না! যেমন বাঘ আবার তেমনই বাঘিনী। বরং অনেক সময়ে বাঘিনী বাঘের ঘাড়ে চড়িত; নিষ্ঠুরতায় নৃশংসতায় দস্যু-পত্নী দস্যুপতিকেও পরাজিত করিত। অনেক দস্যুপতিই আবার শুদ্ধ সুরায় তৃপ্ত হইত না, ভারতের গঞ্জিকাও তাহাদিগের সেব্য ছিল; দস্যুপত্নীরাও স্বর্গিতানন্দে আনন্দিত হইত। পোতস্থ যত দস্যুনাবিক—যত কৃতদাস কৃতদাসীকে—দস্যুপতি ও দস্যুপত্নীর ভয়ে সর্ব্বদাই প্রাণ হাতে করিয়া থাকিতে হইত। কিন্তু দস্যুনাবিকেরাও নিষ্ঠুরতা নৃশংসতায় কুণ্ঠিত ছিল না। দস্যু কি আর কোন কালে—কোন দেশে—মানুষের মত হইয়া থাকে! কিন্তু যত দস্যুনাবিকেরই দস্যুপতির একান্ত বাধ্য থাকিতে হইত।

পোতপ্রকোষ্ঠে দস্যুপতি ও দস্যুপত্নীর জন্যে অমরাবতী প্রস্তুত হইত। যেখানকার যত সুন্দর বহুমূল্য দ্রব্য ঐ খানে সংগৃহীত এবং সজ্জিত থাকিত। সুন্দর মেহগ্নির খাটে উৎকৃষ্ট চীনাংশুক বা মকমলে মোড়া গদী। ঘরে সুন্দর স্থূলকোমল বহুমূল্য গালিচা পাতা। চারিদিকে সুন্দর সুন্দর কাচাবৃত চিত্রপট। বেলোয়ারের ঝাড় দেওয়ালগিরি ঘর আলোকিত করিতেছে। ঘরে নানারূপ বাদ্য-যন্ত্র। দস্যুপত্নীর মজলিস হইতেছে, দেশ বিদেশের সুন্দর সুন্দর কৃতদাস কৃতদাসী ব্যজনাদি করিতেছে, পতি পত্নীর সত্য সত্যই সুবর্ণপাত্রে পানভোজন চলিতেছে। বড় বড় দস্যুপতির পোতে এইরূপ সুখ সমৃদ্ধিই দৃষ্ট হইত। অমরাবতী আর কাহাকে বলে?

আবার দস্যুপতিরাই ছিল দাসপতি। পোত লইয়া আফরিকায় আসিত। পোতের যত নৌকা চারিদিকে ঘুরিত; দাসব্যবসায়ী আফরিকদিগের কাছে হাজার হাজার দাস দাসী ক্রীত হইত। আবার অবসর পাইলে, পোতের দস্যুনাবিকেরাও গ্রামের ভিতর পড়িয়া, ঘর কুটীরাদি জ্বালাইয়া পোড়াইয়া, কাটাকাটি মারামারি করিয়া, কোথাও বা আফরিকদিগের সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিয়া, কামান বন্দুকে গ্রাম উৎসন্ন করিয়া, কত লোককে প্রাণে মারিয়া, অবশিষ্টদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইত। জাহাজ দাস দাসীতে পূর্ণ হইত, সেই জাহাজ লইয়া দস্যুপতি আমরিকায় যাইত। সেখানকার যত ইউরোপীয় দাস-ক্রয়ের জন্যে ব্যগ্র হইয়া থাকিতেন। সকলেই যে, আপনাদের চাষে আবাদে কারবারে কৃতদাস চালাইতেন। দাসপূর্ণ পোত লইয়া দাসপতি—দস্যুপতি—যখন আমরিকায় উপস্থিত হইত, তখন সেখানে মহোৎসব চলিত। পোতপতি ও তাহার সহধর্ম্মিণীর জন্যে—কখনও বা অবিদ্যার জন্যে—প্রাসাদ সজ্জিত থাকিত। দাস দাসীর যে কয় দিন ব্যবসায় চলিত, সে কয় দিন আমোদের ফোয়ারা ছুটিত, মাইফেল চলিত, সুরার স্রোত বহিত, নৃত্য গীতে বিরাম বিশ্রাম থাকিত না। মানুষের আনন্দ কিন্তু শেষে শয়তানের আনন্দে পরিণত হইত, নরহত্যারও অভাব হইত না; কৃতদাস কৃতদাসীর বধে ত আর তখন আমরিকায় দণ্ড ছিল না। আর পোতপতির যত অনুচর সহচর সকলেই কৃতদাসবৎ থাকিত। আমরিকায় প্রশ্রয় ছিল বলিয়াই ত দাসব্যবসায় চলিত। আমরিকার ইউরোপীয় বংশধরেরা দাসপ্রাপ্তির খাতিরে দস্যুবৃত্তিরও অনুমোদন করিতেন, তাহাতে উৎসাহ দিতেন। দাসব্যবসায়ী দস্যুপতিরাও সোৎসাহে দাসব্যবসায় ও দস্যুবৃত্তি করিতে থাকিত।

দাসব্যবসায়নিবারণে ইংরেজ যে, শুদ্ধ পরার্থপরতার জন্যেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কেবল আফরিকার কৃতদাস দিগের দুঃখে কাতর হইয়াই ইংলণ্ডের শ্বেতমহাপুরুষেরা কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন; ঠিক এরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে না। স্পেনীয় পর্ত্তুগীজ দাসব্যবসায়ী দস্যুদিগের জন্যে ইংরেজেরও বাণিজ্য করা ভার হইয়া উঠিয়াছিল। কত বৃটিশ বাণিজ্যপোতকেই বিপন্ন হইতে হইয়াছিল, কত বৃটিশ নাবিককে প্রাণ দিতে হইয়াছিল, কত নাবিককে আবার দাসত্বেও বাধ্য হইতে হইয়াছিল! পরার্থপরতায় সুতরাং বৃটিশের স্বার্থপরতাও মিশ্রিত হইয়াছিল। পরার্থপরতা আর স্বার্থপরতা একত্র হইয়া অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। দাসব্যবসায় ও দস্যুবৃত্তি তখন যদি এক হাতে না থাকিত, তাহা হইলে, সে আমলে, দক্ষিণ আমরিকার সেই স্পেনীয় আধিপত্যের আমলে, ইংরেজরাজ দাসব্যবসায়ের অতদূর বিদ্বেষী বিরাগী হইতেন কি না, সন্দেহ! কিন্তু হেতু যাহাই হউক, কার্য্যটা মহতের মতই হইয়াছিল। দাসব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে যে, বৃটিশ মহাপুরুষ খৃষ্টান মুসলমানের দস্যুবৃত্তিরও দমন করিয়াছিলেন! ইংরেজই হইয়াছিলেন সদনুষ্ঠানে প্রধান উদ্যোগী, শেষে আরও অনেকে যোগ দিয়াছিলেন। তাই ত যত সাগরই এখন নিরুপদ্রব হইয়াছে। আর দাসব্যবসায়ীরাও ত এখন আর সেরূপ প্রকাশ্যভাবে কাজ চালাইতে পারে না! বুঝিলে পাঠক, এদেশের তুলনায় ইউরোপের জলদস্যুরা দিক্‌পাল কি না? এদেশের শৃগালে আর সে দেশের ব্যাঘ্রে তুলনা হয় কি? ইউরোপের সবই বড়, ভারতের সবই ক্ষুদ্র। ইউরোপে বড় বড় বিরাটপোত, ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিঙ্গি নৌকা। ইউরোপ কুবেরে পরিপূর্ণ, ভারত ভিক্ষুকে ভরা। ইউরোপের যত সভা সমিতি দেখিলে ভয় হয়, ভারতের সভা সমিতি দেখিলে হাসি পায়। ইউরোপের যাহা ভাল, তাহা বড়; যাহা মন্দ তাহাও বড়। দস্যু তস্করেও তারতম্য। ইউরোপীয় দস্যুরা সব দিগ্‌গজ, ভারতের দস্যুরা তুলনায় নগণ্য। তাহারা মাতঙ্গ; ইহারা পতঙ্গ, তাহারা সব বিশাল সাল, ইহারা সব তৃণগুল্ম। ইউরোপে ভারতে তুলনা হয় না!

জন্মভূমি।

অষ্টম ভাগ। { অগ্রহায়ণ। ১৩০৫। { ১২শ সংখ্যা।

হিন্দুরমণীগণের অবস্থা ও শিক্ষা।

স্বাভাবিক স্বত্ব

(তৃতীয় প্রস্তাব)

এক্ষণে উল্লিখিত বামাহিতৈষী বক্তা ও লেখকগণের আরোপিত আর একটী দোষের বিষয়ে বিবেচনা করা আবশ্যক। তাহা এই—"এদেশীয় পুরুষগণ রমণীগণকে তাহাদের স্বাভাবক স্বত্বে বঞ্চিত করিয়া থাকেন"। স্বাভাবিক স্বত্বের কথাটা শুনিতে গভীর বলিয়া মনে হয়, এবং ইংরেজিশিক্ষিত ব্যক্তিগণের কর্ণে ইহার বিশেষ মাধুর্য্য আছে। কিন্তু মানবের বা নারীগণের স্বাভাবিক স্বত্ব কি, তাহার অভ্রান্ত মীমাংসা এপর্য্যন্ত হইতে দেখা যায় নাই।

স্বভাবের নিয়ম (Law of Nature) এবং স্বাভাবিক অবস্থা (State of Nature) এই দ্বিবিধমূলক মত অতি পুরাতন; কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসিদেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে ইহা নবীন আকার ধারণ করিয়াছিল। তাঁহাদের মত ফরাসী জাতিকে উত্তেজিত বিচলিত ও ফরাসী বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল; তাঁহাদের মত অল্প বা অধিক পরিমাণে সমগ্র ইউরোপকে আন্দোলিত করিয়াছিল। তাঁহাদের মতে মানব ঐ স্বভাবের নিয়মে (Law of Nature) এবং স্বাভাবিক অবস্থায় (State of Nature) ভ্রষ্ট হইয়াই, বর্ত্তমান ক্লেশময় ও অসম্পূর্ণতাময় অবস্থায় পতিত হইয়াছে; কিন্তু চেষ্টা দ্বারা পুনরায় সেই আদিম পূর্ণতাময় ও সুখময় অবস্থায় উপনীত হইতে পারে। তাঁহাদের মতে কতকগুলি মানবসমষ্টির পরস্পর চুক্তি (Social compact) দ্বারা প্রথমে সমাজ-পত্তন হইয়াছিল। এ সিদ্ধান্ত উল্লিখিত "স্বাভাবিক অবস্থা"-ঘটিত মতের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ। [illegible] দ্বারা এক্ষণে ঐ মতের অলীকতা অনুভূত হইতেছে। অনেকে বলেন যে, সমাজপত্তনের মূলীভূত কারণ অন্য প্রকার।

"স্বাভাবিক স্বত্ব," এই বাক্য সম্ভবতঃ উল্লিখিত ফরাসী পণ্ডিতগণের মতের প্রতিধ্বনিমাত্র। তাঁহাদের উল্লিখিত মত এক সময়ে ইউরোপের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ ইংলণ্ডে, বিকীর্ণ হইয়াছিল। ইংরেজি ভাষা সূত্রে তাহা ভারতেও আসিয়াছিল। ঐ কথা ইংরেজ বা ইংরেজিশিক্ষিত ও ইংরেজি আচার ব্যবহারের পক্ষপাতী "হিতৈষিগণের" মুখ বা লেখনী হইতে নিঃসৃত। সুতরাং ঐ অনুমান নিতান্ত দুর্ব্বল বলিয়া মনে হয় না। সে যাহা হউক, কেহ কাহাকেও তাহার স্বাভাবিক স্বত্বে বঞ্চিত করে কিনা, ইহার মীমাংসা করিতে হইলে, অগ্রে দেখা আবশ্যক, স্বাভাবিক স্বত্বের অর্থ কি?

'স্বভাবের নিয়ম" (Law of Nature) ও 'স্বাভাবিক অবস্থা" (State of Nature) এই দুই মতের পণ্ডিতগণের বিবেচনায় সকল মনুষ্যই সমান; সংসারে উপভোগের অধিকার সকলেরই সমান; তাহাতে ছোট বড় ভেদ নাই। জল বায়ু মৃত্তিকাদি প্রাকৃতিক পদার্থনিচয় মানবের হস্তজাত নহে, তাহাতে সকলেরই সমান অধিকার; রাজা প্রজায় ভেদ নাই। আপাততঃ শুনিতে কথাটা ঠিক ও মনোহর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা অভ্রান্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না। যে শক্তির ক্রিয়াবশতঃ জলবায়ু মৃত্তিকাদি বিবিধ পদার্থ অস্তিত্ববান্ হইয়াছে, সেই শক্তির ক্রিয়াবশতই মানবগণের মানসিক ও শারীরিক শক্তির তারতম্য হইয়াছে। এই তারতম্যবশতই মানসিক শারীরিক শক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তিগণ সংসারে শ্রেষ্ঠতালাভ করিয়া আসিতেছেন এবং অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের উপর আধিপত্য করিয়া আসিতেছেন। এইরূপে মানবসমাজ উন্নত হইতেছে। ক্রমবিকাশশাস্ত্রের মতও এই।

কেমন করিয়া বলিব? যদি তাহা হইত, তবে সকল লোকের দৈহিকশক্তি, মনোবৃত্তি, বুদ্ধি প্রভৃতি সমীভূত হইত।

তর্কবলে 'সকল মনুষ্য সমান; সকলের স্বত্ব সমান' এই মত যতই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হউক না কেন, সংসারে পরস্পরের অবস্থাগত ও ক্রিয়াগত ভেদজ্ঞান কিছুতেই তিরোহিত হইবার নহে। তাহার কারণ, মানব-প্রকৃতি। যিনি স্বভাবতঃ প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ, শারীরিক বলে শ্রেষ্ঠ, তিনি সকল কার্য্যেই জ্ঞানহীন ও দৈহিকশক্তিহীন ব্যক্তিগণ অপেক্ষা অধিকতর কুশলতা দেখাইবেন ও শ্রেষ্ঠতালাভ করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক; আবহমানকাল তাহাই হইয়া আসিতেছে। এই প্রাকৃতিক নিয়মের উপরেই অল্প বা অধিক পরিমাণে সকল জাতীয় সমাজ সংস্থাপিত, বিশেষতঃ হিন্দুসমাজ। তোমার যেমন শক্তি, যেমন সাধনা, যেমন কার্য্য, সমাজে তুমি সেইরূপ স্থানলাভ করিবে। এই নিয়মেই ব্রাহ্মণ-শূদ্র-ভেদ হইয়াছে, উচ্চ-নীচ-ভেদ হইয়াছে, জ্ঞানী অজ্ঞানীর ভেদ হইয়াছে। হিন্দুসমাজমধ্যে জাতিঘটিত বিশেষত্ব কিছু আছে সন্দেহ নাই। প্রাচীন হিন্দু আচার্য্যগণ বহুকাল পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, পৈতৃক গুণ সন্তানে অবভাসিত হয়। ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠতার বংশগত হইবার নানা করণের মধ্যে ইহাই একটী প্রবল কারণ বলিয়া মনে হয়।

পৈতৃক প্রতিভা, পৈতৃক মানসিক গুণ—সন্তানে বিকশিত হয়, এক্ষণে ইহা প্রায় অভ্রান্তসত্যরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এরূপ অধিকারলাভে উল্লিখিত ফরাসী পণ্ডিতগণেরও সম্ভবতঃ আপত্তি ছিল না। কিন্তু অনেক সময়ে ইহাও দেখা যায় যে, পৈতৃক প্রতিভা পৈতৃক পরিশ্রম ইত্যাদির আর্থিক শুভফল হীন ও অপদার্থ উত্তরাধিকারিগণ উপভোগ করিয়া থাকে। ইহা লইয়াই পাশ্চাত্য সমাজে ঘোর বিসংবাদ। সে যাহা হউক, ইহা স্বত্বঘটিত ও দায়ঘটিত সামাজিক নিয়মের অপরিহার্য্য ফল। একজন বাহুবলে ও প্রাতভাবলে যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, অতি প্রাচীন কাল হইতে তাহার স্বগণ তাহা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। যেরূপে এই নিয়ম আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা অতি জটিল এবং রহস্যপূর্ণ। তাহার অবতারণা অথবা ঐ নিয়ম ন্যায়সঙ্গত কিনা তাহার আলোচনা এ প্রস্তাবে অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক। এই মাত্র বক্তব্য যে, ইহাতে অস্বাভাবিকত্ব দেখা যায় না।

স্বাভাবিক স্বত্ব কি? যদি ইহার কোন অর্থ থাকে, তবে তাহা যথেচ্ছাচার। তুমি জীবনধারণের জন্য, জল বায়ু গ্রহণ করিতে অধিকারী, ভূমির উপরে বসতি করিতে অধিকারী, জ্ঞানচর্চ্চা ও ধর্ম্মানুশীলন করিতে অধিকারী, সুখ-স্বচ্ছন্দ-লাভ করিতে অধিকারী; সন্দেহ নাই। এ অধিকার স্বাভাবিক, তাহাতেও সন্দেহ নাই; কারণ ইহা মানব প্রকৃতির অনুযায়ী। কিন্তু এ অধিকার সকলের সমান হইতে পারে না, কারণ তাহা প্রকৃতির অনুযায়ী নহে। যাহার যেমন সামর্থ, যাহার যেমন জ্ঞান, যাহার যেমন অবস্থা, তাহার অধিকারও সেই পরিমাণে হইতে পারে; অধিক নহে। ইহার ভিতর আর একটী অতি গুরুতর কথা আছে।

মানবজাতি সমাজ-বদ্ধ হইয়া বাস করে। সমাজের পত্তন যে কারণেই হউক, সমাজ-পরিহার করিয়া মানবজাতি কোন ক্রমেই থাকিতে পারে না। একটী ক্ষুদ্র শিশু যদি দুই চারি বর্ষ যাবৎ মানবসমাজে থাকিতে না পায়, পিতা মাতা বন্ধু বান্ধবের নিকট থাকিতে না পায়, পশুগণের সঙ্গে লালিত হয়, তবে সে আর কথা কহিতে পারে না, আজীবন পশুবৎ হইয়া থাকে। সমাজপত্তন হইলেই, সমাজরক্ষার উপযুক্ত নিয়মাবলীর প্রয়োজন, সমাজের নেতার প্রয়োজন। সমাজে অসংখ্য মানব একত্র হইয়া আছে। তাহাদের প্রত্যেকের শারীরিক ও মানসিক শক্তির তারতম্য আছে, প্রত্যেকের জীবনধারণোপযোগী কতকগুলি প্রয়োজন আছে। যাহা তোমার আবশ্যক, তাহা হয়ত আমারও আবশ্যক; সুতরাং পরস্পর কলহ বিসম্বাদ অপরিহার্য্য। এইখানে নিয়ম আবির্ভূত হইয়া তাহা নিবারিত করে। এইখানে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীন ক্রিয়ার সীমানির্দ্দেশ, প্রত্যেকের স্বত্ব সংস্থাপন, প্রত্যেকের স্বত্ব রক্ষার প্রয়োজন; পরস্পর দ্রব্যাদির বিনিময়ের ব্যবস্থার প্রয়োজন। যে সকল নিয়মদ্বারা তাহা সাধিত হইত, তাহাই পুরাকালের জাতীয় আচার (Custom); বর্ত্তমান কালে সভ্য জাতির ভিতরে তাহা রাজনিয়ম বা আইন দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান কালের আইনের কোন কোন অংশ সেই প্রাচীন আচারের (Custom) ভিত্তির উপরে স্থাপিত।

এক্ষণে ইহা স্পষ্টই অনুভব করা যাইতে পারে যে, সামাজিক জীবনে স্বথেচ্ছাচার অসম্ভব; যাহার যাহা ইচ্ছা সে আর তাহা করিতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীন ক্রীয়ার সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে, কেহই তাহার নিরাপদে অতিক্রম করিতে পারে না। যাহার ইচ্ছা, সেই আহারান্বেষণ, জ্ঞানচর্চ্চা, সুখোন্নতি করিতে পারে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিয়া করিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীন ক্রিয়ার নির্দ্দিষ্ট সীমা, সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিগণের স্বাধীন ক্রিয়ার নির্দ্দিষ্ট সীমা-দ্বারা সীমান্বিত। সুতরাং সমাজের মঙ্গলের জন্য ও সমাজের অস্তিত্বরক্ষার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীন ক্রিয়ার বর্জ্জন করিতে হয়, এবং সামাজিক নিয়মের অধীন হইয়া চলিতে হয়। ইহা ব্যতীত সমাজ বা সমাজোন্নতি অসম্ভব।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক, এতদ্দেশীয় রমণীগণের স্বাভাবিক স্বত্ব কি? উপরে যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন

হইতে পারে যে, রাজনিয়ম ও সামাজিক নিয়ম অনুসারে তাঁহারা সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিতে, বিধাতার নিয়োজিত পথে ভ্রমণ করিতে, অধিকারিণী। আমরা জানি না, হিন্দুললনাগণকে হিন্দু জাতি অথবা হিন্দু জাতির কোন শাখা এই অধিকারে বঞ্চিত করিয়াছে কি কিনা। যত দূর দেখা যায়, তাহাতে ঐ কথা সম্পূর্ণ অলীক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতে পারে।

সুখ-স্বচ্ছন্দ-লাভের জন্য মানব চির-ব্যাকুল। "কোথা সুখ?—এই পথে?—এখানে ত নয়।" মানব আবহমান কাল এই কবিচিত্রের অভিনয় করিয়া আসিতেছে। যুগে যুগে জীবনের কত আদর্শ চিত্রিত হইয়াছে, আবার তাহা পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইয়াছে। এই আদর্শপরিবর্ত্তন অনিবার্য্য, কারণ মানবের অবস্থা পরিবর্ত্তনশীল।

অনেক মহামনা ব্যক্তির মতে, বিধাতার নিয়োজিত পথে বিচরণ করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য; এবং প্রকৃত সুখ স্বচ্ছন্দের তাহাতেই লাভ হইতে পারে। কিন্তু সেই নিয়োজিত পথ কোথায়, বুদ্ধি বা যুক্তির বলে তাহার নির্ণয় করা সহজ ব্যাপার নহে। যুগান্তরব্যাপিনী চেষ্টা দ্বারা এখনও অভ্রান্তরূপে তাহার স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। কোন্ কোন্ কার্য্য দ্বারা জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়—সেই নিয়োজিত পথে অগ্রসর হওয়া যায়—কেহই যুক্তিবলে এ পর্য্যন্ত তাহার অভ্রান্ত ও সর্ব্ববাদিসম্মত মীমাংসা করিতে সমর্থ হন নাই। অপূর্ণ ও ভ্রান্ত মানবের পক্ষে কেবল বুদ্ধিবলে এরূপ গুরুতর বিষয়ের অভ্রান্ত মীমাংসা অসম্ভব। আমাদের বুদ্ধির যেরূপ অবস্থা, আমাদের সিদ্ধান্তও সেইরূপ হইয়া থাকে। কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মমতের উপর নির্ভর না করিয়া কেবল যুক্তি-সাহায্যে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, মানবীয় শরীর, মন ও বাহ্য জগতের পর্য্যালোচনা করিলে, বিধাতার অভিপ্রায়ের কতকগুলি আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানবীয় ক্রিয়া যে পরিমাণে সেই আভাসের অনুযায়িনী, সেই পরিমাণে তাহা মানবজীবনের উদ্দেশ্য-পূরণকারিণী ও সুখদায়িনী।

কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায়ের সেই আভাসের উপর নির্ভর করিয়া—অথবা কেবল মাত্র বুদ্ধি বা যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া—কখনও মানবসমাজ পরিচালিত হয় নাই। সমাজের মূলে ধর্ম্ম। মানবের হৃদয়ে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এতই প্রবল যে, যে অবধি সে ধরাধামে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই আদি কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সে কখনই ঐ মহীয়সী প্রবৃত্তির ক্রিয়া পরিহার করিতে পারে নাই। পরন্তু ঐ প্রবৃত্তির ক্রিয়াবশতঃ আবহমান কাল মানবের ও সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইয়া আসিতেছে। যদিও পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা বহুদিন অবধি কেবলমাত্র যুক্তিরচিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নিরূপণের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু ধর্ম্মনিরপেক্ষ সমাজ এ পর্য্যন্ত কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ভারতে ত ধর্ম্ম ছাড়া কথা নাই। সুতরাং একথা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, মানব আবহমান কাল ধর্ম্মপ্রণোদিত যুক্তিদ্বারা সামাজিক পথে চালিত হইয়া আসিতেছে,—ধর্ম্মনিরপেক্ষ যুক্তি দ্বারা নহে।

মানবের মন ও অবস্থা উন্নতিশীল। চরাচর—অসীম অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডারস্বরূপ। মানবের উন্নতির সীমা কোথায়, তাহা কেহই বলিতে পারে না। সুতরাং জ্ঞানলাভ—মনের উৎকর্ষসাধন—ধর্ম্মপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন—মানবজীবনের গুরুতর উদ্দেশ্য এবং তাহা অপরিসীমসুখজনক। অপরাপর সকল প্রকার উন্নতি মনের উন্নতির আনুষঙ্গিক। জ্ঞানলাভ দ্বারা মানব ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর কর্ত্তব্যপালনে সমর্থ হয়, বিধাতার কার্য্য ও প্রণালী ও অভিপ্রায় স্পষ্টতররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়, মনকে সেই জ্ঞান দ্বারা অনুরঞ্জিত ও অনুশাসিত করিয়া, সেই অভিপ্রায়ের অনুযায়ী কার্য্য করিতে পারে এবং এইরূপে মানসিক শক্তি পরিবর্দ্ধিত করিয়া, যেখানে জ্ঞান, শক্তি, প্রেম ও মঙ্গলের পূর্ণতা, সেই অপার মনের সহিত যোগ স্থাপিত করিয়া জীবন পূর্ণ করিতে পারে।

বহু যত্নে ও নানাবিধ ক্রিয়া দ্বারা মানবজীবনের এই মহান্ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। যে সকল সামাজিক রীতিনীতি সেই সকল ক্রিয়ার অনুকূল, তাহা উপেক্ষিত হইতে পারে না—তাহা রক্ষা করিবার জন্য যত্ন করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

হিন্দুসমাজে জীবনের আদর্শ একপ্রকার, ইউরোপীয় সমাজে জীবনের আদর্শ অন্য প্রকার—সামাজিক রীতিনীতিও বিভিন্নপ্রকার। কোন্ আদর্শ ঠিক্ অর্থাৎ উল্লিখিত উদ্দেশ্যের অনুকূল, ধর্ম্ম-সাধনের অনুকূল, জীবনের পূর্ণতালাভের অনুকূল, কোন্ সমাজের আচার ব্যবহার সেই মহোদ্দেশ্য-সাধনের অধিকতর উপযোগী, তাহার মীমাংসা না হইলে, একসমাজস্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে অন্যসমাজের প্রচলিত আচার ব্যবহার অনুকরণীয় হইতে পারে না। সে অনুকরণ, জ্ঞানবান্, দূরদর্শী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির কার্য্য নহে। বিধাতার নিয়োজিত পথে ভ্রমণ ও সুখস্বচ্ছন্দে জীবনধারণ সম্বন্ধে হিন্দুজাতির যে ধারণা আছে এবং হিন্দুসমাজে যে নিয়ম প্রবর্ত্তিত আছে, হিন্দু-রমণীগণের স্বত্ব তাহার অনুযায়ী। সে স্বত্বে তাহাদিগকে বঞ্চিত করার প্রমাণ এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার্য্য যে, আমাদের সমস্ত সামাজিক নিয়ম অভ্রান্ত, উৎকৃষ্ট ও অপরিবর্ত্তনীয় নহে। কোন কোন নিয়ম পরিশোধিত হইতে পারে, উন্নত হইতে পারে। কিন্তু তাহা স্বতন্ত্র কথা। সে সংশোধন সামাজিক প্রকৃতির অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক এবং তাহাতে অনেক সদ্বিবেচনা ও ভূয়োদর্শনের প্রয়োজন। অন্ধ অনুকরণ দ্বারা তাহা সাধিত হওয়া অসম্ভব। পরিতাপের বিষয় এই যে, সামাজিক অবস্থার অনুযায়ী আবশ্যক

সংস্কারের দিকে অগ্রসর হইবার লোক অতি অল্প। কেহ কেহ সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনের বিরোধী। ইহা অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিক। কেহ কেহ পুরাতন আচার পদ্ধতি পুরাতন আদর্শে উপেক্ষা করিয়া বিলাতী আদর্শে সমাজসংস্কার করিতে অভিলাষী,—তাহা অসম্ভব। বিলাতী আদর্শে দেশীয় খৃষ্টানগণের সমাজের ন্যায় নবীন সমাজ গঠিত হইতে পারে। কিন্তু সে আদর্শে হিন্দুসমাজ কখন চালিত বা পুনর্গঠিত হইতে পারে না; হিন্দু সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্ত্তন, হিন্দু সমাজের সংশোধন, হিন্দু আদর্শে, হিন্দু সমাজের প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে, হিন্দুজাতির বহুকালসঞ্চিত জ্ঞান ও বহুদর্শিতার সহায়তায় হইতে পারে। হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরে যদি জীবনী শক্তির অভাব না হইয়া থাকে, তবে সেই শক্তির ক্রিয়াবশতঃ ঐরূপে হিন্দুসমাজের সংস্কার ও উন্নতি সাধিত হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

অবস্থার পরিবর্ত্তন জন্য, ইংরেজি শিক্ষা প্রভৃতি কারণে, সমাজ মধ্যে যে সকল নূতন শক্তি জাগরিত হইয়াছে, তাহার প্রকৃতি যাহাই হউক, তাহা কখনই উপেক্ষনীয় নহে। কারণ তাহার ক্রিয়া পরিহার করা অসম্ভব। তাহা আবশ্যক সমাজ সংস্কারে অনেক সহায়তা করিতে পারে। এইরূপ, সেই সকল শক্তির সহায়তা গ্রহণ করিয়া তাহাদের বেগ প্রশমিত না করিলে ক্রমে তাহা সমাজের বিনাশ-সাধন করিবে; ক্রমে তাহার লক্ষণও দেখা যাইতেছে।

বামাগণের "উন্নতিরোধ" নামক অপবাদ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। সমাজ মধ্যে জ্ঞান-বিস্তার হইতেছে, আমাদের সনাতন ধর্ম্ম ও প্রাচীন আচার্য্যগণসঞ্চিত জ্ঞানের দিকে—সমাজের উন্নতির দিকে—ক্রমশঃ সাধারণের দৃষ্টি পতিত হইতেছে। কি উপায়ে হিন্দু সমাজ বর্ত্তমান পতিত অবস্থা অতিক্রম করিয়া উন্নত হইতে পারে, স্বদেশবৎসল, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই তাহার আলোচনা করিয়া থাকে,—যদিও তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। বামাগণের উন্নতি সামাজিক উন্নতির অন্তর্ভূত। ইচ্ছা করিয়া তাঁহাদের উন্নতি-রোধ করা অসম্ভব। কেহই সে চেষ্টা করে না। সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা উন্নত হইবেন সন্দেহ নাই, কারণ তাঁহারা সমাজের অর্দ্ধাংশ। তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া অপরার্দ্ধ উন্নত হইতে পারে, ইহা অস্বাভাবিক ও অসম্ভব। তাঁহাদের উন্নতি-রোধ করা ও সমাজের উন্নতি-রোধ করা সমান কথা। এমন ব্যক্তি সংসারে বিরল, যে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া আপনার উন্নতির পথ আপনি কণ্টকাকুল করে।

ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, হিন্দুজাতি নারীগণের অসম্মানকারী নহেন; পরন্তু সম্মানের উচ্চ আদর্শ তাঁহাদের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বপতিকে রমণীরূপে পূজা করিবার বিধি তাঁহাদের মধ্যেই দেখা যায়। সস্ত্রীক ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার অনুশাসন ও রীতি তাঁহাদের মধ্যেই দেখা যায়; তাঁহারা নারীগণের উন্নতি-রোধ করেন, ইহ অস্বাভাবিক, অসঙ্গত ও অসত্য।

কিন্তু বামাগণের উন্নতি কি? এতৎসম্বন্ধে উল্লিখিত বামাহিতৈষী বক্তা ও লেখকগণের এবং হিন্দু সাধারণের মতের একতা নাই। শিক্ষাদ্বারা যে, বামাগণের উন্নতি হইতে পারে, এ বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ে কোন মতভেদ নাই। "হিতৈষি" গণের মতে বিলাতী আদর্শের শিক্ষাই ফলোপধায়িনী হইবে—তদ্দ্বারাই রমণীগণের ও সমাজের মঙ্গল হইবে। যে অবধি এ দেশে ইংরেজি শিক্ষার আরম্ভ হইয়াছে—যে সময়ে হিন্দু কালেজ স্থাপিত হইয়াছিল সেই অবধি—অল্প বা অধিক পরিমাণে এই মত চলিয়া আসিতেছে এবং তদনুযায়ী কার্য্যও হইয়া আসিতেছে। এ দেশে যতগুলি গবর্ণমেণ্ট-বালিকাবিদ্যালয় বা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে পুষ্ট বালিকাবিদ্যালয় আছে, সে সমস্ত বিদ্যালয়েই বালিকাগণকে অল্প বা অধিক পরিমাণে বিলাতী আদর্শে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহার ফল সমাজের মঙ্গলজনক হইতেছে কি না, তাহাই সবিশেষ বিবেচ্য। হিন্দু সাধারণের মত অন্য প্রকার। তাঁহাদের মতে, হিন্দুললনাগণের শিক্ষা, হিন্দু-সমাজের ও হিন্দু আচারপদ্ধতির হিন্দুনীতির অনুরূপ এবং অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক। এক্ষণে এই গুরুতর বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন। শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র।

বহুজ্ঞ প্রবন্ধলেখক মহাশয়ের সকল মতামত আমাদের অনুমোদিত নহে; কেন না, আমাদের শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। শাস্ত্র ছাড়িয়া আমরা এক পদও চলিতে সমর্থ নহি। পূর্ব্বতন নিবন্ধকার প্রভৃতি মহাশয়েরা শাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই আমাদিগের শিরোধার্য্য; স্বাধীন ব্যাখ্যানে আমাদের অধিকার নাই। কিন্তু প্রবন্ধলেখকের যুক্তিবিন্যাস ও আলোচনা প্রশংসনীয়। সুতরাং তাঁহার প্রবন্ধও আদরণীয়। জং সং।

কোথায় কেন্দ্র?

গাড়ীর চাকা ধুরায় বসিয়া, ধুরার চারিদিকে ঘুরিতে থাকে; ঘুরিতে ঘুরিতে চলিয়া যায়; গাড়ীকেও চাকা সঙ্গে লইয়া যায়। কুলালচক্র একস্থানেই ঘুরে, শকটচক্রের মত চলিয়া যায় না। সৌরজগতের যত গ্রহ উপগ্রহ স্বস্ব কক্ষে ঘুরিয়া বেড়ায়, ঘুরিতে ঘুরিতে চলিয়া যায়। সকলেই সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, আর সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই অনন্ত অসীম আকাশে চলিয়া যাইতেছে। সৌরজগৎ-চক্রের কেন্দ্র সূর্য্য, রাজ্যচক্রের কেন্দ্র কোথায়? রাজধানীকেই কেন্দ্র করিতে হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যজগৎ সৌরজগতের মত নানাগ্রহ উপগ্রহ লইয়া গঠিত। অসংখ্য উপনিবেশ অসংখ্য গ্রহ, ভারতই এই সৌরজগতের প্রধান গ্রহ। ক্ষুদ্র বৃটিশ দ্বীপই এই সকল গ্রহ উপগ্রহের সূর্য্য; সকলকেই ঐ সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতে হইতেছে। কিন্তু স্বস্ব কক্ষেও সকলে ঘুরে। এই আবর্ত্তনেও সূর্য্যের সম্বন্ধ আছে, বিলাত-সূর্য্যের শক্তি সকলের উপর।

লর্ড কুর্জ্জনের মত যাঁহারা বৃটিশ সাম্রাজ্য-জগতের কেন্দ্র এশিয়ায় আনিতে চাহেন, ভারতকেই কেন্দ্রাধার করিয়া সমগ্র বৃটিশ-সৌরজগতের সূর্য্য করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের মতে যে, বৈজ্ঞানিক বিপর্য্যয়ের আভাস আসিয়া পড়ে! বৃটিশ সৌরজগতের কেন্দ্র ভারতে আনিতে হইলে, ইংলণ্ডের সূর্য্যত্ব ঘুচাইয়া ভারতকেই সূর্য্য করিতে হয়; লণ্ডনের রাজধানীত্ব নাকচ করিয়া কলিকাতাকেই —না হয় শিমলাকেই—রাজধানী করিতে হয়। সাম্রাজ্য-জগতের যেখানে রাজধানী, সেইখানে কেন্দ্র। অথবা আরও বৈজ্ঞানিকভাবে নির্দ্দেশ করিতে হইলে, যেখানে কেন্দ্র, সেইখানে রাজধানী। ভারতে কেন্দ্র আনিতে হইলে, ভারতের রাজধানীকেই সমগ্রসাম্রাজ্যের রাজধানী করিতে হইবে।

সেরূপ অসাধ্যসাধনে কাহারও সামর্থ্য আছে কি? কলিকাতাকে লণ্ডন করা কাহারও সাধ্য হইবে কি? কলিকাতাকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী করিতে হইলে, বৃটিশ সৌরজগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে কলিকাতায় আনিতে হইবে, তাঁহার মন্ত্রীদিগকে কলিকাতায় আনিতে হইবে, তাঁহার পার্লেমেণ্টকে ভারতে আনিতে হইবে, যত মন্ত্রীর যত আপিশ আমলাকে কলিকাতায় আনিতে হইবে। এরূপ অসাধ্য-সাধনে কাহারও স্বপ্নেও শক্তি সামর্থ্য হইবে না। কেবল কথার কেন্দ্রে ত রাজ্য চলিবে না; আর কাজের কেন্দ্র ত ভারতে কেহই বসাইতে পারিবেন না।

অতএব, লর্ড কুর্জ্জনের মত যাঁহারা বৃটিশ সৌরজগতের কেন্দ্র ভারতে আনিতে চাহেন, তাঁহাদের কথায় অলঙ্কারের ছটা—বর্ণনার ঘটা—থাকিলেও, প্রকৃত যুক্তির সম্বন্ধ নাই। কথা শুনিতে ভাল, শোনাইতে ভাল; কিন্তু ভাবিতে গেলেই ভুয়া ফাঁপা! প্রকৃত কার্য্যে দুই পন্থা আছে; হয় এখনকার মত বিলাতকেই কেন্দ্র রাখিয়া যত গ্রহ উপগ্রহকে বিলাত-সূর্য্যের একান্ত অধীন করিতে হইবে, না হয় যত গ্রহ উপগ্রহকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সূর্য্যে পরিণত করিয়া সকলকে স্বস্ব কক্ষে স্বাধীন করিয়া দিতে হইবে।

যত ঔপনিবেশিক গ্রহেই প্রায় স্বাধীনতা হইয়াছে; অষ্ট্রেলিয়ার যত গ্রহেই স্বাধীনতা; আফরিকার যত গ্রহেই স্বাধীনতা; আমরিকার কানাডা গ্রহেও স্বাধীনতা। সকল গ্রহেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কেন্দ্র আছে। রাজধানীই ত কেন্দ্র; সকল উপনিবেশ-গ্রহেরই রাজধানী স্বদেশে। লণ্ডনের সহিত কাহারই ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই, বিলাতের পার্লেমেণ্ট বা বিলাতের মন্ত্রীরা ত প্রায় কোন উপনিবেশের উপরই কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন না। সিংহল, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র গ্রহগুলিকে হিসাবের ভিতর না আনিলেও চলে। এ গুলিকে এখনও বিলাত-সূর্য্যের সহিত একটু ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। সিংহল সিঙ্গাপুর পূর্ব্বে ভারত-গ্রহেরই উপগ্রহ ছিল, এখন উহারা গ্রহের গ্রহ নহে, সকলেই এখন সাক্ষাৎ গ্রহ; কিন্তু সিংহলাদির এখনও আষ্ট্রেলীয় আফরিক বা আমরিক গ্রহদিগের ন্যায় সূর্য্যত্ব হয় নাই। এখনও কেন্দ্র স্বদেহে বসে নাই, এখনও বিলাতের কেন্দ্রেই ইহাদের কেন্দ্রত্ব চলিতেছে। আমরিকার জামেকা, ত্রিনিদাদ প্রভৃতিরও অবস্থা কতকটা এইরূপ বটে, কিন্তু কেবল লাভের বেলায়। জামেকা প্রভৃতি গ্রহে শর্করা-বিপত্তি উপস্থিত। জর্ম্মণ ফরাসী প্রভৃতি চিনির জন্যে ঐ সকল দ্বীপের চিনির কারবার উৎসন্ন হইতেছে। বিলাতকে এখন অর্থসাহায্য করিতে হইতেছে। বিষম বাত্যা বন্যায় বিপত্তি ঘটিয়াছে; বিলাতের অর্থে সাহায্য হইতেছে। এইরূপ অনুগ্রহ-লাভের সময়েই জামেকা প্রভৃতি গ্রহের বিলাতে কেন্দ্র, অন্য সময়ে সকলেই স্বাধীন; সকলের তখন কেন্দ্র স্বদেহে।

আমাদের ভারতই কিন্তু বিলাত-সূর্য্যের এখন প্রধান গ্রহ, আর সর্ব্বতোভাবেই অধীন গ্রহ; গলগ্রহ নহে বলিয়াই ভারত বিলাতের প্রধান গ্রহ। ভারত-গ্রহের কোন দিকেই কোনরূপ স্বাধীনতা নাই। সৌরজগতের যত গ্রহ উপগ্রহ সূর্য্যের অধীন হইলেও স্বস্ব কক্ষে স্বাধীনভাবে চলিতে পারে। কিন্তু বৃটিশ-সৌরজগতের এই ভারত-গ্রহের সে স্বাধীনতাও নাই; ভারতগ্রহ নিজের কক্ষেও স্বাধীনভাবে চলিতে পারে না! এস্থলেও বিলাতী-সূর্য্যের কর্ত্তৃত্ব চলে। ভারত-গ্রহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বড় লাট এখন সকল দিকেই পরাধীন; সকল দিকেই বিলাতী সূর্য্যের অধিষ্ঠাতৃদেবদিগের অধীন। বিলাতের দেবতারা ভারতের ষ্টেটসেক্রেটরিকেই প্রতিনিধি করিয়াছেন। তিনিই হইয়াছেন, ভারতের সর্ব্বময় কর্ত্তা; ভারত সম্বন্ধে তিনিই বিলাতী সূর্য্যের মুখ্য দেবতা। ভারতের অধিষ্ঠাতা বড় লাটকে তাঁহারই আদেশে চলিতে হইতেছে। ভারতগ্রহের যিনি পরিচালক, তাঁহারই স্বাধীনতা নাই; ভারতগ্রহের স্বাধীনতা থাকিবে কিরূপে? যাহার নিজের কক্ষে আবর্ত্তন করিবার স্বাধীনতা নাই, তাহার আবার স্বদেহে কেন্দ্র বসিবে কিরূপে? আর সেই কেন্দ্রেই বা রাজধানী হইবে কিরূপে?

সুতরাং লর্ড কুর্জ্জনের কেন্দ্র কল্পনায়ও শোভা পায় না! ভারতকে চিরদিনই বিলাত-সূর্য্যের বিশিষ্টগ্রহ হইয়াই থাকিতে হইবে। ভারতগ্রহ নিজের কক্ষেও কোন কালে স্বাধীনভাবে ঘুরিতে পাইবে না। সূর্য্যের সম্বন্ধ সে আবার ছাড়িবে কিরূপে? যাহার নিজের কক্ষে স্বাধীনতা নাই, তাহার আবার কেন্দ্র কিসের? তাহার আবার কেন্দ্র কোথায়?

"ভারতগ্রহের প্রার্থনীয় কি?" এ প্রশ্নে ভিন্ন ভিন্

রাজনীতিক জ্যোতির্ব্বিৎ ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিয়া থাকেন। কেহ বলেন, ভারতগ্রহকে বিলাতসূর্য্যের আরও ঘনিষ্ঠ করা উচিত, সকল বিষয়েই সম্পূর্ণরূপে বিলাতী সূর্য্যের আয়ত্ত করা উচিত। বলেন, "ভারতগ্রহের গ্রহত্ব ঘুচাইয়া উহাকে বিলাতী সূর্য্যেরই অঙ্গীভূত করিয়া ফেলা উচিত। যখন ঔপনিবেশিকগ্রহের মত স্বাধীনতা নাই, ভারতগ্রহ যখন নিজের কক্ষেও স্বাধীনভাবে চলিতে পারে না, তখন ত কাজে উহার গ্রহত্বই নাই; তবে কেন আর তাহার গলগ্রহত্ব বাড়ান হয়? ভারতগ্রহের কাজে গ্রহত্ব গিয়াছে; নামে গ্রহত্ব ঘুচাইয়া, উহাকে বিলাতী সূর্য্যের একেবারেই অধীন করিয়া দেওয়া উচিত। বিলাতী পার্লেমেণ্টের হাতে ভারতের সম্পূর্ণ ভার ন্যস্ত করা উচিত। পার্লেমেণ্ট যেমন বিলাতকে চালাইতেছে, সেইরূপ ভারতকেও চালাইবে, এইরূপ ব্যবস্থাই করা উচিত।" ইঁহারাই বলেন, "তাড়িত ও বাষ্পের কল্যাণে দূরতা ঘুচিয়া গিয়াছে; বিলাত হইতেই ভারতের সকল কার্য্য চালানো যায়, চালানো উচিত। শোভার্থ একজন বড় লাট রাখিয়া তাঁহার জন্যে বৎসর বৎসর ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। প্রদেশীয় লাটদিগের হাতেই রাজ্যভার রাখিলে যথেষ্ট হইবে। সকলকেই সকল বিষয়ে বিলাতী পার্লেমেণ্টের এবং বিলাতী গবর্ণমেণ্টের আদেশে চলিতে হইবে। ভারতের দুই এক-জনকে বিলাতী পার্লেমেণ্টে লইতে হইবে। ভারতের শাসনে বিচারে—সকল বিষয়ে সকল দিকেই—বিলাতী কর্ত্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে চলিবে। তাহা হইলেই "ভারতগ্রহের সুখ হইবে, গ্রহবাসীদিগের কষ্ট ঘুচিবে, সকলেই বিলাত-বাসীর সমান হইবে।"

অন্য দলের জ্যোতির্ব্বিদেরা বলেন, "ভারতকে স্বাধীন গ্রহ করিতে হইবে। ভারতের বড় লাটকে প্রকৃত প্রস্তাবেই ভারতের অধিষ্ঠাতা ও কর্ত্তা করিতে হইবে। ভারতের ভার তাঁহার হাতেই থাকিবে; বিলাতের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব ভারতে চলিবে না। ভারতের ভাল মন্দ যাহা হয়, ভারতেই হইবে। বিলাতের হস্তক্ষেপ করা অন্যায় হইতেছে; ভারতের তাহাতে ক্ষতিই হইতেছে, আর ভারত-গ্রহও বিলাতের পক্ষে এখন গলগ্রহ হইয়াছে।" এ দলের জ্যোতির্ব্বিদেরা কিন্তু ভারতকে প্রবাসী বৃটিশদিগেরই গ্রহ করিতে চাহেন, বৃটিশদিগকেই ভারতগ্রহের মুখ্য অধিবাসী করিয়া রাখিতে চাহেন। ভারতের স্বাধীনতা ইহাঁদিগের মতে ভারতীয় বৃটিশ বড় কর্ত্তার স্বাধীনতা, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারই সজাতীয়দিগের প্রভুত্ব

দুই দলের মাঝে আর এক দল আছেন। এ দলে ভারতবাসী আছেন, দুই একজন বিলাতবাসীও আছেন। ইহাঁরা বলেন, ভারতবাসীদিগের স্বাধীনতা বাড়াইয়াই ভারতগ্রহের স্বাধীনতা বাড়াইতে হইবে, ভারতের পরিচালনে ভারতবাসীদিগকে অধিকার দিতে হইবে, ভারতের শাসনে বিচারে রাজস্বে ভারতবাসীদিগকে কর্ত্তৃত্ব দিতে হইবে। বিলাতের মত ভারতে সভা সমিতি করিতে হইবে। সেই সভায় ভারতবাসীদিগকেই প্রধান অধিকার দিতে হইবে। বলেন, যত বৃটিশ উপনিবেশগ্রহে যেরূপ ব্যবস্থা আছে, ভারতগ্রহেও সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ভারতগ্রহের প্রার্থনীয় কোনটী? অবস্থা বুঝিয়া ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে এখানে উপনিবেশের মত বন্দোবস্ত হইবে না; হইলেও এখন চলিবে না। ভারতের বৃটিশেরা ভারতবাসীদিগকে কর্ত্তৃত্ব করিতে দিবেন না। উপনিবেশে ভারতে প্রভেদ অনেক। উপনিবেশে বৃটিশবংশজদিগেরই প্রাধান্য, আদিম-দিগের অস্তিত্ব নামে আছে কাজে নাই। উপনিবেশের অধিবাসী বলিতে বৃটিশ বংশজদিগকেই বুঝিতে হয়। আর না হয়, কানাডার মত যেখানে অন্যান্য ইউরোপীয় বা তদ্বংশজেরা সকল বিষয়েই বৃটিশবংশজদিগের সমান হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও বুঝিতে হয়। আসল আমরিকদিগকে আমরিকায় বুঝিতে হয় না, আসল আফ্রিকদিগকেও আফ্রিকায় ধরিতে হয় না, আসল অষ্ট্রেলীয়দিগকেও অষ্ট্রেলিয়ার লইতে হয় না। সুতরাং উপনিবেশে স্বাধীনতা হইয়াছে শ্বেতপুরুষদিগের।

ভারতের অবস্থা অন্যরূপ। যত উপনিবেশের আদিমেরা অসভ্য ছিল, এখনও আছে; সকলেরই ক্রমশঃ লোপ হইতেছে। ভারতের আদিমেরা অসভ্য নহে। ইহাদিগের ত লোপ হয় নাই, হইবেও না। অথচ ভারতের লোক বলিতে ইহাদিগকেই বুঝিতে হয়। উপনিবেশের লোক বলিতে যেরূপ তত্রত্য বৃটিশবংশজাদি শ্বেতপুরুষদিগকেই বুঝিতে হয়, ভারতের লোক বলিতে সেরূপ বুঝিতে হয় না। এখনও ভারতে ভারতীয় লোকেরই আধিক্য। আধিক্য বলিয়া আধিক্য! আটাশ উনত্রিশ কোটির কম হইবে না! ইহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া ত আর সহজ নহে! উপনিবেশের শ্বেতপুরুষেরা স্বাধীনতা পাইয়াছেন, ভারতের শ্বেতপুরুষেরাও না হয় পাইতে পারেন। কিন্তু উনত্রিশ কোটি অশ্বেতপুরুষকে স্বাধীনতা দেওয়া ত সহজ ব্যাপার নহে! আর ভারতের শ্বেতপুরুষদিগের স্বাধীনতা হইলেও ত ভারতের পক্ষে শুভ নহে, ভারতবাসীদিগের পক্ষে শুভ নহে। ইহাদিগের স্বাধীনতা নাই বলিয়া, এখনও ভারতে উপনিবেশের অবস্থা হয় নাই; এখনও ভারতীয় আদিম-দিগকে উৎসন্ন হইতে হয় নাই।

ভারতের শ্বেতপুরুষদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে; ভারতের অসংখ্য অশ্বেতপুরুষকেও স্বাধীনতা দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চলিতে হইবে।

সুতরাং ভারতগ্রহ উপনিবেশের মত স্বাধীনগ্রহ হইতে পাইবে না। পাওয়াও তাহার উচিত নহে। ভারত বিলাতের সহিত মিশিয়াও যাইতে পারিবে না। ধর্ম্মে ভিন্নতা, কর্ম্মে ভিন্নতা, বিশ্বাসে ভিন্নতা, আশ্বাসে ভিন্নতা; ভিন্নতা সকল দিকে। ভারত বিলাতে মিলিয়া যাইবে না। ভারতের অবস্থা ব্যবস্থা যেরূপ আছে, সেইরূপই থাকিবে, ভারতকে বিলাতের অধীন কিন্তু স্বতন্ত্র গ্রহ হইয়াই থাকিতে হইবে। ভারতের বড় লাটই বড় লাট থাকিবেন। ভারতের ছোট লাটেরাও ছোট লাট থাকিবেন। বিলাতের কর্ত্তৃত্বও ইহাঁদিগকে মানিতে হইবে। তবে ঐ কর্ত্তৃত্বের তারতম্য হইতে পারে। কথায় কথায় কর্ত্তৃত্ব না চালাইয়া, সকল বিষয়েই প্রভুত্ব না করিয়া, বিলাতের কর্ত্তা—ষ্টেটসেক্রেটরি—অনেক বিষয়েই ত ভারতের কর্ত্তাকে কর্ত্তা করিতে পারেন। ভারতের হিতে অধিক দৃষ্টি রাখিতে চান, ভারতের স্বার্থে অনায়াসেই আনুকূল্য করিতে পারেন। ন্যায়পরতা ও সমদর্শিতার ভাগ একটু বাড়াইয়া দিলেই বিলাতের কর্ত্তারা কাজ সহজ করিতে পারেন; বিলাতের পার্লেমেণ্টও মনে করিলে—ইচ্ছা করিলে—ভারতগ্রহের গতিবিধি বিষয়ে ভাল বন্দোবস্ত করিতে পারেন। বিলাতের স্বার্থপরতা কিছু কমিলেই ভারতের স্বার্থরক্ষা হইতে পারে। আর, তন্ন-তন্ন করিয়া না দেখাইলেও, পাঠক বুঝিতে পারিবেন, বিলাতী স্বার্থের প্রখরতা কমিলেই কিরূপে ভারতের মঙ্গল হইতে পারে।

আভাসমাত্র দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য, আভাস দিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। বিশাল বিরাট বৃটিশ সাম্রাজ্যের—ইংলণ্ডীয় সৌর জগতের—কেন্দ্র যেরূপ ইংলণ্ডেই আছে, সেইরূপই থাকিবে; কেন্দ্রস্থল রাজধানী যেরূপ লণ্ডনে আছে সেইরূপ থাকিবে। ভারতে কেন্দ্র কোন কালেই হইবে না; কলিকাতায় রাজধানী কোন কালেই হইবে না। লর্ড কর্জ্জনের কেন্দ্রকথা কাব্যে শোভা পাইতে পারে, কল্পনায় শোভা পাইতে পারে; প্রকৃতে কোন কালেই শোভা পাইবে না; অসাধ্যের সাধন ত কিছুতেই হইবে না।

সুখের মাপ।

হিন্দুর জীবন ঈশ্বরাদিষ্ট—শাস্ত্রোপদিষ্ট—কর্ম্মের জন্যে; সুতরাং হিন্দুর পক্ষে "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্;" শরীররক্ষা না হইলে ত আর জীবনরক্ষা হয় না। দেহ হিন্দুকে সুস্থ রাখিতেই হইবে, মনকে সুস্থ ত রাখিতেই হইবে। দেহ ও মনকে সুস্থ রাখিবার তরে যাহা আবশ্যক, হিন্দুর পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। সাধ করিয়া নিজের দুঃখ বাড়ানো হিন্দুর পক্ষে অকর্ত্তব্য; ক্রমাগত অভাববৃদ্ধি হইলে ত কর্ত্তব্যরক্ষা হয় না। সুতরাং হিন্দুর পক্ষে দুরাকাঙ্ক্ষ এবং সদা-অসন্তুষ্ট হওয়া অনুচিত। বিলাসের সংখ্যা-বৃদ্ধি হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত নহে, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রেরও অনুমোদিত নহে। হিন্দুর সভ্যতা হৃদয়ে; হৃদয়কে সুস্থ রাখিবার তরে দেহের স্বাস্থ্য আবশ্যক। সেই স্বাস্থ্যের জন্যে দেহের যত অভাব, তাহার পূরণ করিতে হিন্দু অবশ্যবাধ্য, কিন্তু সেই অভাবের অকারণ বর্দ্ধন করিতে হিন্দু বাধ্য নহেন; বরং সেরূপ বর্দ্ধন হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ। বিলাসের বৃদ্ধি হইলেই এই কর্ত্তব্যে ব্যাঘাত হয়, ব্যতিক্রম ঘটে। বিলাস চরিতার্থ করিবার শক্তি সকলের নাই, অথচ বিলাস-বাসনা সকলেরই বলবতী হইল; এরূপ অবস্থায় মনের অসুখ বাড়িয়া উঠিল। মনের অসুখ বাড়িয়া উঠিলেই সব পণ্ড হইল! ইউরোপ আমরিকায় তাহাই হইতেছে! আমাদের ভারতেও এখন হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

ইংরেজেরা স্বদেশের দৃষ্টান্তে—স্বদেশের মতে—স্বদেশের জ্ঞানে—নির্ভর করিয়াই সকল বিষয়ের বিচার করেন। তাই এদেশের কৃষকদিগকে বিলাতী ছাতা মাথায় দিতে দেখিয়া, জুতা পায়ে দিতে দেখিয়া, হাতে ব্যাগ ঝুলাইতে দেখিয়া, সিদ্ধান্ত করেন, কৃষকের ও কৃষিশ্রমী কৃষাণ-মজুরের সুখবৃদ্ধি হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহার কেবল অভাব বাড়িতেছে; নব নব অভাবের পূরণ করিবার তরেই তাহাকে বিব্রত হইতে হইতেছে। তাহার দেহের সুখ বাড়ে নাই, দেহ তাহার পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ সবল হয় নাই; তাহার পরমায়ু বাড়ে নাই। পরন্তু তাহার মনে দুশ্চিন্তা অনেক বাড়িয়াছে; দুশ্চিন্তা বাড়িলেই মন অসুস্থ হয়। অভাব যত বাড়িতেছে, পূরণশক্তি তত বাড়িতেছে না; কাহারই কোন দেশে তত বাড়ে না। এই জন্যেই ত ইউ-রোপ আমরিকায় অসন্তোষ বাড়িতেছে। আর অসন্তোষ বাড়িতেছে বলিয়াই সমাজ ক্রমশঃ বিপন্ন হইতেছে। সাম্যবাদের প্রবন্ধে ইহা বেশ করিয়া দেখাইয়াছি, পরে মজুরপ্রলয়ের প্রবন্ধেও ইহাই আলোচ্য হইবে।

ইউরোপীয় সমাজতত্ত্ববিদেরাও ইউরোপীয় মতেই সকল দিকের আলোচনা সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। সাম্য-বাদে এবং সুতরাং সমাজবিপ্লবে ইহাঁরাই ত সুতরাং প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছেন। একটা দৃষ্টান্তে ইহাঁদিগের অমূলক আনন্দের আভাস দিব। যে সকল লোকে কৃষিকার্য্যে মজুরী করে, অর্থাৎ যাহারা পরের জমিতে চাষ করিয়া পয়সা রোজগার করে, তাহাদিগের পূর্ব্বতন ও অধুনাতন অবস্থায় তুলনা করিয়া বিলাতের যত সমাজতত্ত্ববিৎ এখন একটু একটু আনন্দ করিয়া থাকেন। তাঁহাদেরই একজনের আনন্দমূলক হিসাবে দেখিতে পাইবে;

"২৫ বৎসর পূর্ব্বে ইহাদিগের মজুরীর প্রাপ্য, বাস-গৃহ, শিক্ষা অতি মন্দ ছিল; দেশের পক্ষে ঘোর কলঙ্ক-জনক ছিল। ১৮০০ সাল হইতে ১৮৩৪ সাল পর্য্যন্ত ইহাদের আহার বিহারাদি অতীব হীন ও দারিদ্র্য-ব্যঞ্জক ছিল। ইহাদিগের দিনমজুরীতে কুলাইত না, গ্রাম্যসংস্থান হইতে সাহায্য করিতে হইত। কিন্তু গত পনর বৎসরে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে।" ১৮৯৪ সালের মজুর-কমিশনে যত মজুরের অবস্থা সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ ও

আলোচনা হইয়াছে। মজুর-প্রলয়ের প্রবন্ধে সে কমিশনের পরিচয় প্রাপ্য; শ্রমিকতুষ্টির উদ্দেশ্যাদিও সেই প্রবন্ধের আলোচ্য। সেই কমিশনের কৃষিবিষয়ক কমিশনর লিটিল সাহেব নিজের রিপোর্টে কৃষিশ্রমীদিগের বর্ত্তমান সুখ স্বচ্ছন্দের কথা কহিবার সময়ে বলিয়াছেন;

"দৈনিক পরিশ্রমের কাল অনেক কমিয়া গিয়াছে। চারিদিকে কল বন্ধ হওয়ায় কঠোর কার্য্য সহজ হইয়াছে। অনেক জেলাতেই দেখা গেল, আর মেয়েপুরুষের কাজ করিতে হয় না, কেবল পুরুষেরাই খাটুনী খাটে। ছোট ছোট বালক বালিকাদিগের কৃষিশ্রম আইনের সাহায্যে রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আবার এখন অনেক কৃষকতনয় ও কৃষকতনয়া বিনা বেতনে বিদ্যালাভ করিতে পাইতেছে। বাসভবনেরও উন্নতি হইয়াছে। এখনকার মজুর খায় ভাল, পরে ভাল, থাকে ভাল ঘরে। পিতা পিতামহের যে সুখ ঘটে নাই, এখন পুত্র পৌত্রদিগের তাহা ঘটিয়াছে। এখন সে স্বচ্ছন্দে থাকে, খাটে কম। তাহার পুত্র কন্যারা ভবিষ্যৎ সুখ সমৃদ্ধির আশা করে, সমাজের উচ্চ সোপানে উঠিবার আকাংক্ষা রাখে; সে পক্ষে সুযোগ সুবিধাও দেখিতে পায়। পিতা পিতামহের যাহা ছিল না তাহা ইহাদের হইয়াছে; আবার ইহাদের পুত্র পৌত্রেরা আরও উচ্চে উঠিবার সুযোগ পাইতেছে।" কিন্তু অসন্তোষও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতেছে; সাম্যবাদও ক্রমেই পসার বাড়াইয়া লইতেছে; যত মজুরসম্প্রদায়েই সাম্যবাদ প্রবেশ করিতেছে; সকলই ইচ্ছা করিতেছে, এখন যে শ্রম টুকু করিতে হইতেছে, সে টুকুও করিব না। ফলে মজুরপ্রলয়ের পথই ক্রমে মুক্ত হইতেছে। আবার সুখের হিসাবটা অঙ্কে ফেলা হইয়াছে। দেখ পাঠক, দেখ দেখ;

"১৮৭১ সালে ইংলণ্ড ওয়েল্‌সে ৯ লক্ষ ৯৬ হাজার ৬৪২ জন কৃষিক্ষেত্রে মজুরী করিয়াছিল, স্কটলণ্ডে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ৯৬ জন কৃষিকার্য্যে কৃষাণী করিয়াছিল। কিন্তু ১৮৮৪ সালে সেই ইংলণ্ড ওয়েল্‌সে ৮ লক্ষ ৯০ হাজার ১৭৪ জনকে, আর স্কটলণ্ডে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৭৬১ জনকে খাটিতে হইয়াছিল!" কত কমিল দেখিলে! আবার ১৮৯১ সালে আরও কম, ইংলণ্ড ওয়েল্‌সে ৭ লক্ষ ৯৮ হাজার ৯১২ জন, স্কটলণ্ডে ১ লক্ষ ২০ হাজার ৭৭০ জন। অর্থাৎ ইংলণ্ড ওয়েল্‌সের মোট লোকসংখ্যার অনুপাতে ১৮৭১ সালে খাটিয়াছিল শতকরা প্রায় ৪।০ জন, ১৮৮৪ সালে ৩৷৷০ জনেরও কম, আর ১৮৯১ সালে ২৸০ জন মাত্র। আর স্কটলণ্ডে শতকরা ১৮৮১ সালে প্রায় ৫ জন, ১৮৮৪ সালে ৪ জন, ১৮৯১ সালে ৩ জন। মজুরীর হার বাড়িয়াছে; ইংলণ্ড ওয়েল্‌সে প্রত্যেকের সাপ্তাহিক বেতন গড় পড়তায় ১২।০ শিলিং; কোন কোন স্থলে অনেক অধিক। স্কটলণ্ডে গড়েই ১৮৸০ শিলিং, স্থলবিশেষে আরও অধিক।

এই ত সুখের মাপ! আর এই মাপেই ইংরেজরাজ ভারতেও মাপিতে চাহেন, মাপিবার ব্যবস্থাও করিতে চাহেন। বিলাতে কৃষিমজুরের সংখ্যা ক্রমেই কমিতেছে; ইহা ১নং সুখ। কিন্তু দেশে বেকারের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে; আর বেকার মজুরদিগের জন্যে মধ্যে মধ্যে শুদ্ধ সমাজে কেন রাজ্যে পর্য্যন্ত প্রলয় উপস্থিত হইতেছে। মজুরেরা পূর্ব্বে পরিশ্রম করিয়া দুই পয়সা রোজগার করিত, এখন তাহাদিগকে রোজগার করিতে হয় না; ঘরে বসিয়া থাকে, অথচ স্বাধীনতার উপভোগ করে; এটা হইল ২ নম্বরের সুখ! যে দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা পূর্ণ মাত্রায়, সে দেশের স্ত্রীলোকদিগকে কাজ করিতে হয় না; সুখের চরম!

কৃষিমজুরদিগের খাটুনী কমিয়াছে, রোজগার বাড়িয়াছে। কিন্তু কলের জন্যে অনেকের কাজ গিয়াছে, ক্রমে সংখ্যা যত কমিবে, ততই সুখ বাড়িবে। অথচ কৃষিমজুরদিগের ক্রন্দন বাড়িয়াছে, চীৎকার বাড়িয়াছে। চীৎকার শুনিয়া রাজপুরুষদিগকেও ভীত হইতে হইয়াছে। যখন এরূপ সুখ ছিল না, তখন এত চীৎকার শুনিতে হইত না। তখন এত ঘন ঘন ধর্ম্মঘট হইত না, ধর্ম্মঘটের এত ঘটা হইত না, ধর্ম্মঘটের জন্যে রাজ্যে প্রলয় উপস্থিত হইত না।

যদি সুখই বাড়িয়াছে, তবে অসন্তোষ বাড়িতেছে কেন? রোজগার বাড়িতেছে, কিন্তু অভাবও বাড়িতেছে; রন্ধনের চাউল চর্ব্বণে যাইতেছে; লাভের গুড় পিপড়ায় খাইতেছে! আয় যদি বাড়িয়া থাকে এক গুণ, ত খরচ বাড়িয়াছে চারিগুণ। বিলাসের যতই সংখ্যা বাড়িতেছে, অভাবেরও ততই মাত্রা চড়িতেছে।

বস্তুতঃ যাহাকে প্রকৃত সুখ বলে, তাহা বিলাতের মজুরদিগের বাড়ে নাই। পিতা পিতামহদিগের যে সন্তোষ ছিল, পুত্র পৌত্রদিগের সে সন্তোষ নাই। সুতরাং তাহাদের যে সুখ ছিল, ইহাদের সে সুখ নাই। ইংরেজের পাশ্চাত্য মতে যাহা সুখ, আমাদের প্রাচ্য মতে তাহা সুখ নহে। ইংরেজের খৃষ্টানী মাপে যাহাতে যত সুখ, আমাদের হিন্দু মাপে তাহাতে তত সুখ দৃষ্ট হয় না।

কিন্তু রাজা ইংরেজ ভারতেও বিলাতের সুখ আনিবার তরে চেষ্টা পাইতেছেন, যথাসাধ্য আয়োজনও করিতেছেন। মজুরতনয়দিগের বিদ্যালাভের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ব্যবস্থায় ক্রমেই বাড়াবাড়িও করিতেছেন। মজুরদিগের বিলাসবৃদ্ধি দেখিয়া আনন্দ করিতেছেন। মজুরপত্নীদিগকে বিনাশ্রমে কাল কাটাইতে দেখিলে আরও আনন্দিত হইবেন। ক্রমেই সুখ সপ্তমে উঠিবে! শেষে সাম্যবাদের বাতাস আসিলেই কিন্তু সর্ব্বনাশ হইবে! লোকের অসন্তোষ যত বাড়িবে, রাজ্যের আশঙ্কা আতঙ্কও তত বাড়িবে।